এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-১: ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ

প্রশ্ন ▶১ ঔপনিবেশিক শাসন ও নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পেষিত 'M' রাষ্ট্রের জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে চলেছে। গণআন্দোলনে বাধ্য হয়ে শাসকগোষ্ঠী একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রকে দুভাগে ভাগ করে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে দেশ ত্যাগ করে। *[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার সদস্য সংখ্যা কতজন? ১

খ. বঙ্গভঙ্গ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো আইনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার সদস্য সংখ্যা ৩ জন।

খ বঙ্গভঙ্গ বলতে ১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ২ ভাগে বিভক্ত করাকে বোঝায়।

প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের বাংলা প্রেসিডেন্সিকে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম এবং বাংলা প্রদেশ নামে ২টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। যা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রণীত আইনের সাথে আমার পঠিত ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতবর্ষের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের এক পর্যায়ে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে গণআন্দোলন শুরু করে। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পরস্পর বিরোধী দাবির প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার মহাসমস্যায় পড়ে। ভারতের এই রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার লক্ষ্যে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটি কার্যকর করার লক্ষ্যে ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি একটি বিল উত্থাপন করেন। এ বিলে ব্রিটিশ ভারতে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই বিলটি রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এটিই ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে খ্যাত।

উদ্দীপকের 'M' রাষ্ট্রের জনগণ ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে চলেছে। তাদের গণআন্দোলনে বাধ্য হয়ে শাসকগোষ্ঠী একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। শাসকগোষ্ঠীর প্রণীত নতুন আইন অনুযায়ী জন্ম হয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। এ আইনের সাথে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে পাকিস্তান ও ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দূরীভূত হয়।

দীর্ঘ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা হয়। এজন্য এ আইন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দলিল। উক্ত আইন প্রণয়নের ফলে এ উপমহাদেশে রক্তপাতহীন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়াই স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য ইত্যাদিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। নতুন প্রেরণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুটি স্বাধীন দেশের জনগণ নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶২ 'গ' একজন রাজনৈতিক নেতা। মানবতার কল্যাণ তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কখন? ১

খ. 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক প্রস্তাবের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল- বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

খ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। তার মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, জীবন পরিচালনা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে তারা পৃথক দুটি জাতি। তার এই মতবাদটি 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে আলোচিত প্রস্তাবের সাথে আমার পঠিত লাহোর প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে তৎকালীন ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোর সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসন সংক্রান্ত

Teachingbd24.com

অধিকার রক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়। এ প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলিম রাজনীতিতে ইতিবাচক সাড়া জাগে এবং মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত অর্জন করে।

উদ্দীপকের 'গ' একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কথা চিন্তা করে তাঁর অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রস্তাবের মধ্যে অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল- আমি এ উক্তিটিকে যথার্থ মনে করি।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রস্তাবের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়। যে রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি জানায়।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সবকিছুই ছিল লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বিজয় হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে পূর্ববাংলায় শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৮৮৫ সালে সর্বপ্রথম এ উপমহাদেশে একটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। মুসলমানগণও তাদের স্বার্থ এবং দাবি-দাওয়া পূরণের উদ্দেশ্যে আরো একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দল দুটি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য দেখায়। পরবর্তীতে দল দুটির নেতৃত্বে ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। *[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন কোন রাজনৈতিক দলের কথা বলা হয়েছে? যেকোনো একটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. ভারত বিভক্তিতে উক্ত দল দুটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে প্রদেশগুলোর নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। এতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমত, সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশ আত্মনির্ভরশীল হবে। মোটকথা, প্রদেশগুলোর সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্তি এবং প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বশীল হওয়াই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

গ উদ্দীপকে 'কংগ্রেস' ও 'মুসলিম লীগ' নামে ব্রিটিশ ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কথা বলা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৮৫ সালের শেষের দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। দলটির সদস্যপদ হিন্দু-মুসলিম সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ইংরেজ শাসকদের কাছে দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে মুসলমানরা নিজেদের একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগ নামে মুসলমানদের নিজস্ব দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ দলটি গঠিত হয়েছিল। যথা:

১. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য প্রদর্শন এবং সরকারের কোনো নীতি সম্পর্কে তাদের মনে ভুল ধারণা জন্মালে তা দূর করা।

২. ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষা এবং তাদের অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া গঠনমূলকভাবে সরকারের কাছে উপস্থাপন করা।

৩. এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি যেন কোনো বিদ্বেষভাব না জাগে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. রাজনীতিতে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব করা।

ঘ ভারত বিভক্তিতে উক্ত দল দুটি অর্থাৎ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটির সদস্যপদ হিন্দু-মুসলিমসহ সব ভারতীয়র জন্য উন্মুক্ত ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের কিছু সিদ্ধান্তে মুসলমানরা ভিন্নমত পোষণ করে এবং তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকার আদায় ও অগ্রগতির লক্ষ্যে মুসলিম নেতারা কংগ্রেসের প্রতি হতাশা থেকে ১৯০৬ সালে পৃথক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতীয় কংগ্রেস দল ভারতীয়দের অধিকার আদায়ে নানামুখী কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ফলে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে তাদের প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে। প্রথমদিকে কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করে। তবে পরে এ সংগঠনটি ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

অন্যদিকে বিংশ শতকের শুরুর দিকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। সাংগঠনিক ভিত্তি থাকায় মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় সহজ হয়। পৃথক নির্বাচনের দাবিসহ মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সংগ্রাম করায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন ক্রমশ বাড়তে থাকে। গঠনের পরবর্তী ৪০ বছরে (স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত) মুসলমানদের মধ্যে দলটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এদিকে ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) নীতিসহ বিভিন্ন কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। এমন প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। এতে মুসলিমদের পৃথক জাতি হিসেবে উল্লেখ করে তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতবাসীর মনে স্বাধিকারের চেতনার জন্ম দিয়েছিল। কিছু চেষ্টা সত্ত্বেও দুই দলের নেতাদের মতপার্থক্য শেষ পর্যন্ত দূর করা সম্ভব না হওয়ায় ভারত অনিবার্যভাবে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্তির পথে এগিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ ছকটি দেখো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]

ক. দ্বৈতশাসন কী? ১

খ. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে [?] চিহ্নিত স্থানে কোন ভারত শাসন আইনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা আলোচনা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবার্ট ক্লাইভ দুই জনের যে অভিনব শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাকে দ্বৈতশাসন বলে।

খ লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা।

লাহোর প্রস্তাবের ধারাগুলো বিবেচনা করলে এর কিছু মৌলিক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন : ১. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন স্থানসমূহকে 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিতকরণ। ২. ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন এবং এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রদেশগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। ৩. সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ। ৪. লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে দেশের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কথা বলা হয়েছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ আইনের বলেই ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। উদ্দীপকটি এই আইনের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কথা বলা হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও এ বিষয়গুলোর উল্লেখ আছে। এ আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। এতে বলা হয়- প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশ আত্মনির্ভরশীল হবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়সমূহকে সংরক্ষিত এবং হস্তান্তরিত এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আলোচ্য আইনটির মাধ্যমে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করা। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, উদ্দীপকটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকেই নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আইন অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিভিন্ন কারণে অকার্যকর হয়ে পড়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এ আইন প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট অর্থাৎ ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল। তবুও এ আইন বিভিন্ন মহলে বহুলভাবে সমালোচিত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলেও বিভিন্ন কারণে তা যথার্থ ছিল না। তাই স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতার পথে ওই কারণগুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নরগণ ছিলেন প্রকৃত শাসক। তারা ব্রিটিশ রাজা বা রানি কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং সীমাহীন ক্ষমতা লাভ করতেন। তাদের এই ক্ষমতা এবং তার অপব্যবহার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক ধারণার সাথে অসংগতিপূর্ণ ছিল। গভর্নর জেনারেলেরও ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক নীতিকে খর্ব করেছিল। এছাড়া প্রাদেশিক আইনসভার সীমাবদ্ধতা, যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য, আমলা, বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য, গভর্নরের নিয়ন্ত্রনাধীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগ, প্রাদেশিক বিষয়ে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা কোনো দিনই কার্যকর হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক প্রশাসনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা হলেও এটি কোনো প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ছিল না। মূলত এ শাসন ব্যবস্থা ছিল একটা আড়ম্বরপূর্ণ প্রহসনমাত্র। ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তার মৌলিকতা হারিয়ে এক বিকৃত ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫ নাগরিকদের অধিকতর সেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দু'ভাগে ভাগ করে 'ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন' ও 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন' নামে পৃথক দুটি সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করে।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২; নায়েক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ২]

ক. বঙ্গভঙ্গ কী? ১

খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করা— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশকে(প্রদেশ) বিভাজন করাই হলো বঙ্গভঙ্গ।

খ ব্রিটিশ শাসনামলের শুরুর দিকে বাংলার শাসনভার সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করাই হলো দ্বৈত শাসন।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভের (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) পর লর্ড ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। দ্বৈত শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নামেমাত্র নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি ও জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার ইত্যাদি লাভজনক কাজ কোম্পানি নিজের হাতে রাখে। বলা হয়, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ঐতিহাসিক ঘটনা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সাদৃশ্য আছে।

বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি প্রশাসনিক বোঝা লাঘব করে। তাছাড়া এটি নবগঠিত পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি ও জীবনমান উন্নয়নে নতুন যুগের সূচনা করে। উদ্দীপকে বর্ণিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দু'ভাগে ভাগ হওয়ার সাথে বঙ্গভঙ্গের সাদৃশ্য আছে।

ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশ ছিল আয়তনে ও জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড়। একজন গভর্নর জেনারেলের পক্ষে এত বড় প্রদেশ শাসন করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন (George Nathaniel Curzon; 1859-1925) ভারত সচিবকে লিখেছিলেন যে, একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে এত বড় ও জনবহুল এলাকা শাসন করা সম্ভব নয়। তার এ লিখিত রিপোর্টের আলোকেই ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নতুন প্রদেশটি গঠিত হয় পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা, রাজশাহী(দার্জিলিং বাদে), চট্টগ্রাম ও আসাম নিয়ে। এর নাম হয় 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ। ঢাকাকে এ নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ; কলকাতা হয় এর রাজধানী।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, নাগরিকদের অধিকতর সেবা দেওয়ার জন্য সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দু'ভাগে ভাগ করে। এর একটি হলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; যা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ঘটনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করা— এ বক্তব্যটি যথার্থ।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ থাকলেও এর অন্যতম কারণ ছিল রাজনৈতিক তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করা। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয়রা নিজেদের অধিকারের বিষয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে বিশেষ করে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়।

ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে 'যুগান্তর দল' এবং 'অনুশীলন সমিতি' নামে দুটি অতি বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। এসব আন্দোলনে ভীত হয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের চিরায়ত শাসন কৌশল 'ভাগ কর এবং শাসন কর নীতি' (Divide & Rule Policy) প্রয়োগ করে। বাংলা তথা বঙ্গপ্রদেশকে বিভক্ত করে ব্রিটিশরা এ দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করে তাদের শাসনকে দীর্ঘায়িত করার কৌশল গ্রহণ করে। এছাড়া ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহও বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন শুরু করে জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সুযোগ পাবে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। শিক্ষিত হিন্দু সমাজ মনে করে, তাদের দ্রুত বেড়ে ওঠা বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে ব্যাহত করা এবং এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ব বাংলার মুসলিম প্রভাব বাড়ানোকে উৎসাহিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। আবার বাংলার অধিকাংশ বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের হাতে, তাই বঙ্গভঙ্গের ফলে তারা আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এভাবেই বঙ্গভঙ্গের দ্বারা ব্রিটিশ শাসকগণ কৌশলে কলকাতাকেন্দ্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার সুযোগ লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রশাসনিক কাজ সহজতর করার পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশরা 'ভাগ কর ও শাসন কর' কৌশল সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের থেকে আলাদা করে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার অনৈক্য ভারতে তাদের শাসনকে আরো শক্তি যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶৬ 'ক' রাষ্ট্রের প্রদেশগুলোতে প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে দুভাগ করে সংরক্ষিত বিষয় ও হস্তান্তরিত বিষয় নামে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংরক্ষিত বিষয়গুলো গভর্নর তার হাতে রাখেন। *[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কী? ১

খ. লাহোর প্রস্তাব বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের প্রদেশে প্রবর্তিত আইনের সাথে তোমার পঠিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ ভারতে সাংবিধানিক সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে ভারত সচিব জন মর্লে ও গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর উদ্যোগে ১৯০৯ সালে যে সংস্কার আইন পাস করা হয়, তাই মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন নামে পরিচিত।

খ ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনাই হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। বস্তুতপক্ষে, ভারতের মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শগত পার্থক্যের ফল ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্রের প্রদেশে প্রবর্তিত ব্যবস্থার সাথে আমার পঠিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়। এটি ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। সাধারণত দ্বৈতশাসন বলতে কোনো প্রশাসনে দুটি কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিকে বোঝায়। এমন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিষয়কে দুভাগে ভাগ করা হয় এবং পরিচালনার জন্য দুই ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক বিষয়গুলোকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এ দুভাগে ভাগ করা হয়। বিচার বিভাগ, ভূমিরাজস্ব, পুলিশ, জেল, ভূমি উন্নয়ন ও কৃষিঋণ, ত্রাণ, সেচ, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ, বনজশিল্প, বিমা, গৃহ নির্মাণ, ঋণদান, শ্রমিক সমস্যার সমাধান, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয় হিসেবে পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নর ও তার কার্যনির্বাহী পরিষদের ওপর ন্যস্ত হয়। অপরদিকে কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, মৎস্য, স্থানীয় সরকার, জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে পরিচালনার ভার গভর্নর ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত হয়। প্রাদেশিক গভর্নর হস্তান্তরিত বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হতেন। উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের প্রদেশগুলোতে আমরা দেখতে পাই, প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে দুভাগ করে সংরক্ষিত বিষয় ও হস্তান্তরিত বিষয় নামে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সংরক্ষিত বিষয়সমূহ গভর্নর তার হাতে রাখেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের রাষ্ট্রের আইন আমার পঠিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকারিতার দিক দিয়ে ব্যর্থ হলেও ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের দিক দিয়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ধাপে ধাপে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। কেননা, এ আইনে গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক বিষয়গুলোকে দুটি সংস্থায় বা দুভাগে বিভক্ত করায় সরকারের স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়ে প্রহসনে পরিণত হয়।

যেকোনো দেশে দলব্যবস্থা সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু প্রদেশে দ্বৈত শাসন কার্যকর করার সময় এমন দলব্যবস্থা ছিল না। মন্ত্রীগণ যৌথভাবে নিযুক্ত না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত হন এবং সরকারি সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল থাকতেন। তাছাড়া মন্ত্রিসভার দায়িত্বহীনতা, সংসদীয় ঐতিহ্যের অভাব, বিষয় বণ্টনের ত্রুটি, মন্ত্রিসভা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রভৃতি কারণে ১৯১৯ সালের আইনটি কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আইনটির মাধ্যমে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয়নি। তাই এ আইন ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো এ আইনকে অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যজনক বলে ঘোষণা করে এবং প্রত্যাখ্যান করে।

স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় এবং কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে জনগণ শীঘ্রই ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বিরোধিতা শুরু করে। তবে সাংবিধানিক সংস্কারের দিক বিবেচনায় এ আইনকে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৭ প্রশাসনিক সুবিধার্থে 'ক' অঞ্চলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অবশ্য এর পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কত সালে গঠিত হয়? ১

খ. বেঙ্গল প্যাক্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি ব্রিটিশ ভারতের কোন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনাটি ভারতবর্ষের রাজনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? আলোচনা করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

খ ব্রিটিশ আমলে বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাক্ট।

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগই ছিল মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অশিক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্য খ্যাত নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এ বৈষম্য দূর করতে বেঙ্গল প্যাক্ট এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীসহ বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়। অনগ্রসর মুসলিমদের কিছু বাড়তি সুবিধা দিয়ে সরকারি চাকরি ও আইন পরিষদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস করাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়। এ ঘটনার পেছনে যে কারণগুলো নিহিত ছিল, উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলটি ভাগের ক্ষেত্রেও সেগুলো লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলটি প্রশাসনিক কারণে ভাগ করা হয়েছিল। তবে এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রেও তেমনটিই দেখা যায়। ১৯০৫ সালের আগে ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বঙ্গই ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এর আয়তন ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। তাই প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করা হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কলকাতা নগরই ছিল ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী এবং বাংলা প্রদেশের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ দিনে দিনে পিছিয়ে পড়েছিল। শিক্ষার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে অনগ্রসর পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল চরম হতাশা। তাই উন্নয়ন ও অধিকার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের দাবি পূরণ এবং একইসঙ্গে কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ শুধু প্রশাসনিক কারণই নয়, ১৯০৫ সালে বাংলাকে বিভক্ত করার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল। বঙ্গভঙ্গের উল্লিখিত কারণগুলো উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের বিভক্তিকরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উদ্দীপকের উক্ত ঘটনাটি অর্থাৎ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনগ্রসর মুসলমানরা মনে করেছিল বঙ্গভঙ্গ হয়ে নুতন প্রদেশ হলে শিক্ষাদীক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়ন হবে এবং দীর্ঘদিনের অবহেলা ও বঞ্চনার অবসান ঘটবে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে বাঙালি জাতির বিকাশমান সংহতি ও চেতনার ওপর আঘাত হিসেবে দেখে। পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ হওয়ায় পূর্ববঙ্গের ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে ওঠে। তবে পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়, বিশেষ করে ধনাঢ্য ভূস্বামীরা বঙ্গভঙ্গের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুই সম্প্রদায়ের ওপর বঙ্গভঙ্গের এই বিপরীতধর্মী প্রভাবের ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষবৃক্ষ রোপিত হয়। হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করে।

আপাতদৃষ্টিতে, বঙ্গভঙ্গ মুসলিমদের অনুকূলে একটি প্রশাসনিক উদ্যোগ হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে ব্রিটিশদের বড় একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। বঙ্গভঙ্গ ছিল তাদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নামে পরিচিত কূটকৌশলের অংশ। বাংলা প্রদেশকে ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার কৌশলে কলকাতাকেন্দ্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার সুযোগ লাভ করে। এছাড়া এর ফলে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতার বোধ ও কট্টরপন্থার জন্ম হয়। এটি বাংলার দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভক্তি উসকে দেয়। এমনকি বঙ্গভঙ্গ রদের পরেও, রাজনীতি এবং অধিকার আদায়ের প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকারের কোনো ঐক্য আর গড়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন ▶ ৮ রফিকের দেশে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সরকার তার ওপর অর্পিত কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রাধান্য বিদ্যমান। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? ১

খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসনব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্রিটিশ ভারতের কোন আইনে এ ধরনের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

খ সৃজনশীল ৫নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শাসন ব্যবস্থা হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। ব্রিটিশ ভারতের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এ ধরনের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ আছে।

ভারতের সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যর্থতার ফলশ্রুতিই হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। এই আইনেই উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে রফিকের দেশে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার কাজ করতে পারবে। এখানে রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রাধান্য বিদ্যমান। এছাড়া দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চকক্ষ প্রদেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং প্রাদেশিক বিষয়গুলো প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এ আইনের বলে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রদেশগুলো সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা লাভ করে এবং প্রাদেশিক সরকার দায়িত্বশীল হয়। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রে উচ্চ পরিষদ ও নিম্নপরিষদ নামে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হয়। এ আইনসভায় উচ্চ পরিষদ কর্তৃক প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি জটিল আইন। তবে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে এই আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত বিদ্যমান।

ঘ সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৯ বিশাল আয়তনে গঠিত অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন জনাব ইসমাঈল। তাঁর একার পক্ষে বিশাল অঞ্চলের উন্নয়ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হচ্ছিল। এর ফলে কর্তৃপক্ষ বিশাল অঞ্চল 'ক' ও 'খ' অঞ্চলে বিভক্ত করে। এতে 'ক' অঞ্চলের জনগণ খুশি হলেও 'খ' অঞ্চলের জনগণ তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে দুই অঞ্চলকে পুনরায় একত্রীকরণ করা হয়। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কাকে বলে? ১

খ. মুসলিম লীগ কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণ 'ক' অঞ্চলের জনজীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে প্রাদেশিক বিষয়গুলোর ওপর প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্বকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলে।

খ ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সর্বদিক হতে অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও এটি অবহেলিত ও বঞ্চিত মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে ব্যর্থ হয়। মুসলমানদের এ অবহেলিত ও হীন অবস্থা হতে উদ্ধারকল্পে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ অনুভূতির সার্থক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের ধারক ও বাহক হিসেবে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।

১৯০৫ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গ প্রদেশেই ছিল আয়তনে এবং জনসংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল, এবং লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশ শাসন করা ছিল খুবই কষ্টকর। তাই এ প্রদেশকে ভেঙে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়, যা উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ইসমাইল তার অধীনে বিশাল অঞ্চলের উন্নয়ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অঞ্চলটিকে 'ক' ও 'খ' অঞ্চলে বিভক্ত করে। এতে 'ক' অঞ্চলের জনগণ খুশি হলেও 'খ' অঞ্চলের জনগণ তীব্র বিরোধিতা করে। এ ঘটনা মূলত বঙ্গভঙ্গকেই নির্দেশ করে। বৃহৎ আয়তন ও বিশাল জনসংখ্যার বঙ্গ প্রদেশকে একজন ব্রিটিশ শাসকের পক্ষে শাসন করা দুরূহ ছিল। তাই ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা অনুযায়ী 'পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে' একটি প্রদেশ এবং 'পশ্চিম বাংলা' নামে অন্য একটি প্রদেশ গঠিত হয়। বঙ্গ প্রদেশকে দুই প্রদেশে বিভক্ত করার কারণে মুসলমানরা খুশি হলেও ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ অনেক অসন্তুষ্ট হয়। বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্য হিন্দুরা আন্দোলন শুরু করে। এর এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে। আর উদ্দীপকেও এ ঘটনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণ অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ 'ক' অঞ্চলের তথা পূর্ব বাংলার জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

উদ্দীপকের বিশাল অঞ্চলের বিভক্তিকরণ ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গভঙ্গকে নির্দেশ করে। আর 'ক' অঞ্চল দিয়ে পূর্ব বাংলাকে বোঝানো হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার জনজীবনে যে প্রভাব পড়েছিল উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের জনগণের জীবনেও একই ধরনের প্রভাব পড়বে।

পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বঙ্গভঙ্গ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এর ফলে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলিম সমাজের রাজনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। নতুন প্রদেশের প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় নতুন প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা দেখা যায়। বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে ঢাকা পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় নতুন নতুন সুরম্য অট্টালিকা, হাইকোর্ট, সেক্রেটেরিয়েট, আইন পরিষদ ভবন, কার্জন হল প্রভৃতি নির্মিত হতে থাকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও অগ্রগতি অর্জিত হয়। এছাড়া ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। পূর্ব বাংলায় রেল লাইনসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। লর্ড কার্জন স্বয়ং আশা প্রকাশ করেন, নতুন প্রদেশ উন্নত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বলে বলীয়ান হয়ে পূর্ববঙ্গ শাসনব্যবস্থায় যোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গের জনজীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। অনুরূপভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণও 'ক' অঞ্চলের জনজীবনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶১০ উপমহাদেশের শাসনের এক পর্যায়ে ব্রিটিশরা ভারত শাসন আইন নামে একটি আইন তৈরি করে। উক্ত আইনে সর্বপ্রথম ভারতের প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়। এই আইনে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও দুটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এই আইনের ধারাবাহিকতায় এক সময় ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. দ্বৈতশাসন কাকে বলে? ১

খ. কেন ব্রিটিশ সরকার 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি গ্রহণ করেছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আইনের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এই আইনের ধারাবাহিকতায় ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবার্ট ক্লাইভ যে অভিনব শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাকে দ্বৈতশাসন বলে।

খ ভারত উপমহাদেশে বসবাসরত প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্যই ব্রিটিশরা 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি গ্রহণ করেছিল।
ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের শাসননীতির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল— হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে নিজেদের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী করা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের গৃহীত বঙ্গভঙ্গ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।
ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া, সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং নতুন প্রদেশ গঠন করার মাধ্যমে এ আইন ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে।
উদ্দীপকে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত একটি আইনের কথা বলা হয়েছে। যেখানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন, দুটি আলাদা প্রদেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এগুলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ আইন গৃহীত হয়। এ আইনে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য ব্রিটিশ ভারতের সকল প্রদেশ ও ফেডারেশনে যোগদানে ইচ্ছুক দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর ওপর প্রাদেশিক সরকারেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আবার এ আইনে ব্রহ্মদেশকে (বার্মা) পৃথক করে উড়িষ্যা ও সিন্ধু নামে দুটি আলাদা(নতুন) প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত আইনটিতে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। মন্তব্যটি যথার্থ।
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সচেতন জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ফলে তারা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেয়। এ বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরেই ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে হিন্দু-মুসলিম উভয়ই আলাদা জাতি, আর এ নীতি পাকিস্তান-ভারত নামক আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পথ তৈরি করে দেয়। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে তারা হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কংগ্রেসের আচরণ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের (হিন্দু-মুসলিম আলাদাজাতি) ভিত্তিতে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলা হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে উভয় সম্প্রদায় আলাদাভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৪৬ সালে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। তাছাড়া মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায় মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে যায়। তারপরও তারা পরিকল্পনার প্রতি নমনীয় থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনায় তাদের স্বার্থগত বিষয়গুলোকে সমর্থন দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে নানা বিরোধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় শাসনব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করলে তা দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের পরস্পর বিরোধী ভূমিকার কারণে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়। ফলে জন্ম নেয় ভারত-পাকিস্তান নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র।
পরিশেষে বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার দাবিতে রূপ লাভ করে। ফলে নানা ধারাবাহিক ঘটনার প্রেক্ষিতে জন্ম নেয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

প্রশ্ন ▶১১ দক্ষিণ আফ্রিকা এমন একটি দেশ যেখানে বিদেশি শাসক দীর্ঘদিন শাসন করেছে। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে সেখানকার কৃষ্ণাজ্ঞ জনগণ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীনতা লাভ করেছে। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. কত সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল? ১

খ. ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় প্রাদেশিক শাসন কীরূপ ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে তোমার পঠিত কোন ঘটনার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উক্ত ঘটনার পরিণতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল।

খ ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত ভারত শাসন আইনে ভারতের প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়। এতে বলা হয়, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে প্রদেশগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। দায়িত্বশীলরা তাদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর অনুগত প্রাদেশিক গভর্নর প্রদেশে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তাই বলা যায় যে, ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় প্রাদেশিক শাসন ছিল অনেকটা নামমাত্র ও অর্থহীন।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে আমার পঠিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।
ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন বিদেশি অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ নিরবে এ পরাধীনতাকে মেনে নেয়নি। দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালিয়ে একসময় তারা স্বাধীনতা অর্জন করে।
১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষ তাদের স্বাধীনতা হারায়। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি নানা কৌশল ও

https://teachingbd24.com

বল প্রয়োগের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা কালক্রমে পুরো ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মাইলফলক। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে এবং তারা স্বাধীনতার দাবিতে সংগঠিত হতে থাকে। উপমহাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভূমিকা পালন করেন। তাদের আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারতীয়দের স্বাধীনতা প্রদান করে। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই, দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘদিন বিদেশি শাসন কার্যকর ছিল। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ দীর্ঘ সংগ্রামের পর ন্যায্য অধিকার লাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উক্ত ঘটনা অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিণতি ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সাধারণত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চারাজ্যগুলো পাকিস্তানের এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চরাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে করে দুটি রাষ্ট্র নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে একটি পূর্ব পাকিস্তান, অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা নানাভাবে বিশেষ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিগৃহীত ও শোষিত হতে থাকে।

১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর মূল প্রস্তাবই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং ব্যাপক সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।

এভাবে লাহোর প্রস্তাবকে এড়িয়ে যাওয়া এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা না করায় এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা মূলত সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, সমাধান দিতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এর উজ্জ্বল প্রমাণ। ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিনা রক্তপাতে সম্ভব হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। যদিও পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি ছিল, তথাপি অনেকেই মনে করেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তথা পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিণতিই হলো আজকের বাংলাদেশ। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রশ্ন ▶ ১২ আফ্রিকা মহাদেশের একটি বৃহৎ অঞ্চলে পাশাপাশি দুটি প্রধান সম্প্রদায় বসবাস করে। এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদেশি শাসন বিদ্যমান থাকায় দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকে। শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলেও তা সমাধান হয়নি। পরিশেষে, কর্তৃপক্ষ দু'সম্প্রদায়কে আলাদা করার চিন্তা করে এবং পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করে। এ আইন অনুযায়ী দু'সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

[ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১; ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের সাথে তোমার পঠিত কোন আইনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

খ সৃজনশীল ৫নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের সাথে আমার পঠিত ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ আইনের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এ আইন ভারতে দীর্ঘ বিদেশি শাসনের সমাপ্তি ঘটায় এবং এক নতুন যুগের সূচনা করে। উদ্দীপকে বর্ণিত আইনটি এ বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় আফ্রিকা মহাদেশের একটি বৃহৎ অঞ্চলের দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ লক্ষ করা যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বিদেশি শাসনের অধীনে থাকাই এর কারণ। কর্তৃপক্ষ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিলেও তাতে কাজ হয়নি। অবশেষে তারা দু'সম্প্রদায়কে আলাদা করার চিন্তা করে এবং পার্লামেন্টে এ নিয়ে একটি আইন পাস করে। ঐ আইন অনুযায়ী দু'সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেও এমনটি দেখা যায়। এখানে দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭) বিদ্যমান ছিল। আবার ব্রিটিশ শাসনাধীনে এখানকার প্রধান দুটি সম্প্রদায় তথা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বার বার দ্বন্দ্বের ঘটনা ঘটেছে। ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগের মাধ্যমে এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব দূর করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত দু'সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রকেই এর সমাধান মনে করা হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয়। এ আইনের ফলে ভারতবর্ষে একশ নব্বই বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে আর সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের। এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত আইনটি ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ছিল একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চূড়ান্ত অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে। ১৭৫৭ সালে প্রহসনের পলাশী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল, এ আইনের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। আইনটি পাসের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানে সংসদীয় ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এ আইন ভারতের মানুষকে বড় কোনো সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়াই স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দেয়। তারা নতুন দেশগড়ার স্বপ্ন ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করে। উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রা,

https://teachingbd24.com

সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। দেশবিভাগ নামে পরিচিত এ ঘটনা উপমহাদেশবাসীর সমকালীন প্রজন্মের মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলে। ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শরণার্থী ও অভিবাসন সংকটেরও সৃষ্টি করেছিল।
পরিশেষে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনেক দিক থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন ▶ ১৩ আলম সাহেব একজন খ্যাতনামা মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য তার দলের বার্ষিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল। *[চা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে ভারতবর্ষে আগমন করে? ১
খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আলম সাহেবের পেশকৃত প্রস্তাবের সাথে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পঠিত উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তিসহ লেখ। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করে।

খ সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের আলম সাহেবের পেশকৃত প্রস্তাবের সাথে আমার পঠিত লাহোর প্রস্তাবের সাদৃশ্য রয়েছে।
১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সম্বলিত যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তাই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এই প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলিম রাজনীতিতে ইতিবাচক সাড়া জাগায় এবং মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এই প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি অর্জন করে। যেটি উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, আলম সাহেব এক মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি তার দলের বার্ষিক সম্মেলনে তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাবের মধ্যেই তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল। এই প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনোরূপ স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে না- এ সত্যটি উপলব্ধি করে মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরে বাংলা ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির দাবি উত্থাপন করে। যার ফলশ্রুতিতে বহু চড়াই-উৎরাই পার করে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির পেশকৃত প্রস্তাব এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব এক ও অভিন্ন।

ঘ লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।
ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত প্রস্তাবের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি জানায়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি সবকিছুই ছিল লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বাঙালিরা আরো সুসংহত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়ী করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিপীড়ন চালাতে শুরু করলে বাঙালি জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'ক' নামক অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল। বৃহৎ এই অঞ্চলে ক্রমশ দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ ও সম্প্রদায় দুইটির অনৈক্যের কারণে অঞ্চলটিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ঔপনিবেশিক শক্তি অঞ্চলটির স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের ফলে 'ক' অঞ্চলটিতে সম্প্রদায়গত পরিচয়ে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কাকে? ১
খ. স্বদেশি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে তোমার পঠিত যে আইনের সাদৃশ্য রয়েছে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় উক্ত আইনটি অপরিহার্য ছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নবাব আব্দুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়।

খ যে আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ হয়েছিল এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হয়েছিল তাকে বলে স্বদেশি আন্দোলন।
স্বদেশি আন্দোলনের উৎস ছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী গণজাগরণ যা, ১৯১১ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল । এই আন্দোলন ছিল প্রাক-গান্ধী যুগের সফলতম আন্দোলনগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্বদেশি আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তাগণ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীর সাভারকর, বাল গঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রায়। পরবর্তীকালে স্বদেশি রণকৌশলটিকে গ্রহণ করে মহাত্মা গান্ধী এটিকে স্বরাজ-এর আত্মারূপে বর্ণনা করেন। এটি বাংলায় সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং এটিকে বন্দে মাতরম আন্দোলনও বলা হতো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের সাথে আমার পঠিত ভারতবর্ষের ১৯৪৭ সালের আইনের মিল রয়েছে।
'ক' নামক অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল। বৃহৎ এই অঞ্চলে ক্রমশ দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সংগঠিত হতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ ও সম্প্রদায় দুটির অনৈক্যের কারণে অঞ্চলটিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ঔপনিবেশিক শক্তি অঞ্চলটির স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করে, যা ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্বের ফলে ব্রিটিশ সরকার মহা সমস্যায় পড়ে যায়। এই সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দেখলেন সাম্প্রদায়িকতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষ বিভক্ত করার লক্ষ্যে ৩ জুন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এটি কার্যকর করতে ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপিত করেন। এ বিলে ব্রিটিশ ভারতে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই বিলটি রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এটিই ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে খ্যাত। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবইয়ের ভারতবর্ষের ১৯৪৭ সালের আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনটি অপরিহার্য ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনটি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই আইন দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। এই আইন ভারতবর্ষের ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায় এবং 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে পাকিস্তান ও ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দূরীভূত হয়। যদিও দীর্ঘ পথপরিক্রমা, আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা হয়; তথাপি এ উপমহাদেশে রক্তপাতহীন ও স্বাধীনতাযুদ্ধ ব্যতিরেকে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ আইন ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য ইত্যাদিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে।
পরিশেষে বলা যায় যে, এ আইন দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. করিম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অঞ্চলে একটি রাজনৈতিক দলের প্রখ্যাত নেতা। তিনি ঐ অঞ্চলের সকল জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য তার দলের বার্ষিক সভায় একটি সুপারিশমালা পেশ করেন। তার সুপারিশমালায় ঐ অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের সাথে স্বাধীন অঙ্গরাজ্যসমূহের সম্পর্ক কী হবে বা সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন? ১
খ. কী উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল? ২
গ. মি. করিমের সুপারিশমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমার পঠিত বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সুপারিশমালার আলোকে তোমার পঠিত সুপারিশমালার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।

খ সৃজনশীল ৯নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মি. করিমের সুপারিশমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমার পঠিত বিষয়টি হলো লাহোর প্রস্তাব।
১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সম্বলিত যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তাই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। উদ্দীপকেও অনুরূপ সুপারিশমালা লক্ষণীয়।
উদ্দীপকে দেখা যায় যে, মি. করিম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অঞ্চলের একটি রাজনৈতিক দলের প্রখ্যাত নেতা। তিনি ঐ অঞ্চলের সকল জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য তার দলের বার্ষিক সভায় একটি সুপারিশমালা পেশ করেন। এ সুপারিশমালায় ঐ অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত ছিল। অনুরূপভাবে বাংলার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটি ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে তিনি এক বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা তিনি এ প্রস্তাবে উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের সুপারিশমালার সাথে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রহিমপুর উপজেলার সবচেয়ে বড় একটি ইউনিয়ন হলো আলীনগর। তাই একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে সমগ্র ইউনিয়ন পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক সুবিধার্থে আলীনগরকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে পূর্ব আলীনগরবাসী খুশি হয়। কারণ তাদের দীর্ঘদিনের বৈষম্যের অবসান ঘটবে। কিন্তু পশ্চিম আলীনগরবাসী এই সিদ্ধান্তে হতাশ হয়। কারণ তাদের প্রভাব কমে যাবে। তাই তারা এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তটি বাতিল করে।

[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় কখন? ১
খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উক্ত ঘটনাটি তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক চেতনার এক নতুন দিক উন্মোচন করে।' -উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৭নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭

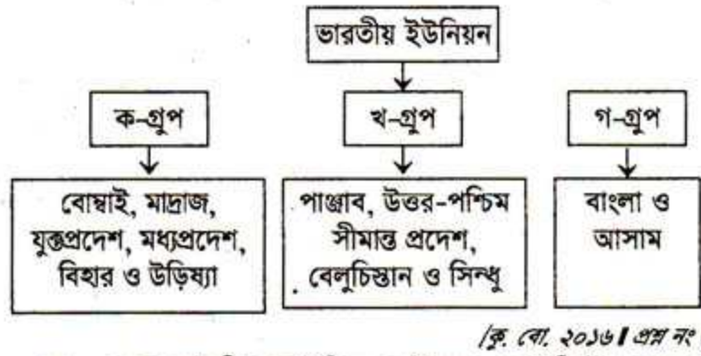

[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. কোন ভারতীয় কাউন্সিল আইনকে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন বলা হয়? ১
খ. মজলুম জননেতা বলা হয় কাকে এবং কেন? ২
গ. উপরে প্রদর্শিত ছকে ব্রিটিশ সরকারের কোন পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে? তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উক্ত পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হয়েছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনকে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন বলা হয়।

খ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয়।
ব্রিটিশ আমল থেকেই একজন কৃষকের সন্তান হিসেবে ভাসানী দরিদ্র, অবহেলিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। তিনি বরাবরই ছিলেন জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পরও তিনি কৃষকদের স্বার্থ আদায়, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের কথা চিন্তা করেন এবং আন্দোলন সংগ্রাম করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর আন্দোলন ছিল জনগণকেন্দ্রিক। শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থের জন্য আজীবন কাজ করার কারণে ভাসানীকে তাই মজলুম জননেতা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত ছকে ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে।
ছকে উল্লিখিত ভারতীয় ইউনিয়ন তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত। ঠিক একইভাবে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নও তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত।
ব্রিটেনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি বিপুলভাবে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট পরিবর্তন হলে ব্রিটিশ সরকারও তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৪৫ সালের শুরুতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দাবি ওঠে। এ উদ্দেশে ১৯৪৬ সালে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য ভারতে আসেন। এরা হলেন- স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড পেথিক লরেল এবং এভি আলেকজান্ডার। তারা ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য দূর করার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু উভয় দলের মাঝে আপসমূলক আলোচনা না হওয়ায় মন্ত্রিমিশন তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ঘ উক্ত পরিকল্পনা অর্থাৎ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মতপার্থক্য। ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণগুলি হলো—
প্রথমত, মূল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেউই একমত হতে পারেনি। ফলে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।
দ্বিতীয়ত, ১৯৪৬ সালের ২৯ জুন ব্রিটিশ সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থগিত রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। এই সরকারে কংগ্রেস যোগদান করলেও মুসলিম লীগ যোগদানে অস্বীকার করে। ফলে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।
তৃতীয়ত, ১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট কংগ্রেস জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। সেদিনটিকে মুসলিম লীগ কালো দিবস হিসেবে পালন করে। ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে গোলযোগ শুরু হয়, যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ লাভ করে।
চতুর্থত, মুসলিম লীগ এক সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেশি দিন টিকতে পারেনি।
পরিশেষে বলা যায় যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বন্দ্ব এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বিশ্বের বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচ উপনিবেশ। এই ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য ইন্দোনেশিয়ার জনগণ সকল জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। কিন্তু দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে একপেশে নীতি বিশেষ করে খ্রিষ্টানদের বঞ্চিত করার নীতি গ্রহণ করে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব-তিমুরের খ্রিষ্টানরা পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। কেননা তারা মনে করে প্রথম রাজনৈতিক দলটি দ্বারা তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ সম্ভব হবে না। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মুসলমানদের সংগঠিত করেন কে? ১
খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক দল গঠনের সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন রাজনৈতিক দল গঠনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে উক্ত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মুসলমানদের সংগঠিত করেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক দল গঠনের সাথে ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম লীগ দল গঠনের সাদৃশ্য রয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ডাচ শাসন থেকে মুক্তি পেতে ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। কিন্তু দলটি পূর্ব তিমুরের সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের স্বার্থের ব্যাপারে ছিল উদাসীন। ফলশ্রুতিতে পূর্ব তিমুরের খ্রিষ্টানরা তাদের স্বার্থ আদায়ে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম লীগ গঠনের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়।
১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে তারা ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট তুলে ধরে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই দলটি সমগ্র ভারতবাসীর সমর্থন লাভে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে কংগ্রেসের অধিকাংশ হিন্দু নেতা এ নীতির তীব্র বিরোধিতা করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে শুরু হয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা। হিন্দু সম্প্রদায়ের এমন আক্রমণাত্মক আচরণে মুসলমানরা বুঝতে পারে কংগ্রেস মুসলিম স্বার্থের অনকূল কোনো দল নয়। এমতাবস্থায় অনগ্রসর ও অবহেলিত মুসলমানদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রগতিশীল নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্দেশ্য ও মুসলিম লীগ গঠনের প্রেক্ষাপট অভিন্ন।

ঘ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে উক্ত রাজনৈতিক দল তথা মুসলিম লীগের অবদান অসামান্য।
মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দলটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দলটি বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়। পরবর্তীকালে ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি, ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে দলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪০ সালে দলটি ভারতবর্ষের সংকট সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। এই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব। এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানরা তাদের পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। ১৯৪২ সালের ক্রিপস মিশন, ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি আলাদা রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, উপমহাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন তথা পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে মুসলিম লীগের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৯ 'ক' অঞ্চলটি ছিল আয়তন ও জনসংখ্যায় ব্রিটিশ-ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ। একজন শাসকের পক্ষে এতবড় প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা ছিল কষ্টকর। তাই প্রদেশটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমউন্নয়ন। ব্রিটিশ সরকার এ অঞ্চলের মানুষকে শাসন করার উদ্দেশ্যে প্রদেশটিকে ভাগ করলেও এটি ছিল একটি অংশের প্রাণের দাবি। একটি অংশ উপকৃত হলেও অপর অংশের সার্বিক বিরোধিতা ও অসহযোগিতার কারণে তা পুনরায় একীভূত করা হয়। *[চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখন গঠিত হয়? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' অঞ্চলের বিভাজনের সাথে তোমার পঠিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে গঠিত হয়।

খ 'ফরায়েজি আন্দোলন' হলো ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, যা হাজি শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। 'ফরজ' শব্দটি থেকে ফরায়েজি শব্দটি এসেছে। 'ফরজ শব্দের অর্থ অবশ্য পালনীয়।

হাজি শরীয়তউল্লাহর সময় মুসলমান সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার ও বিধর্মী আচার-অনুষ্ঠান বিরাজমান ছিল। মুসলমানদের আচার-আচরণে হিন্দু প্রভাব ছিল। তারা শীতলা পূজা, বসন্ত পূজা, কালী পূজা, মহররমে মাতম, ভেলা ভাসানো ইত্যাদি নানা অনৈসলামিক কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় হাজি শরীয়তউল্লাহ বাংলার অধপতিত মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড নিরসনের জন্য চেষ্টা করেন। তার এ প্রচেষ্টাই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ অন্যতম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। দল হিসেবে মুসলিম লীগের জন্ম, স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার প্রাপ্তি, বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গভঙ্গেরই ফলাফল। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা হলেও এর জন্য উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো পর্যাপ্ত ছিল না। এজন্য গভর্নর হাউস সচিবালয়, কর্মকর্তাদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পানি, বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন– মুরারিচাঁদ কলেজকে সরকারিকরণ, জগন্নাথ কলেজকে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ, বেসরকারি কলেজে অনুদান প্রদান, শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন ভবন নির্মাণ ইত্যাদি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের ব্যাপক উন্নতি হলেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার বিরোধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক পরিচয় সম্পর্কে অধিকতর সচেতন মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাকে একত্রিত করার চেষ্টা করে। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলে। অন্যদিকে, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশরা তাদের চিরায়ত প্রথা 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির স্বার্থক প্রয়োগ করে, যা তাদের শাসনকালকে দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব 'S' তার সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা এবং একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। এর আলোকে 'ক' ও 'খ' নামে দু'টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। 'খ' রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর নানা রকম শোষণ, নিপীড়ন চালায়। পরবর্তীতে অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে 'খ' রাষ্ট্রটি ভেঙে 'গ' রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। মূলত 'গ' রাষ্ট্রটির বীজ জনাব 'S' এর মূল প্রস্তাবেই নিহিত ছিল। *[চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে ছিলেন? ১

খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রদত্ত তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব 'S' কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটির সাথে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'গ' রাষ্ট্রটির বীজ জনাব 'S' এর মূল প্রস্তাবেই ছিল– বিশ্লেষণ করো। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য, যিনি প্রথম গণপরিষদ সদস্য হিসেবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রদত্ত তত্ত্বটি হলো 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'।

১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বটি প্রদান করেন। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলিম দুইটি আলাদা জাতি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব, তারা কখনো এক হতে পারে না। সুতরাং, দুটি জাতিকে আলাদা করে মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

গ জনাব 'S' কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমার পঠিত 'লাহোর প্রস্তাবের' সাথে মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব 'S' তার সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা এবং একাধিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং এর আলোকে 'ক' ও 'খ' নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। খ' রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠীর নানা রকম শোষণের ফলে 'খ' রাষ্ট্র ভেঙে 'গ' রাষ্ট্রটির জন্ম হয়, যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ' গঠনের দাবি জানানো হয়, যা মুসলমানদের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে। এই প্রস্তাবের পথ ধরেই পাকিস্তান ও ভারত নামক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটায়। সুতরাং, বলা যায় যে, জনাব 'S' কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটির সাথে লাহোর প্রস্তাবই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ মামুনের ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড়। জনসংখ্যাও অনেক বেশি। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে পুরো ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইউনিয়নের অধিবাসীদের একটি অংশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি তুলে ধরে। ফলে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে আর এক পক্ষ বিষয়টির বিরোধিতা করে। তবে এই বিভক্তি বেশিদিন স্থায়িত্ব পায়নি এবং একটি পক্ষ এক নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে।

[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]

Teachingbd24.com

ক. কত সালে সর্বভারতীয় নিখিল কংগ্রেস জন্মলাভ করে? ১
খ. জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব সম্পর্কে তুমি কী জান? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসিক যে ঘটনার মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বভারতীয় নিখিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বি-জাতি তত্ত্ব হলো ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার নির্ণায়ক ও আদর্শাশ্রয়ী একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বটি প্রদান করেন। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলিম দুইটি আলাদা জাতি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব, তারা কখনো এক হতে পারে না। সুতরাং, দুটি জাতিকে আলাদা করে মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তার এ ঘোষণাটি ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' নামে খ্যাত।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা বঙ্গভঙ্গের সাথে মিল রয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ বলতে ১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ২ ভাগে বিভক্ত করাকে বোঝায়। ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সিই ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এই বিশাল আয়তনবিশিষ্ট জনবহুল বঙ্গ প্রদেশে একজন প্রশাসকের পক্ষে রাজধানী কলকাতা থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। এ জন্য লর্ড কার্জন প্রশাসনিক অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা প্রেসিডেন্সিকে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম এবং বাংলা প্রদেশ নামে ২টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। যা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মামুনের ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার জনগণও তাদের সুবিধার জন্য উক্ত অঞ্চলকে বিভক্ত করার দাবি তোলে। এরূপ অবস্থায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ইউনিয়নটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, উদ্দীপকের ঘটনাটি বঙ্গভঙ্গের সাথে মিল রয়েছে। কারণ ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করেছিল এবং পূর্ব বাংলার জনগণ নিজের সুবিধার কথা বিবেচনা করে উক্ত বিষয়টি মেনে নিয়েছিল।

ঘ বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক এবং হিন্দুদের জন্য নেতিবাচক।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ মুসলমান জনগণের মধ্যে নতুন আশা ও উদ্দীপনা জাগ্রত করে। মধ্যবিত্ত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আশীর্বাদ বলে গণ্য করে। মুসলমানরা তাদের পূর্বমর্যাদা ফিরে পায় এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করে। মুসলমানরা অধিকারসচেতন হয়ে ওঠে, হিন্দু আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল নেতিবাচক। যদিও নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানদের অনুকূলে বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং গোড়া হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গকে মেনে নিতে পারেনি, বরং চরমভাবে এর বিরোধিতা শুরু করে। হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এটিকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হিসেবে উল্লেখ করে। কলকাতার আইন ব্যবসায়ীরা তাদের মক্কেল কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা করতে থাকেন। সংবাদপত্রের মালিকরা তাদের পত্রিকার প্রচার ও বিক্রয় হ্রাসে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা লাভবান হলেও পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানরা একে অপরের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২২ সুমনের দাদু গল্প বলায় পটু। প্রতিদিনই সুমন তার দাদুর কাছ থেকে বিভিন্ন গল্প শোনে। দাদু বললেন 'আজ আমি তোমাকে এমন একজন মহান নেতার গল্প বলব যার একান্ত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হয়।'

[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. কখন মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণীত হয়? ১
খ. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণটি বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণীত হয়।

খ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'প্রশাসনিক' কারণ।

বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বাংলার আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। এত বড় প্রদেশ কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হলে, প্রদেশের বিশালায়তনের কারণে ত্রাণকার্য পরিচালনা ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রদেশে প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজন অপেক্ষা কম সংখ্যক কর্মচারী ছিল। যার ফলে প্রদেশ বিভাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটি আমার পঠিত পাঠ্যবইয়ের মুসলিম লীগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হয়।

জন্মলগ্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যেসব উদ্দেশ্যে স্থির করা হয় সেগুলো হলো—

১. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবর্ষের মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা।
২. মুসলমানের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করা এবং তাদের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে শ্রদ্ধার সাথে পেশ করা।
৩. উপরে বর্ণিত দুটি উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। তবে পরবর্তীতে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়—
   i. মুসলমানদের সরকারি চাকরি এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
   ii. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি।
   iii. মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
   iv. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের উপযোগী একটা স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি অর্জন করা।
   v. ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করা ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে যে মহান নেতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আমার পাঠ্যবইয়ের নবাব সলিমুল্লাহ ব্যক্তিত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত না হলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—

১. **আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা:** তিনি আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং নামে ঢাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

২. **মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান:** মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্তমানে এটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে।

৩. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য অবদান ছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে তাঁকে এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. **সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রতিষ্ঠা:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক হল নির্মাণ করা হয় যার নামকরণ করা হয় "সলিমুল্লাহ মুসলিম হল"।

৫. **সলিমুল্লাহ এতিমখানা প্রতিষ্ঠা:** এদেশের দুঃখী মানুষদের জন্য তিনি একটি এতিমখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং বলা যায়, তদানিন্তন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তার অবদান অতুলনীয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ একটি দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'ক' ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও বিপুল। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইউনিয়নের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথক ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে দুটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। *[যি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. পলাশীর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১

খ. সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন করো। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে সংঘটিত হয়।

খ সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হলো এনফিল্ড নামক রাইফেলের চর্বিমাখানো কার্তুজ যেটাতে গরু বা শূকরের চর্বি বলে প্রচার করা হয়েছিল।

১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার এনফিল্ড রাইফেল নামে এক প্রকার নতুন বন্দুক চালু করে। এই বন্দুকের কার্তুজ ছিল চর্বিযুক্ত এবং সেই চর্বি গরু বা শূকরের চর্বি বলে প্রচার ছিল। গরুর মাংস বা চর্বি হিন্দুদের কাছে এবং শূকরের মাংস বা চর্বি মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ বিধায় ঐ কার্তুজ ব্যবহার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মনাশ বলে বিবেচিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।

দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'ক' ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও বিপুল হওয়ার কারণে একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তাই ইউনিয়নের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথক ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে দুটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের পেছনেও অনুরূপ কারণ বিদ্যমান।

ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এ প্রদেশের আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লাখ। একজন গভর্নরের পক্ষে এতবড় এলাকা পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া সুচতুর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের মাঝে রাজনৈতিক চেতনাকে ধুলিস্যাৎ করার জন্য 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির প্রয়োগ ঘটানোর জন্য বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন করেছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গভঙ্গের মিল রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ 'X' নামক রাষ্ট্রটি একটি বিদেশি শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। এখানে দুটি সম্প্রদায়ের বাস। সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। আবার মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও লেগে যেত। বিদেশি শক্তিটি 'X' রাষ্ট্রকে শাসন করার জন্য বিভিন্ন সময় আইন তৈরি করে। কিন্তু সম্প্রদায় দুটিকে কোনোক্রমেই খুশি করতে পারে না। অবশেষে দেশটি বিভক্ত করে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশি শক্তি একটি আইন পাস করে। আইনটিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম দু'টি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। *[যি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কোন কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাসকৃত আইনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন আইনের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

খ সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পাসকৃত আইনের সাথে আমার পঠিত পাঠ্যপুস্তকের ভারতবর্ষের ১৯৪৭ সালের আইনের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায় যে, 'X' নামক রাষ্ট্রটি একটি বিদেশি শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। এখানে দুটি সম্প্রদায়ের বাস। সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। আবার মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও লেগে যেত। বিদেশি শক্তিটি 'X' রাষ্ট্রকে শাসন করার জন্য বিভিন্ন সময় আইন তৈরি করে। কিন্তু সম্প্রদায় দু'টিকে কোনোক্রমেই খুশি করতে পারে না। অবশেষে দেশটি বিভক্ত করে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশি শক্তি একটি আইন পাস করে। ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রেক্ষাপট লক্ষ করা যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্বের ফলে ব্রিটিশ সরকার মহা সমস্যায় পড়ে। এই সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি সাম্প্রদায়িকতার মারাত্মক রূপ দেখলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য লর্ড

Teachingbd24.com

মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষ বিভক্তি করার লক্ষ্যে ৩ জুন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এটি কার্যকর করতে ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপিত করেন। এ বিলে ব্রিটিশ ভারতে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই বিলটি রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এটিই ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে খ্যাত। অতএব বলা যায় যে, উদ্দীপকের সাথে ভারতবর্ষে প্রণীত ১৯৪৭ সালের আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৪৭ সালের আইনটি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনটি অপরিহার্য ছিল। এই আইন দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। এই আইন ভারতবর্ষের ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায় এবং 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে পাকিস্তান ও ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দূরীভূত হয়। যদিও দীর্ঘ পথপরিক্রমা, আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করা হয়; তথাপি এ উপমহাদেশে রক্তপাতহীন ও স্বাধীনতাযুদ্ধ ব্যতিরেকে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ আইন ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য ইত্যাদিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶২৫ বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানেরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটে। ফলে তারা তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল। *[বি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? ১

খ. ৩ জুন পরিকল্পনা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রস্তাবে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালান। ১৯৪৭ সালের ২ জুন নেহেরু, জিন্নাহ ও শিখ নেতা বলদেব সিংহের সাথে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা তিনি ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারতবর্ষের জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এটিই ৩ জুন পরিকল্পনা বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

গ উদ্দীপকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তারা পৃথক আবাসভূমির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. ভৌগোলিক দিক হতে সংলগ্ন এলাকাগুলো পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হবে।

২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের যে সকল এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।

৩. এভাবে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।

৪. ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।

৫. প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষা,পররাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২৬ রাজশাহী কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা সফরে ঢাকায় এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তারা কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হয়। ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিপুল বইয়ের সমাহার দেখে তারা অবাক হয়। শাহবাগে যাবার পর তাদের শিক্ষক জনাব সেলিম সাহেব বুঝিয়ে বললেন যে, এ স্থানেই ১৯০৬ সালে এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল এবং সে সংগঠনটির নেতৃত্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]*

ক. ভারতের কোন গভর্নর জেনারেলের সময় বঙ্গভঙ্গ করা হয়? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্জন হল এবং ফুলার রোডের সাথে যে দুজন ব্যক্তির নাম জড়িত বঙ্গভঙ্গের সাথে তাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানটিতে যে রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে উক্ত দলের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্জন হলের সাথে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন এবং ফুলার রোডের সাথে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের নাম জড়িত।

প্রশাসনিক কার্যক্রমের সুবিধার্থে ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের বিশাল ভূ-খণ্ডের 'বাংলা প্রেসিডেন্সি'কে বিভক্ত করেন। তিনি পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। ঢাকা হয় এ প্রদেশের রাজধানী; অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে একত্রিত করে বাংলা প্রদেশ গঠন করা হয়। লর্ড কার্জন ঢাকায় এসে ঢাকাকে নতুন শাসন বিভাগীয় এককের কেন্দ্রবিন্দু ঘোষণা করেন। স্যার জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলারকে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজশাহী কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা সফরে ঢাকায় আসে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হয়। আবার তারা ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে যায়। উল্লিখিত কার্জন হল নির্মিতি হয় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের নামে নির্মিত একটি ভবন। বঙ্গভঙ্গ করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁর নামে ভবনটির নামকরণ করা হয়। অপর দিকে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ছিলেন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর। তাঁর স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় ফুলার রোড। তার আমলেই বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানটিতে অর্থাৎ শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলটির অর্থাৎ মুসলিম লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৯০৬ সালের ২৮-৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নবাব ভিখারুল মুলক। শাহবাগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সমগ্র ভারতের প্রায় ৮ হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। নবাব সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসি' অর্থাৎ সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ গঠনের প্রস্তাব দেন। কিছু প্রতিনিধির আপত্তির প্রেক্ষিতে কনফেডারেসি শব্দটি পরিত্যাগ করে লীগ শব্দটি গ্রহণ করা হয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর নবাব মুহসিন উল-মূলক ও নবাব ভিখারুল মুলক এ সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতিতে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে।

মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে প্রথমবারের মতো মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের সংকট সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। এই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব। মুসলিম লীগের অধীনে পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' তুলে ধরেন। এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানরা তাদের পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে।

অতএব বলা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বঙ্গভঙ্গের রদ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। দুই জাতির মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটে। ফলে তারা তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির গুরুত্ব অনুভব করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. পলাশীর যুদ্ধ হয় কত সালে? ১

খ. ৩ রা জুন পরিকল্পনা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রস্তাবে কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল— ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালান। ১৯৪৭ সালের ২ জুন নেহেরু, জিন্নাহ ও শিখ নেতা বলদেব সিংহের সাথে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা তিনি ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারতবর্ষের জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এটিই ৩ জুন পরিকল্পনা বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

গ উদ্দীপকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তারা পৃথক আবাসভূমির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. ভৌগোলিক দিক হতে সংলগ্ন এলাকাগুলো পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হবে।

২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের যে সকল এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।

৩. এভাবে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।

৪. ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।

৫. প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষা,পররাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রবিদের ইউনিয়নটি বড়। জনসংখ্যাও অনেক বেশি। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে পুরো ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তাছাড়া ইউনিয়নের অধিবাসীদের একটি অংশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে তাদের মতামত দেয়। ফলে কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে অন্য পক্ষ তীব্র বিরোধিতা করে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

ক. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কত সালে প্রবর্তিত হয়? ১

খ. 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পর্কে কি জান? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে বাংলার ঐতিহাসিক যে বিষয়ের মিল রয়েছে তার পদক্ষেপগুলির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়।

খ সৃজনশীল ৭নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৯

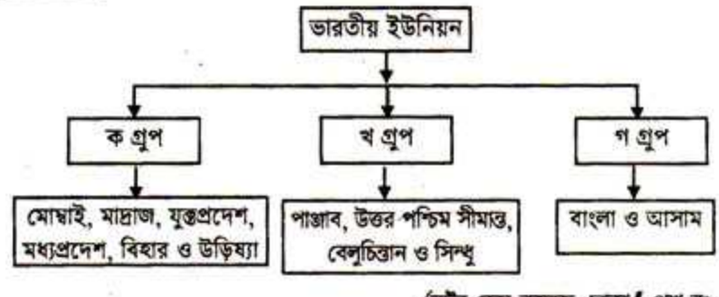

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. ১৯৩৭ সালের প্রদেশের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা কত ছিল? ১

খ. ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ২

গ. উপরে প্রদর্শিত ছকে ব্রিটিশ সরকারের কোন পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে? তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হয়েছিল বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৩৭ সালের প্রদেশের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ২৫০ জন।

Teachingbd24.com

খ ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের মাধ্যমে ভারতে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এ আইনে ৫ জন সদস্যকে নিয়ে গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। এদের মধ্যে অন্তত ৩ জনকে ১০ বছর ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এ শাসন পরিষদে সাধারণ সদস্য ছাড়াও কমপক্ষে ৬ জন বা অনধিক ১২ জন অতিরিক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়। এসব সদস্য গভর্নর জেনারেল কর্তৃক ২ বছরের জন্য মনোনীত হয়।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত ছকে ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে।

ছকে উল্লিখিত ভারতীয় ইউনিয়ন তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত। একইভাবে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নও তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত।

ব্রিটেনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি বিপুলভাবে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট পরিবর্তন হলে ব্রিটিশ সরকারও তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৪৫ সালের শুরুতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দাবি ওঠে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার তিন জন সদস্য ভারতে আসেন। এরা হলেন- স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড পেথিক লরেন্স এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার। তারা ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য দূর করার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু উভয় দলের মাঝে আপসমূলক আলোচনা না হওয়ায় মন্ত্রিমিশন তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ঘ সৃজনশীল ১৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০

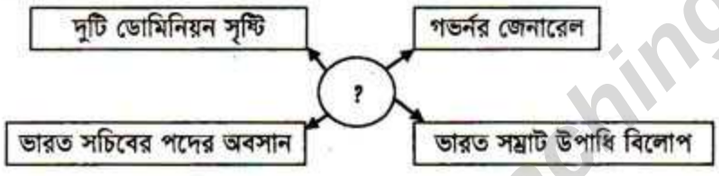

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়? ১

খ. বারাসাত বিদ্রোহ বলতে কি বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ব্রিটিশ ভারতের কোন আইনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? ৩

ঘ. বৃটিশ ভারতের তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উক্ত আইনের তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বি-জাতি তত্ত্বের আলোকে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

খ তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন ছিল অত্যাচারী নীলকর বণিক এবং স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে। তিনি ইংরেজ সরকারের নিকট বহুবার এ বিষয়ে নালিশ দেন। কিন্তু কোনো সুরাহা না পেয়ে ১৮২৫ সালে ৮৩ হাজার কৃষক সেনাকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন তিতুমীর এখন এ দেশের নবাব। দেশের সকল প্রজাই স্বাধীন। কৃষকরাই এ দেশের জমির মালিক। আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন মানি না। তিতুমীরের এ বিদ্রোহ ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ সুজনের দাদা গল্প বলায় পটু। তিনি প্রতিদিন সুজনকে বিভিন্ন গল্প বলেন। দাদা বললেন, আজ আমি তোমায় এমন এক মহান নেতার গল্প বলব যার একান্ত প্রচেষ্টায় বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী হয়।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কে চালু করেন? ১

খ. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণটি বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন আইয়ুব খান।

খ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'প্রশাসনিক' কারণ।

বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বাংলার আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। এত বড় প্রদেশ কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হলে, প্রদেশের বিশালায়তনের কারণে ত্রাণকার্য পরিচালনা ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রদেশে প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজন অপেক্ষা কম সংখ্যক কর্মচারী ছিল। যার ফলে প্রদেশ বিভাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন রাজনৈতিক সংগঠনটি আমার পঠিত পাঠ্যবইয়ের মুসলিম লীগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হয়।

জন্মলগ্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যেসব উদ্দেশ্যে স্থির করা হয় সেগুলো হলো—

১. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবর্ষের মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা।

২. মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করা এবং তাদের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট শ্রদ্ধার সাথে পেশ করা।

৩. উপরিউক্ত দুটি উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। তবে পরবর্তীতে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়–

i. মুসলমানদের সরকারি চাকরি এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

ii. মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার স্বীকৃতি।

iii. মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

iv. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের উপযোগী একটা স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি অর্জন করা।

v. ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করা ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকে যে মহান নেতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আমার পাঠ্যবইয়ের নবাব সলিমুল্লাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত না হলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—

Teachingbd24.com

১. **আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা:** তিনি আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং নামে ঢাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

২. **মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান:** মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্তমানে এটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে।

৩. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য অবদান ছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে তাঁকে এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. **সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রতিষ্ঠা:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক হল নির্মাণ করা হয় যার নামকরণ করা হয় 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল'।

৫. **সলিমুল্লাহ এতিমখানা প্রতিষ্ঠা:** এদেশের দুঃখী মানুষদের জন্য তিনি একটি এতিমখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং বলা যায়, তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তার অবদান অতুলনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৩২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি ঐক্যবদ্ধ জার্মানির আন্দোলনের ভয়ে জার্মানিকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়। ১৯৯০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি আবার ঐক্যবদ্ধ একটি জার্মানিতে পরিণত হয়। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বেঙ্গল প্যাক্টের মূল রূপকার কে? ১

খ. ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন ঘটনার মিল আছে? দুইটি কারণসহ আলোচনা কর। ৩

ঘ. "উপমহাদেশের ঘটনাটির বিভক্তিকরণের প্রভাব ছিল বিপরীতধর্মী।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেঙ্গল প্যাক্টের মূল রূপকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

খ শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থ নিয়ে আজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করার কারণেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

ষাটের দশকে আইয়ুব শাসনবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক জ্বালাময়ী কণ্ঠ। তিনি সর্বদাই সাম্যের কথা বলেছেন। কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তার সুযোগ্য নেতৃত্বের কথা সর্বজনবিদিত।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ করা হয়। মূলত প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করা হলেও এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

১৯০৫ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশই ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এর আয়তন ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশের শাসনকাজ পরিচালনা করা ছিল কষ্টকর। তাই প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করা হয়। এছাড়া বাংলা প্রদেশের পুরো অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো। এতে পূর্ববঙ্গের জনগণ বঞ্চিত হয়ে চরম হতাশ হয়ে পড়ে। তাই মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গের দাবি পূরণ এবং কলকাতাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে মুসলমান সম্প্রদায় চরমভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়। তাই এর মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ারও ইচ্ছা ছিল ব্রিটিশ সরকারের। এসব কারণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল। যা উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উপমহাদেশের ঘটনাটির বিভক্তিকরণের প্রভাব ছিল বিপরীতধর্মী— উক্তিটি যথার্থ।

বঙ্গভঙ্গের ফলে উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে বাঙালি জাতির বিকাশমান সংহতি ও চেতনার ওপর আঘাত বলে বর্ণনা করে। আর মুসলমানরা মনে করে বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের স্বার্থরক্ষা হবে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার মুসলমানরা তাদের অধিকার ফিরে পাওয়ার আশায় উজ্জীবিত হয়। পূর্ব বাংলা নামে নতুন প্রদেশ হওয়ায় ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে বঙ্গবঙ্গের ফলে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দুই সম্প্রদায়ের ওপর বঙ্গভঙ্গের এই বিপরীতধর্মী প্রভাবের ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষবৃক্ষ রোপিত হয়। হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে মোকাবিলা করার জন্য মুসলমানরা মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে।

আপাতদৃষ্টিতে, বঙ্গভঙ্গ মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হয়। কারণ এতে তাদের 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির বিজয় হয়। বঙ্গবঙ্গের ফলে ব্রিটিশ সরকার কৌশলে কলকাতাকেন্দ্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার সুযোগ লাভ করে। এছাড়া বঙ্গভঙ্গের কারণে রাজনীতিতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবঙ্গের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং মুসলমানদের উন্নয়নের পথ প্রসারিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ মহানগরীর নগরবাসীদের অধিকতর সেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দু'ভাগে ভাগ করে 'ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন' ও 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন' নামে পৃথক দুটি সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করে। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. কত সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য আছে কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করা—বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ A ও B নামক দুটি সম্প্রদায় একই রাষ্ট্রে বসবাস করত। উক্ত সম্প্রদায় দুটির মধ্যে A সম্প্রদায় বিদেশী শক্তির সহায়তায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকে কিন্তু B সম্প্রদায়ের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে তারা ব্যবসা, শিল্প, কৃষ্টি, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে অনগ্রসর জনপদে পরিণত হয়। এক সময় বিদেশি শক্তি "ভাগ কর শাসন কর" নীতির ভিত্তিতে নিজেদের সুবিধার্থে উপনিবেশটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দেয়। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

Teachingbd24.com

ক. দ্বৈত শাসন বলতে কী বুঝ? ১
খ. 'ভাগ কর শাসন কর' নীতটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উপমহাদেশের কোন রাজনৈতিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনার পেছনে যে অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে সেগুলো বর্ণনা কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ শাসনামলের শুরুর দিকে বাংলার শাসনভার সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করাই হলো দ্বৈত শাসন।

খ ভাগ কর ও শাসন কর নীতি হলো ব্রিটিশদের কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার একটি রাজনৈতিক কৌশল।

ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা এক পক্ষকে খুশি করে নিজেদের পক্ষে রেখে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। তাই তারা সুকৌশলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং উগ্র ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু ও মুসলিমরা একে অন্যের জন্য শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ সুযোগে ব্রিটিশরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতিটি কার্যকর করতে তৎপর হয়।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত ঘটনার অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের পিছনে অন্তর্নিহিত অনেক কারণ রয়েছে।

বঙ্গ প্রদেশকে বিভক্ত করার পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। এর পেছনে প্রশাসনিক কারণটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। এ বিশাল ভূখণ্ডের প্রদেশটিকে কেন্দ্র থেকে একজন গভর্নরের পক্ষে শাসন করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ, পুলিশ ও ডাকব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। এ প্রেক্ষিতে ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ স্যার চার্লস গ্রান্ট সর্বপ্রথম বাংলা প্রদেশকে দুভাগে বিভক্ত করার সুপারিশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা নগরই ছিল ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী এবং বাংলা প্রদেশের সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। আর পূর্ববাংলার কৃষিজীবী মুসলিম জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ শোষণ করে হিন্দু জমিদারশ্রেণি রাজধানী কলকাতায় বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। তারা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কল্যাণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে পিছিয়ে পড়া পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল চরম হতাশা। এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ সরকার বাংলা প্রদেশকে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে। যাতে হিন্দু ও মুসলমানরা এক হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের পেছনে সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণসহ ব্রিটিশ সরকারের অন্তর্নিহিত কূট-কৌশল ছিল।

প্রশ্ন ▶৩৫ নীলাচল ইউনিয়নটি আয়তনে যেমন বড়, জনসংখ্যাও তেমনি অনেক বেশি। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় ইউনিয়ন সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনা করা কষ্ট ও কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া ইউনিয়নের অধিবাসীদের একটি অংশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে তাদের মতামত দেয়। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে। অধিবাসীদের একটি অংশ এর তীব্র বিরোধিতা করে। এমনকি সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড চালায়। ফলে এই বিভক্তিকরণ বেশিদিন টিকে থাকেনি। *[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. সর্বভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম কত সালে? ১
খ. জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে বাংলার ঐতিহাসিক যে ঘটনার মিল রয়েছে, তার তিনটি কারণ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলার ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালে।

খ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। তার মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, জীবন পরিচালনা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে তারা পৃথক দুটি জাতি। তার এই মতবাদটি 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ২১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৬ একটি দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'ক' ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও বিপুল। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এতো বড় ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইউনিয়নের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথক ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে দুটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. কত সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছিল? ১
খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয় ১৯০৬ সালে।

খ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। তার মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, জীবন পরিচালনা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে তারা পৃথক দুটি জাতি। তার এই মতবাদটি 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ২১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৭ সোহানাদের শ্রেণিশিক্ষক ক্লাসে ব্রিটিশ শাসনাধীন একটি দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। একটি শাসন আইনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন— যেখানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। প্রদেশের শাসনকর্তা হবেন নিয়মতান্ত্রিক। প্রাদেশিক আইন পরিষদ আইন তৈরি করবে। শিক্ষক বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেন যে, নানাবিধ বাধার কারণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ কার্যকর করা যায়নি। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

https://teachingbd24.com

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কেন কার্যকর হয়নি? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

খ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলো ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস কর্তৃক সম্পাদিত একটি ভূমি সংক্রান্ত চুক্তি।

এই চুক্তির মাধ্যমে জমিদারদেরকে জমির স্থায়ী মালিকানা প্রদান করা হয়। নিয়মিত ও নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে খাজনা প্রদানের বিধান রেখে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের জমিদারী হারানোর বিধান রাখা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে কৃষকরা সরাসরি জমিদার কর্তৃক শোষিত হতে থাকে। তবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে শিক্ষিত শ্রেণি হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসন আইন অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে পর্যালোচনা করা হলো-

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং পরম মিত্র দেশীয় রাজ্যগুলো নিচেয় একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রদেশে দ্বৈতশাসন রহিত হয় এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়। আর, কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হয়। কেন্দ্র সরকারের বিষয়সমূহ সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সংরক্ষিত বিষয় গভর্নর জেনারেল ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে পরিচালনা করতেন। তবে তিনি তাকে পরামর্শদানের জন্য তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারতেন। হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করতেন। এ আইনে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হয়। সংবিধান ছিল দীর্ঘায়িত, জটিল ও দুষ্পরিবর্তনীয়। এ আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য আইনের মাধ্যমে রাজ প্রতিনিধি নামক এক নতুন পদ গঠন করা হয়। এ আইনে ভোটাধিকারের যোগ্যতা শিথিল হওয়ায় অনেকে নতুন ভোটার হন।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক দীর্ঘায়িত সংবিধান।

ঘ সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৮ ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আতিক একে সিপাহি বিদ্রোহ বলতে নারাজ। সে স্যারকে প্রশ্ন করল, ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা সংগত নয় কেন? শ্রেণিকক্ষে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আতিকের মতকে সমর্থন করল। শিক্ষক বিষয়টি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক কৌশল বলে অভিমত দিলেন।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. সিপাহি বিদ্রোহ কী? ১
খ. সিপাহি বিদ্রোহের মূল কারণ কী কী? ২
গ. আতিকের মতে সিপাহি বিদ্রোহকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিক্ষকের উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিপাহি বিদ্রোহ হলো ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম সংগ্রাম, যা ভারতীয় সিপাহিদের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয়েছিল।

খ ১৮৫৭ সালে সংগঠিত সিপাহি বিদ্রোহের মূল কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. এনফিল্ড রাইফেলে গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের ব্যবহার যা হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে।
২. সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি, কোম্পানির অদক্ষ, পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসনব্যবস্থা।
৩. স্বত্ববিলোপ নীতির অজুহাতে অন্যায়ভাবে দেশীয় রাজ্যগুলো অধিকার করা।

গ হ্যাঁ, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম নামে আখ্যায়িত করা যায়। কারণ সিপাহি বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিতাড়িত করে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা।

সিপাহি বিদ্রোহের বিস্তৃতি ছিল সমগ্র ভারতব্যাপী। আর তাতে সিপাহিদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকরাও অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে এ বিদ্রোহটি জাতীয়তাবাদী রূপ লাভ করেছিল। সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ব্যারাকপুরে। কিন্তু অতি দ্রুততার সাথে এটি আগ্রা, দিল্লি, মিরাট, পাটনা, কলকাতা এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আরও বিপ্লব, সংগ্রাম, আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল যেমন— তিতুমীরের সংগ্রাম, ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। কিন্তু এর কোনোটিই সর্বভারতীয় ছিল না, কোনটি ছিল অঞ্চলভিত্তিক বা কোনটি ছিল গোষ্ঠী বা দলভিত্তিক। এমনকি উদ্দেশ্যগত দিক থেকেও এই আন্দোলনগুলোকে স্বাধীনতাকামী আন্দোলন বলা যাবে না। অপরদিকে সিপাহি বিদ্রোহ ছিল সর্বভারতীয় এবং এ বিদ্রোহের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার। ইতিহাসবিদরাও সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যেমন— বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জেমস আউটরিচ সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিক জে. বি. নটন ও ড. মজুমদার এ আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, 'এটা বিদ্রোহ আকারে শুরু হলেও পরে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়।'

সুতরাং বলা যায় যে, অনুচ্ছেদের আতিকের বলা ১৮৫৭ সালের সংগ্রামই ছিল ভারতের প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ঘ ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সিপাহিরা যাতে সংঘটিত হতে না পারে এজন্যই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে বলা হয় গরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের ব্যবহার। সৈন্যদেরকে এ কার্তুজ দাঁত দিয়ে ভেঙে তারপর রাইফেলে লোড করতে হতো। গরু ও শূকরের চর্বি মুখে নেওয়া হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। তাই ভারতীয় সৈন্যরা এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একসাথে বিদ্রোহ করেছিল।

শুধু প্রত্যক্ষ কারণে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে আরও অনেক কারণ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল অদক্ষ, পক্ষপাতদুষ্ট ও মারাত্মক দুর্নীতিপরায়ণ। তারা দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে বংশানুক্রমিক শাসকদের আভিজাত্য হ্রাস করেছিল, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল, দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন করেছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে ব্যবসায়ী জমিদারদের কৃষি জমির মালিক বানিয়েছিল। তাছাড়া লর্ড ডালহৌসি প্রণীত স্বত্ববিলোপ নীতি প্রণয়নের দ্বারা কোম্পানি সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, তাঞ্জোর ও কর্ণাটকের অধিকার গ্রহণ করে এবং সেখানকার উত্তরাধিকারী শাসকদের বঞ্চিত করে।

https://teachingbd24.com

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভুল রাজনৈতিক কৌশলসমূহের ফলশ্রুতিই হলো ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি বিদ্রোহ। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক যথার্থই বলেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ অধ্যাপক আব্দুস সালাম শ্রেণিকক্ষে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ এবং তা রদের ঘটনা অবিভক্ত ভারতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এছাড়াও তিনি কীভাবে ব্রিটিশ সরকার ধীরে ধীরে বিভিন্ন ভারত শাসন আইন দ্বারা এদেশের জনগণকে কিছু কিছু সাংবিধানিক সুবিধা প্রদান করেছিল সে সম্পর্কেও ছাত্রদেরকে ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ২]*

ক. কখন, কোথায় মুসলিম লীগের জন্ম হয়? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'বঙ্গভঙ্গ এবং তা রদের ঘটনা অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা'—অধ্যাপক আব্দুস সালামের উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল'— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

খ সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ 'বঙ্গভঙ্গ এবং তা রদের ঘটনা অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা'— উদ্দীপকের আব্দুস সালামের উক্তিটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাদেশকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করার সুপারিশপূর্বক একটি প্রতিবেদন ভারত সচিবের নিকট পেশ করেন। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা জারি করে এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হয় ঢাকা এবং স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।

বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা লাভবান হলে হিন্দু ও কায়েমি স্বার্থবাদী মহল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে ব্রিটেনের মিল মালিকদের দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করা হয়। একদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের তীব্র আন্দোলন ও অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীদের হত্যাযজ্ঞ ব্রিটিশ সরকারকে হতচকিত করে তোলে। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার বঙ্গভঙ্গকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালান। ব্রিটিশ রাজমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের শত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ স্থায়ী হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরাজ কায়েমি স্বার্থবাদী হিন্দুদের বিক্ষোভের নিকট নতি স্বীকার করে এবং ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন। ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪০

প্রতিক্রিয়া	→	১৯১১ সালে সংগঠিত হয়
প্রতিক্রিয়া	→	হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয় বলে ধারণা লাভ হয়

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ২]

ক. সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয় কত সালে? ১

খ. কংগ্রেস গঠনে হিউমের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উল্লিখিত ছকে কোন ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকের ঘটনায় হিন্দুদের যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তা সম্পূর্ণ মুসলমানদের বিপরীত— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালে।

খ ব্রিটিশ ভারতের জনগণের রাজনৈতিক মুক্তির প্রাথমিক প্রচেষ্টা হলো রাজনৈতিক দল কংগ্রেস প্রচেষ্টা।

ব্রিটিশ সরকার ভারতে তাদের শাসন দীর্ঘায়িত করার জন্য জনগণের উপর দমননীতি প্রয়োগের পাশাপাশি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। এ সময় ভারতের হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা করেছিল। এ সময় অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামে একজন ইংরেজ বেসামরিক কর্মকর্তা ভারতবাসীদের অসন্তোষ প্রশমিত করার লক্ষ্যে ১৮৮৩ সালের ১ মার্চ একটি খোলা চিঠির মাধ্যমে ভারতীয়দের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং মানবিক উৎকর্ষতা লাভের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন। হিউম ১৮৮৪ সালের প্রথমদিকে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট ডাফরিন এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত বাসীর পক্ষে তার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ডাফরিন হিউমের পরিকল্পনাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ ছকের ঘটনায় অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে হিন্দুদের যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তা মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গে রদের ঘোষণা করায় পশ্চিম বাংলার হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ উল্লসিত হয়ে ওঠে। কারণ কলকাতাকেন্দ্রিক লোকজন তাদের হারানো প্রভাব প্রতিপত্তি ফিরে পায়। আবারো কলকাতা সমগ্র বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র পরিণত হওয়ায় ব্যবসায়ীগণ খুশি হয়। পূর্ব বাংলার মক্কেলরা আবার কলকাতায় ছুটে আসবে ভেবে আইনজীবীগণ খুশি হন। এককথায় বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতা, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীগণ তাদের হারানো গৌরব ও প্রভাব প্রতিপত্তি ফিরে পেয়ে আনন্দিত হয়। অন্য দিকে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ঘোষণা শুনে মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিস্ময়ে বিমূঢ় ও হতাশ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের মধ্যে যে উৎসাহ, প্রাণচঞ্চল্য ও জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা তা স্তব্ধ করে দেয়। পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের ওপর থেকে মুসলিম জনগণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। নবাব স্যার সলিমুল্লাহসহ অনেক মুসলিম নেতাই ব্রিটিশ সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ হিন্দুদেরকেও অবিশ্বাস করতে শুরু করে।

উদ্দীপকের ছকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমাজের এক অংশের জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে ১৯১১ সালে একটি ঘটনা ঘটে। ভারতীয় কংগ্রেস একে স্বাগত জানায় এবং হিন্দুগণ উৎফুল্ল হয়। সুতরাং ছকের ঘটনাটি ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঘোষিত বঙ্গভঙ্গ রদকে ইঙ্গিত করছে যার ফলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ছকের ঘটনায় অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনায় হিন্দুদের যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তা সম্পূর্ণ মুসলমানদের বিপরীত।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪১ মি. এলেক্স ব্রিটিশ উপনিবেশিক অঞ্চলের একটি রাজনৈতিক দলের প্রখ্যাত নেতা। তিনি তাঁর অঞ্চলের সব জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দলের বার্ষিক সভার একটি সুপারিশমালা পেশ করেন। তাঁর সুপারিশমালায় ঐ অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের সাথে স্বাধীন অঙ্গরাজ্যসমূহের সম্পর্ক কী হবে বা সংখ্যালঘুদেরও স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন? ১

খ. ব্রিটিশদের ভাগ কর ও শাসন কর নীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. এলেক্স এর সুপারিশমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমার পঠিত বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সুপারিশমালার আলোকে তোমার পঠিত সুপারিশমালার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।

খ ভাগ কর ও শাসন কর ইংরেজ শাসকদের একটি কূটকৌশল বা কূটনীতি। এটি ব্রিটিশ সরকারের একটি চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি।

১৮৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতির অনুসরণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪২ বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটে। ফলে তারা তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল। *[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. পলাশীর যুদ্ধ হয় কত সালে? ১

খ. মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্যগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রস্তাবে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ সালে।

খ ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সবদিক হতে অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও এটি অবহেলিত ও বঞ্চিত মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে ব্যর্থ হয়। মুসলমানদের এ অবহেলিত ও হীন অবস্থা হতে উদ্ধারকল্পে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ অনুভূতির সার্থক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের ধারক ও বাহক হিসেবে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

গ উদ্দীপকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তারা পৃথক আবাসভূমির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. ভৌগোলিক দিক হতে সংলগ্ন এলাকাগুলো পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হবে।

২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের যে সকল এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।

৩. এভাবে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।

৪. ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।

৫. প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষা,পররাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

ঘ লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রস্তাবের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবটি সাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি জানায়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি সবকিছুই ছিল লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বাঙালিরা আরো সুসংহত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়ী করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিপীড়ন চালাতে শুরু করলে বাঙালি জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ ১৮৫৭ সাল ⟶ মহাবিদ্রোহ

১৯০৫ সাল ⟶ ক

১৯৪৭ সাল ⟶ খ

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? ১

খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' চিহ্নিত স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাটি কেন রদ করা হয়েছিল? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'খ' চিহ্নিত স্থানের উপযুক্ত বিষয়টি ভারতবর্ষের বিভক্তির সাথে জড়িত। বিশ্লেষণ কর। ৪

Teachingbd24.com

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল।

খ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলো ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রশাসন কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ও বাংলার ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি।

এ চুক্তির আওতায় জমিদার উপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভূ-সম্পত্তির নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী হন।কিন্তু জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কর প্রদানে সক্ষম না হলে এ মালিকানা স্বত্ব বিলুপ্ত করা হবে বলে এ ব্যবস্থায় উল্লেখ করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশরা তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা চালায়।

গ উদ্দীপকে ক চিহ্নিত স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাটি হলো বঙ্গভঙ্গ।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ করলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বঙ্গভঙ্গ করে। তবে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। এর পেছনে অনেক কারণ ছিল।

মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহযোগিতার কারণে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশি উপকৃত হবে ভেবে বর্ণবাদী ও কায়েমি হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। তারা স্বদেশি আন্দোলন এবং এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী আন্দোলনের ডাক দেয়। হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্বদেশি আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ব্রিটিশ রাজা নতি স্বীকার করে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে খ চিহ্নিত স্থানটি ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনকে নির্দেশ করে। যা ভারতবর্ষের বিভক্তির সাথে জড়িত।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দুটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি, ভারত সচিবের পদের অবসান এবং ভারত সম্রাট উপাধি বিলোপ করা হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়ন নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ আইন অনুযায়ী ভারত সচিব পদের বিলুপ্তি ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক রাখার দায়িত্ব কমনওয়েলথ সেক্রেটারির ওপর অর্পণ করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে প্রতিটি ডোমিনিয়নের একজন গভর্নর জেনারেল থাকার বিধান করা হয়। ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী রাজকীয় মর্যাদা ও উপাধি হতে ভারত সম্রাট উপাধি বিলুপ্ত হয়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে ব্রিটিশ ভারতের ১৯৪৭ সালের আইনকে ইঙ্গিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ বিশাল আয়তন নিয়ে গঠিত অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন জনাব মানিক মিয়া। তার একার পক্ষে বিশাল অঞ্চলের উন্নয়ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হচ্ছিল। এর ফলে কর্তৃপক্ষ বিশাল অঞ্চলকে 'ক' ও 'খ' অঞ্চলে বিভক্ত করে। এতে 'ক' অঞ্চলের জনগণ খুশি হলেও 'খ' অঞ্চলের জনগণ তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে দুই অঞ্চলকে পুনরায় একীভূত করা হয়। *[দিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং-১]*

ক. ব্রিটিশরা কত বছর ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছিল? ১

খ. 'লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল দ্বি-জাতি তত্ত্ব'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণ 'ক' অঞ্চলের জনজীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছিল।

খ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব।

হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। এই ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে বিভক্ত করার রাজনৈতিক মতবাদই হলো দ্বি-জাতিতত্ত্ব। আর এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪০ সালে লাহোরে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে।

গ সৃজনশীল ৯নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ অধ্যাপক ডালিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে পড়ছিলেন। তিনি একটি ভারত শাসন আইনে দেখতে পেলেন যে, উক্ত আইন দ্বারা প্রদেশগুলোতে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করা হয়। তার প্রায় ষোল বছর পর আর একটি ভারত শাসন প্রণীত হলে এতে প্রদেশ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন বিলুপ্ত করা হয়। তবে এবারে কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। শেষোক্ত ভারত শাসন আইন দ্বারা প্রদেশগুলোকে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল তা ছিল নামমাত্র ও অর্থহীন। *[লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. কত সালে, কোথায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়? ১

খ. বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণ কেন উৎফুল্ল হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ৩

ঘ. 'শেষোক্ত ভারত শাসন আইনে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান হয়েছিল তা ছিল নামমাত্র ও অর্থহীন' উদ্দীপকে বর্ণিত উক্তির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ সালে ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ'-এর জন্ম হয়।

খ বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হয়। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফলে মুসলমানগণ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়। ঢাকায় অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বড় বড় সুরম্য অট্টালিকা গড়ে ওঠায় ঢাকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া চাকরি-বাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ভেবে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি ভারত শাসন আইন বলতে এখানে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কথা বলা হয়েছে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সাথে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনের মধ্যকার পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো—

প্রথমত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রদেশে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়। অন্যদিকে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়।

Teachingbd24.com

দ্বিতীয়ত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও স্থানীয় শাসন। অপরদিকে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রের হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইন-শৃঙ্খলা।

তৃতীয়ত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল আইন-শৃঙ্খলা, বিচার, পুলিশ ও অর্থ। অন্যদিকে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রে সংরক্ষিত বিষয়ের মধ্যে ছিল দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও ধর্মীয় বিষয়।

ঘ শেষোক্ত ভারত শাসন আইনে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল, তা ছিল নামমাত্র ও অর্থহীন— এ উক্তিটি যথার্থ।

আমরা জানি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ প্রদেশে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রদেশের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত থেকে প্রদেশের তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর ওপর প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শাসনের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন শুধু তত্ত্বগতই ছিল, বাস্তবে নয়। কারণ এ আইনে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদের অপরিসীম ক্ষমতা প্রদানের ফলে প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গড়ে ওঠেনি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল, গভর্নর এবং ভারত সচিবের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অতএব বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল, তা ছিল অকার্যকর, নামমাত্র ও অর্থহীন।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ জনাব ইমতিয়াজ একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তিনি তার এক বক্তৃতায় ইংরেজদের আগমন এবং দূরভিসন্ধির চক্রান্তের এক প্রামান্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ দেশের আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা কতিপয় ব্যক্তির চরম বিশ্বাসঘাতকতার দিকও তুলে ধরেন। যার ফলশ্রুতিতে জাতিকে প্রায় দুইশত বছরের গ্লানি সইতে হয়। *[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), বেড়া, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তা কে? ১

খ. 'ভাগকর, শাসন কর' নীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে শাসকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের আগমনের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কতিপয়দের চরম বিশ্বাসঘাতকতা এদেশের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার অন্যতম কারণ-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তা ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কর্নওয়ালিস।

খ ভাগ কর ও শাসন কর নীতি হলো ব্রিটিশদের কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার একটি রাজনৈতিক কৌশল।

ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা এক পক্ষকে খুশি করে নিজেদের পক্ষে রেখে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। তাই তারা সুকৌশলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং উগ্র ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু ও মুসলিমরা একে অন্যের জন্য শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ সুযোগে ব্রিটিশরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতিটি কার্যকর করতে তৎপর হয়।

গ উদ্দীপকের শাসকদের অর্থাৎ ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে আগমনের কারণ ছিল বাণিজ্য করা।

ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার লক্ষ্যে ব্রিটিশরা ১৫৯৯ সালে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে লন্ডনে 'The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies' নামে একটি বণিক সংঘ গঠন করে। ১৬০০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে ব্রিটিশ রাজের সনদ লাভ করে সংগঠনটি 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে পরিচিতি লাভ করে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আগমন করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩৩ সালে উড়িষ্যা উপকূলে পৌছায় এবং বালেশ্বর ও হরিহরপুরে কুঠি স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

ইংরেজরা সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি সম্বলিত একটি ফরমান লাভ করে। তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করেন। এ সুবিধাটি পরবর্তীতে কোম্পানিকে বাংলার রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করে। ১৬৯০ সালে মুঘল সম্রাট ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে কোম্পানি সমগ্র ভারতবর্ষে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কতিপয়দের চরম বিশ্বাসঘাতকতা এদেশের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার অন্যতম কারণ- উক্তিটি যথার্থ।

১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই নবাবের কিছু ক্ষমতালোভী আত্মীয় ও রাজ দরবারের কয়েকজন সভাসদ ইংরেজ বণিকদের সাথে মিলে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মীর জাফর আলী খান, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, কোম্পানির কর্মকর্তা ওয়াটসন নবাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা পলাশীর প্রান্তরে নবাবকে পরাজিত করার মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন ঘটায়।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণে অগ্রসর হলে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ পলাশী প্রান্তরে উপস্থিত হন। উক্ত যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি মোহন লাল, মীর মদন ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রের আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কুপরামর্শে নবাব সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ করেন। ক্লাইভ মীরজাফরের ইঙ্গিতে বিশ্রামরত নবাব বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং নবাব বাহিনী পরাজিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য ২শত বছরের জন্য অস্তমিত হয়।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশটি বিশাল বড় এবং জনসংখ্যাও অনেক বেশী। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সম্প্রতি এ প্রদেশটি বিভক্ত করে তেলেঙ্গানা নামক আরও একটি প্রদেশ স্থাপন করে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। কিন্তু এর প্রতিবাদে সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দল আন্দালন শুরু করছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে তেলেঙ্গানা ভারতের ২৯তম প্রদেশে পরিণত হলো।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), বেড়া, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কতসালে ভারতবর্ষে আগমন করে? ১

খ. দ্বৈত শাসন বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি তোমার পাঠ্য বইয়ের যে বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য তার কারণসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার ফলাফল বর্ণনা কর। ৪

Teachingbd24.com

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করে।

খ সৃজনশীল ৫নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের বঙ্গভঙ্গের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর যে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়, তা ইতিহাসে 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুবিধার্থে ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের বিশাল ভূ-খণ্ডের 'বাংলা প্রেসিডেন্সি'কে বিভক্ত করেন। তিনি পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের অন্ধ্র প্রদেশটি বিশাল বড় এবং জনসংখ্যাও অনেক বেশি। তাই প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এ প্রদেশটি বিভক্ত করে তেলেঙ্গানা নামক আরো একটি প্রদেশ করা হয়। উদ্দীপকের এ ঘটনাটি বঙ্গভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করে। কারণ ব্রিটিশ শাসনামলে বঙ্গ প্রদেশটি ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রদেশ এবং এর জনসংখ্যাও ছিল অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি।

ঘ সৃজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ হাইতিতে প্রথমে স্পেনীয় ও পরে ফরাসিরা উপনিবেশ গড়ে তোলে। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ হতে মুক্তির জন্য মি. জ্যা জ্যাক ডেসলিনি ও মি. রোলান্ড দুটি ধারায় আন্দোলন শুরু করেন। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কাছে মি. জ্যা জ্যাক ডেসলিনি একটি রিপোর্ট ও মি. রোলান্ড চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করেন। উক্ত রিপোর্ট ও দাবির প্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠী একটি সংক্ষিপ্ত দলিল পেশ করেছিল এবং এই দলিলে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছিল।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১]

ক. কাকে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' প্রবক্তা বলা হয়? ১

খ. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের দ্বারা আইনসভার ক্ষমতা কীরূপ বৃদ্ধি পেয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক কোন আইনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কতটুকু কার্যকরী হয়েছিল বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা বলা হয়।

খ মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের দ্বারা আইনসভার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

এ আইনের মাধ্যমে আইন পরিষদের সদস্যগণকে বাজেট উপস্থাপন করার এবং জনস্বার্থ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। তবে রাজস্ব সংক্রান্ত শুল্ক, সরকারি ঋণ, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রস্তাব গ্রহণ বা আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল।

গ সৃজনশীল ১০নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ জনাব "S" এর উদ্যোগে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে 'ক' ও 'খ' নামক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। 'খ' রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর অনেক অন্যায় অত্যাচার চালায়। অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর 'খ' রাষ্ট্র ভেঙ্গে 'গ' রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। মূলত 'গ' রাষ্ট্রটির স্বাধীনতার বীজ জনাব 'S' এর মূল প্রস্তাবেই নিহিত ছিল।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ২]

ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে ছিলেন? ১

খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রদত্ত তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'S' কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটির সাথে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'গ' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বীজ জনাব 's' এর মূল প্রস্তাবেই ছিল ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য। তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

খ সৃজনশীল ২০নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২০নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫০ সালেহা কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হয়। ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিপুল বইয়ের সমাহার দেখে অবাক হয়। তার শিক্ষক বললেন, এ স্থানেই ১৯০৬ সালে এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল, যে সংগঠনটির নেতৃত্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. ভারতের কোন গভর্নর জেনারেলের সময় বঙ্গভঙ্গ করা হয়? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কার্জন হল এবং ফুলার রোডের সাথে যে দুজন ব্যক্তির নাম জড়িত বঙ্গভঙ্গের সাথে তাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্জন হল এবং ফুলার রোডের সাথে লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের নাম জড়িত।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। আর বঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কার্জনকে সার্বিকভাবে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করেছিলেন অভিজ্ঞ প্রশাসক স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। এ জন্য বঙ্গভঙ্গের পর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে ভারত সচিবকে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। এরপর ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন এবং ১৫ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর করেন।

উদ্দীপকে সালেহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ও ফুলার রোডে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি দেখতে পায়। এই কার্জন হল ও ফুলার রোডের নামকরণ হয়েছে লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের নামানুসারে। আর লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার উপরোল্লিখিতভাবে বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। তাই বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের সাথে লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনটি হলো মুসলিম লীগ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে এ সংগঠনটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতিতে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগের অধীনেই পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (Two Nation Theory) তুলে ধরেন। এর ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে প্রথমবারের মতো মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের সংকট সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। এই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব। এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানরা তাদের পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

অতএব বলা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ক্ষেত্রে শাহবাগে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৫১ সূত্রাপুর ইউনিয়নটি অনেক বড় এবং বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়লে এক অংশের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে বিভক্তির দাবি উঠে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আরো বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সূত্রাপুর ইউনিয়নটি দুইভাগে বিভক্ত করে। এতে অপর এক পক্ষ বিভক্তির তীব্র বিরোধীতা করে। ফলে এ বিভক্তি বেশিদিন স্থায়িত্ব পায়নি।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৩]

ক. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কী? ১

খ. ভাগ কর ও শাসন কর নীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসিক যে ঘটনার মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ঐতিহাসিক বিভক্তি কেন স্থায়িত্ব পায়নি- ব্যাখ্যা কর। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে প্রদেশগুলোর নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

খ ভাগ কর ও শাসন কর নীতি হলো ব্রিটিশদের কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার একটি রাজনৈতিক কৌশল।

ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা এক পক্ষকে খুশি করে নিজেদের পক্ষে রেখে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। তাই তারা সুকৌশলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং উগ্র ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু ও মুসলিমরা একে অন্যের জন্য শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ সুযোগে ব্রিটিশরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতিটি কার্যকর করতে তৎপর হয়।

গ সৃজনশীল ২১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ঐতিহাসিক বিভক্তি স্থায়িত্ব না পাওয়ার কারণ হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের চরম বিরোধিতা এবং অসহযোগিতা।

বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা উপকৃত হলেও হিন্দু সমাজ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা এটাকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে দাবি করে। ধীরে ধীরে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয় এবং অনতিবিলম্বে তা এক দুর্বার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তারা বিলাতি পণ্য বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলন এবং এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী আন্দোলনের ডাক দেয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে তারা বিলাতি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে ব্রিটিশ মিল মালিকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে, যাতে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্বদেশি আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের কাছে নতি স্বীকার করে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের চরম বিরোধিতা এবং অসহযোগিতার কারণে বঙ্গভঙ্গ স্থায়িত্ব পায়নি।

প্রশ্ন ▶ ৫২ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে দীর্ঘদিন ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরাজমান ছিল। তারা একটি বিদেশী শাসনের অধীন ছিল। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের জন্য ঐ অঞ্চলের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। ঐ অঞ্চলের দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তার প্রেক্ষিতে ঐ বিদেশী সরকার একটি আইন পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে পৃথিবীর বুকে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। *[জাফরাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১]*

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলতে কি বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের সঙ্গে তোমার পঠিত যে আইনের মিল রয়েছে তার ৩টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে আইনের কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য বর্ণনা কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

খ সৃজনশীল ৫নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের সাথে আমার পঠিত ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারত উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ আইনের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এ আইন ভারতীয় রাজনীতিতে একটি দীর্ঘ শাসনকালের সমাপ্তি ঘটায় এবং একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত দক্ষিণ এশিয়ার দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ লক্ষ করা যায়। এর কারণ হলো দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বিদেশি শাসনের অধীনে থাকা। তবে এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলেও তা সমাধান হয়নি। অবশেষে কর্তৃপক্ষ দু'সম্প্রদায়কে আলাদা করার চিন্তা করে এবং পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করে। এ আইন অনুযায়ী দু'সম্প্রদায়ের জন্য দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়। এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রিটিশ শাসন (১৭৫৭-১৯৪৭) বিদ্যমান ছিল। এ কারণে এখানকার প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের তথা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের সাম্প্রদায়িকতা দূর করার চেষ্টা করে। অবশেষে ভারতের সর্বশেষ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে '১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস হয়। এ আইনের ফলে ভারতবর্ষে একশত নব্বই বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। আর জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন সার্বভৌম দুটি রাষ্ট্র। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত আইনটি ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইন অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল, এ আইনে তার সমাপ্তি ঘটে। এ আইন পাসের মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন ও স্বার্বভৌম দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানে সংসদীয় ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এ আইন ভারতীয়দেরকে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়াই স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দেয়। এতে ভারতীয়রা নব-নব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। এ আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট ভারত-পাকিস্তান নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পথ চলা শুরু করে। ফলে উপমহাদেশের জনগণের কৃষি, সভ্যতা, সাহিত্য, জীবনযাত্রার প্রণালী ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের পথে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ আবুল হাসান একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। তিনি তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দলের কাউন্সিল মিটিংয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার রাজনৈতিক দলটি এই প্রস্তাব সংশোধন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিদেশি শাসকগোষ্ঠী কোনো উপায় না দেখে একটি আইনের মাধ্যমে বৃহৎ রাষ্ট্রটিকে ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৩]

ক. দ্বৈতশাসন কী? ১

খ. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রস্তাবের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন প্রস্তাবের সাদৃশ্য আছে? উক্ত প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত আইনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আইনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবার্ট ক্লাইভ দুই জনের যে অভিনব শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাকে দ্বৈতশাসন বলে।

খ ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ভারতের প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

এতে বলা হয়, কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে প্রদেশগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তারা তাদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং এর অনুগত প্রাদেশিক গভর্নর প্রদেশে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক গভর্নর প্রাদেশিক সরকারের কাজের ওপর নানাভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। এর ফলে প্রাদেশিক শাসন অনেকটা প্রহসনে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রস্তাবের সাথে আমার পঠিত শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের সাদৃশ্য আছে। নিচে লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো—

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সম্বলিত যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তাই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

লাহোর প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করলে মুসলিম লীগের দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়।

- ভৌগোলিক দিক হতে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।
- এভাবে গঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।
- ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শক্রমে তাদের শাসনতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকরি ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
- অঞ্চল বা প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সব ক্ষমতার অধিকারী হবে।

ঘ সৃজনশীল ১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ মি. মিশেল একটি বড় অঞ্চলের প্রশাসক। অঞ্চলটি আয়তনে বড় হওয়ার কারণে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মি. মিশেল সরকারের নিকট অঞ্চলটিকে বিভক্ত করার আবেদন জানালে সরকার রাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলটিকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত করে। এতে উত্তরাংশের জনগণ খুশী হয়। উত্তরাংশের জনপ্রিয় নেতা আব্দুল আলিম অনুধাবন করেছিলেন দক্ষিণাংশের জনগণ এই বিভক্তিকরণ মানবে না। এজন্য দক্ষিণাংশের জনগণের বিভক্তিকরণ বিরোধী তৎপরতাকে মোকাবিলা করার জন্য তিনি একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কোন আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে? ১

খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রবর্তিত রাজনৈতিক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আব্দুল আলিমের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সঙ্গে তোমার পঠিত কোন সংস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণের কারণ এবং তোমার পঠিত ঐতিহাসিক ঘটনাটির বিভক্তিকরণের কারণ কি একই ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ভারত শাসন আইন ১৮৫৮'-এর মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে।

খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রবর্তিত রাজনৈতিক তত্ত্বটি হলো দ্বি-জাতিতত্ত্ব। এটি ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। এ মতবাদটিই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের আব্দুল আলিমের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সাথে আমার পঠিত মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন সংস্থাটির মিল আছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক শ্রেণির হিন্দু সামন্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত। এ অবস্থায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ নামে আলাদা প্রদেশ গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করেন। এ সুপারিশের উপযোগিতা বিবেচনা করে এবং শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করেন। স্যার সলিমুল্লাহ উপলব্ধি করেছিলেন, বঙ্গভঙ্গ হলে শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দু সমাজ এর বিরোধিতা করবে। তাই তিনি মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। উদ্দীপকেও এমনটি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে মি. মিশেল একটি বড় অঞ্চলের প্রশাসক। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য তিনি এ অঞ্চলকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি অংশে বিভক্ত করেন। উত্তরাংশের জনগণ খুশি হয়। কিন্তু দক্ষিণাংশের জনগণ বিরোধিতা করে। এই বিরোধিতা মোকাবেলার জন্য উত্তরাংশের জনগণ আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে একটি সংস্থা গঠন করেন। তাই বলা যায়, আব্দুল আলিমের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সাথে মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন সংস্থাটির মিল আছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভক্তিকরণের কারণটি হলো প্রশাসনিক কারণ। আমার পঠিত ঐতিহাসিক ঘটনা অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও আরো কিছু কারণ রয়েছে।

বঙ্গভঙ্গের বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম হলো প্রশাসনিক কারণ। অবিভক্ত বাংলার আয়তন ২ লক্ষ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ। এত বিশাল আয়তন এবং বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাকে একজন গভর্নরের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে বাংলাকে বিভক্ত করা হয়। উদ্দীপকেও এমনটি লক্ষণীয়।

স্যার অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম এর প্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। এ কারণে ব্রিটিশ সরকার 'Divide and Rule' নীতি প্রয়োগের চেষ্টা চালায় বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে। এছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও বঙ্গভঙ্গ করা হয়। বাংলা প্রেসিডেন্সির রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার পাট উৎপন্ন হলেও পাটকলগুলো গড়ে ওঠে কলকাতায়। ফলে কলকাতা অল্প সময়েই সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে, বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হতে থাকে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের সমস্যার কথা উল্লেখ করে বড়লাটকে পত্র লিখলে তিনি পত্রের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও বঙ্গভঙ্গের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶৫৫ আলম সাহেব একজন খ্যাতনামা মুসলিম রাজনীতিবিদ। তিনি তার ধর্মের অনুসারীদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য তার দলের বার্ষিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল। *[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে ভারতবর্ষে আগমন করে? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আলম সাহেবের পেশকৃত প্রস্তাবের সাথে উদ্দীপকের প্রস্তাবের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তোমার পঠিত উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল— তুমি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তিসহ লিখ। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করে।

খ সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫৬ 'X' নামক রাষ্ট্রটি একটি বিদেশি শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। এখানে দুটি সম্প্রদায়ের বাস। সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। আবার মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও লেগে যেত। বিদেশি শক্তিটি 'X' রাষ্ট্রকে শাসন করার জন্য বিভিন্ন সময় আইন তৈরি করে। কিন্তু সম্প্রদায় দুটিকে কোনোক্রমেই খুশি করতে পারে না। অবশেষে দেশটি বিভক্ত করে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশি শক্তি একটি আইন পাস করে। আইনটিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম দুটি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। *[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কোন কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়? ১

খ. বঙ্গভঙ্গ কেন রদ হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাশকৃত আইনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন আইনের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয়দফা কর্মসূচিকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

খ হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহযোগিতার কারণে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশি উপকৃত হলে বর্ণবাদী ও কায়েমি হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। তারা স্বদেশি আন্দোলন এবং এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী আন্দোলনের ডাক দেয়। হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্বদেশি আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ব্রিটিশরাজ হিন্দুদের কাছে নতি স্বীকার করে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫৭ 'ক' নামক একটি দেশে ব্রিটিশ বণিক কোম্পানি কৌশলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এই কোম্পানি ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসে ও ধীরে ধীরে 'ক' নামক দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করতে সচেষ্ট হয়। 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি প্রণয়ন করে তারা প্রায় দুইশ বছর দেশটিকে শাসন ও শোষণ করে প্রশাসনিক সুবিধার দোহাই দিয়ে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করে। ফলশ্রুতিতে বড় দুটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। *[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১

খ. লাহোর প্রস্তাব কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের উপমহাদেশের কোন ঘটনাটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভক্তি করণের ফলে যে প্রভাব সৃষ্টি হয় তার সাথে তোমার পঠিত বিষয়ের বিভক্তিকরণের প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

Teachingbd24.com

খ ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবনাই হচ্ছে লাহোর প্রস্তাব।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। বস্তুতপক্ষে, ভারতের মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শগত পার্থক্যের ফল ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবকে কখনও কখনও 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

গ সৃজনশীল ৭নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ 'A' রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ আয়তনে বেশ বড়। এ প্রদেশে 'ক' ও 'খ' দুটি অঞ্চল। 'ক' অঞ্চলটিতে সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় 'খ' অঞ্চলের লোকদের বিভিন্ন কাজে 'ক' অঞ্চলে আসতে হয়। এছাড়াও নানা সমস্যা প্রদেশটিতে লেগেই থাকত। 'খ' প্রদেশের দাবির মুখে অবশেষে শাসকগোষ্ঠী 'ক' ও 'খ' অঞ্চল দুটোকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করে। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. কত সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়? ১

খ. লাহোর প্রস্তাবের ২টি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে রাজনৈতিক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে তার প্রধান ৩টি কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এটি কি শেষ পর্যন্ত রদ করা হয়েছিল? কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ গঠিত হয় ১৯০৬ সালে।

খ ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে দাবি উত্থাপন করেন তাই ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত। এ দাবির দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ভৌগোলিকভাবে পৃথক অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের রাজনৈতিক ঘটনা বঙ্গভঙ্গের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

বঙ্গভঙ্গের পেছনা বেশ কিছু কারণ নিহিত ছিল। সেগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কারণ ছিল অন্যতম।

প্রথমত, ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি ছিল 'Divide and Rule Policy' (ভাগ কর ও শাসন কর নীতি)। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা ভারতের প্রধান দুটি ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এ নীতির বাস্তবায়নের জন্য তারা হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও রাজনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টায় ১৮৮৫ সালে গড়ে তোলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বাংলা প্রদেশ বিশেষ করে কলকাতা ছিল কংগ্রেসের অন্যতম সূতিকাগার। ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ এবং বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বঙ্গভঙ্গ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

তৃতীয়ত, আলীগড় আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে গণজাগরণের সঞ্চার হয়। ফলে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানায়।

ঘ বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত রদ করা হয়েছিল।

বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে ঢাকা পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঢাকাকে নতুন শাসন বিভাগীয় এককের কেন্দ্রবিন্দু ঘোষণা করা হলে পূর্ববঙ্গের জনগণ বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশি উপকৃত হয় এবং কলকাতার ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়। ফলে বর্ণবাদী ও কায়েমি হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। তারা এটাকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে দাবি করে। ধীরে ধীরে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয় এবং অনতিবিলম্বে তা এক দুর্বার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

তারা বিলাতি পণ্য বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলন এবং এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী আন্দোলনের ডাক দেয়। বিলাতি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে ব্রিটিশ মিল মালিকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্বদেশি আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ফলে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের কাছে নতি স্বীকার করে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ রদের পেছনে মূল কারণ ছিল হিন্দু মৌলবাদের চরম বিরোধিতা এবং ব্রিটিশ সরকারের হীন রাজনৈতিক কৌশল।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ ব্রিটিশ শাসনাধীন বতসোয়ানায় দু'টি সম্প্রদায় বাস করত। দীর্ঘদিন একত্রে থাকার ফলে তাদের মধ্যে জাতিগত হিংসা বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করেন। তাদের একত্রে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ঐ রাষ্ট্রের জনপ্রিয় নেতা সোলায়মান বখত তাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত ঐ দাবির প্রেক্ষিতে দেশ বিদেশি শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। *[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে করেন? ১

খ. ভারতবর্ষের দুটি জাতি সম্পর্কিত মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সোলায়মান বখতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তোমার পঠিত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রস্তাবটি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ লিখ। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কর্নওয়ালিস জারি করেন।

খ ভারতবর্ষের দুটি জাতি সম্পর্কিত মতবাদটি হলো দ্বি-জাতি তত্ত্ব।

১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বটি প্রদান করেন। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলিম দুইটি আলাদা জাতি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং, জাতীয়তার দিক থেকেও তারা আলাদা। এটিই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তি।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রস্তাবটি অর্থাৎ, দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে আমি মনে করি।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজকে ব্যাপক আলোড়িত করেছিল।

Teachingbd24.com

দ্বি-জাতি তত্ত্বের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে লক্ষ কোটি মুসলমান রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ছিলো এ তত্ত্বের ধারাবাহিকতা। লাহোর প্রস্তাব দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। এরই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রস্তাবটি অর্থাৎ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রদত্ত প্রস্তাব দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৬০ 'ক' ইউরোপ মহাদেশের একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্র। ধর্মীয় ও ভূ-খণ্ডগত বিশালতার কারণে দেশটির 'গ' প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এর একটি অংশ 'গ্রীক সাইপ্রাস' ও অন্যটি 'তুরস্ক সাইপ্রাস', নামে পরিচিত। 'ক' দেশের এ বিভক্তিকরণ নিয়ে দু অংশের মধ্যে জাতিগত সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। এতে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অবশেষে একটি সম্প্রদায়ের আন্দোলনের কারণে সরকার ২০০৮ সালে প্রদেশটি পুনঃএকত্রীকরণে বাধ্য হয়। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' কত সালে ভারতবর্ষে আগমন করে? ১

খ. ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রয়োজন ছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ভারতবর্ষের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর, উক্ত ঘটনাটি উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য দায়ী? যুক্তি দাও। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করে।

খ ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

এ শাসনামলে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জনগণ ছিল মুসলমান। অথচ এ অঞ্চলের অধিকাংশ জমিদার ও মহাজন ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। এদের অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণে মুসলমান সম্প্রদায় অতিষ্ট হয়ে ওঠে। এমনকি আইনসভা ও প্রশাসনে মুসলমানদের প্রতিনিধি ছিল অপ্রতুল। এসব কারণে মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি তুলে।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত ঘটনাটি অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য দায়ী।

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও অগ্রগতির জন্য বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শাসনকার্যের সুবিধা, ধর্মীয় ও ভূখণ্ডগত বিশালতার কারণে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দুটি অংশে বিভক্ত করেন। এর ফলে মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হন। কিন্তু শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দুরা এর চরম বিরোধিতা করে। ফলে দুই অংশের মধ্যে জাতিগত সংঘাত শুরু হয়। অবশেষে, শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দু সমাজের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে এটি রদ করা হয়। উদ্দীপকেও এমন ঘটনা লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে 'ক' ইউরোপ মহাদেশের একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। ধর্মীয় ও ভূ-খণ্ডগত বিশালতার কারণে দেশটির 'গ' প্রদেশকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। এর একটি অংশ গ্রিক সাইপ্রাস ও অন্যটি তুরস্ক সাইপ্রাস নামে পরিচিত। এ বিভক্তিকরণ নিয়ে দুই অংশের মধ্যে জাতিগত সংঘাত চরম আকার ধারন করে। এতে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অবশেষে একটি সম্প্রদায়ের আন্দোলনের কারণে সরকার ২০০৮ সালে প্রদেশটিকে পুনরায় একত্রিত করে। এরকম জাতিগত সংঘাত বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬১ সজীব ও রাজীব দুই ভাই। সজীব তার পাঠ্যবই হতে একদল বিদেশি বণিকের ভারতে আগমন ও প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে রাজীবকে পড়ে শোনাচ্ছিল। সজীব বলল 'এরা একদিনে এই উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেনি, বরং এর পেছনে ছিল তাদের দূরদর্শী ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা'। রাজীব বলে, 'আমি পত্রিকায় পড়েছিলাম, এরা সর্বপ্রথম সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ভারত বর্ষে আসে।'

[সরকারি পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ২]

ক. কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হয়? ১

খ. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ কী ছিল? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বণিকদের কর্মকাণ্ড পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বণিকদের এদেশে আগমনের অন্তর্নিহিত কারণ কী ছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে ঘোষিত হয়।

খ বঙ্গভঙ্গের মূলে প্রশাসনিক কারণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। এ বিশাল প্রদেশটিকে কেন্দ্র থেকে একজন গভর্নরের পক্ষে শাসন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ, পুলিশ ও ডাকব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। এই প্রশাসনিক কারণই ছিল বঙ্গভঙ্গের অন্যতম কারণ।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত বণিকদের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাদৃশ্য আছে।

উদ্দীপকে সজিব তার পাঠ্যবই থেকে একদল বিদেশি বণিকের ভারতে আগমন ও প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে রাজিবকে পড়ে শোনাচ্ছিল। সে আরও বলে, এরা একদিনে এই উপমহাদেশে আগমন করেনি, বরং এর পেছনে ছিল তাদের দূরদর্শী ও সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা। রাজিব আরও বলে, এরা সর্বপ্রথম সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ভারতবর্ষে আসে। অনুরূপ ঘটনা পাঠ্যবইয়ের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করলেও তাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা ছিল ভারতবর্ষ শাসন করা। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আসে। এরপর উড়িষ্যা, বালেশ্বর, হরিহরপুর প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করে। বাংলার সুবাদার শাহ সুজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। পরবর্তীতে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কার্যকর শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে কোম্পানির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসকদের সাথে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ঘ উদ্দীপকের বণিকদের অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এ দেশে আগমনের অন্তর্নিহিত কারণ ছিল ভারতবর্ষের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের আড়ালে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ভারতবর্ষে আসে। এ কোম্পানিটি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে ১৫ বছরের অনুমতি পায়। ব্রিটেনের রানি স্বয়ং এ কোম্পানির একজন অংশীদার হন। এটি ভারতবর্ষে বিভিন্ন কুঠি স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

Teachingbd24.com

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সুবাদার শাহ সুজার কাছে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি পায়। পরবর্তীতে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়লাভের মাধ্যমে বাংলায় কোম্পানি কার্যকর শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে কোম্পানির ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কোম্পানি বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে দেশিয় রাজ্যগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। কোম্পানির শাসন-শোষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠে। এসব আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখ্য ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন, সিপাহি বিদ্রোহ প্রভৃতি। এসব আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করতে ১৮৫৮ সালে রানি ভিক্টোরিয়া সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মূলত ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করে।

প্রশ্ন ▶ ৬২ ইশা ব্রিটিশ ভারতের সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাস পড়ছিল। একটি আইনে সে দেখতে পেল যে উক্ত আইন দ্বারা বার্মাকে ভারত থেকে পৃথক করা হয়। সেই আইনের মাধ্যমে প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ আইন বলে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

[স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১]

ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে ইশা যে আইন সম্পর্কে পড়ছিল তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত আইনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি সংবলিত যে প্রস্তাব পেশ করেন তাই লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের ইশা যে আইন সম্পর্কে পড়ছিল সেটি হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভাতরবর্ষে এক বিক্ষুব্ধ অবস্থার সৃষ্টি করে। এ আইনের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য ১৯২৮ সালের ৩ মার্চ সাইমন কমিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু সাইমন কমিশনের সুপারিশসমূহকে ভারতবর্ষের জনগণ ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই একই বছরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিল নেহেরু রিপোর্ট। কিন্তু এ রিপোর্টে মুসলমানদের দাবি পূরণ না হওয়ায় তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯২৯ সালে জিন্নাহ মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করলেন ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার নিরসনকল্পে। সবকিছু মিলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ হয়ে উঠল অতীব জটিল। এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনা ও প্রস্তাবসমূহকে একত্রিত করে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। পরে শ্বেতপত্রটি পার্লামেন্টের 'যুক্ত কমিটি' দ্বারা পরীক্ষিত হয়। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কমন্সসভায় তদানীন্তত ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর একটি বিল উত্থাপন করেন। ২ আগস্ট ব্রিটিশ রাজের সম্মতি লাভের পর বিলটি আইনে রূপান্তরিত হয়। ঐ আইন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন' নামে পরিচিত।

ঘ উক্ত আইনে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ প্রদেশে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রদেশের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত থেকে প্রদেশের তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শাসনের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথসভা প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলেও বাস্তবে তার কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়নি। এ আইনে প্রদেশের গভর্নর ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের প্রধান। প্রাদেশিক গভর্নর নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুধু প্রধান ছিলেন না, তিনি তার 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' এবং 'বিচারবুদ্ধিমূলক ক্ষমতা'র মাধ্যমে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য ও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারতেন।

আইন প্রণয়নেও প্রাদেশিক গভর্নরগণ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। গভর্নর আইনসভার বিল নাকচ করা, ফেরত পাঠানো ইত্যাদি ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এছাড়া জরুরি অবস্থায় প্রদেশে আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। গভর্নরগণ ব্রিটিশরাজ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন বলে তাদের কার্যাবলির জন্য মন্ত্রিসভার কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল অর্থহীন। এ ব্যাপারে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার কোনো ক্ষমতা ছিল না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন শুধু তত্ত্বগতই ছিল বাস্তবে নয়। গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদের অপরিসীম ক্ষমতা প্রদানের ফলে প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গড়ে ওঠেনি। মূলত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল অকার্যকর ও অর্থহীন।

আলোচনা শেষে বলা যায়, গভর্নর জেনারেলের হস্তক্ষেপ এবং আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে ১৯৩৫ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ফলপ্রসূ হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৬৩ '১৬০৩ সালে স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের রাজবংশ রাজা প্রথম জ্যাকবের অধীনে একত্রিত হয়ে শত বছরের যুদ্ধের পর ১লা, মে ১৭০৭ প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি আর সাম্রাজ্যের গৌরবময়তার লোভে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে নিজেদের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয় স্কটল্যান্ডের তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। কিন্তু ধরে রাখে নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা, গির্জা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও নিজস্ব মুদ্রা। ১৯১৯ সালে টনি ব্লেয়ারের সরকারের সময় এক গণভোটের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো স্কটল্যান্ড পৃথক পার্লামেন্ট চালু করে, যেখানে প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন করা হয়।

[আলহাজ মকবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে? ১

খ. ভারতবর্ষে মুসলমানগণ স্বার্থ আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটের সাথে ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপটের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্কটল্যান্ডের পৃথক পার্লামেন্ট চালু করার প্রয়োজনীয়তা ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭-এর আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ১৯১১ সালে।

খ পৃথক জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে এবং পৃথক আবাসভূমির দাবিতে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ স্বার্থ আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছিল এবং তারা তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছিল। মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সচেতন করতে এবং তাদের পৃথক আবাসভূমির দাবিকে বেগবান করতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রবর্তন করেন এবং এর ভিত্তিতে লাহোর প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতেই ভারতবর্ষে মুসলমানগণ স্বার্থ আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটের সাথে ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপটের সাদৃশ্য হলো দীর্ঘ সময়ের ব্রিটিশ শাসনের অবসান।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন পাসের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আবার কংগ্রেসে ও মুসলিম লীগের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেও চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা মোতাবেক ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করে। এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি পৃথক ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের ঘটনাতেও একই বিষয় ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। স্কটল্যান্ডও এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে যায়। নিজেদের সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশ সম্রাটের কাছে বিকিয়ে দিয়ে তারা শত বছরের যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পায়। স্কটল্যান্ডের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে যেভাবে শত বছরের যুদ্ধের অবসান হয় তেমনিভাবে ভারত স্বাধীনতা আইন পাসের মাধ্যমেও ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। এদিক দিয়েই উক্ত দুই প্রেক্ষাপটের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ মোতাবেক উদ্দীপকে আলোচ্য স্কটল্যান্ডের পৃথক পার্লামেন্ট চালু করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যই পার্লামেন্ট তথা আইনসভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনেও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ আইনের মাধ্যমেই বিনা রক্তপাত এবং সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম ছাড়াই ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। যেকোনো স্বাধীন রাষ্ট্রেই আইনসভা থাকা অত্যন্ত জরুরি। তাই ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন মোতাবেক গণপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রত্যেক গণপরিষদের আলাদা আলাদা সংবিধান রচনার শর্তও এতে রাখা হয়। সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ দুটি উক্ত দুই রাষ্ট্রের আইনসভা হিসেবে কাজ করে।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে পৃথক পার্লামেন্টের গুরুত্বের কথা অনুধাবন করা হয়েছিল বিধায় এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উদ্দীপকে আলোচ্য স্কটল্যান্ডের পৃথক পার্লামেন্ট চালু করার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। স্কটল্যান্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ১৯১৯ সালে টনি ব্লেয়ারের সরকারের সময় গণভোটের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো স্কটল্যান্ড পৃথক পার্লামেন্ট চালু করে। আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে পার্লামেন্ট থাকা আবশ্যক। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনেও এ বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছিল যা উদ্দীপকের ঘটনাতেও প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ খুলনা কলেজের পৌরনীতির শিক্ষিকা রিমা চৌধুরী। তাঁর পৌরনীতি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ১৯০৫ সালে সংঘটিত বঙ্গভঙ্গের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে পাঠদান শেষে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে বঙ্গভঙ্গের ফলে কারা বেশি উপকৃত হয়? এক শিক্ষার্থী উত্তর দেয়, মুসলিম সম্প্রদায় ও ব্রিটিশ শাসকচক্র।

[হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. বঙ্গভঙ্গ কখন হয়? ১

খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে চালু করে? ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষিকার পাঠদানকৃত বঙ্গভঙ্গের কারণগুলো কী হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বঙ্গভঙ্গের ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীর উত্তরের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়।

খ লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্পাদিত একটি স্থায়ী চুক্তি। এর ফলস্বরূপ কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে শিক্ষিকার পাঠদানকৃত বঙ্গভঙ্গের বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

এর মধ্যে অন্যতম হল প্রশাসনিক কারণ। কেননা বাংলার আয়তন ছিল প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা খুব দুরূহ ছিল। এজন্য প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল।

প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ভাবলেন যে, বহু প্রদেশে বিভক্ত করা হলে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করা সম্ভব হবে এবং হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বিনষ্ট করা হবে। এ আশায় তিনি বঙ্গ প্রদেশকে বিভক্ত করে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দু সমাজ সচেতন হয়ে উঠলে ব্রিটিশ সরকার Divide and Rule নীতি প্রয়োগ করে বঙ্গভঙ্গের চেষ্টা করে। প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের সমস্যার কথা উল্লেখ করেও বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

ঘ সৃজনশীল ২১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬৫ একটি বড় আয়তনের দেশে কয়েকটি ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী আলাদা আলাদা অঞ্চলে পূর্বপুরুষ থেকে বসবাস করে। সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কারণে তারা মাঝে মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়। দেশটির শাসক বিভেদনীতির মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে শান্তি স্থাপনের প্রত্যাশায় জনাব আরিফ কিছু কিছু অঞ্চল নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাজ্য গঠনের প্রস্তাব উথাপন করেন।

[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]

ক. কোন আইনে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হতে পৃথক করা হয়? ১

খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বুঝ? ২

গ. জনাব আরিফের প্রস্তাব যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবকে ইঙ্গিত করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে উক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

খ ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার শাসনভার সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করাই হলো দ্বৈত শাসন।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) পর লর্ড ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। দ্বৈত শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নামমাত্র নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি ও জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার ইত্যাদি লাভজনক কাজ কোম্পানি নিজের হাতে রাখে। বলা হয়, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রথম অধ্যায়: ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ

★★ উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন

১. সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৮৫৭ সালে খ ১৮৬০ সালে
গ ১৯৭০ সালে ঘ ১৮৮৫ সালে — ক

২. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কোন দেশের বণিক সংঘ? [জ্ঞান]
ক ফ্রান্স খ ইংল্যান্ড
গ পর্তুগাল ঘ হল্যান্ড — খ

৩. কত সালে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৭৬৩ সালে খ ১৭৬৪ সালে
গ ১৭৬৫ সালে ঘ ১৭৬৬ সালে — খ

৪. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করে? *[কু. বো. '১৫]*
ক ১৬০০ সালে খ ১৬০১ সালে
গ ১৭৫৭ সালে ঘ ১৮৫৭ সালে — ক

৫. সিরাজউদ্দৌলা কত সালে বাংলার নবাব হন? *[সি. বো. '১৫, '১৬]*
ক ১৭৫২ সালে খ ১৭৫৪ সালে
গ ১৭৫৬ সালে ঘ ১৭৫৭ সালে — গ

৬. পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? *[দি. বো. '১৫, '১৬; চ. বো. '১৬ ব. বো. '১৫; সি. বো. '১৫; রা. বো. '১৫]*
ক ১৭৫৭ সালে খ ১৮৫৭ সালে
গ ১৯০৫ সালে ঘ ১৯৪৭ সালে — ক

৭. কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়? *[কু. বো. '১৬; চা. বো. '১৫]*
ক ১৭৫৭ খ ১৭৬৫
গ ১৭৮৫ ঘ ১৭৯৩ — ঘ

৮. 'Divide and Rule' নীতি কোন শাসকদের নীতিকে নির্দেশ করে? *[চ. বো. '১৫]*
ক পর্তুগীজ শাসক খ ডাচ শাসক
গ ফরাসি শাসক ঘ ইংরেজ শাসক — ঘ

৯. ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর প্রধান কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক লর্ড কর্নওয়ালিশ খ লর্ড বেন্টিঙ্ক
গ লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ লর্ড ক্লাইভ — ঘ

১০. কোন ইংরেজ শাসক দুই মেয়াদে বাংলার গভর্নর হয়েছিল? [অনুধাবন]
ক হেনরি ভেনসিটার্ট খ রজার ড্রেক
গ জন কার্টিয়ার ঘ রবার্ট ক্লাইভ — ঘ

১১. কোন চুক্তির বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার 'দিউয়ানি সনদ' লাভ করে? [জ্ঞান]
ক এলাহাবাদ চুক্তি খ মারী চুক্তি
গ পুনা চুক্তি ঘ আলীনগর চুক্তি — ক

১২. ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গভঙ্গ সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যগণ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়— [অনুধাবন]
i. ১৯০৫ সালে সংঘটিত বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন
ii. একটি সর্বভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠন
iii. মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য 'মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

১৩. মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের কাছ থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানি লাভ করায়— [অনুধাবন]
i. বাংলার নবাব ক্ষমতাহীন দায়িত্ব পালন করত
ii. কোম্পানি সরাসরি প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়
iii. কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

★★ ভারতীয় কাউন্সিল আইন-১৮৬১

১৪. ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ অনুসারে গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদ কত জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল? [জ্ঞান]
ক তিন জন খ চার জন
গ পাঁচ জন ঘ ছয় জন — গ

১৫. কোন আইন দ্বারা বাংলা অঞ্চলকে প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
ক মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯৩৯
খ ভারত শাসন আইন, ১৯১৯
গ ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১
ঘ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ — গ

১৬. ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে ভারতে কোন ব্যবস্থার জন্ম হয়? [জ্ঞান]
ক প্রগতিশীল খ প্রতিনিধিত্বশীল
গ স্বাধীনতাকামী ঘ শাসনতান্ত্রিক — খ

১৭. ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে মনোনয়ন পেতেন— [অনুধাবন]
i. ভারতীয় যুবরাজ
ii. বিপুল সম্পত্তির মালিক
iii. অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

★ ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৯২

১৮. কোন আইন দ্বারা ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো নির্বাচননীতি গৃহীত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী আইন
খ ১৮৫৭ সালের ভারত শাসন আইন
গ ১৮৬১ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন
ঘ ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন — ঘ

১৯. ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনানুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট কত ভাগ বেসরকারি সদস্য হতো? [জ্ঞান]
ক ৩ ভাগের ২ ভাগ খ ৪ ভাগের ২ ভাগ
গ ৫ ভাগের ২ ভাগ ঘ ৬ ভাগের ২ ভাগ — গ

২০. ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনানুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যগণ সরকারের কোন বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পেত? [জ্ঞান]
ক অর্থনৈতিক বিষয়ে খ রাজনৈতিক বিষয়ে
গ জনস্বার্থ বিষয়ে ঘ প্রশাসনিক বিষয়ে — ক

Teachingbd.com

২১. ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনানুযায়ী প্রাদেশিক আইনের সদস্যগণ কোন বিষয়ক প্রশ্ন সরকারকে করতে পারত? [জ্ঞান]
ক) জনস্বার্থ বিষয়ক খ) অর্থনৈতিক বিষয়ক
গ) ইলবার্ট বিল বিষয়ক
ঘ) রাজনৈতিক বিষয়ক **ক**

২২. ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইনকে বলা হয়— [অনুধাবন]
i. উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ প্রদর্শক
ii. প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপ
iii. সংসদীয় সরকারের ভিত্তিস্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

★★ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস– ১৮৮৫

২৩. ভারতীয় হিন্দু জনগণের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন? [জ্ঞান]
ক) বিপিনচন্দ্র পাল খ) অরবিন্দ ঘোষ
গ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
ঘ) রাসবিহারী বসু **গ**

২৪. 'ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি।' এখানে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? [অনুধাবন]
ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
খ) মুসলিম লীগ
গ) কৃষক প্রজা আন্দোলন
ঘ) মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন **ক**

২৫. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন কে? [ব. বো. ১৬]
ক) অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম
খ) মহাত্মা গান্ধী
গ) জওহর লাল নেহেরু
ঘ) লর্ড ডাফরিন **ক**

২৬. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়— [অনুধাবন]
i. ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর
ii. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়
iii. বোম্বাই শহরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

★★ বঙ্গভঙ্গ-১৯০৫

২৭. বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক) ১৯০৩ সালে খ) ১৯০৫ সালে
গ) ১৯০৯ সালে ঘ) ১৯১১ সালে **খ**

২৮. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন কে? [জ্ঞান]
ক) লর্ড কর্ণওয়ালিশ খ) লর্ড কার্জন
গ) লর্ড চেমসফোর্ড ঘ) লর্ড রীডিং **খ**

২৯. নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয় কোথায়? [জ্ঞান]
ক) মুর্শিদাবাদে খ) কলকাতায়
গ) ঢাকায় ঘ) চট্টগ্রামে **গ**

৩০. বঙ্গভঙ্গের পর লর্ড কার্জন ঢাকাকে কী হিসেবে চিহ্নিত করেন? [অনুধাবন]
ক) শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু
খ) পর্যটন নগরী
গ) উদীয়মান রাজধানী
ঘ) পরিচ্ছন্ন নগরী **ক**

৩১. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ কোনটি? [ব. বো. ১৬]
ক) রাজনৈতিক খ) প্রশাসনিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) ধর্মীয় **খ**

৩২. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক) ১৯০৫ খ) ১৯০৬
গ) ১৯০৯ ঘ) ১৯১১ **ঘ**

৩৩. বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার মূল কারণ কোনটি? [অনুধাবন]
ক) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন
খ) মুসলমানদের দুর্বল রাজনীতি
গ) হিন্দুদের সাথে জড়িত ব্রিটিশ স্বার্থ
ঘ) হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপন **ক**

৩৪. বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন হিসেবে যৌক্তিক হলো— [দি. বো. ১৬]
i. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতি
ii. ব্রিটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির বিজয়
iii. মুসলিম লীগের জন্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

৩৫. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ ছিল— [অনুধাবন]
i. স্বদেশি আন্দোলন
ii. বিলাতি দ্রব্য বর্জন
iii. কংগ্রেসের সমর্থন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মালেক স্যার তার শিক্ষার্থীদের বলেন, বাংলাতেও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে যখন বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। তেমনিভাবে ১৯০৫ সালে সংঘটিত ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন সকল স্তরের মানুষকে ক্রমেই রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করেছিল।

৩৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংঘটিত ঘটনা বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক) সিপাহি বিদ্রোহ খ) নীল বিদ্রোহ
গ) বঙ্গভঙ্গ ঘ) কংগ্রেস **গ**

Teachingbd.com

http://teachingbd.com

৩৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের তাৎপর্য— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ব্রিটিশ উচ্ছেদ আন্দোলন সংগঠিত করা
ii. পাকিস্তান রাষ্ট্র দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়
iii. বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও iii খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮–৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
নান্দাইল উপজেলার বেতাগৈর ইউনিয়নটির আয়তন ২০ বর্গ কি.মি যা অন্যান্য ইউনিয়নের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। তাছাড়া ইউনিয়নটির পূর্বাঞ্চল ছিল নদী অধ্যুষিত। ফলে নিরাপত্তা রক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল নিম্নমানের। তাই উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল হোসেন ইউনিয়নটিকে ভেঙ্গে দুটি ইউনিয়নে পরিণত করার পরামর্শ দেন জেলা প্রশাসককে।

৩৮. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চেয়ারম্যানের সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন প্রশাসকের মিল রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক লর্ড ব্যামফিল্ড ফুলার
খ লর্ড কার্জন
গ লর্ড মাউন্টব্যাটেন
ঘ লর্ড রিপন **খ**

৩৯. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ইউনিয়নের সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন প্রদেশটির সাদৃশ্য রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক মাদ্রাজ খ উড়িষ্যা
গ বাংলা প্রেসিডেন্সি
ঘ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ **গ**

৪০. অনুচ্ছেদে বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতার যে সকল বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. প্রশাসনিক এলাকার বিশালায়তন
ii. নিরাপত্তা বিধানের ঘাটতি
iii. অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ মুসলিম লীগ, ১৯০৬

৪১. ভারতীয় মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনে উদ্বুদ্ধ হয় কেন? *[সি. বো. '১৫]*
ক মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য
খ হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য
গ মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্য
ঘ পৃথক জাতিসত্তা প্রকাশের জন্য **গ**

৪২. 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯০২ সালে খ ১৯০৫ সালে
গ ১৯০৬ সালে ঘ ১৯১১ সালে **গ**

৪৩. মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাবকারী কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক নবাব ভিখারুল মূলক
খ ফিরোজ শাহ্ মেহতা
গ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্
ঘ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ **গ**

৪৪. ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আলাদা সংগঠনের উৎসাহ দেন কেন? [অনুধাবন]
ক কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীলতার জন্য
খ কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য
গ মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ধ্বংস করার জন্য
ঘ হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য **খ**

৪৫. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল— [অনুধাবন]
i. সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা
ii. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য নিশ্চিত করা
iii. মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া উত্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯০৯

৪৬. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী? *[চ. বো. '১৫]*
ক ইংরেজদের স্বতন্ত্র নির্বাচন
খ হিন্দুদের স্বতন্ত্র নির্বাচন
গ মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন
ঘ সংখ্যালঘুদের নির্বাচন **গ**

৪৭. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কত সালে পাস হয়? [জ্ঞান]
ক ১৮৮৫ সালে খ ১৯০৯ সালে
গ ১৯১৯ সালে ঘ ১৯৩৫ সালে **খ**

৪৮. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কতজন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ৬০ জন খ ৬৫ জন
গ ৬৯ জন ঘ ৭২ জন **গ**

৪৯. ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দানের প্রতি ব্রিটিশদের উদ্দীপিত করেছিল কোনটি? [অনুধাবন]
ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি
খ মুসলিম লীগের রাজনীতি
গ ব্রিটিশদের উদারতা
ঘ প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা **ঘ**

৫০. ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়-দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা হয়? [অনুধাবন]
ক গভর্নর জেনারেল খ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট
গ ভারত সচিব ঘ ভারতীয় পার্লামেন্ট **খ**

৫১. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন ব্যর্থ হওয়ার কারণ— [অনুধাবন]
i. ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি
ii. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ
iii. দায়িত্বশীল সরকারের প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
স্যার নীলরতন সরকার ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ। তিনি একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তার সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ৫২ জন সদস্য ছিল। তিনি পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৫২. স্যার নীলরতন সরকার কোন কাউন্সিল আইনের বলে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন? [প্রয়োগ]
ক ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৮৬১
খ ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৮৯২
গ ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৯০৯
ঘ ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৯১৯ **গ**

৫৩. স্যার নীলরতন সরকারের সময়ের আইনসভার ক্ষেত্রে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সীমিত ভোটাধিকার ছিল
ii. নির্বাচিত ও অনির্বাচিত উভয় প্রকার সদস্য ছিল
iii. মুসলিমদের জন্য মুসলিম প্রতিনিধি ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

৫৪. 'বেঙ্গল প্যাক্ট' কত সালে সম্পাদিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯১৬ সালে খ ১৯১৯ সালে
গ ১৯২০ সালে ঘ ১৯২৩ সালে **ঘ**

৫৫. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে হস্তান্তরিত বিষয় কোনটি ছিল? *[ঢা. বো. '১৫]*
ক অর্থ খ সেচ
গ শিক্ষা ঘ ভূমি **গ**

৫৬. ১৯১৯ সালে প্রবর্তিত নতুন শাসন ব্যবস্থা ছিল- *[চ. বো. '১৫]*
ক প্রধানমন্ত্রীর শাসন খ দ্বৈতশাসন
গ গর্ভনরের শাসন ঘ রাষ্ট্রপতির শাসন **খ**

৫৭. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনানুযায়ী ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ছিল কার? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*
ক আইন পরিষদের সদস্যদের
খ নিম্নবংশের সদস্যদের
গ উচ্চবংশের সদস্যদের
ঘ গভর্নর জেনারেলের **ঘ**

৫৮. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের সাথে জড়িত এডউইন মন্টেগু ও লর্ড চেমসফোর্ডের পদমর্যাদা যথাক্রমে কী ছিল? [অনুধাবন]
ক ভারত সচিব, পার্লামেন্ট সদস্য
খ পার্লামেন্ট সদস্য ও ভারত সচিব
গ ভারত সচিব, ভাইসরয়
ঘ ভাইসরয়, স্পিকার **গ**

৫৯. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন রাজকীয় সম্মতি লাভ করে কখন? [জ্ঞান]
ক ২২ নভেম্বর খ ২৩ নভেম্বর
গ ২২ ডিসেম্বর ঘ ২৩ ডিসেম্বর **ঘ**

৬০. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা প্রবর্তিত 'কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া'র সদস্য সংখ্যা কত ছিল? [জ্ঞান]
ক ১০ খ ১২
গ ১৪ ঘ ১৬ **খ**

৬১. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা আইনসভায় যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হলো— [অনুধাবন]
i. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা
ii. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা
iii. প্রাদেশিক আইনসমূহের ৭০ ভাগ সদস্য ছিল নির্বাচিত
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
'ক' অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। যেকোনো অজুহাতে এই অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি লেগে থাকে। এ ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি একটি চুক্তি সম্পাদন করে। *[য. বো. '১৫]*

৬২. উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলে কোন চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক লক্ষ্ণৌ চুক্তি খ বেঙ্গালপ্যাক্ট
গ পুনাচুক্তি ঘ সিমলা চুক্তি **খ**

৬৩. এই চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক—
i. স্বায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা
ii. ধর্মভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা
iii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

৬৪. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিশেষ দিক কোনটি? [জ্ঞান]
ক যুক্ত নির্বাচন খ যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা
গ স্বায়ত্তশাসন ঘ ভারত বিভক্তি **গ**

৬৫. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আইনের সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত করা হয়? [জ্ঞান]
ক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওপর
খ কোম্পানির ওপর
গ ভারতীয়দের ওপর
ঘ কংগ্রেসের ওপর **ক**

৬৬. মনে কর তুমি ব্রিটিশ ভারতে রয়েছে। ভারতের সাথে ফ্রান্সের একটি চুক্তি হচ্ছে। চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো কে নিয়ন্ত্রণ করছে? [প্রয়োগ]
ক মন্ত্রিপরিষদ খ গভর্নর জেনারেল
গ ভারত সচিব ঘ ভারতীয় জমিদার **খ**

http://teachingbd.com

৬৭. ভারত শাসন আইনে ভারতীয় উপদেষ্টামণ্ডলী রহিত করার সাথে কোনটি জড়িত? [অনুধাবন]
ক ভারত সচিব খ রাজপ্রতিনিধি
গ উপদেষ্টা সংখ্যা ঘ ভারতীয় প্রতিনিধি **গ**

৬৮. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা প্রশমিত করতে চেয়েছিল— [অনুধাবন]
i. ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের অসন্তোষ
ii. ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের ক্ষোভ
iii. হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দূরত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের ছকটি দেখ এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

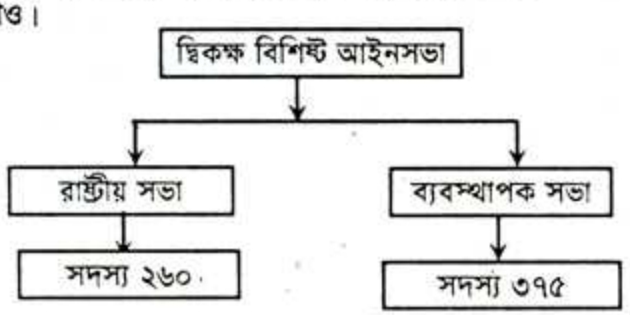

[দি. বো.; রা. বো. '১৫]

৬৯. উদ্দীপকে কোন আইনটির সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে?
ক ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইন
খ ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন
গ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
ঘ ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন **গ**

৭০. উদ্দীপকে যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—
i. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত
ii. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
iii. কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ প্রাদেশিক নির্বাচন, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬

৭১. অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৩০ সালে খ ১৯৩৫ সালে
গ ১৯৩৭ সালে ঘ ১৯৪৬ সালে **গ**

৭২. অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচন বা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯২৯ খ ১৯৩২
গ ১৯৩৫ ঘ ১৯৩৭ **ঘ**

৭৩. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রাদেশিক নির্বাচন হয় কত সালে? [অনুধাবন]
ক ১৯৩৫ সালে খ ১৯৩৬ সালে
গ ১৯৩৭ সালে ঘ ১৯৩৮ সালে **গ**

৭৪. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোনটি কংগ্রেসের ব্যতিক্রমী অর্জন? [অনুধাবন]
ক ৫টি মুসলিম আসন খ ৭টি ব্রিটিশ আসন
গ ৭১১টি হিন্দু আসন ঘ ৭টি মুসলিম আসন **ঘ**

৭৫. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন হলো— *[চা. বো. '১৫]*
i. কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়া
ii. নতুন প্রদেশ সৃষ্টি
iii. প্রদেশে নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭৬. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মূল কথা হলো— *[য. বো. '১৫]*
i. প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে
ii. আইনসভা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে
iii. প্রদেশে দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭৭. ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. সরকার গঠনে কংগ্রেস প্রাধান্য লাভ করে
ii. মুসলিম লীগ মুসলিম আসনে প্রাধান্য বিস্তার করে
iii. নির্বাচনে দ্বিদলীয় প্রাধান্য দেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ জিন্নাহ্‌র দ্বি-জাতি তত্ত্ব

৭৮. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রচার করেন কে? [জ্ঞান]
ক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
খ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
গ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ঘ মাওলানা শওকত আলী **গ**

http://teachingbd.com

৭৯. জিন্নাহর লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের ফলাফল কী? *[চ. বো. '১৩]*
ক ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
খ একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
গ অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যাহত
ঘ অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠা **গ**

৮০. জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূল দিক কোনটি? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক ভারতের প্রধান জাতি মুসলমান
খ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের সমান অধিকার
গ ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসন করবে
ঘ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করতে হবে **খ**

৮১. কত সালে জিন্নাহর চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯২৭ সালে খ ১৯২৮ সালে
গ ১৯২৯ সালে ঘ ১৯৩০ সালে **গ**

৮২. জিন্নাহর চৌদ্দ দফায় কোন অঞ্চলকে পৃথক প্রদেশ করার দাবি ছিল? [জ্ঞান]
ক সিন্ধু খ বাংলা
গ পাঞ্জাব ঘ বেলুচিস্তান **ক**

৮৩. দ্বি-জাতি তত্ত্বের সূচনা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৩৮ সালে খ ১৯৪০ সালে
গ ১৯৪১ সালে ঘ ১৯৪৫ সালে **খ**

★★ লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

৮৪. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কত সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন? [জ্ঞান]
ক ১৯০৫ সালে খ ১৯৩৫ সালে
গ ১৯৪০ সালে ঘ ১৯৪৭ সালে **গ**

৮৫. 'ভারতে মাত্র দুটি দলই আছে- ব্রিটিশ ও কংগ্রেস'- ঘোষণাটি কার? [জ্ঞান]
ক মহাত্মা গান্ধীর খ চিত্তরঞ্জন দাসের
গ সুভাষ বসুর ঘ জওহরলাল নেহেরুর **ঘ**

৮৬. মুসলিম লীগ কত সালে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা বর্জন করে? [জ্ঞান]
ক ১৯৪২ সালে খ ১৯৪৪ সালে
গ ১৯৪৫ সালে ঘ ১৯৪৬ সালে **ঘ**

৮৭. মোহম্মদ আলী জিন্নাহর 'নাজাত দিবস' ঘোষণার কারণ কী? [অনুধাবন]
ক ভারতের স্বাধীনতা লাভ
খ পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ
গ কংগ্রেসের পদত্যাগ
ঘ ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ **গ**

৮৮. লাহোর প্রস্তাবের মাঝে প্রত্যাখ্যান করার ইঙ্গিত থাকে— [অনুধাবন]
i. ক্রিপস্ প্রস্তাব
ii. ভারত স্বাধীনতা আইন
iii. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

৮৯. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর কার নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রিসভা গঠিত হয়? [জ্ঞান] *[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা; সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা]*
ক শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ আবুল হাশেম ঘ চিত্তরঞ্জন **খ**

৯০. ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কেন? [অনুধাবন] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউ এসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর]*
ক কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করায়
খ মুসলিম লীগ গ্রহণ করায়
গ ব্রিটিশরা প্রত্যাখ্যান করায়
ঘ রানির অনুমোদন না পাওয়ায় **ক**

৯১. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা পেশ করা হয় কত সালে? [জ্ঞান] *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৯৪৪ সালে খ ১৯৪৬ সালে
গ ১৯৪৭ সালে ঘ ১৯৪৮ সালে **খ**

৯২. মন্ত্রিমিশনের সদস্য ছিলেন কারা? [অনুধাবন]
ক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, লর্ড প্যাথিক লরেন্স, এ. ভি. আলেকজান্ডার
খ লর্ড ওয়াভেল, লর্ড লিনলিথগো, লর্ড মাউন্টব্যাটেন
গ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ, এ ভি আলেকজান্ডার
ঘ লর্ড প্যাথিক লরেন্স, এ. ভি. আলেকজান্ডার, লর্ড ওয়াভেল **ক**

৯৩. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রধান কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক লর্ড মাউন্টব্যাটেন
খ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্
গ লর্ড প্যাথিক লরেন্স
ঘ এ. ভি. আলেকজান্ডার **খ**

৯৪. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ *'India wins Freedom'* গ্রন্থে কংগ্রেস সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন? [প্রয়োগ]
ক কংগ্রেস শুরু থেকে অখণ্ড ভারত চেয়েছিল
খ অখণ্ড ভারতের প্রতি কংগ্রেসের আন্তরিকতার অভাব ছিল
গ মুসলিম ও কংগ্রেস পরস্পর বিপরীত
ঘ পাকিস্তান সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক **খ**

http://teachingbd.com

★★ স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, ১৯৪৭

৯৫. অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাথে কোন ব্যক্তি জড়িত? [জ্ঞান]
ক হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
খ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ আবুল মনসুর আহমেদ **ক**

৯৬. 'আমি সব সময় অখণ্ড বাংলা ও বৃহৎ বাংলার পক্ষপাতি'— উক্তিটি কে করেছিলেন? [জ্ঞান]
ক হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
খ চিত্তরঞ্জন দাস
গ কিরণ শংকর রায় ঘ শরৎচন্দ্র বসু **ক**

৯৭. 'যুক্ত বাংলা একদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে'- উক্তিটি কে করেছেন? [জ্ঞান]
ক খাজা নাজিমুদ্দিন খ নূরুল আমিন
গ জওহরলাল নেহেরু
ঘ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ **গ**

৯৮. নবীন স্যার শ্রেণিকক্ষে এমন একজন নেতার কথা বললেন, যিনি স্বাধীন বঙ্গদেশের বিরোধিতা করেন। তিনি কার কথা বলেছেন? [প্রয়োগ]
ক শরৎ বসু খ সুভাষ চন্দ্র বসু
গ কিরণ শঙ্কর রায় ঘ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী **ঘ**

★ ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

৯৯. ৩রা জুন পরিকল্পনা কী? [রা. বো. '১৬]
ক ভারত বিভক্ত করার পরিকল্পনা
খ ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনা
গ বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা
ঘ পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা **ক**

১০০. কোন পরিকল্পনার বাস্তব রূপ ভারত স্বাধীনতা আইন? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা
খ ৩ জুন পরিকল্পনা
গ ভারত পরিকল্পনা ঘ ক্রিপস্ পরিকল্পনা **খ**

১০১. ১৯৪৭ সালের কত তারিখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয়দের কাছে এদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিয়েছিলেন? [জ্ঞান]
ক ২০ জানুয়ারি খ ১০ ফেব্রুয়ারি
গ ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘ ২০ ফেব্রুয়ারি **ঘ**

১০২. ভারতের সর্বশেষ ইংরেজ গভর্নর জেনারেল কে? [জ্ঞান]
ক লর্ড মিন্টো খ লর্ড কার্জন
গ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘ লর্ড হার্ডিঞ্জ **গ**

১০৩. পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণ কমিশনের সভাপতি কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক লর্ড মাউন্টব্যাটেন খ স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ
গ লয়েড জর্জ ঘ লর্ড কার্জন **খ**

১০৪. ভারতের রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনে কোনটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে? [অনুধাবন]
ক ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন
খ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
গ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন
ঘ ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধান **গ**

১০৫. ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল— [অনুধাবন]
i. ইংরেজ শাসনের অবসান
ii. মুসলিম শাসনের পুনর্জাগরণ
iii. ভারত বিভক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১০৬. লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে যেটি পরিলক্ষিত হয়— [চ. বো. '১৫]
i. পাকিস্তান ও ভারত সৃষ্টি
ii. দ্বি-জাতি তত্ত্বের সৃষ্টি
iii. সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রাজিবের দেশটি এক সময় বিদেশি শক্তি দ্বারা শাসিত হত। একসময় ঔপনিবেশিক সরকার একটি আইন করে ও দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর একটি রাজিবের রাষ্ট্র। [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]

১০৭. উদ্দীপকে বর্ণিত ঔপনিবেশিক সরকারের তৈরি আইনের সাথে তোমার পঠিত কোন আইনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ? [প্রয়োগ]
ক ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন
খ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন
গ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
ঘ ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন **ঘ**

১০৮. উক্ত আইনের ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়
ii. মুসলমানগণ আলাদা রাষ্ট্রের অধিকারী হয়
iii. হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের অবসান হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-২: পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

প্রশ্ন ▶১ 'ঘ' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দুই যুগ পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে বিজয়ী হয়। কিন্তু সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বিজয়ী দলের নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কার দ্বারা নির্বাচিত হন? ১

খ. শাসন বিভাগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়- বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের দ্বারা অর্থাৎ পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

খ শাসন বিভাগ বলতে বোঝায় সরকারের সে বিভাগকে যে বিভাগ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসন বিভাগই সরকারের আসল চালিকা শক্তি। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। শাসন বিভাগের কাজ হলো আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন করা।

গ উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে আমার পঠিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও দেশটির জাতীয় পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের মধ্যে পিপিপি মোট ৮৩টি আসন পায়। আওয়ামী লীগের এ বিজয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে দেয়। ফলে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে তারা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ঘ' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দুই যুগ পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বিজয়ী দলের নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যা আমার পঠিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ২৫ বছরের অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে বাঙালির স্বাধিকার এবং মুক্তি লাভের দাবিরই বহিঃপ্রকাশ।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও তা আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতালের ডাক দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তার ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ২ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন চলে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ অন্যান্য শহরগুলোতে হাজার হাজার নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রকৃতই পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়।

প্রশ্ন ▶২ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার মাত্র ৩ ভাগ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলনে নামে এবং জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। *[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. ছয়দফা কী? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন স্বাধীনতার সূত্রপাত করে- বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয়দফা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত বাঙালির অধিকার আদায়ের ৬টি দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি।

খ যুক্তফ্রন্ট বলতে ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ জোট চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয়। দলগুলো হলো- আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামি পার্টি এবং গণতন্ত্রী দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই দেশটির রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয়। সে সময় পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। অথচ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও তরুণ সমাজ তাদের এ

Teachingbd24.com

ঘোষণার প্রতিবাদ জানায় এবং তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারা পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। এ কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি করলে শহিদ হন জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকসহ আরো অনেকে। ফলে এ আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সরকার মাত্র ৩ ভাগ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলনে নামে এবং জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। তাদের এ আন্দোলন ও প্রতিরোধ কর্মসূচির সাথে বাঙালির ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্রপাত করে।

পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। তবুও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকসহ আরো অনেকে শহিদ হন। এ আন্দোলনই বাঙালি জাতির ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন নামে খ্যাত।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকার মাত্র ৩ ভাগ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলনে নামে এবং জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। তাদের এ আন্দোলন ১৯৫২ সালের বাঙালির ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ভাষা আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তীকালে বাঙালির প্রতিটি গণ-আন্দোলনে প্রেরণা যোগায় এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধিকারের প্রশ্নে পূর্ব বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের। তাই বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্রপাত করে।

প্রশ্ন ▶৩ 'খ' রাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাগারে রাখার পর ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করায় জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এক পর্যায়ে সরকার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে জনপ্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. ভাষা আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেগবান করে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

খ ভাষা আন্দোলন বলতে বোঝায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে সংঘটিত গণআন্দোলন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরপরই দেশটির রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, সফিকসহ আরো অনেকে শহিদ হন। এ আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পাকিস্তানের অন্যতম আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে।

আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করার পর পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পূর্ব বাংলার জনগণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে উপেক্ষা করেন। ৬ দফা আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বাত্মক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনই '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে খ্যাত। গণআন্দোলনে ভীত হয়ে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুসহ অন্য বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনায়ও দেখা যায়, 'খ' রাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাগারে রাখার পর ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করায় জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এক পর্যায়ে সরকার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে জনপ্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। যা আমার পঠিত ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে বাঙালির ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সাদৃশ্যপূর্ণ যা বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেগবান করে।

১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অল্পসময়ের মধ্যে এ প্রতিবাদ গণআন্দোলনে রূপ নেয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতারা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে অটল থাকে। এ সময় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। গণআন্দোলন আরও তীব্র রূপ ধারণ করে এবং প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং সব আসামিকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। গণঅভ্যুত্থানের ফলে ষড়যন্ত্রমূলক এ মামলার অবসান ঘটে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

গণঅভ্যুত্থানের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যেতে থাকে। তাই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয় যা মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ রচনা করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার জনগণ নিজেদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংগ্রাম করে এবং এর ফলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ ছকটি দেখো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

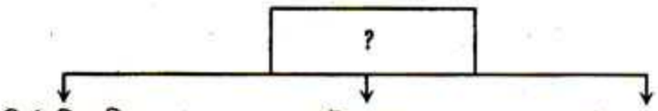

[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. ১৯৫৮ সালে কে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন? ১

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে? উক্ত নির্বাচনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত নির্বাচনে কোন জোট জয়লাভ করে এবং তাদের বিজয়ের কারণসমূহ আলোচনা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন।

খ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে বোঝায়। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় একটি দিন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জীবন দিয়েছিল। ভাষার জন্য বাঙালির এ মহান আত্মত্যাগকে মূল্যায়ন করে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘভুক্ত সবগুলো দেশে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশ এবং মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক। এ নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব বাংলার মানুষকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। উদ্দীপকে এ নির্বাচনেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের ছকটিতে নির্বাচনি প্রতীক হিসেবে নৌকা, মোট আসন সংখ্যা ৩০৯ এবং ফলাফলের স্থানে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ২২৩ উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরে নাম হয় আওয়ামী লীগ) নেতৃত্বে মোট চারটি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। জোটের অন্য তিন দল ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামি ও গণতন্ত্রী দল। এর নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা। এ নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৩০৯ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টিতে জয়ী হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া মুসলিম লীগ সাত বছরেই বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলায় নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হয়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নিয়ম অনুযায়ী ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করে। শেষ পর্যন্ত গণদাবির মুখে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ (৮-১২ মার্চ) পূর্ব বাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নামক জোট জয়লাভ করে।

উদ্দীপকের ছকটি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে নির্দেশ করে। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে তাদের জয়লাভের পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান ছিল।

জনপ্রিয়তা হারানো মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মধ্য, বাম ও ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক শক্তি বেড়ে যায় এবং নির্বাচনে বিজয় সহজতর হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ভিত্তিক নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের দলিল। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। তাছাড়া বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি ইশতেহারে প্রাধান্য পায়। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ২১ দফার প্রতি বিপুলভাবে সমর্থন জানায়। এর ফলেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অনন্য সাফল্য অর্জন করে। নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টিও যুক্তফ্রন্টের জয়ের অন্যতম কারণ ছিল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এবং এ.কে. ফজলুল হকের মতো সুযোগ্য ও জননন্দিত নেতৃবৃন্দ ছিলেন যুক্তফ্রন্টের পরিচালনার দায়িত্বে।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পেছনে এদেশের ছাত্র ও তরুণ-যুব সমাজেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। মূলত তারাই সাধারণ মানুষের কাছে মুসলিম লীগের শোষণের চিত্র এবং যুক্তফ্রন্টের কল্যাণকামী কর্মসূচি প্রচার করে যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন আদায় করে। তাছাড়া মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি, তাদের জনবিচ্ছিন্নতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী হতে সহায়তা করেছিল।

সবশেষে বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট জোট এবং এর ইশতেহারের প্রতি জনগণ পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছিল। ফলে তারা ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে।

প্রশ্ন ▶৫ অনেক স্বপ্ন নিয়ে 'প্রত্যাশা' সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্বশীলদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ায় সংস্থাটির কোনো গঠনতন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন পর একটি গঠনতন্ত্র তৈরি হলেও তা অল্প সময়ের ব্যবধানে বাতিল হয়ে যায়।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. যুক্তফ্রন্ট কী? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান প্রণয়নের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মূলে ছিল 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অমিল'— পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে নাম হয় আওয়ামী লীগ), কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামি এবং বামপন্থী গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে ১৯৫৪ সালে গঠিত একটি রাজনৈতিক জোট।

খ পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে সংঘটিত বাংলার মানুষের তীব্র আন্দোলনই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। ১৯৬৮ সালের নভেম্বরের ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

সব শ্রেণির বাঙালির মধ্যে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অভিন্ন দাবি ছিল স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ। তবে শিল্প শ্রমিক এবং নিম্ন ও মধ্য আয়ের পেশাজীবীদের কাছে এটি ধীরে ধীরে পাকিস্তানীদের শোষণ ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ অভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সর্ববৃহৎ গণজাগরণ। এর মধ্য দিয়ে আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটেছিল।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানি সংবিধান প্রণয়নের সাদৃশ্য আছে।

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকায় দেশটির সংবিধান

https://teachingbd24.com

তৈরি করতে দীর্ঘ ৯ বছর লেগে যায়। দীর্ঘদিন পর সংবিধান তৈরি হলেও মাত্র দুই বছরের মাথায় তা বাতিল হয়ে যায়। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের প্রত্যাশা সমাজকল্যাণ সংস্থার গঠনতন্ত্র তৈরিরও মিল পাওয়া যায়।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে 'আদর্শ প্রস্তাব' গ্রহণ করে। এছাড়া সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি তিনজন প্রধানমন্ত্রীর সময়কালে তিনটি রিপোর্ট তৈরি করে। তবে কোনো রিপোর্টই আলোর মুখ দেখেনি। তাছাড়া ঐ সময়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অযাচিতভাবে গণপরিষদের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে গণপরিষদ বাতিল করেন। ১৯৫৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারি গণপরিষদে 'সংবিধান বিল' উত্থাপিত হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে তা পাস হয়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে এ সংবিধান কার্যকর হয়।

উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেক স্বপ্ন নিয়ে 'প্রত্যাশা' সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্বশীলদের মধ্যে মতভেদ থাকায় সংস্থাটির কোনো গঠনতন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন পর একটি গঠনতন্ত্র তৈরি হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যে বাতিল হয়ে যায়। উদ্দীপকের এ সংস্থাটির গঠনতন্ত্র তৈরির সাথে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের স্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান প্রণয়নের দীর্ঘসূত্রিতা এবং তা অল্পসময়ের ব্যবধানে বাতিল হয়ে যাওয়ার মূলে ছিল 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অমিল'।

জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি অংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং অন্যটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা(বর্তমান বাংলাদেশ)। এ দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রায় ১২০০ মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব(ভারতের ভূখণ্ড) ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক অমিল লক্ষ করা যায়। ইসলাম ধর্মের বন্ধন ছাড়া দুই অংশের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাকপরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস এসব দিকে প্রায় কোনোই মিল ছিল না।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর পরই দেশটির পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ বাঙালি হলেও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু হয়। এ ছাড়া লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়নি। বরং তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকামী ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষাবলম্বনকারীদের মধ্যে বিরোধের ফলে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘ সময় নিতে বাধ্য হয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ছিল পাকিস্তান সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিষয়। মূলনীতি কমিটির প্রথম রিপোর্টে পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কমসংখ্যক আসন দেওয়া হয়। এ কারণে বাঙালি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

সবশেষে বলা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যকার ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক দূরত্ব এবং অমিল পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। যার ফলে সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের একটি অঞ্চলের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা শাসকগোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করেন। *[রা. বো. ১৭ | প্রশ্ন নং ৫; নায়েম স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৩; পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ছয়-দফা কর্মসূচি কী? ১

খ. আগরতলা মামলা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত ছয়-দফা কর্মসূচির কোনো সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ব পাকিস্তানের (পরে স্বাধীন বাংলাদেশ) প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে কর্মসূচি পেশ করেন তাই ছয়-দফা কর্মসূচি।

খ পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে তিনিসহ মোট ৩৫ জন বাঙালি সামরিক- বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ঐ কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় সেদেশের সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছেন। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মওলানা ভাসানী পাকিস্তান সরকারের এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুসহ সব বন্দির মুক্তির দাবিতে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির সাদৃশ্য আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৬ দফা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকারের দাবি একটি পরিণতি পায় এবং তাদেরকে স্বাধীনতার পথে চালিত করে। উদ্দীপকটি এই অসাধারণ কর্মসূচিরই ইঙ্গিত বহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই এর একটি অঞ্চলের জনগণ শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে তাদের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে তাদের জনপ্রিয় নেতা শাসকগোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবি পেশ করেন। বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের এ ঘটনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) জনসাধারণের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা বেসামরিক ও সামরিক চাকরি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি করে। বাঙালিরা একসময় এ বৈষম্য অবসানের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবিকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এককথায় এটি ছিল বাঙালির নায্য অধিকার আদায়ের সনদ। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের শাসকদের কাছে উত্থাপিত কর্মসূচিটি মূলত ৬ দফা দাবিরই প্রতিচ্ছবি।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শোষিত বাঙালিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রথম লিখিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে। পাকিস্তান সরকার এ দাবিকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তবে এ অঞ্চলের জনগণ ক্রমেই ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে থাকে। এর ফলে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ১৯৭১ সালে এসে তা স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। ছয় দফা দাবিতে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ধারাবাহিকতায়ই আমরা চূড়ান্ত মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলাম।

পরিশেষে বলা যায়, ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণেই এ আন্দোলন বা কর্মসূচিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ 'ক' রাষ্ট্রের শাসকদের শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে জনগণ শুরু থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়। দীর্ঘ দুই যুগ পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনগণ তাদের পছন্দের দলকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শাসকগোষ্ঠী নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করলে জনগণের প্রিয় নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের কয়টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে? ১

খ. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত আন্দোলনই হলো অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক সরকারের গড়িমসি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির সরাসরি অসহযোগিতার ফলে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ আন্দোলনের পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং নয়মাস যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও মুক্তি লাভেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে সত্তরের নির্বাচনই বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এর মাধ্যমেই বাঙালিরা প্রথমবারের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বশাসনের সুযোগ লাভ করে। সত্তরের নির্বাচন আরও প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ে আতঙ্কিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তখন জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। ফলে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তার সর্বশক্তি দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। বলা বাহুল্য, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অবিচল আস্থায় সমগ্র বাঙালি জাতি আত্মচেতনার ও স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। জনগণ দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিল, একমাত্র আওয়ামী লীগই তাদের বাঁচার দাবি আদায় করতে সক্ষম হবে। বস্তুত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় পরবর্তীকালে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। আর এ কারণেই বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৮ আফ্রিকা মহাদেশের একটি বৃহৎ রাষ্ট্র 'ক'। রাষ্ট্রটি দু'টি অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশে গড়ে ওঠা একটি রাজনৈতিক দল ঐ অঞ্চলের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দক্ষিণ অংশে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলটি দক্ষিণ অংশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দল দু'টি অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আগরতলা মামলার আসামি কতজন ছিল? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে পাকিস্তানের কোন নির্বাচনের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়? উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাচন পাকিস্তানে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে কী সমস্যা তৈরি করেছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার আসামি ছিল ৩৫ জন।

খ যুক্তফ্রন্ট বলতে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে। ১৯৫৩ সালে গঠিত চারটি দলের এ জোটটিই 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিত। জোটের দলগুলো হলো-১ আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. নেজাম-ই-ইসলামি পার্টি, ৩. কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও ৪. বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

গ উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' দেশের উত্তর অংশের রাজনৈতিক দল ঐ অঞ্চলের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে দক্ষিণ অংশের রাজনৈতিক দলটিও কেবল সে অঞ্চলের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দল দুটি অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) অংশের জনগণের মূল প্রতিনিধি ছিল আওয়ামী লীগ। আর তখন ঐ রাষ্ট্রের পশ্চিম অংশে বেশি জনপ্রিয় দল ছিল পাকিস্তান পিপলস পার্টি। পাকিস্তানের দুই অংশে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Teachingbd24.com

নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং ১৬০টি আসনেই জয়লাভ করে। অবশিষ্ট ২টি আসনে নির্বাচিত হন পিডিপির নুরুল আমিন এবং নির্দলীয় প্রার্থী ত্রিদিব রায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশে পিপিপি মোট ৮৩টি আসন পায়। আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর দলটির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পিপিপি মোট ৮৮টি আসন পায়। অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৩১০ (১০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন পেয়ে একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। লক্ষ্যণীয় যে, এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি, পিপিপিও তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচনটি পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচন দেশটির জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করেছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচন অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বশেষ নির্বাচন। এ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাঙালিরা তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য পৃথক পথ বেছে নিয়েছে। তারা আর পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের নিষ্পেষণমূলক শাসনে থাকতে রাজি নয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের প্রত্যাখ্যান করাকে কেন্দ্র করে দেশটিতে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এর সমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানি অগণতান্ত্রিক শাসকচক্রের অনড় অবস্থান ও ক্ষমতালিপ্সা এভাবেই দেশটির বিভক্তি ডেকে আনে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় পায়। সে অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং নতুন জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালিদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানান। তার নির্দেশ অনুযায়ী দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে ১৬-২৪ মার্চ প্রহসনের আলোচনায় বসেন। আলোচনার আড়ালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে গণহত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের দিকে ঢাকাসহ বিভিন্নস্থানে পাকিস্তানি সেনারা বর্বর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেই ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেন।

তাই বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদী শাসকরা এদেশে হত্যাযজ্ঞ চালায়। এর পরিণতিতে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র। সুতরাং উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফল এবং সে ব্যাপারে পাকিস্তানের শাসকদের চরম অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী প্রতিক্রিয়া দেশটির জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

প্রশ্ন ▶৯ আবির যে রাষ্ট্রের বাসিন্দা সেটি ১৯৪৭ সালে আলাদা দু'টি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয়। রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিমাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পূর্বাঞ্চলের প্রতি ক্রমাগত শোষণ, অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতির আশ্রয় নেয়। যার ফলে পূর্বাঞ্চলের মানুষের মনে ক্রমাগত অসন্তোষের জন্ম নেয়। এ প্রেক্ষাপটে পূর্বাঞ্চলের এক জনপ্রিয় নেতা একটি দাবি পেশ করেন এবং ঘোষণা করেন উক্ত দাবিই হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ও মুক্তির সনদ। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উপস্থাপন করেন? ১

খ. ভাষা আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

খ ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা যে আন্দোলন করে তাই হলো ভাষা আন্দোলন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৫২ সালে তারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণায় পূর্ব-বাংলার ছাত্র জনতা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন পরিচালনা করে। এ আন্দোলনে কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সংঘটিত এই আন্দোলনই হলো ভাষা আন্দোলন।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফা দাবির মিল আছে।

১৯৪৭ সালে বাঙালিরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত হয়। এই মুক্তি তাদেরকে আর এক শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের কবলে পতিত করে। এই নির্যাতন অর্থাৎ পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। উদ্দীপকে এই পদক্ষেপটিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত রাষ্ট্রটি আলাদা দুটি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয়। এ রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পর থেকেই এর একটি অঞ্চল শাসকদের বৈষম্যের শিকার হয়। এরই প্রেক্ষিতে শোষিতরা একটি দাবি পেশ করে। ছয় দফা দাবির ক্ষেত্রেও এমন প্রেক্ষাপট লক্ষণীয়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্বাঞ্চলের জনগণের প্রতি নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। চাকরি, কৃষি, শিল্পসহ অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই তারা পাহাড়সম বৈষম্য তৈরি করে। পূর্ব বাংলার কাঁচামাল নিয়ে পাকিস্তানি শিল্পপতিরা উত্তরোত্তর ব্যবসার উন্নয়ন করে আর পূর্ব বাংলা অনুন্নতই থেকে যায়। এছাড়া ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ দেখা দিলে পূর্ব বাংলা অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় বিভিন্ন বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন। তিনি এ কর্মসূচিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি বলে অভিহিত করেন। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের ঘটনা ছয় দফা আন্দোলনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ঘটনা অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে।

উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ আন্দোলন ছিল শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার।

১৯৬৬ সালের ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথম লিখিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, বাঙালিদের সাফল্য লাভ করার কৌশল বা সামর্থ্য আছে। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার নানা টাল-বাহানা করেছিল। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে জনমত ক্রমেই ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হতে থাকে। ছয় দফা দাবির ফলেই ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি ১৯৭১ সালে তা স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। এই দাবিতে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালিরা মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমরা মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি।

পরিশেষে বলা যায়, ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণেই ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ⟶ রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ⟶ উপ-রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দীন আহমদ ⟶ প্রধানমন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমদ ⟶ পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী ⟶ অর্থমন্ত্রী
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান ⟶ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী ⟶ প্রধান সেনাপতি

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]

ক. দ্বৈতশাসন কাকে বলে? ১
খ. কেন ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? ২
গ. উল্লিখিত তথ্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সরকারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলা প্রদেশকে শাসন করার যে নীতি গ্রহণ করেন ইতিহাসে তাই 'দ্বৈতশাসন' নামে পরিচিত।

খ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর পরই বাঙালিরা ভাষাকেন্দ্রিক বৈষম্যের শিকার হয়। এ সময় পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং ৩.২৭ ভাগ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দু ভাষাভাষি বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। আর এ কারণেই ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়।

গ উল্লিখিত তথ্যটি আমার পাঠ্যবইয়ের মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ; অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা মূলত মুজিব নগর সরকারের গঠনকেই প্রকাশ করে।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় এবং ইতিহাসে এই অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এই সরকারই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার স্বাধীনতাকামী জনতা মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় আশার আলো দেখতে পায়। তরুণরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে ভারতে ভিড় জমালে এ সরকার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে তরুণদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠায়। স্বাধীনতা চেতনাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এবং সংগ্রামী জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। বাংলাদেশে ২৬ মার্চ সকাল হতে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ শুরু হলে এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহতভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন এবং সব স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে, কূটনৈতিক তৎপরতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১১ একটি নির্বাচনে শাসক দলের ব্যাপক ভরাডুবি হয়। বিরোধীদলগুলোর জোট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ী হয়। এই নির্বাচনের পরেই দেশটিতে একটি সংবিধান রচিত হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। তাছাড়া এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বাংলাদেশের আইনসভার গঠন উল্লেখ করো। ১
খ. ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নির্বাচন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে— মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের আইনসভা ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ৩০০ জন প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ৫০ জন মহিলা সদস্য সংসদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। আইনসভায় একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন। তারা সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

খ বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ায় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ জন্যই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে— মন্তব্যটি যথার্থ।
পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ নির্বাচনের ফলেই বাঙালিরা সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন হয়। বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

Teachingbd24.com

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি বাঙালি জনমনে নতুন রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালির ২১ দফা দাবি বাস্তবায়িত হয়। আর এ পথ ধরেই বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয় এবং সবশেষে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। এ নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়েই বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক বিজয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তাদের প্রাণের দাবি বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। এ সফলতা তাদের পরবর্তী প্রতিটি কাজে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এ নির্বাচনে বিজয় অর্জন করেই বাঙালি বুঝতে পারে ন্যায্য দাবি কখনো বৃথা যেতে পারেনা। তারা বুঝতে পারে নিজের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙালিকে রাজনৈতিক সচেতনতা দান করে।

প্রশ্ন ▶ ১২ একটি রাষ্ট্র পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত। পূর্ব অংশের জনগণ পশ্চিম অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছিল। পূর্ব অংশের জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, পৃথক মুদ্রা এবং আরো কিছু দাবি সংবলিত এক কর্মসূচি উত্থাপন করে।

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কাকে বলে? ১

খ. 'ঋণ সালিশি বোর্ড' কেন গঠন করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন কর্মসূচির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত কর্মসূচির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দূর করে সঠিক ধর্মীয় বিধান প্রচলনের উদ্দেশ্য হাজি শরীয়তউল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনকে ফরায়েজি আন্দোলন বলে।

খ দরিদ্র কৃষকদের উচ্চ হারের সুদ মওকুফ করে তাদের ঋণ পরিশোধের সুযোগ করে দিতে 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করা হয়।

১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন। কারণ তিনি জানতেন কৃষক কুলের মুক্তি ব্যতীত বাংলার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এ বোর্ড গঠন করে তিনি কৃষকদের ঋণের দায়ভার থেকে মুক্ত করেন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ এক সময় সুদান একটি অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল। তখন সেখানকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে অর্জিত অর্থ উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো। ফলে সুদানের উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এই প্রেক্ষিতে দুই অঞ্চলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অবশেষে দক্ষিণ সুদান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কত সালে কার্যকর হয়? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দক্ষিণ সুদানের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের কোন দিকটির সাদৃশ্য তুমি খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দক্ষিণ সুদানের চাইতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি ব্যাপক"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ১৯৫৬ সালে কার্যকর হয়।

খ যুক্তফ্রন্ট হলো একটি রাজনৈতিক জোট। এটি ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠিত হয়। মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যথা- i. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ii. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, iii. মাওলানা আতাহার আলীর নেজাম-ই-ইসলামি পার্টি এবং iv. হাজী দানেশের বামপন্থি গণতন্ত্রী দল। তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অন্যায়, অত্যাচার ও বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের অবসান ঘটানোই ছিল যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

গ দক্ষিণ সুদানের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকটির সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাই।

১৯৪৭ সালে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একটির নাম হয় পশ্চিম পাকিস্তান এবং অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান। সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিকসহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে প্রকট। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকের হেড অফিস ও স্টেট ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অর্থ পাচার হতো অবাধে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো মূলধন গড়ে উঠতে পারে নি। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে মোট বৈদেশিক মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগ অর্জিত হতো। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের এ উৎপাদিত পাটের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিগুণ ছিল।

এভাবে জীবনযাত্রার মান, শিল্পায়ন, আমদানি খাতে ব্যয়, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বড় ধরনের আর্থিক বৈষম্য ছিল।

উদ্দীপকে সুদানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দেশটি একসময় অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল। সেখানকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে অর্জিত অর্থ উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো। ফলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাসের জন্ম নেয়, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এতে করে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। উদ্দীপকের এ দক্ষিণ সুদান অভ্যুদয়ের সাথে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির মিল লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশকেও তার স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে অনেক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে নয় মাসের যুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা অর্জন করে।

ঘ দক্ষিণ সুদানের চাইতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি ব্যাপক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পটভূমি দক্ষিণ সুদানের চাইতে অনেক বিস্তৃত। পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ যখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন তারা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ ছিল দক্ষিণ সুদানের চেয়ে কঠিন ও সংকটপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বে সাবেক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সাবেক ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, যুবক বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক লোকদের দিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মূলত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করে মোকাবিলা করে। এগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. **অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ও যুদ্ধ:** ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দখলকৃত অঞ্চলসমূহে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ,

Teachingbd24.com

অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। বাঙালি যুবক সম্প্রদায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে গোপনে সংগঠিত হয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে।

২. **যৌথ বাহিনীর আক্রমণ ও চূড়ান্ত বিজয়:** বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি যৌথ বাহিনী গঠিত হয় এবং তাদের আক্রমণে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। অন্যদিকে দক্ষিণ সুদানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুদানের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের ফলে জনগণের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক শক্তির প্রচেষ্টায় সুদানের উভয় অংশের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং পরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে দক্ষিণ সুদানের জনগণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে রায় দেয়। অবশেষে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় দক্ষিণ সুদান নামে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র। পরিশেষে বলা যায়, দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা অর্জন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পটভূমি এক নয়। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব সাজু একজন রাজনীতিবিদ ও ১৯৭১-এ মুজিবনগরে গঠিত সরকারের একজন সদস্য ছিলেন। তার বিশ্বাস রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে দেশ সেবার সুযোগ সবচেয়ে বেশি। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, 'বাঙালি মুক্তিপ্রিয় একটি রাজনৈতিক জাতি।' *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কত সালে ছয়দফা দাবি পেশ করা হয়েছিল? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি পেশ করা হয়েছিল।

খ ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে সংঘটিত বাংলার জনগণের তীব্র আন্দোলনই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

পূর্ব বাংলায় জাতিগত নিপীড়ন ও বঞ্চনা এবং ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামসহ বিভিন্ন পর্যায়ে গড়ে ওঠা স্বকীয় সত্তার বোধ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। বস্তুত এ অভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালের সর্ববৃহৎ গণজাগরণ। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটে।

গ সৃজনশীল ১০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি হলো, 'বাঙালি মুক্তিপ্রিয় একটি রাজনৈতিক জাতি'। এ বক্তব্যটি সম্পর্কে আমার মতামত নিচে উপস্থাপন করছি।

বাঙালি মুক্তিপ্রিয় একটি রাজনৈতিক জাতি। এ বক্তব্যটির প্রমাণ আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের দিকে তাকালেই দেখতে পাই। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে বহু আশা-প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলা তথা বাঙালিরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের নানামুখী বৈষম্যমূলক নীতি বাঙালিদের নানাভাবে বিপর্যস্ত করলে মুক্তিপ্রিয় বাঙালি জাতি বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালি মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে প্রথমে ভাষা আন্দোলন করে। পরবর্তীতে মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে বাঙালি পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। যেমন- ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ছিল শাসকদের অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। এ নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে বাঙালি স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে মুক্তির পথ খোঁজে। ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি তথা পূর্ববাংলার জনগণ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিপ্রিয় বাঙালির অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রাজনীতিবিদ ও মুজিবনগর সরকারের সদস্য জনাব সাজুর বিশ্বাস বাঙালি মুক্তিপ্রিয় একটি রাজনৈতিক জাতি বক্তব্যটি অত্যন্ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'ক' রাষ্ট্রের একটি প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে অংশ নিয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অল্পদিনের ভেতরে সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো প্রাদেশিক নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচনের বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালে যে আন্দোলন করে তাই হলো ভাষা আন্দোলন।

খ যুক্তফ্রন্ট বলতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে। চারটি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যে জোট গঠন করা সেই জোটটিই 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিতি। এর শরিক দলগুলো হলো-১ আওয়ামী মুসলিম লীগ ২. নেজাম-ই-ইসলামি ৩. কৃষক শ্রমিক পার্টি ও ৪. বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে আমার পঠিত ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে এ নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের এক 'ব্যালট বিপ্লব'। উদ্দীপকের ঘটনা এই বৈপ্লবিক নির্বাচনেরই ইঙ্গিত বহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রে একটি প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কয়েকটি রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ফলাফলে দেখা যায় জোট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলেও যড়যন্ত্রের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয়। এমন ঘটনা ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনেও লক্ষ করা যায়। এতে অংশগ্রহণের জন্যও যুক্তফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠিত হয়েছিল। এতে আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজাম-ই-ইসলামি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং বামপন্থী গণতন্ত্রী দল শরিক ছিল। এরা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। অন্যদিকে এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা এ. কে.

Teachingbd24.com

ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। তবে এ মন্ত্রিসভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর নানা চক্রান্তে আদমজী জুট মিলে বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষিত হয়ে পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ হয়। সুতরাং দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচন ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচনের অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়।

পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা। এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ চেতনার জন্ম দিয়েছিল তা পরবর্তী জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা ও তাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি বাঙালিদের কাছে উদ্ভাসিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল এটাই প্রমাণ করে, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ পশ্চিম পাকিস্তান হতে সম্পূর্ণ পৃথক। আর এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম। নির্বাচনি কর্মসূচি বাঙালির বঞ্চনা ও শোষণের বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত করে। ফলে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার জনগণের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার করে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে দাবি উঠেছিল যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সে দাবি পূরণের পথ সুগম হয়। আর এ পথ ধরেই বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে এ নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়েই। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি জয়যুক্ত হয়। আর ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ছয়দফায়ও এ দাবিটিই প্রাধান্য পায়। আর স্বায়ত্তশাসনের এ চেতনা থেকেই অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ফলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। রাজনীতিতে অবাঙালি নেতৃত্বের প্রশ্নে বাংলার জনমানুষের মোহমুক্তি ঘটে। এছাড়া এলিট শ্রেণি ও ভূস্বামী অভিজাতদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ফলে উপর্যুক্ত পরিবর্তনগুলো শোষিত পূর্ব বাংলার জনমনে বিপুল প্রভাব ফেলে। ফলে তারা জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এছাড়া নির্বাচনের ফলে সংঘটিত প্রতিটি পরিবর্তন এটাই প্রমাণ করে যে, এ বিজয় মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি সংবলিত এক কর্মসূচি পেশ করেন। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো কর্মসূচির সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি ছিল 'বাঙালির মুক্তির সনদ'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ।

খ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বোঝায়।

জেনারেল আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসন বাংলার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ফলে তারা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করে। তখন সরকার মিথ্যা মামলায় বঙ্গবন্ধুকে আটক করে। এর ফলে সমগ্র পূর্ব-বাংলার ছাত্রজনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আন্দোলন থেকে এটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এটিই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রুনা লায়লা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। তিনি একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারেন যে, রাষ্ট্রটির প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দল একটি অঞ্চল থেকে প্রায় সবগুলি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. নির্বাচন কমিশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে তোমার পঠিত কোনো নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

খ নির্বাচন কমিশন বলতে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে এ সংস্থাটি গঠন করা হয়। এটি স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন ও অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা করে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন উক্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ পাকিস্তানের মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পাকিস্তানের মৃত্যুবার্তা বহন করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পি.পি.পি. সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও লাভ করেনি। দুটি দলই অঞ্চলভিত্তিক দলে পরিণত হয় এবং নিজেদের কর্মসূচি ও দাবি-দাওয়ার প্রতি অনড় মনোভাব প্রকাশ করে। ফলে পাকিস্তানের ভাঙনও ত্বরান্বিত হয়। বিশেষ করে, ভুট্টোর অনমনীয় মনোভাব, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি অসহিষ্ণু ও অশোভনীয় আচরণ ও বাচনভঙ্গি পাকিস্তানের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে। এ জন্য অনেকেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে 'পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তাবাহক' বলে মনে করেন।

সুতরাং বলা যায়, ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয় ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এ নির্বাচনি রায় মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। স্বাধীন বাংলাদেশের আগমনী বার্তা বহন করে এনেছিল এ নির্বাচন।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ 'ক' ও 'খ' একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের দুই অঞ্চল। 'ক' অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখে। এতে 'খ' অঞ্চল বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে 'খ' অঞ্চলের একজন মহান নেতা কিছু কর্মসূচি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদানের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না।

[চা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশের ভাষা ছিল বাংলা? ১

খ. আগরতলা মামলা কেন দায়ের করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচি এবং তোমার পঠিত কর্মসূচির মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের ভাষা ছিল বাংলা।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচি এবং আমার পঠিত বইয়ের কর্মসূচির মধ্যে আমি ৬-দফা কর্মসূচিকে উত্তম বলে মনে করি। নিচে এ সম্পর্কে যুক্তি দেখানো হলো—

১. **মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা:** ৬-দফা কর্মসূচিতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। যেমন- ৬-দফা কর্মসূচির তৃতীয় দফাতে বলা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময়যোগ্য। ষষ্ঠ দফায়— পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়।

২. **বাঙালি জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ:** শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়।

৩. **ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি:** ছয় দফা ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার চূড়ান্ত পর্যায়। এর উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার আশায় বাঙালিরা মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচিতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো বিষয় না থাকার কারণে 'খ' অঞ্চলের জনগণ তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আশা করতে পারে না। সুতরাং, উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচির চাইতে আমার পঠিত বইয়ের ৬-দফা কর্মসূচি যে উত্তম এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ একটি অঞ্চলের জনগণ পাঠ্যপুস্তকে তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাদের দাবি স্বীকৃতি পায়। ফলে বৃহৎ রাষ্ট্রটির ঐক্য সুদৃঢ় হয়। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কাকে? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের কোন আন্দোলনের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে তোমার পঠিত আন্দোলনের পরিণতি ছিল বিপরীতমুখী-বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে।

খ যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, আমলাদের দৌরাত্ম্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়েছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম লীগ সরকার একক আধিপত্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইলেও পূর্ব বাংলার জনগণ তা মেনে নেয়নি। জিন্নাহর মৃত্যুর পর যোগ্য রাজনৈতিক নেতার শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতির কারণে সরকারের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে।

গ উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে আমার পঠিত ভাষা আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সে সময় পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০% লোকের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। অন্যদিকে, মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা ছিল উর্দু। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা মেনে নেয়নি। ছাত্র ও তরুণ সমাজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাতে দমে যায়নি বরং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে। মিছিলে পুলিশ গুলি করলে শহিদ হন জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকসহ আরো অনেকে। ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এরূপ আন্দোলনের কারণে সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্যসমূহ উদ্দীপকে বর্ণিত দেশের ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে আমার পঠিত ভাষা আন্দোলনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে আমার পঠিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিণতি ছিল বিপরীতমুখী।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ একটি অঞ্চলের জনগণ পাঠ্যপুস্তকে তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাদের দাবি স্বীকৃতি পায়। ফলে বৃহৎ রাষ্ট্রটির ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

Teachingbd24.com

কিন্তু আমার পঠিত বইয়ের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিণতিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়নি; বরং তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন করলে তাতে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটে। নানা ছলচাতুরিতে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে পুঁজি করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গের প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৬২ সালে ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাকমিশন গঠন করলে জনগণ তাতে বাঁধা দেয়। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এতে ভীত হয়ে তা দমন করার জন্য শোষণ-নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার দরুণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৬৯ সালের স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারে বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটান ও তার পতন নিশ্চিত করেন। এতে সফল হয়ে বাঙালিরা ১৯৭০ সালে নির্বাচন করলে তাতেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয় লাভ করে। পরবর্তীতে ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা টালবাহানা করলে তা যুদ্ধে রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

উদ্দীপকের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় আর আমার পঠিত বইয়ের আন্দোলনের ফলে এক রাষ্ট্র পৃথক হয়ে দুটি আলাদা রাষ্ট্র হয়। পরিশেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে আমার পঠিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিণতি ছিল বিপরীতমুখী।

প্রশ্ন ▶২০ আফ্রিকার একটি দেশের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে শোষিত ও নির্যাতিত। এই শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের পাশে দাঁড়ান ম্যান্ডেলা নামে এক আফ্রিকান নেতা। তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলো দাবি উত্থাপন করেন। সেই দাবিগুলো আদায়ের জন্য তার নেতৃত্বে জনগণ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. তিতুমীরের পূর্ণনাম কী? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দাবিগুলো কোন বাঙালি নেতার দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ঐ দাবিগুলো ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ'– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের পূর্ণনাম হলো সৈয়দ মীর নিসার আলী।

খ হাজি শরীয়তউল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনের নাম হলো ফরায়েজি আন্দোলন।

ফরায়েজি শব্দটি এসেছে ফরজ শব্দ থেকে যার অর্থ হলো অবশ্যই পালনীয়। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত হয়ে ফরজ পালনে আহবান জানান। মুসলমানদের কুসংস্কারপূর্ণ আচরণ এবং নৈতিক অধঃপতন তাকে বিচলিত করে। তিনি এর ঘোর বিরুধিতা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। তার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের নাম হলো ফরায়েজি আন্দোলন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২১ 'ক' একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু তার প্রতিবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. অপারেশন সার্চ লাইট কী? ১

খ. কী উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের সাথে কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাতীয় জীবনে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর পরিচালিত একটি বর্বর অভিযানের নাম।

খ যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অন্যায়, অত্যাচার ও বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের অবসান ঘটানো। এছাড়া বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করেছিলেন যে, ন্যায্য দাবিসমূহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিকল্প নেই।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২২ আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে জর্জ ওয়াশিংটন প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, দূরদৃষ্টি ইত্যাদি কারণে চিরস্মরণীয়। উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নিজ দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অপরিসীম। এ কারণে জাতি তার কাছে চিরঋণী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তেমনি এক নেতার অবদান চিরস্মরণীয়। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. কোন নেতার নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়? ১

খ. বেঙ্গল প্যাক্ট কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকের নেতার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নেতার সাদৃশ্য রয়েছে- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নেতার বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল– উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

খ বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ সমাধানের লক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)।

বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদনের ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাশের নাম অবিস্মরণীয়। দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপনে এক চুক্তি করার কথা চিন্তা করেন। তার এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের প্রতি বাংলার মুসলিম নেতা এ. কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও অন্য নেতারা একাত্মতা প্রকাশ করেন। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সুদীর্ঘ আলোচনার পর ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বরাজ পার্টির এক সভায় বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদন লাভ করে।

গ উদ্দীপকের নেতার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সমার্থক। স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদান। এই মহান নেতার লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি শাসক নামের শোষক গোষ্ঠীর অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার থেকে বাংলার মানুষদের মুক্ত করা। যার কারণে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের ভাষা অন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬

Teachingbd24.com

সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ সর্বত্রই ছিল বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সহজ পথে পাক শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় সম্ভব নয়। তাইতো তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের আহবান জানান। বাঙালি জাতি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১-এ ছিনিয়ে আনে মহান বিজয়।

উদ্দীপকের ব্যক্তিত্ব জর্জ ওয়াশিংটনের মাঝে আমরা যে প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, দূরদৃষ্টিতার গুণ দেখতে পাই; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝেও অনুরূপ গুণের সমাহার ঘটেছিল।

ঘ উক্ত নেতা বলতে এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার কারণে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন দেশের মর্যাদায় বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ জন্যে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদে কখনো পিছু হটেন নি। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ খ্যাত ছয় দফা পেশ করেন। এই ছয় দফার দাবির প্রতি ভীত হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা করে। এতেও তিনি ভীত হননি একটুও। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের চাপে পাক সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও তিনি পাক সরকারের সাথে কোনো আপোষ করেননি, বরং ১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের আহবান জানান। তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করে বাঙালি জাতি অর্জন করে স্বাধীনতার লাল সূর্য।

ওয়াশিংটনের মতোই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপনিবেশিক শাসকদের সাথে আপোষ করেননি। বরং শক্ত হাতে নির্ভীক চিত্তে বাঙালি জাতিকে দেখিয়েছেন মুক্তির পথ। তাই আমি মনে করি বাঙালি জাতির মুক্তি অর্জনে এই মহানায়কের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৩ তিউনিসিয়ার জনগণ দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট জাইন আল আবেদিন বেন আলির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ফলে জনগণের ওপর সরকারের নির্যাতন বেড়ে যায়। আরব বসন্ত নামে পরিচিত এই আন্দোলন এক পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়? ১

খ. বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয় কোন কর্মসূচিকে এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য বর্ণনা করো। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

খ অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালির 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয়।

ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক এবং স্বভাবতই এর প্রতি তাদের সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটার ক্ষেত্রে ছয় দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এটা ছিল শোষকের হাত হতে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার। সত্তরের নির্বাচন ছিল মূলত ছয় দফা তথা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর জনমত যাচাইয়ের অপূর্ব সুযোগ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পিছনে ছয় দফা কর্মসূচীর ছিল জোরালো আবেদন। এসব কারণেই ছয় দফাকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গ উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে পাকিস্তানের অন্যতম আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, তিউনিসিয়ার জনগণ দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট জাইন আল আবেদিন বেন আলির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ফলে জনগণের ওপর সরকারের নির্যাতন বেড়ে যায়। আরব বসন্ত নামে পরিচিত এই আন্দোলন এক পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায়ও দেখা যায়, স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের এক দশকের স্বৈরশাসনের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের বীজ নিহিত ছিল। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করেই পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্য, স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মত ঘৃণ্য কাজে আইয়ুব খান লিপ্ত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তার বিরুদ্ধে মাঠে নামে। ফলে তখন বিরোধী দলের উপর দমন-পীড়ন, গ্রেফতার, হয়রানি এবং ছাত্র নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটায়।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে পাকিস্তানের অন্যতম আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত যে ঘটনা পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় তা হলো গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন হঠাৎ করেই গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় নি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিভিন্ন ক্ষোভ, হতাশা, অপ্রাপ্তি, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সমন্বিত আন্দোলন ছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

আইয়ুবখানের স্বৈরাচারী ভূমিকার কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল অংশেই গণঅসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী অসন্তোষ ও বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি এগারো দফার দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং আহত অবস্থায় বন্দি হয়। ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র-জনতা পুলিশ এবং ইপিআর এর সাথে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। পুলিশ একপর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করলে বিরাট একটি মিছিল শহিদ মিনারের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে পুলিশের গুলিবর্ষণে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান।

২১ জানুয়ারি আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে বহু লোক রাস্তায় নেমে পড়ে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ছয় দফা এবং ছাত্রদের এগারো দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি আরও মজবুত হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। এছাড়া গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের পতন হলে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে জনগণের এ বিজয়কে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠলে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, গণঅভ্যুত্থানই পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২৪ সাদী সাহেব তার নাতনীকে একটি গণঅভ্যুত্থানের গল্প শুনাচ্ছিলেন। তিনিও এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এ আন্দোলন ক্রমে প্রকট আকার ধারণ করলে শাসকগোষ্ঠী মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামিকে মুক্তিদান করেন। *[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. কে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন? ১

খ. ছাত্রদের ১১ দফার গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবি উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে মামলার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

খ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ পাকিস্তান সামরিক সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি' ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১১ দফা কর্মসূচির ২টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো—

১. ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

২. সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং আগরতলা মামলায় গ্রেফতার ও হুলিয়া প্রত্যাহার করা।

গ আগরতলা মামলা ছিল একনায়ক আইয়ুব খানের শাসনামলের এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। বাঙালির অধিকার আদায়ের লড়াই নস্যাৎ করতে পাকিস্তানি শাসকচক্র এ ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে। আইয়ুব খান সরকার শেখমুজিবসহ ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার একটি মামলা দায়ের করে যা 'আগরতলা মামলা' নামে পরিচিত। এ মামলার শিরোনাম ছিলঃ "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য"। মামলার অভিযোগে বলা হয় প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ভারতের আগরতলায় ষড়যন্ত্র করছে। মামলার বিচারের জন্য ১৯৬৮ সালে ঢাকায় একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে এ মামলার বিচারকার্য শুরু হয়। এ মামলায় ৩৫ জনকে আসামী করা হলেও পরবর্তীতে ১১ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তারা রাজসাক্ষী হয়। এ মামলায় ২০০ জন সাক্ষী ছিল। ১৯৬৯ সালে এ মামলার বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। তীব্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে ইঙ্গিত করে। নিম্নে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল আলোচনা করা হলো—

১. **জাতীয়তাবাদের বিকাশ:** ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতীয়বাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুসংহত হয়।

২. **স্বৈরাচার বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি:** ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগনের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বৈরাচার বিরোধী মানসিকতার সৃষ্টি হয়। ফলে গণতন্ত্রের জন্য আরো বেশি ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারে জনগণ মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়।

৩. **আগরতলা মামলার অবসান:** ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়।

৪. **স্বৈরাচারী শাসনের অবসানঃ** এই আন্দোলনের ফলে আইয়ুব-মোনায়েম খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হয়।

৫. **বঙ্গবন্ধু মুজিব অবিসংবাদিত নেতা:** এ আন্দোলনের ফলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একমাত্র অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন।

৬. **স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি:** এ আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদের কারণে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতি অংশগ্রহণ করে এবং স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন তথা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল সুদুরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶২৫ 'Y' রাষ্ট্রে জনগণ তাদের মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি করে আসছিল। শাসকগোষ্ঠী তা কোনোক্রমেই মানতে রাজি নয়। অবশেষে সমগ্র জনগোষ্ঠী মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে রাখে। শাসকগোষ্ঠী এ দাবি মেনে না নিয়ে শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের হতাহত করে। অবশেষে তীব্র আন্দোলনের মুখে শাসকগোষ্ঠী দাবি মানতে বাধ্য হয়। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত যে আন্দোলনের মিল আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর।

খ দ্বিজাতি তত্ত্ব হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের উন্মেষ ঘটান। তার মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, জীবনধারণ, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদন্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। তার এ মতবাদটিই দ্বিজাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাপক।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন করলে তাতে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটে। নানা ছলচাতুরিতে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে পুঁজি করে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গের প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৬২ সালে ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাকমিশন গঠন করলে জনগণ তাতে বাধা দেয়। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এতে ভীত হয়ে তা দমন করার জন্য শোষণ-নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার দরুণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৬৯ সালের স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারে বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটায় ও তার পতন নিশ্চিত করে। এতে সফল হয়ে বাঙালিরা ১৯৭০ সালে নির্বাচন করলে তাতেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয় লাভ করে। জয় পরবর্তীতে ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা টালবাহানা করলে তা যুদ্ধে রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনের মূল তাৎপর্য এই যে, এ আন্দোলনের চেতনার পথ ধরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ আসিফ একটি দেশের ইতিহাস পড়ে জানতে পারে- দেশটি একটি ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীন দেশেও তারা শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। দেশের জনগণ শুরু থেকেই এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, পৃথক মুদ্রা এবং আরও কিছু সুপারিশ পেশ করেন। *[বি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? ১

খ. ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার সুপারিশ স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে কোন আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে উক্ত আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

খ বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

মাত্র ১৮ মিনিটের তেজস্বী এ ভাষণের পরেই বাঙালি জাতির সামনে একটি গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায় আর তা হলো স্বাধীনতা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কৌশল, ও শত্রু মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য অপরিসীম।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ৬-দফা আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য অপরিসীম।

আলোচ্য উদ্দীপকের বর্ণনায় নেতার যে সুপারিশ আছে তা পাঠ্যবইয়ের ৬-দফার বর্ণনার প্রথম ও তৃতীয় দফার সাথে মিল রয়েছে।

৬-দফার দ্বিতীয় দফাতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ দফাতে বলা হয়, সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। কেন্দ্রীয় তথা প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের যোগান আঞ্চলিক তহবিল হতে সরবরাহ করা হবে। এ দফার তাৎপর্য হলো— কেন্দ্রীয় সরকারকে কর আদায়ের ঝামেলা পোহাতে হবে না, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য গুলোর জন্য কর ধার্য ও আদায়ের মধ্যে কোনোরূপ দ্বৈততা থাকবে না। এতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ হবে। পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত মুদ্রায় পূর্ব পাকিস্তান লাভবান হওয়ার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান লাভবান হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নতই থেকে যাচ্ছে এমন উপলব্ধি হয় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে। ষষ্ঠ দফায় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। এ দফার তাৎপর্য হলো- এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আঞ্চলিক নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার হয়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ৬-দফা আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য ব্যাপক ও অর্থবহ।

প্রশ্ন ▶ ২৭ দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আশা জেগেছিল যে এবার তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে। কিন্তু অচিরেই অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক বঞ্চনার কারণে তাদের হতাশায় নিমজ্জিত হতে হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের এক পর্যায়ে সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধিকারের কথা চিন্তা করে কয়েকটি দফার সমন্বয়ে একটি অনন্য কর্মসূচি প্রদান করেন। যা জাতির মুক্তি সনদ হিসেবে বিবেচিত হয়। *[বি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? ১

খ. মুজিবনগর সরকারের গঠন লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সম্মোহনী নেতা কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচির আলোকেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে- তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা।

খ মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এর গঠন নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রপতি: শেখ মুজিবুর রহমান
২. উপ-রাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম
৩. প্রধানমন্ত্রী: তাজউদ্দীন আহমদ
৪. পররাষ্ট্রমন্ত্রী: খন্দকার মোস্তাক আহমেদ
৫. অর্থমন্ত্রী: ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
৬. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী: এ এইচ এম কামারুজ্জামান
৭. প্রধান সেনাপতি: জেনারেল এম এ জি ওসমানী
৮. ডেপুটি চীফ অব স্টাফ: গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'ক' ও 'খ' একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের দুই অঞ্চল। 'ক' অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখে। এতে 'খ' অঞ্চল বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে 'খ' অঞ্চলের একজন মহান নেতা কিছু কর্মসূচি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদানের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান কত সালে রচিত হয়েছিল? ১

খ. তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে কি জানো? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল আছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচি এবং তোমার পঠিত কর্মসূচির মধ্যে কোনটি তুমি উত্তম মনে কর? যুক্তি দেখাও। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান রচিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে।

খ তমদ্দুন মজলিস হলো ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের অধ্যাপকদ্বয় যথাক্রমে আবুল কাশেম ও নুরুল হক ভূঁইয়া বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষকে সাংগঠনিক রূপদানের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' গঠন করেন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচি এবং আমার পঠিত বইয়ের কর্মসূচির মধ্যে আমি ৬-দফা কর্মসূচিকে উত্তম বলে মনে করি। নিচে এ সম্পর্কে যুক্তি দেখানো হলো—

১. **মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা:** ৬-দফা কর্মসূচিতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। যেমন- ৬-দফা কর্মসূচির তৃতীয় দফাতে বলা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময়যোগ্য। ষষ্ঠ দফায়— পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়।

২. **বাঙালি জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ:** শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়।

৩. **ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি:** ছয় দফা ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার চূড়ান্ত পর্যায়। এর উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার আশায় বাঙালিরা মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচিতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো বিষয় না থাকার কারণে 'খ' অঞ্চলের জনগণ তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আশা করতে পারে না। সুতরাং, উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচির চাইতে আমার পঠিত বইয়ের ৬-দফা কর্মসূচি যে উত্তম এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ 'ঘ' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দুই যুগ পরে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বিজয়ী দলের নেতা ও জনগণ নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. অপারেশন সার্চ লাইট কেন সংগঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন বস্তুত পক্ষে রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

খ অপারেশন সার্চলাইট হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর পরিচালিত একটি বর্বর অভিযানের নাম।

২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনাতেও সংকট উত্তরণে কোনো ঐকমত্য হয়নি। মূলত ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণে প্রয়োজনীয় সমর প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তিনি আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। তবে যাবার আগে তিনি সেনাবাহিনীকে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ মতো পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খানের সৈন্যরা ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় এক গণহত্যার তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে। যা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে খ্যাত।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ 'ক' ভূখন্ডটি হাজার বছর ধরে পরাধীন ছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে দেশটি নানা বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হতে থাকে। এ থেকে মুক্তির জন্য বহু মানুষ বিভিন্ন সময়ে জীবন দেয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা আনতে পারেনি। এ সময় এক মহান নেতা পরাধীনতা থেকে দেশের জনগণকে মুক্ত করতে স্বাধীনতার ডাক দেন। তার ডাকে সকল মানুষ সাড়া দেয় ও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটি স্বাধীন হয়। ফলে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশটি মুক্তি পায়।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (NAP) জন্ম কত সালে? ১

খ. কোন কোন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতার স্বাধীনতার ডাক সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP) এর জন্ম হয় ১৯৫৭ সালে।

খ ১৯৫৩ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়।

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে চরম শিক্ষা দেয়ার জন্য এ অঞ্চলের কয়েকটি সমমনা দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এটি মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এগুলো হলো- মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই ইসলামী এবং হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থি গণতন্ত্রী দল।

গ উদ্দীপকের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের মুক্তিযুদ্ধকে ইঙ্গিত করেছে।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পূর্ব বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা প্রদানে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ২ মার্চ এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। ১০ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্য এই দিন আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশটি হাজার বছর ধরে পরাধীন ছিল। দেশটি নানা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। এ থেকে মুক্তির জন্য বহু মানুষ বিভিন্ন সময়ে জীবন দেয়, কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা আনতে পারেনি। এ সময় এক মহান নেতা স্বাধীনতার ডাক দেন। তার ডাকে জনসাধারণ সাড়া দেয় এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি মুক্তিযুদ্ধকে ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। এ ভাষণে তিনি চারটি দাবি

Teachingbd24.com

উত্থাপন করেন। সেগুলো হলো সামরিক আইন মার্শাল-ল প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। গণহত্যার তদন্ত করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি তার প্রজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের বিকল্প কোন পথ নেই। কৌশলগত কারণে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও তার বক্তব্যের মূল চেতনা ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালির আন্দোলন সংগ্রামের এক নতুন বাঁক তৈরি হয়, তা হলো 'স্বাধিকার নয় স্বাধীনতা'। মূলত এই ভাষণের সাথে সাথেই বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রশাসন তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে পূর্ব বাংলার স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাজনা, ট্যাক্স প্রদান বর্জন করা হয়। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। তিনি বাঙালিদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। শত্রুর মোকাবেলা করার কথা বলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর এই মহান ঘোষণা মিথ্যা হয়নি। তার এই ঘোষণা স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ সাবিনা তার দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ে জানতে পারে তার দেশটি দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচিত ও বঞ্চিত ছিল। এই শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির জন্য এক পর্যায়ে তাদের মহান নেতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান পশ্চিমা শাসকদের কাছে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা ও পৃথক মুদ্রার জন্য দাবি জানায়।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কবে কার্যকর হয়? ১

খ. অ্যাটর্নি জেনারেলের দুটি কাজ বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দাবিগুলোর সাথে আর কি কি দাবি ছিল? আলোচনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত দাবিগুলোর মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবস থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

খ অ্যাটর্নি জেনারেলের ২টি কাজ হলো—

১. অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

২. অ্যাটর্নি জেনারেল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির সাদৃশ্য আছে। উদ্দীপকে বর্ণিত দিকগুলো ছাড়াও ৬ দফার আরও বিভিন্ন দিক রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ছয় দফা একটি অনন্য ও অসাধারণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। আলোচ্য উদ্দীপকে নেতা যে সুপারিশগুলো করেছেন তা পাঠ্যবইয়ের ৬ দফা কর্মসূচির প্রথম ও তৃতীয় দফার সাথে মিল আছে।

৬ দফার দ্বিতীয় দফায় বলা হয়, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে। তাছাড়া সরকারের অন্যান্য বিষয় প্রদেশগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে। কর ও শুল্ক ধার্যের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে ছয় দফার চতুর্থ দফায়। পঞ্চম দফায় বলা হয়, প্রতিটি অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের হিসাব আলাদা রাখতে হবে এবং আমদানি-রপ্তানি ও বাণিজ্য চুক্তি করার অধিকার থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়েছে ষষ্ঠ দফায়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচির মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ আন্দোলন ছিল শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার।

১৯৬৬ সালের ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথম লিখিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে এবং যা ছিল সমগ্র বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, বাঙালিদের সাফল্য লাভ করার কৌশল বা সামর্থ্য আছে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিল্প, কারখানা, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করতো। দেশের সমুদয় সম্পদ ২২টি পরিবারের মধ্যে কুক্ষিগত ছিল। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার নানা টাল-বাহানা করেছিল। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে জনমত ক্রমেই ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হতে থাকে। ছয় দফাকে তারা মুক্তির একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ত্বরান্বিত করে। এই দাবিতে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালিরা ১৯৭১ সালে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমরা মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি।

পরিশেষে বলা যায়, ছয় দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ বেয়েই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণেই ছয়দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩২ 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের একটি অঞ্চলের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা শাসকগোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবী-দাওয়া উত্থাপন করেন।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দাবী সম্বলিত কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে।

খ যুক্তফ্রন্ট বলতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে। চারটি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠন করা এই জোটটিই 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিতি। এর শরিক দলগুলো হলো-১. আওয়ামী মুসলিম লীগ ২. নেজাম-ই-ইসলাম ৩. কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও ৪. গণতন্ত্রী দল।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩৩ এবার ভোট দিতে গিয়ে জয়ীর দাদুর কথা মনে পড়ল। দাদু বলেছিলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়। *[হলি ক্রস কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. মুক্তিযুদ্ধের কয়টি সেক্টর ছিল? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন দায়ের করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জয়ীর দাদু যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা বলেন, তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৭০ সালের নির্বানের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর ছিল।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচার চালানো হয়।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৪ মোহনার দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ এ দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। মোহনা উত্তর অঞ্চলে বসবাস করে কিন্তু দেশ শাসন করে দক্ষিণ অঞ্চলের শাসকেরা। এতে বিমাতাসুলভ আচরণে অতীষ্ঠ হয়ে মোহনার অঞ্চলের একজন বলিষ্ঠ নেতা নিজেদের দাবীকে সংহত করার জন্য মুদ্রা, কর, খাজনা, বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু সুপারিশ দক্ষিণ অঞ্চলের শাসকদের নিকট পেশ করেন। 'মহান নেতার এ কর্মসূচীই উত্তর অঞ্চলে স্বাধীনতার সনদ বলে গণ্য হয়'। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কত সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়? ১

খ. ৩৫ জনকে আসামী করে কোন মামলা হয়? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মহান নেতা কর্তৃক উত্থাপিত কর্মসূচীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ সালে।

খ ৩৫ জনকে আসামী করে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে তিনিসহ ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। এ মামলা ছিল বাঙালি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচারনা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের মহান নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উত্থাপিত কর্মসূচিটি হলো ৬ দফা কর্মসূচি।

১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এপর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। তারা বেসামরিক ও সামরিক চাকরি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি করে। বাঙালির প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের প্রতিবাদ এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবিকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ ছয়দফা দাবি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে তিনি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং মুদ্রা ব্যবস্থা, কর ও খাজনা আদায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতিবিষয়গুলো প্রদেশসমূহের হাতে ন্যস্ত করতে বলেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মোহনার দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ এ দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। আর এ দেশটি শাসন করে দক্ষিণ অঞ্চলের শাসকেরা। উত্তর অঞ্চলের প্রতি শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে এ অঞ্চলের একজন নেতা নিজেদের দাবিকে সংহত করার জন্য মুদ্রা, কর, খাজনা, বৈদেশিক বাণিজ্যসংক্রান্ত কিছু সুপারিশ দক্ষিণ অঞ্চলের শাসকদের কাছে পেশ করেন। উদ্দীপকের এ ঘটনা বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। তারা পূর্ব অঞ্চলের জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করত। আর এ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থাৎ ছয়দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ঘটনা।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বৈষম্য ও শোষণ করা হয়েছিল ৬ দফা কর্মসূচি ছিল তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এটি ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বাঁচার দাবি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য ৬ দফা ছিল এক সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও অনুপ্রেরণা সমৃদ্ধ কর্মসূচি। এর ফলে তাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের ঐক্য ও সংহতি জোরদার করে।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিল্প, কলকারখানা, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করত। ছয় দফা ছিল শোষকের হাত হতে বাঙালির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার। সত্তরের নির্বাচন ছিল মূলত ছয় দফা তথা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর জনমত যাচাইয়ের অপূর্ব সুযোগ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পিছনে ছয় দফা কর্মসূচীর ছিল জোরালো আবেদন। এসব কারণেই ছয় দফাকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন ▶৩৫ মেঘলা জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে তার দাদুর কথা মনে পড়ল। দাদু বলেছিলেন ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়। *[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কখন? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান ভাঙনের সংকেত বহন করে-এর স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিব নগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বোঝায়।

জেনারেল আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসন বাংলার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ফলে তারা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করে। তখন সরকার মিথ্যা মামলায় বঙ্গবন্ধুকে আটক করে। এর ফলে

https://teachingbd24.com

সমগ্র পূর্ব-বাংলার ছাত্রজনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আন্দোলন থেকে এটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এটিই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' দেশের উত্তর অংশে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দল ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। আবার দক্ষিণ অংশে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলটি দক্ষিণ অংশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দল দুটি অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বৃহৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধি ছিল আওয়ামী লীগ। আর এ রাষ্ট্রের পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের নেতৃত্ব দিতেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অঞ্চল দুটিতে জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন লাভ করে। অবশিষ্ট ২টি আসনে নির্বাচিত হন পিডিপির নুরুল আমিন এবং নির্দলীয় ত্রিদিব রায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের মধ্যে পিপিপি মোট ৮৩টি আসন পায়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মোট ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পিপিপি মোট ৮৮টি আসন পায়। অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি, পিপিপিও তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান ভাঙণের সংকেত বহন করে— মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের নির্বাচন অবিভক্ত পাকিস্তানের শেষ নির্বাচন। এ নির্বাচনে মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল এবং অন্যান নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় সূচিত হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন ছিল বাঙালিদের মুক্তির প্রেরণা। এ নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যার সমাপ্তি ঘটে পাকিস্তান ভাঙনের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার ন্যায়সংগত অধিকার ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরু করে। ১৯৭১ সালে ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। এই ঘোষণার সাথে সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই ঘটনার জের ধরে ইয়াহিয়া খান পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। কিন্তু এই ঘোষণায় আস্থা রাখতে না পেরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়। এ জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা পূর্ববাংলার মানুষের বিজয় সূচিত হয়। এর ফলাফল স্বরূপ পাকিস্তান ভাঙণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি স্বার্থবাদী শাসকদের ষড়যন্ত্রে এ দেশে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই নির্বাচনের পরবর্তী মাত্র ১ বছরের মধ্যেই পাকিস্তান ভেঙ্গে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একটি পাকিস্তান অপরটি বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ আফ্রিকার একটি দেশের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে শোষিত ও নির্যাতিত। এই শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের পাশে দাঁড়ান ম্যান্ডেলা নামে এক আফ্রিকান নেতা। তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলো দাবি উত্থাপন করেন। সেই দাবিগুলো আদায়ের জন্য তার নেতৃত্বে জনগণ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]

ক. তিতুমীরের পূর্ণ নাম কী? ১

খ. সিপাহী বিদ্রোহ বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দাবিগুলো কোন বাঙালি নেতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐ দাবিগুলো ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের পূর্ণনাম হলো সৈয়দ মীর নিসার আলী।

খ সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ১৮৫৬ সালে এনফিল্ড রাইফেল নামে একটি বিশেষ ধরনের বন্দুকের প্রচলন করে। এটির কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ঢুকাতে হতো। এ কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মাখানো ছিল যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মনাশের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়। এ পরিস্থিতিতে সংগত করণেই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ কলকাতার নিকট দম দম ও ব্যারাকপুরে মঙ্গলপান্ডে নামে জনৈক সিপাহি বিপ্লব শুরু করে। পরবর্তীতে সারা ভারতে ইংরেজদের সাথে সিপাহিদের বিভিন্ন জায়গায় প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। তবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, সংগঠনের অভাব, উপযুক্ত নেতা, সামরিক প্রশিক্ষণ ও রসদের অভাবে এই সিপাহী বিদ্রোহ সফলতা লাভ করতে পারেনি।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭

সরকার

↓

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমদ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জান

[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ২]

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ২

গ. ছকে উল্লিখিত তথ্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সরকারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা।

খ মৌলিক গণতন্ত্র হলো ১৯৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রবর্তিত একটি স্থানীয় সরকার পদ্ধতি।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনালের আইয়ুব খান একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মৌলিক

https://teachingbd24.com

গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ জারি করেন। প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল ১.ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি, ২. থানা পরিষদ, ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ এবং ৫. প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ।

গ উল্লিখিত তথ্যটি আমার পাঠ্যবইয়ের মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এছাড়া উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ; অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা মূলত মুজিব নগর সরকারের গঠনকেই প্রকাশ করে।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় এবং ইতিহাসে এই অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এই সরকারই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার স্বাধীনতাকামী জনতা মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় আশার আলো দেখতে পায়। তরুণরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে ভারতে ভিড় জমালে এ সরকার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে তরুণদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠায়। স্বাধীনতা চেতনাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এবং সংগ্রামী জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। বাংলাদেশে ২৬ মার্চ সকাল হতে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ শুরু হলে এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহতভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন এবং সব স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা এবং কূটনৈতিক তৎপরতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ রক্তিম টিভিতে একটি যুদ্ধের সচিত্র প্রতিবেদন দেখছিল। প্রতিবেদনে নিরস্ত্র মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর-দোকানপাট লুণ্ঠন, পোড়ানো এবং চোখ বাধা অবস্থায় নির্যাতনের ছবি দেখানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে পরাজিত বাহিনীর প্রধানের দলিলে স্বাক্ষরের একটি দৃশ্য দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল কতজন? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন কী ছিল? ২

গ. রক্তিমের দেখা যুদ্ধের প্রতিবেদনের সাথে তোমার পঠিত কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এই যুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের জন্য যারা অস্ত্র ধরেছিল তাদের কল্যাণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত? মতামত দাও। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল ৩৫ জন।

খ ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজি শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজি শরীয়তউল্লাহ মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তারা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজি শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ রক্তিমের দেখা যুদ্ধের প্রতিবেদনের সাথে আমার পঠিত ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। ঐ রাতেই ইয়াহিয়া খান কর্তৃক টিক্কা খানকে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে সেনাবাহিনী ইপিআর, পুলিশফাঁড়ি এবং ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের উপর আক্রমণ চালায়। এরপর থেকে শুরু হয় নিরস্ত্র মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর-দোকানপাট লুণ্ঠন ও পোড়ানো। অসহায় মানুষদের ওপর চোখ বাঁধা অবস্থায় নির্যাতন চালাতে থাকে হানাদার বাহিনী। প্রায় ৩০ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয় এবং ২ লক্ষ নারীর সম্মানহানির মাধ্যমে অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

উদ্দীপকে রক্তিমের দেখা যুদ্ধের প্রতিবেদনে হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন, পোড়ানো এবং নির্যাতনের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, রক্তিমের দেখা প্রতিবেদন এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র এক ও অভিন্ন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিবরণ দ্বারা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন বাংলায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই যুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করেছিল তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে। ইয়াহিয়া খান কর্তৃক টিক্কা খানের নির্দেশে সারাদেশে শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ এবং নির্যাতন। তবে অল্প দিনের মধ্যেই বাঙালি প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রতিটি সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। নিয়মিত বাহিনী, অনিয়মিত বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনী, গেরিলা বাহিনী পরিচালনা করে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিবাহিনীতে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের কল্যাণে রাষ্ট্রের নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। যদিও তাদের রক্তঋণ পরিশোধযোগ্য নয়, তদুপরি তাদের সার্বিক সেবায়

Teachingbd24.com

রাষ্ট্রের নিয়োজিত হওয়া উচিত। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ভাতা, তাদের পুনর্বাসন, আবাসিক নিশ্চয়তা দান, তাদের সন্তানদের যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানেব মাধ্যমে নানারিধ সাহায্য করা যেতে পারে। এছাড়াও উন্নত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত তাদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

উদ্দীপকে বর্ণিত বিবরণ ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে। স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম ও প্রতিরোধের মাধ্যমে বাঙালি জীবন ও রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। যে সব মুক্তিকামী মুক্তিযোদ্ধারা নিরস্ত্র মানুষের জন্য অস্ত্র ধরেছিল তাদের কল্যাণের ও সম্মানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে নীতি নির্ধারণ এবং আইন তৈরি করা দরকার।

প্রশ্ন ▶৩৯ আবির যে রাষ্ট্রের বাসিন্দা সেটি ১৯৪৭ সালে আলাদা দু'টি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয়। রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিমাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পূর্বাঞ্চলের প্রতি ক্রমাগত শোষণ, অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতির আশ্রয় নেয়। যার ফলে পূর্বাঞ্চলের মানুষের মনে ক্রমাগত অসন্তোষের জন্ম নেয়। এ প্রেক্ষাপটে পূর্বাঞ্চলের এক জনপ্রিয় নেতা একটি দাবি পেশ করেন এবং ঘোষণা করেন উক্ত দাবিই হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ও মুক্তির সনদ।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৪]

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উপস্থাপন করেন? ১

খ. ভাষা আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

খ ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা যে আন্দোলন করে তাই হলো ভাষা আন্দোলন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৫২ সালে তারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণায় পূর্ব-বাংলার ছাত্র জনতা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন পরিচালনা করে। এ আন্দোলনে কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত এই আন্দোলনই হলো ভাষা আন্দোলন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪০ পূর্ব তিমুরের জনপ্রিয় নেতা জানানা গুসামাও ও তার দল দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ক্ষমতাসীন সরকার শান্তিপূর্ণভাবে তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি এক বিশাল জনসভায় তার দলের এ বিজয়কে জনগণের জাতীয়তাবাদী বিজয় বলে উল্লেখ করেন।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১১]

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে পাকিস্তানের কত সালের নির্বাচনের মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. পূর্ব তিমুরের সাথে পাকিস্তানের নির্বাচন পরবর্তী শাসনক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালে।

খ ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে চার দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি মুসলিম আসন লাভ করে। এর মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ৯টি। যুক্তফ্রন্টের ২২৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৬, নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি ২১ এবং গণতন্ত্রী দল পায় ১৩টি আসন। অন্যদিকে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। অমুসলিম আসনে কংগ্রেস ২৫, তফসিলী ফেডারেশন ২৭ ও সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট পায় ১৩টি আসন। এ নির্বাচনে মুসলিম ও অমুসলিম আসন মিলিয়ে ৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গ উদ্দীপকে পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাংলার স্বাতন্ত্র্যবোধের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা। এটি পূর্ব বাংলার জনগণকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

উদ্দীপকে পূর্ব তিমুরের উক্ত নির্বাচনকে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে জনপ্রিয় নেতা গুসামাও ও তার দলের বিজয় হয়েছে এবং বিজয়কে জনগণের জাতীয়তাবাদী বিজয় হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কয়েকটি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। এর নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা। এ নির্বাচনে ৩০৯ টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ টি আসনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়ী হয়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নিয়ম অনুযায়ী ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করে এবং এখানকার আইনসভার মেয়াদ আরও তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের আশঙ্কায় এরূপ ব্যবস্থা করা হলেও এতে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা আরও কমে যায়। শেষ পর্যন্ত গণদাবির মুখে বাধ্য হয়ে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব বাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে যুক্তফ্রন্ট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পূর্ব তিমুরের সাথে পাকিস্তানের সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন তথা ১৯৫৪ এর নির্বাচন পরবর্তী শাসনক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার পার্থক্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকে আমরা দেকতে পাই যে, পূর্ব তিমুরের জনপ্রিয় নেতা জানানা গুসামাও ও তার দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে ক্ষমতাসীন সরকার শান্তিপূর্ণভাবে তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ক্ষমতা গ্রহণের পরে এক বিশাল জনসভায় তিনি তার দলের এ বিজয়কে জনগণের জাতীয়তাবাদী বিজয় হিসেবে আখ্যা দেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয় লাভের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্য থাকলেও পরবর্তী প্রক্রিয়ায় এ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। '৫৪-এর নির্বাচনে বিজয় লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানান। সুতরাং এখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিয়টি গৌণ। এছাড়াও ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তী সময়ে এ কে ফজলুল হক তেমন কোনো বড় জনসভা করেন নি। তবে তাঁর ও শরিক দল মিলে যে যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল সেটা বাস্তবিক অর্থেই পূর্ব বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) জনগণের জাতীয়তাবাদী বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও এর পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সাথে উদ্দীপকের নির্বাচন ও পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় তেমন কোনো সাদৃশ্য নেই।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪১

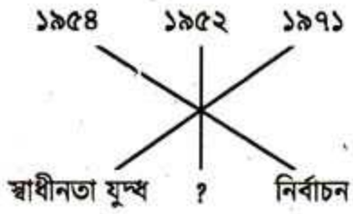

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন কে? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব লেখ। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি কী? এর চূড়ান্ত রূপ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি বাঙালি জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।— মূল্যায়ন করো। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা।

খ তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি নিজেদের স্বাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে যায়। তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে এবং জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরপরই কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালির বহুকাঙ্ক্ষিত ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। তাই বলা যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মাইলফলক।

গ '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। এ ঘোষণার প্রতিবাদে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। পাকিস্তান সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা সাধারণ ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সকল সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিমনেশিয়াম মাঠের পাশে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটের পাশে ছাত্রছাত্রীদের জমায়েত শুরু হয়। অতঃপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের দিকে যাবার উদ্যোগ নেয়। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে বরকত, সালাম ও আব্দুল জব্বার এবং রফিক শহিদ হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে তীব্র আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪নং অনুচ্ছেদে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ঘ '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন বাঙালি জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে- কথাটি যথার্থ।

ভাষা আন্দোলনকে ঘিরেই বাঙালি প্রথম স্বাধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। অধিকার সচেতন ছাত্র-জনতা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে। এ আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি জোগায়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় স্বাধিকারের চিন্তা চেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর এ চেতনাই পরবর্তীকালে প্রতিটি গণআন্দোলনে প্রেরণা যোগায় এবং জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে শাসক দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাতভাঙা জবাব দেয়। এরপর ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

আলোচনা শেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয় জীবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলনে সফল হয়ে বাঙালি পাকিস্তান বিরোধী সকল আন্দোলনের প্রেরণা পায়।

প্রশ্ন ▶ ৪২ একদিন রেজাদের কলেজের সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষক খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে বের হন। প্রভাতফেরি শেষে তারা কলেজের শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সর্বশেষে তাদের অডিটোরিয়ামে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। আলোচনায় কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'এই দিবস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা।'

[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং-২]

ক. আগরতলা মামলার আসামি ছিলেন কতজন? ১

খ. আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ ডিসেম্বর তাৎপর্যপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দিবসের ঐতিহাসিক বিভিন্ন পর্যায় উপস্থাপন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রেজাদের কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্যের সাথে তুমি কী একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে লেখো। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার আসামি ছিলেন ৩৫ জন।

খ ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ মূলত পশ্চিম পাকিস্তানিদের দুগ্ধপ্রদানকারী গাভীতে পরিণত হয়। তারা এরপর থেকে সুদীর্ঘ ২৫ বছর আমাদের শোষণ-নির্যাতন চালায়। তবে স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি দমে থাকেনি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং সবশেষে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বরে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করি। এজন্য ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গ সৃজনশীল ১৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার প্রতিপক্ষদের মাতৃভাষা পরিবর্তনে ব্যর্থ হওয়ায় স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐক্যমত প্রকাশ করে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের চরম ভরাডুবি ঘটলে শুরু হয় নানামুখী ষড়যন্ত্র।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. কার নেতৃত্বে তমুদ্দিন মজলিশ গঠিত হয়? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে যে নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ফলাফল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চরম স্বৈরাচারী আচরণ শাসকদলের ভরাডুবির অন্যতম কারণ— উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম-এর নেতৃত্বে।

https://teachingbd24.com

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে প্রদেশগুলোর নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। এতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমত, সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশ আত্মনির্ভরশীল হবে। মোটকথা, প্রদেশগুলোর সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্তি এবং প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বশীল হওয়াই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ চরম স্বৈরাচারী আচরণ শাসক দলের ভরাডুবির অন্যতম কারণ- উক্তিটি যথার্থ।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম পরাজয়ের পিছনে বেশ কিছু কারণ নিহিত ছিল। মুসলিম লীগ সরকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যোগসাজশে সমগ্র দেশকে বিভিন্ন পন্থায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অবিচার ও চরিত্রহীনতার অতল পঙ্কে নিমজ্জিত করেছিল। পাকিস্তানের গণপরিষদে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার দেশকে সংবিধান দিতে ব্যর্থ হয়। তদুপরি তারা গণপরিষদকে ব্যবহার করে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান বাতিল করা শুরু করে।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের নানামুখী বৈষম্যমূলক নীতি বাঙালিদের নানাভাবে বিপর্যস্ত করলে মুক্তিপ্রিয় বাঙালি জাতি বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালি মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে প্রথমে ভাষা আন্দোলন করে। পরবর্তীতে মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে বাঙালি পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। তারা এ নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নানা বৈষম্যমূলক নীতি এবং ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখার মানসিকতাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির কারণ।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ কুমিল্লা জেলার কৃতি সন্তান জনাব 'ক' এক আলোচনায় দেশ বিভাগের বাস্তব বিষয়গুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এসময় তিনি কেন দেশ বিভাগ জরুরী তা বলতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন। তা হলো— নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। সর্বশেষে তিনি দাবিসমূহ বাস্তবায়নে সংঘটিত সংগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা দেন।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ১]

ক. পলাশীর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১

খ. বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার মিল পাওয়া যায় তার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ সালে।

খ বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক।

মুসলমানগণ নতুন চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গের ফলে নিজেদের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও অগ্রগতি অর্জিত হয়। এছাড়া ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। পূর্ব বাংলায় রেলরাইনসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। লর্ড কার্জন স্বয়ং আশা প্রকাশ করেন, নতুন প্রদেশ উন্নত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বলে বলীয়ান হয়ে পূর্ববঙ্গ শাসনব্যবস্থায় যোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক'-এর বক্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' এক আলোচনায় দেশ বিভাগের বাস্তব বিষয়গুলো তুলে ধরেন। এসময় তিনি কেন দেশ বিভাগ জরুরি তা বলতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। যেমন— নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। সবশেষে তিনি এ দাবিসমূহ বাস্তবায়নে সংঘটিত সংগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। ৬ দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৬ দফা একটি অনন্য ও অসাধারণ কর্মসূচি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার বাঙালিদের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা চাকরি, কৃষিশিল্প, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য তৈরি করে। এতে পূর্ব বাংলার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এ ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবি। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে শোষিত বঞ্চিত করার জন্য শাসকগোষ্ঠী চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য পাঁয়তারা শুরু করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর এ ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আন্দোলন করে। মূলত এ আন্দোলনই পরবর্তী সংগ্রামের অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করে। যার ফলে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ২]

ক. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১

খ. আগরতলা মামলা দায়ের করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত আন্দোলন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।"— মতামত দাও। ৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচার চালানো হয়।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪৬ ২০১১ সাল বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক সংকটের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। দেশে দেশে সামরিক শাসকদের দৌরাত্ম্য কমাতে গণ-আন্দোলন শুরু হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মিশর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া প্রভৃতি দেশে গণতন্ত্রের জোয়ারে সামরিক শাসকদের সকল একনায়কতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এদেশে সামরিক শাসন জারি করা হলে তা গণআন্দোলনের কাছে হেরে যায়। সামরিক আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বর্তমান গণআন্দোলনের মতো অতীতেও আন্দোলন হয়েছিল।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাঙালি প্রতিনিধি কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে জাতীয় পরিষদের গঠন কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে এদেশে কোন সামরিক আইন জারির কথা বলা হয়েছে? কোন পরিস্থিতিতে এ আইন জারি করা হয়েছিল? ৩

ঘ. উক্ত সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা করো। ৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাঙালি প্রতিনিধি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

খ ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের কেন্দ্রে এক-কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়।

জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১০ জন। ৩০০টি নির্বাচিত এবং ১০টি মহিলাদের জন্যে ১০ বছরের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। ১৫৫ জন করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মোট ৩১০ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় পরিষদে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। জাতীয় পরিষদের কার্যকাল ছিল ৫ বছর।

গ আলোচ্য উদ্দীপকে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে যে সামরিক আইন জারি করা হয় তার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মদদপুষ্ট হয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা তদানিন্তন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের সহযোগিতায় পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার কারণ নিম্নরূপ:

সুসংগঠিত দলের অভাব: ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানে কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে নি। মুসলিম লীগ পরিণত হয়েছিল কয়েকজন কুচক্রী ও ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের পকেট সংগঠনে। আওয়ামী লীগকে দমনপীড়ন করে কোণঠাসা করে রাখা হয়।

দলীয় শৃঙ্খলার অভাব: পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলার অভাব, দল বদলের খেলা, উপদলীয় কোন্দল প্রভৃতি কারণে জনগণ রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগ গ্রহণ করেন সুচতুর সেনানায়ক আইয়ুব খান।

সময়োচিত নির্বাচনের অভাব: ১৯৪৯ সালের পর থেকে পাকিস্তানে কখনোই সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে মুসলিম লীগ সরকার অনেক শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সাহসী হয় নি। এ সুযোগ গ্রহণ করে সেনাবাহিনী প্রধান।

গভর্নর জেনারেলের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ: ১৯৪৭ সালের পর থেকেই গভর্নর জেনারেলগণ অন্যায় ও অযাচিতভাবে মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন যা পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনা: ১৯৫৯ সালে যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তা অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগের বিজয় লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য সামরিক শাসন জারি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ঘ ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করেন। সুচতুর সেনানায়ক জেনারেল আইয়ুব খান তাকে সহযোগিতা করেন। পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ:

সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি: ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত: এ সামরিক শাসনের ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। সামরিক একনায়কগণ সবসময় সংসদীয় গণতন্ত্রের সপক্ষে জনমত তৈরিতে সচেষ্ট থাকতেন।

রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ রুদ্ধ: সামরিক শাসনের বেড়াজালে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত: সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সুকৌশলে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। অনেক সময় তাদেরকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার কুপ্রচেষ্টা চালানো হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ: পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণকে শাসন শোষণ করার জন্য পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সব ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করে। ফলে তাদের মধ্যে বাঙালি ও গণতন্ত্রী দল জাতীয়তাবোধ দানা বেঁধে ওঠে।

প্রশ্ন ▶৪৭ আসিফ একটি দেশের ইতিহাস পড়ে জানতে পারে- দেশটি একটি ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীন দেশেও তারা শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। দেশের জনগণ শুরু থেকেই এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, পৃথক মুদ্রা এবং আরও কিছু সুপারিশ পেশ করেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? ১

খ. ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার সুপারিশ স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে কোন আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে উক্ত আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

খ বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

মাত্র ১৮ মিনিটের তেজস্বী এ ভাষণের পরেই বাঙালি জাতির সামনে একটি গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায়, আর তা হলো স্বাধীনতা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কৌশল, ও শত্রু মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির সাদৃশ্য আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৬ দফা একটি অনন্য ও অসাধারণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। উদ্দীপকটি এই অসাধারণ কর্মসূচিরই ইঙ্গিতবহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় একটি দেশের স্বাধীনতার পর থেকেই এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে জনমনে

https://teachingbd24.com

ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি পেশ করে। ৬ দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা চাকরি, কৃষিশিল্প, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য তৈরি করে। এতে পূর্ব বাংলার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এ ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবি। সুতরাং দেখা যায়, দেশটির কর্মসূচিটি মূলত ৬ দফা দাবিরই নামান্তর।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ৬ দফা আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য অপরিসীম।

আলোচ্য উদ্দীপকের বর্ণনায় নেতার যে সুপারিশ আছে তা পাঠ্যবইয়ের ৬ দফার বর্ণনার প্রথম ও তৃতীয় দফার সাথে মিল রয়েছে।

৬ দফার দ্বিতীয় দফাতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ দফাতে বলা হয়, সকল প্রকার ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের যোগান আঞ্চলিক তহবিল হতে সরবরাহ করা হবে। এ দফার তাৎপর্য হলো- কেন্দ্রীয় সরকারকে কর আদায়ের ঝামেলা পোহাতে হবে না, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য কর ধার্য ও আদায়ের মধ্যে কোনোরূপ দ্বৈততা থাকবে না। এতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ হবে। পঞ্চম দফায় বলা হয়, বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত মুদ্রায় পূর্ব পাকিস্তান লাভবান হওয়ার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান লাভবান হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নতই থেকেই যাচ্ছে এ ধারণার উপলব্ধি হয় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে। ষষ্ঠ দফায় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। এ দফার তাৎপর্য হলো- এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আঞ্চলিক নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার হয়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ৬ দফা আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য ব্যাপক ও অর্থবহ।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ 'X' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের একটি অঞ্চলের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসনগোষ্ঠীর নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা শাসক গোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করেন। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ২]*

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্য কোন কর্মসূচীর সাদৃশ্য আছে? কর্মসূচিসমূহ বিস্তারিত লেখ। ৩

ঘ. উক্ত কর্মসূচী ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

খ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে বোঝায়। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় একটি দিন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জীবন দিয়েছিল। ভাষার জন্য বাঙালির এ মহান আত্মত্যাগকে মূল্যায়ন করে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘভুক্ত সবগুলো দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ 'ক' রাষ্ট্রে একটি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয় ঘটে। বিজয়ী হয় ৪টি দল মিলে তৈরী হওয়া একটি নির্বাচনী জোট। নির্বাচনের পূর্বে তারা ২১ দফা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। জনগন তাদের বিপুল ভোটে জয়ী করেন। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ২]*

ক. প্রথম শহীদ মিনার তৈরি হয় কখন? ১

খ. আইয়ুব খানের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে পাকিস্তানের কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম শহীদ মিনার তৈরি হয় ১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি।

খ যখন একটি সংস্কৃতি অন্য আরেকটি সংস্কৃতির ওপর প্রভাবক হিসেবে চেপে বসে বা জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলা হয়।

ভাষা হলো সংস্কৃতির একটি মৌলিক উপাদান। কিন্তু ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক গঠিত 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' শিক্ষাক্ষেত্রে ষষ্ঠ থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করে এবং উর্দুকে সর্বজনীন ভাষায় রূপান্তরের সুপারিশ করে। এছাড়া বাংলা ও উর্দুর জন্য অভিন্ন বর্ণমালা উদ্ভাবনের প্রস্তাব করে। এ সমস্ত অবান্তর ও অযৌক্তিক প্রস্তাবগুলো ছিল মূলত কুচক্রী আইয়ুব খানের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নামান্তর।

গ উদ্দীপকে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাংলার স্বাতন্ত্র্যবোধের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা। এটি পূর্ব বাংলার জনগণকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'ক' নামক রাষ্ট্রের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয় ঘটে। এতে ২১ দফা কর্মসূচি দেয়া ৪ দলীয় জোট বিজয়ী হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কয়েকটি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। এর নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা। এ নির্বাচনে ৩০৯ টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ টি আসনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়ী হয়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নিয়ম অনুযায়ী ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করে এবং এখানকার আইনসভার মেয়াদ আরও তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের আশঙ্কায় এরূপ ব্যবস্থা করা হলেও এতে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা আরও কমে যায়। শেষ পর্যন্ত গণদাবির মুখে বাধ্য হয়ে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব বাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান মুসলিম লীগের পরাজয়ে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান।

যোগ্য নেতৃত্বের অভাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আমলাদের দৌরাত্ম্য ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে

Teachingbd24.com

মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম লীগ সরকার একক আধিপত্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইলেও পূর্ব বাংলার জনগণ তা মেনে নেয়নি। জিন্নাহর মৃত্যুর পর যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতির কারণে সরকারের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে।

এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মধ্য, বাম ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যজোটে গঠিত হওয়া যুক্তফ্রন্টের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাও মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার গণমানুষের অধিকারের দলিল। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার জনগণ ২১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে। কার্যত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই পাকিস্তান মুসলিম লীগের দৈন্যদশা ফুটে ওঠে এবং অচিরেই সাম্প্রতিক অতীতের প্রতাপশালী এ দলটি বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার নেশা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবসহ নানাবিধ জনবিরোধী কার্যকলাপের কারণে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটেছিল।

প্রশ্ন ▶৫০ পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী বাংলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিতে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পূর্ব বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবেও দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাই বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা 'বাঙালীর মুক্তির সনদ' নামে কয়েক দফা দাবি জনগনের নিকট তুলে ধরেন। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কী? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কেন মুসলিম লীগ পরাজিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে যে কয়েক দফা দাবীর কথা বলা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দাবীগুলো কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৫০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো সংস্কৃতি অন্য আরেকটি সংস্কৃতির ওপর প্রভাবক হিসেবে চেপে বসে, তখন তাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলা হয়।

খ যোগ্য নেতৃত্বের অভাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আমলাদের দৌরাত্ম্য ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম লীগ সরকার একক আধিপত্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইলেও পূর্ব বাংলার জনগণ তা মেনে নেয়নি। জিন্নাহর মৃত্যুর পর যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতির কারণে সরকারের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে।

গ উদ্দীপকে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ছয় দফা একটি অনন্য ও অসাধারণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিকেও আঘাত হানে। ফলে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি পেশ করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার বাঙালিদের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা চাকরি, কৃষিশিল্প, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য তৈরি করে। এতে পূর্ব বাংলার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৫-ছয় ফেব্রুয়ারি ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এ ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবি। এ দাবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ দাবি ছিল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

ঘ উদ্দীপকের দাবিগুলো অর্থাৎ ছয়দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয়দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ আন্দোলন ছিল শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার।

১৯৬৬ সালের ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথম লিখিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে এবং যা ছিল সমগ্র বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, বাঙালিদের সাফল্য লাভ করার কৌশল বা সামর্থ্য আছে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিল্প, কারখানা, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করতো। দেশের সমুদয় সম্পদ ২২টি পরিবারের মধ্যে কুক্ষিগত ছিল। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার নানা টাল-বাহানা করেছিল। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে জনমত ক্রমেই ছয়দফার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হতে থাকে। ছয়দফাকে তারা মুক্তির একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ত্বরান্বিত করে। এই দাবিতে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালিরা ১৯৭১ সালে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমরা মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ছয়দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ বেয়েই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণেই ছয়দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶৫১ ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়ী হবার পরও যখন পাকিস্তানী শাসকেরা ক্ষমতা হস্তান্তর করল না। তখন বাংলাদেশের মানুষেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ৭ মার্চের ভাষণে সে হতাশা দূর হয়ে বিপ্লবের চেতনা ছড়িয়ে পড়ল। তাই যুদ্ধকে মোকাবেলা করার সাহস তারা পেয়েছিল। দরিদ্র বাঙালী জাতি স্বাধীনতার স্বাদ পায়। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কি? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তার বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাঙালি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের ভাষণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র যাতে কেবল কিছু নির্দিষ্ট লোকের অংশগ্রহনে জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ছিল।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং

Teachingbd24.com

আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচারণা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের মুক্তিযুদ্ধকে ইঙ্গিত করেছে।

উদ্দীপকে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পূর্ব বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা প্রদান করতে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ২ মার্চ এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। ২৫ মার্চ নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১০ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্য এই দিন আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। এ ভাষণে তিনি চারটি দাবি উত্থাপন করেন। সেগুলো হলো সামরিক আইন মার্শাল-ল প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। গণহত্যার তদন্ত করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি তার প্রজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের বিকল্প কোন পথ নেই। কৌশলগত কারণে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও তার বক্তব্যের মূল চেতনা ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালির আন্দোলন সংগ্রামের এক নতুন বাঁক তৈরি হয়, তা হলো 'স্বাধিকার নয় স্বাধীনতা'। মূলত এই ভাষণের সাথে সাথেই বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রশাসন তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে পূর্ব বাংলার স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাজনা, ট্যাক্স প্রদান বর্জন করা হয়। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। তিনি বাঙালিদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। শত্রুর মোকাবেলা করার কথা বলেছিলেন। তার এই মহান ঘোষণা মিথ্যা হয়নি। তার এই ঘোষণা স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫২ 'M' রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা লাভের পর শাসকগোষ্ঠী একটি প্রদেশের সাথে বৈষম্য শুরু করে। প্রদেশটির জনপ্রিয় নেতা তাঁর প্রদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি শাসকগোষ্ঠীর নিকট পেশ করেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তা না মেনে উক্ত নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেন। এই মামলা দায়েরের প্রতিবাদে রাষ্ট্রটিতে এক প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অপারেশন সার্চলাইট কী? ১

খ. বাংলার কৃষককুলের মুক্তির অগ্রদূত কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ গণ-আন্দোলনের ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

৫২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর পরিচালিত একটি বর্বর অভিযানের নাম।

খ বাংলার কৃষককুলের মুক্তির অগ্রদূত বলা হয় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে।

দরিদ্র কৃষক প্রজারাই দেশের আসল প্রাণ একথা উপলব্ধি করে ফজলুল হক তাদের অবস্থার উন্নতি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কৃষক সমিতি গঠন করেন। কৃষক ও প্রজাদের ঋণের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৭ সালে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন। তিনি বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন পাস করে। ফজলুল হক ছিলেন নিপীড়িত, নির্যাতিত কৃষককুলের মুক্তিদাতা।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে ঐ অভ্যুত্থানের ফলাফল বলতে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত গণঅভ্যুত্থানের ফলাফলকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:—

১. **আগরতলা মামলা প্রত্যাহার:** ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের মাধ্যমে আগরতলা মামলার সব আসামি মুক্তি পান। আন্দোলনে ভীত হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে।

২. **গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান:** গণআন্দোলন প্রশমিত করার জন্য ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। গোলটেবিল বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়:

ক. প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা।

খ. সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের হাতে সংবিধান রচনার ভার প্রদান ও

গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো প্রবর্তন।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে এক দশকের স্বৈর ও সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান 'এক ব্যক্তি: এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সে ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় এবং একই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৩ 'গ' রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার 'ক' প্রদেশের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বৈষম্য শুরু করে। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'ক' প্রদেশটিতে নির্বাচন দেওয়া হলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলিত হয়ে একটি জোট গঠন করে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের ভরাডুবি হয়। রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ২৩ বছর পর অনুষ্ঠিত এক জাতীয় নির্বাচনে প্রদেশটির জনগণ একটি রাজনৈতিক দলকে এককভাবে ভোট প্রদান করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ২]

ক. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাদের শাসন ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে কৌশল গ্রহণ করেছিল সেটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে নির্বাচনী জোট গঠন তোমার পঠিত কোন নির্বাচনকে ইঙ্গিত করে? এই নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল'— মতামত দাও। ৪

৫৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালে যে আন্দোলন করে তাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

খ ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাদের শাসন ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে কৌশল গ্রহণ করেছিল সেটি হলো— 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি।

ভাগ কর ও শাসন কর ইংরেজ শাসকদের একটি কূটকৌশল বা কূটনীতি। ১৮৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতির অনুসরণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন পূর্ব অঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্র তৈরি করে" বক্তব্যটি যথার্থ বলে মনে করি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এরপর ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে এ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পূর্ণতা দিয়ে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে।

অন্যদিকে এ নির্বাচন ছিল পাকিস্তানে সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য একটি বিরাট পরাজয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে এবং পাকিস্তানের বিভক্তি সময়ের দাবিতে পরিণত হয়। এই নির্বাচনি ফলাফল আরও প্রমাণ করে যে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের বিভক্তিকে চূড়ান্ত রূপ দান করে।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান — রাষ্ট্রপতি

সৈয়দ নজরুল ইসলাম — উপ-রাষ্ট্রপতি

তাজউদ্দীন আহমদ — প্রধানমন্ত্রী

খন্দকার মোশতাক আহমেদ — পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী — অর্থমন্ত্রী

এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান — স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী — প্রধান সেনাপতি

[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]

ক. দ্বৈত শাসন কাকে বলে? ১

খ. কেন ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? ২

গ. উল্লিখিত তথ্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সরকারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলা প্রদেশকে শাসন করার যে নীতি গ্রহণ করেন ইতিহাসে তাই 'দ্বৈতশাসন' নামে পরিচিত।

খ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার কারণে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর পরই বাঙালিরা ভাষাকেন্দ্রিক বৈষম্যের শিকার হয়। এ সময় পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং ৩.২৭ ভাগ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দু ভাষাভাষি বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। আর এ কারণেই ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়।

গ উল্লিখিত তথ্যটি আমার পাঠ্যবইয়ের মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ; অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা মূলত মুজিব নগর সরকারের গঠনকেই প্রকাশ করে।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় এবং ইতিহাসে এই অস্থায়ী সরকার

Teachingbd24.com

'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এই সরকারই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার স্বাধীনতাকামী জনতা মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় আশার আলো দেখতে পায়। তরুণরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে ভারতে ভিড় জমালে এ সরকার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে তরুণদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠায়। স্বাধীনতা চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং সংগ্রামী জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। বাংলাদেশে ২৬ মার্চ সকাল হতে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ শুরু হলে এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহতভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন এবং সব স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে, কূটনৈতিক তৎপরতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ 'ক' ও 'খ' একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের দুই অঞ্চল। 'ক' অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন ঘরে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখে। এতে 'খ' অঞ্চল বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে 'খ' অঞ্চলে একজন মহান নেতা কিছু কর্মসূচি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদানের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
[স্কলারসহোম, সিলেট ▌প্রশ্ন নং ৪]

ক. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশের ভাষা ছিল বাংলা? ১
খ. আগরতলা মামলা কেন দায়ের করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচির ফলাফল একখন্ড বাংলাদেশ ব্যাখ্যা কর? যুক্তি দাও। ৪

৫৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের ভাষা ছিল বাংলা।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচার চালানো হয়।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো- 'ইনশাআল্লাহ'..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ▌প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মজলুম জননেতা বলা হয় কাকে? ১
খ. বাঁশের কেল্লা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বক্তব্যটি আমাদের কোন ঐতিহাসিক ভাষণের কথা মনে করিয়ে দেয়? উক্ত ভাষণের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লেখিত ভাষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মজলুম জননেতা বলা হয় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে।

খ বাঁশের কেল্লা ছিল শহিদ তিতুমীর প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্গ।

বারাসাতের বিদ্রোহের পর তিতুমীর বুঝতে পারেন যে, ইংরেজদের সাথে তার যুদ্ধ অনিবার্য। তাই সমর প্রস্তুতি ও সেনা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিজ বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য বারাসাতের কাছে নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর তিনি এটি নির্মাণ করেন। বাঁশের কেল্লাটি বাঁশ ও কাদা দিয়ে নির্মিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের বক্তব্যটি আমাদের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা মনে করিয়ে দেয়। উক্ত ভাষণের বিভিন্ন দিক নিচে আলোচনা করা হলো—

৭ মার্চ ১৯৭১ সাল বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের সমাবেশে জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ঐতিহাসিক এ ভাষণটি ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত সংগ্রামের আহ্বান। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক এ ভাষণের পটভূমিতে ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিদের একমাত্র প্রতিনিধিকারী দল আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয় সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করা। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বাঙালি জাতিকে সমূলে নির্মূল করার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় চলছিল শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। অপরদিকে দেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর চলছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়ার ইঙ্গিত ছিল তার বক্তৃতায়। শত্রুর মোকাবিলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনের কথাও বলেন তার ভাষণে। যেকোনো উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এমন বক্তব্যের পর তিনি ঘোষণা করেন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে.... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের উল্লিখিত ভাষণের অর্থাৎ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৭ মার্চ-এর ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা এক কথায় অনন্য। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও

https://teachingbd24.com

বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা এবং বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণে বাঙালি জাতির পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিক নির্দেশনা ছিল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা এবং যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা। এ ভাষণে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কলা-কৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ ভাষণের ফলেই সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালি বস্তুত সশস্ত্র বাঙালিতে পরিণত হয় এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, দেশমাতৃকার স্বাধীনা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। পরবর্তীতে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶৫৭ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ খুলনায় দৃষ্টিনন্দন একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। বাঙ্গালী জাতি সত্তার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে উক্ত শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সোপান।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ নির্বাচনে বিজয়ী কোন নেতা পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন? ১

খ. '"১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি" বাঙ্গালী জাতির মুক্তি সনদ' ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে? উক্ত আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খ বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ায় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ জন্যই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫৮ এক সময় আফ্রিকা মহাদেশে সুদান নামক একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র ছিল। উক্ত সুদান নাম রাষ্ট্র পূর্বাংশ এবং দক্ষিণাংশ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। তখন দক্ষিণ সুদানের সম্পদ নিয়ে সুদানের মূল শাসকগোষ্ঠী শুধুমাত্র পূর্ব সুদানের উন্নয়নে ব্যয় করত। দক্ষিণ সুদানের জনগণ চাকুরী সহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছিল। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আর শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এক সময় বাধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে জনগণ বিপুল সাড়া দেয়। অতঃপর শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে 'দক্ষিণ সুদান' নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয়। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করেছিল? ১

খ. নবাব আবদুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহম্মেদ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সুদান রাষ্ট্রের সাথে তোমার পঠিত কোন রাষ্ট্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, সুদান হতে দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভ এবং পাকিস্তান হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনা প্রবাহের হুবহু মিল রয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে।

খ স্যার সৈয়দ আহমেদের মতো নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের উন্নয়নে সমাজ সংস্কারমূলক ও শিক্ষা বিস্তারমূলক কাজ করেন। এ সকল কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

মুসলমান সমাজের দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্গতি স্যার সৈয়দ আহমদকে চরমভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা ও উদাসীনতা তাদের দুঃখ দৈন্যের কারণ। তাই তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নওয়াব আব্দুল লতিফও অনুরূপ ভাবনা ভেবেছিলেন এবং মুসলমানদের সামগ্রিক উন্নয়নে নিবেদিত ছিলেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যের সাথে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের মিল রয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যার মূল প্রস্তাব ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং ব্যাপক সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। ১৯৫৮ সালের আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরগুলোতে বাঙালির অবস্থান ছিল খুবই নগণ্য। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তান কখনো সুদৃষ্টি দেয়নি। জীবনযাত্রার মান, শিল্পায়ন, আমদানি খাতে ব্যয়, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বড় ধরনের আর্থিক বৈষম্য ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যও ছিল যা পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের উত্তর অংশও বিভিন্নভাবে দক্ষিণ অংশকে বঞ্চিত করেছে এবং বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যের সাথে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের সাদৃশ্য থাকায় উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রের সাথে আমার পঠিত তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দক্ষিণ সুদানের জনগণের স্বাধীনতা অর্জন এবং বাংলাদেশের জনগণের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জন একরকম নয়। দক্ষিণ সুদানের জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের সাথে বাংলাদেশের জনগণের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের তুলনা নিম্নরূপ-

দুটো দেশের সাদৃশ্য যে জায়গায় ছিল সেটি হলো দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব পাকিস্তান উভয়ই তাদের দেশের অন্য আর একটি অংশ দ্বারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। বৈষম্য ক্রমাগত হারে বৃদ্ধির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যেই তিক্ততা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ জন্ম নিয়েছিল।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও ছিল। যেমন- সুদানের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু পাকিস্তানে এ ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য এ ধরনের দাঙ্গা সৃষ্টি না হওয়ার পেছনে ভৌগোলিক দূরত্বের বিষয়টা হয়ত ছিল। দক্ষিণ সুদানে আন্তর্জাতিক শক্তির প্রচেষ্টায় শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং পরে গণভোট হয়। গণভোটে দক্ষিণ সুদানের জনগণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে রায় দেয়। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় দক্ষিণ সুদান নামের একটি রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলাদেশ দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে, ত্রিশ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে, অত্যাচারি পাকিস্তানিদের পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করলে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যদিও দক্ষিণ সুদান ও বাংলাদেশের জনগণের ওপর অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য একই রকমের হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র দুটির স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়া ছিল পুরোপুরি ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ একক পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর অধিনে প্রথম ও শেষ জাতীয় নির্বাচন ছিল 'ক' সালের জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনে বাঙালীরা একটি দল এবং তার নেতাকে একচেটিয়া ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। ঐ নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকাঠামোর মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নানা টালবাহানা করতে থাকে। পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৩]

ক. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা কোথায় এবং কে উত্তোলন করেন? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও পাকিস্তান সরকার বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা কি ও কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত নির্বাচনের ফলাফলই পাকিস্তানের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দেয়" তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র নেতা আ স ম আব্দুর রব উত্তোলন করেন।

খ পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল, শেখ মুজিবসহ এ কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। মামলায় ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মওলানা ভাসানী সরকারের এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল বন্দির মুক্তির দাবিতে গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬০ মেঘলা জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে তার দাদুর কথা মনে পড়ল। দাদু বলেছিলেন ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কখন? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান ভাঙনের সংকেত বহন করে— এর সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৬০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃত্বকে বোঝায়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত এবং অর্থ এ ত্রিবিধ বিষয়ের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিচার, পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ের কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এভাবেই ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। মূলত এটিই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬১ জনাব করিম একজন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ। তিনি যে দেশে বাস করেন সেখানে অধিকাংশ মানুষ একটি প্রধান ভাষায় কথা বলে। এই ভাষা তাদের মায়ের মতো। তবে এক সময় সে দেশের শাসনকর্তা এই প্রধান ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা না করে কতিপয় লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরপর থেকে শুরু হয় ভাষাগত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন। এই আন্দোলনে অনেকে শহীদ হন। অবশেষে শাসনকর্তা অধিকাংশের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন পরবর্তীতে সকল আন্দোলনের জন্য প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহীদ তিতুমীরের আসল নাম হলো সৈয়দ মীর নিসার আলী।

খ হাজী শরিয়তুল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনের নাম হলো ফরায়েজি আন্দোলন।

ফরায়েজি শব্দটি এসেছে 'ফরজ' শব্দ থেকে যার অর্থ হলো অবশ্য পালনীয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত হয়ে ফরজ পালনে আহ্বান জানান। মুসলমানদের কুসংস্কারপূর্ণ আচরণ এবং নৈতিক অধঃপতন তাকে বিচলিত করে। ফলে তিনি এর ঘোর বিরোধিতা

Teachingbd24.com

করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। তার নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলনের নাম ফরায়েজি আন্দোলন।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬২ আবীরের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে তিনি খুলনার মেজর জলিলের সাথে থেকে সরাসরি শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধ করেছেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। আবীরের চাচা সালাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের সাথে নিয়ে সে খুলনায় চলে আসে। গোপনপথে ভারতে গিয়ে তারা ট্রেনিং নিয়ে আসে। এরপর ভারত থেকে ফিরে তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. পাকবাহিনী কত তারিখে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আবীরের চাচা মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, স্বাধীনতা অর্জনে শুধু আবীরের বাবার মত মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।

খ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণ ও সরকার অনন্য সাধারণ ভূমিকা রাখে।

ভারত ১ কোটি বাংলাদেশি নাগরিককে খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করে। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে। সাধারণ জনগণ শরণার্থীদের আশ্রয়দান করে। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে ভারতের বহু সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছেন।

গ উদ্দীপকে আবিরের চাচা মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন অনিয়মিত বাহিনীও অংশগ্রহণ করেছিল। এসব অনিয়মিত বাহিনীতে ছাত্র, কৃষক, যুবক, নারী, রাজনৈতিক দলের কর্মী, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। এরপর তারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনী বা আস্তানায় হামলা চালায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে এরা অসীম সাহস ও মনোবল নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, আবিরের চাচা একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি ট্রেনিং নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনীর মাঝেও লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকের আবিরের বাবার মতো মুক্তিযোদ্ধারাই শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রেখেছিল বলে আমি মনে করি না।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মুক্তির সংগ্রামে শামিল হয়। এদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিল ছাত্র। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। আর ১৯৭১ সালের মার্চ থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সারা দেশে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নারী মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্ববোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে। আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণও অংশগ্রহণ করেছিল। অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬৩ ইরাকের কুর্দি নেতা আব্দুল্লাহ ইরাক সরকারের নিকট প্রস্তাব করলেন যে, ইরাকের উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের কুর্দিদের নিয়ে 'স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্র হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির, যার অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত। কিন্তু সরকার আব্দুল্লাহর প্রস্তাব কিছুটা সংশোধন করে সকল কুর্দিদের নিয়ে একটি স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের কুর্দিরা এক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ | প্রশ্ন নং ২]

ক. 'দ্বৈতশাসন কী? ১

খ. 'হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রয়োজন-জিন্নাহর এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর এই ঘটনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল? যুক্তি দাও। ৪

৬৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবার্ট ক্লাইভ দুই জনের যে অভিনব শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাকে দ্বৈতশাসন বলে।

খ হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রয়োজন-জিন্নাহর এই উক্তিটির দ্বি-জাতি তত্ত্বটির সমার্থক। জিন্নাহর এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করলে ভারত পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের উন্মেষ ঘটান। তার মতে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি।

গ উদ্দীপকে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল পাকিস্তানে দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা।

লাহোর প্রস্তাবের ধারাগুলো বিবেচনা করলে এর কিছু মৌলিক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন স্থানসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করতে হবে। স্বাধীন রাষ্ট্র হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির, যার অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পাশাপাশি সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। দেশের যে কোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলো মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অঞ্চল বা প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকায় প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

উল্লেখিত ঘটনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানে দুটি অঞ্চলে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। যা আলোচ্য উদ্দীপকে ইরাকের কুর্দি নেতা আবদুল্লাহ কর্তৃক ইরাক সরকারের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পঠিত ঐতিহাসিক ঘটনা 'লাহোর প্রস্তাব' এর সাথে সাদৃশ্য আছে।

Teachingbd24.com

ঘ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের দ্বারা সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার অন্যতম উৎস ছিল বলে আমি মনে করি। লাহোর প্রস্তাবের ঘটনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। নিম্নে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো:

লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত: ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। লাহোর প্রস্তাবে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল পূর্ব ভারতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিসেবে বধিষ্ণু পূর্ব বাংলাকে নিয়ে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠিত হবে। সুতরাং, এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাঙালিদের অর্থাৎ, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন হরণ করে একে ঔপনিবেশিক শাসনে পরিণত করে। অথচ লাহোর প্রস্তাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বাঙালি নেতারা দাবি করে যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এ দাবি পরবর্তীতে স্বাধীকার আন্দোলনে রূপ লাভ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ 'ক' রাষ্ট্র প্রধানতঃ পূর্ব ও পশ্চিম এ দুটি অংশে বিভক্ত। ঐ রাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে দু'অঞ্চল থেকে দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল পূর্ব অংশে কোন আসন পায়নি তেমনি পূর্ব অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল পশ্চিম অংশে কোন আসন পায়নি। *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নাম লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে তোমার পঠিত নির্বাচনের যে সামঞ্জস্য রয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তোমার পঠিত উক্ত নির্বাচনের ফলাফলের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার দাবিতে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তাকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বলা হয়।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো যে জোট গঠন করেছিল তাই যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত।

যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক দল ছিল চারটি। যথা: ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ; ২. শেরে বাংলার নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি; ৩. মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে নেজাম-ই ইসলাম পার্টি ও ৪. হাজী দানেশের নেতৃত্বে বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

গ উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্র দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। ঐ রাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে দু'অঞ্চল থেকে দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিমের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পূর্বে কোনো আসন পায়নি এবং পূর্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পশ্চিমে কোনো আসন পায়নি। পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। বৃহৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধি ছিল আওয়ামী লীগ। আর এ রাষ্ট্রের পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের নেতৃত্ব দিতেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অঞ্চল দুটিতে জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন লাভ করে। অবশিষ্ট ২টি আসনে নির্বাচিত হন পিডিপির নুরুল আমিন এবং নির্দলীয় ত্রিদিব রায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের মধ্যে পিপিপি মোট ৮৩টি আসন পায় অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মোট ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পিপিপি মোট ৮৮টি আসন পায়। অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি, পিপিপিও তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচনটি পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমার পঠিত উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

১৯৭০ সালের নির্বাচন অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম ও শেষ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন ছিল বাঙালিদের মুক্তির প্রেরণা। এ নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যার সমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের উত্থানের মধ্য দিয়ে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ন্যায়সংগত অধিকার ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। এই ঘোষণার সাথে সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই ঘটনার জের ধরে ইয়াহিয়া খান পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। কিন্তু এই ঘোষণায় আস্থা রাখতে না পেরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়। এ জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী দেশে ব্যাপকভাবে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়। এ আন্দোলনের একপর্যায়ে ২৫-এ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদেশে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেই ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল বাঙালি জাতির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। প্রকৃতপক্ষে এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পদক্ষেপ।

প্রশ্ন ▶ ৬৫ ভোলার একটি পৌরসভার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী আলাউদ্দিন আলী বিজয়ী ঘোষিত হন। কিন্তু বিশেষ মহলের প্রভাবে আলাউদ্দিন আলীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে টাল বাহানা শুরু করে। ফলশ্রুতিতে তার দল এবং স্থানীয় জনগণের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। *[আলহাজ মকবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে কত সালে? ১

খ. পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আলাউদ্দিন আলীর দল ও জনগণের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তার সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর সময়ের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে আলাউদ্দিন আলীর নিকট প্রশাসন কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের টাল বাহানা স্বাধীনতা পূর্ব পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের অনরূপ' ব্যাখ্যা কর? ৪

৬৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে ১৯৭১ সালে।

Teachingbd24.com

খ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের প্রকৃত উদাহরণ।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এসব সমস্যার কারণে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করতেই দীর্ঘ নয় বছর সময় লেগেছিল। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি, ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাদের দৌরাত্ম্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য সমস্যাজড়িত পাকিস্তান রাষ্ট্র তাই স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে বেশ হিমশিম খেয়ে যায়।

গ উদ্দীপকের আলাউদ্দিন আলীর দল ও জনগণের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তার সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর সময়ের সাদৃশ্য হলো ক্ষমতা দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করা।

বিজয়ীদলকে ক্ষমতা না দিয়ে যদি টালবাহানা করা হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয় উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় বাঙালি জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২ মার্চ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এমনিভাবে উদ্দীপকের প্রেক্ষিতেও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা করায় অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে আলোচিত ভোলার একটি পৌরসভার উপনির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী আলাউদ্দিন আলীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে টালবাহানা করে। তাদের এরূপ টালবাহানার কারণে তার দল এবং স্থানীয় জনগণের মাঝে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা পূর্ব আলোচিত অসহযোগ আন্দোলনেরই অনুরূপ ঘটনা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর সময়ের সাথে উদ্দীপকের ঘটনার এদিক দিয়েই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে আলাউদ্দিন আলীর দলের সাথে ক্ষমতাসীন দল যে ধরনের আচরণ প্রদর্শন করেছে তার প্রেক্ষিতে প্রশ্নের মন্তব্যটিকে আমি যথার্থ মনে করি।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে না নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতেই তারা তাদের ক্রান্তিকালে উপনীত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের এরূপ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদেই ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এরই পথ ধরে সূচনা হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল তা ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে উদ্দীপকের ঘটনায়। এখানে দেখা যায়, নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আলাউদ্দিন আলী বিজয়ী ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ মহলের প্রভাবে প্রশাসন তার নিকট ক্ষমতা হস্তন্তরে টালবাহানা শুরু করে। এটি মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরিচালিত ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। তারা যেভাবে বাঙালির উত্থানকে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আলাউদ্দিন আলীর সাথেও অন্যায় আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৬৬ মি. 'ক. বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। স্বদেশের প্রতি তার খুব টান ছিল। সত্তরের নির্বাচনের পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ তাকে ক্ষুব্ধ করে। নিরস্ত্র জনগণের ওপর নির্বিচারে গুলি, গণহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি সংবাদে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। স্বজাতির মুক্তির জন্য সুকৌশলে তিনি একটি যুদ্ধবিমান নিয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শত্রু বিমানের গুলিতে নিহত হন। এভাবে অনেক শহীদের আত্মত্যাগে দেখা স্বাধীন হয়।

[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৭]

ক. ভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শহীদদের আত্মত্যাগকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

৬৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষার জন্য, মায়ের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করা হয় তাই ভাষা আন্দোলন।

খ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণগুলো হলো-

১. ১৯৫৮ সালের অক্টোবরের ঘোষিত সামরিক শাসনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যেভাবে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্যুদস্ত হয় তার প্রতিবাদস্বরূপ পরবর্তীতে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়।

২. সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অত্যধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদের গণবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদ হিসেবে গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ার প্রতি ক্ষমতাসীন সরকারের অবজ্ঞা প্রদর্শনের প্রতিবাদস্বরূপ এ গণঅভ্যুত্থান ঘটে।

গ উদ্দীপকে মি. 'ক' বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম টান ছিল তার। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। স্বজাতির মুক্তির জন্য সুকৌশলে তিনি একটি যুদ্ধবিমান নিয়ে পালিয়ে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যে শত্রুর গুলিতে নিহত হন। তিনি হলেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান। যিনি পাকিস্তান থেকে যুদ্ধ বিমান নিয়ে পালিয়ে আসেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিমানটাকে ধ্বংস করে দেয়।

উদ্দীপকের ঘটনাটি আমার পঠিত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে নির্দেশ করছে। কারণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলার আপামর জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তেমনি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হলেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান। জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়েও দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার মানসে কর্মরত অবস্থায় থেকে বিমান নিয়ে পলায়ন করে। স্বাধীনতা অর্জনে যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল তা ইতিহাসে বিরল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শহিদ অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের আত্মত্যাগকে আমি যেভাবে মূল্যায়ন করব তা হলো- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত হামলা সেদিন বাঙালি জাতিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে সারাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। গঠন করা হয় মুক্তিবাহিনী, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ, এই যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল প্রশংসনীয়। শিল্পীগণ গণসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে দেশের জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয় সরকারি, বেসরকারি চাকরিজীবী, লেখকগণ, স্বাধীন বাংলা

Teachingbd24.com

বেতারের শিল্পীগণ বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের গতি, প্রকৃতি, মানুষের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে উজ্জীবিত করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রবাসী বাঙালিরা অর্থ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের কাজ করেন। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশে ভারত যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়। তারপর বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ এয়ার কমোডোর এ কে খন্দকার ১৬ ডিসেম্বর পাকস্তিানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম হয়। আলোচনার শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বীর শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬৭ রহমান সাহেব ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের একজন নেতা ছিলেন। তিনি তার নাতীকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গল্প শুনাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি সরকার আমাদের ক্ষমতা না দিয়ে আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। পরবর্তীতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ সেনানিবাস, খুলনা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ কয়টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল? ১

খ. ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে কি জান? ২

গ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল।

খ বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা এককথায় অনন্য। এ ভাষণের মাধ্যমে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কৌশল ও শত্রু মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন।

গ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানা অজুহাতে বাংলার মানুষকে শোষণ করেছে। তাদের শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেকে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তাই তারা সুযোগ পেয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়ী করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি প্রথমবারের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বশাসনের সুযোগ লাভ করে। সত্তরের নির্বাচন আরও প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

পূর্ব বাংলার জনগণ প্রত্যাশা করেছিল নির্বাচনের মাধ্যমে শোষকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে অধিকার আদায় করবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে। জনগণ দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিল, একমাত্র আওয়ামী লীগই তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে। নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেতে শুরু করে। তাই বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য অনেক।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও মুক্তি লাভেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে সত্তরের নির্বাচনই বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এর মাধ্যমেই বাঙালিরা প্রথমবারের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বশাসনের সুযোগ লাভ করে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ে আতঙ্কিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা সর্বশক্তি দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় পরবর্তীকালে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে। এ প্রেরণা থেকে বাঙালি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচন একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

প্রশ্ন ▶ ৬৮ এক দেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল ক ও খ নামক দুটি রাজ্য। রাজা খ রাজ্যের সম্পদ লুটে নিয়ে গিয়ে 'ক' রাজ্যের উন্নয়ন ঘটাতো। এভাবে দিনের পর দিন খ রাজ্যের বাসিন্দারা শোষিত ও বঞ্চিত হতো। কোনো প্রতিবাদ করতে গেলে রাজা খ রাজ্যের লোকদের উপর জুলুম নির্যাতন চালাতো। এমনকি কোনো যৌক্তিক দাবি তুললে নেতৃবৃন্দদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে বন্দি করে রাখতো। একদিন খ রাজ্যের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি অভ্যুত্থান ঘটায়। তাতে শাসকের পতন ঘটে।

[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. পাকিস্তানে কে প্রথম সামরিক শাসন জারি করে? ১

খ. ছয় দফার দুটি দফা উল্লেখ কর। ২

গ. উদ্দীপকটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে মিল রয়েছে তার কারণসমূহ লেখ। ৩

ঘ. উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে 'ছয় দফা' ঘোষণা করেন।

ছয় দফার প্রথম কর্মসূচিটি ছিল সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত। পাকিস্তানের সংবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির। এর যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ও পার্লামেন্টারি সরকার লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইনসভাই হবে সর্বেসর্বা। সরকার যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। সংবিধানে জনগণের পূর্ণ মৌলিক অধিকার রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও রক্ষিত হবে। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অধীনে একটি সত্যিকার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দ্বিতীয় দফাটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে কেবল দুটি বিষয় থাকবে— দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র। সরকারের অবশিষ্ট বিষয়গুলো প্রদেশসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

দ্বিতীয় অধ্যায়: পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭–১৯৭১)

★★ পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা

১. পাকিস্তানি আমলে বাঙালিদের মনে ক্ষোভ জন্ম নেয় কেন? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউ এসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর]
ক বিমাতাসুলভ আচরণ
খ অবস্থানের কারণে
গ শিক্ষাব্যবস্থা না থাকায়
ঘ সামরিক শাসনে
ক

২. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে কত সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয় অপরিহার্য ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৯৩৭ সালের খ ১৯৪৬ সালের
গ ১৯৫৪ সালের ঘ ১৯৭০ সালের
খ

৩. পাকিস্তান জন্মের পর পূর্ব বাংলা কোন প্রদেশের বাস্তুহারাদের নিয়ে সংকটে পড়ে? [অনুধাবন]
ক বিহার খ সিমলা
গ পাঞ্জাব ঘ দিল্লি
ক

৪. রাশেদ বিশ্বমানচিত্রে দেখেছে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের ব্যবধান ২০০০ মাইল। এই ব্যবধানটি পাকিস্তান আমলে কী সমস্যা তৈরি করেছিল? [প্রয়োগ]
ক স্বৈরতন্ত্রের প্রকোপ
খ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা
গ স্বায়ত্তশাসন বিলোপ
ঘ শিক্ষায় অনগ্রসরতা
খ

★★ পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

৫. দুই পাকিস্তানের মাঝে আঞ্চলিক সমস্যা তৈরি করেছিল কোনটি? [অনুধাবন]
ক বিশাল দূরত্ব
খ বিদেশি শাসক
গ রাজনৈতিক পরিস্থিতি
ঘ মানসিক দূরত্ব
ক

৬. প্রথম গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের কতজন সদস্য ছিল? [জ্ঞান]
ক ৩০ জন খ ৩৫ জন
গ ৪০ জন ঘ ৪৪ জন
খ

৭. পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে রাজনৈতিক সমস্যা ছিল কোনটি? [অনুধাবন]
ক অধিক অংশগ্রহণ
খ অত্যধিক প্রভাব বিস্তার
গ রাজনৈতিক আদর্শের বিচ্ছিন্নতা
ঘ সীমিত অংশগ্রহণ
ঘ

৮. পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ কত সালে গঠন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৩ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৫৭ সালে ঘ ১৯৫৯ সালে
খ

৯. পাকিস্তান আমল (১৯৪৭ - ১৯৭১) বাঙালিদের জন্য ছিল— [ব. বো. ১৫]
i. শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস
ii. সুখ ও সমৃদ্ধির ইতিহাস
iii. স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ইতিহাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ ii ও iii
ক

★ বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

১০. পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ ভাবতে থাকে কোন শাসকগোষ্ঠী? [জ্ঞান]
ক ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী
খ পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী
গ ফরাসি শাসকগোষ্ঠী
ঘ পর্তুগিজ শাসকগোষ্ঠী
খ

১১. তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর বৈমানিকের সংখ্যা কীরূপ ছিল? [জ্ঞান]
ক ৬% খ ৭%
গ ৮% ঘ ৯%
ঘ

১২. অখণ্ড পাকিস্তান শাসনামলে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পদে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৮৬ জন খ ১৮০ জন
গ ১৭৬ জন ঘ ১৭০ জন
ক

★★ ভাষা আন্দোলন: ১৯৪৮- ১৯৫২

১৩. মাওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে? [চ. বো. ১৫]
ক ১৯৪৮ খ ১৯৪৯
গ ১৯৫০ ঘ ১৯৫১
খ

১৪. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কোনটি পরিলক্ষিত হয়? [চ. বো. ১৫]
ক শহিদ মিনার তৈরি
খ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন
গ খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রস্তাব
ঘ তমদ্দুন মজলিসের প্রচেষ্টা
ঘ

১৫. ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ কোন ধারা ভঙ্গ করে? [কু. বো. ১৫]
ক ১৪৪ খ ১৫৪
গ ১৬৪ ঘ ১৭৪
ক

১৬. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে? [কু. বো. ১৫]
ক ১৪ ডিসেম্বর খ ১৬ ডিসেম্বর
গ ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৬ মার্চ
গ

১৭. বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল উৎস কোনটি? [সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]
ক ভাষা খ ধর্ম
গ ইতিহাস ঘ রাজনৈতিক চেতনা
ক

১৮. আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে মাওলানা ভাসানী তাতে কোন পদ গ্রহণ করেন? [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
ক সম্পাদক খ সভাপতি
গ সহ-সভাপতি ঘ যুগ্ম-সম্পাদক
খ

Teachingbd.com

১৯. 'উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র
খ লিয়াকত আলী খানের
গ খাজা নাজিমুদ্দীনের
ঘ নূরুল আমীনের **ক**

২০. পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কোন দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে? [অনুধাবন]
ক শিল্পকারখানা গড়ার দাবি
খ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি
গ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি
ঘ অর্থ পাচার বন্ধ করার দাবি **গ**

২১. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রথম কে উদ্বোধন করেন? [জ্ঞান]
ক শহিদ সালামের পিতা
খ শহিদ জব্বারের পিতা
গ শহিদ শফিউরের পিতা
ঘ শহিদ বরকতের পিতা **গ**

২২. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কেন? [অনুধাবন]
ক ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানে
খ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে
গ ভাষা আন্দোলন বেগবান করতে
ঘ ভাষা আন্দোলন দমন করতে **গ**

২৩. রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সর্বপ্রথম কবে হরতাল পালিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর
খ ১৯৪৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর
গ ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি
ঘ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ **ঘ**

২৪. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খ হাবিবুর রহমান
গ গাজীউল হক ঘ শামসুল হক **ঘ**

২৫. পাকিস্তানের জনসংখ্যার মোট কত ভাগ বাংলায় কথা বলতো? [জ্ঞান]
ক ৪০ ভাগ খ ৪৬ ভাগ
গ ৫০ ভাগ ঘ ৫৬ ভাগ **ঘ**

২৬. মুনিরার মোবাইলে তার বান্ধবী ইংরেজিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উইস করায় সে রেগে যায়। তার মধ্যে বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রভাব পড়েছে? [প্রয়োগ]
ক শিক্ষা আন্দোলন খ গণঅভ্যুত্থান
গ ভাষা আন্দোলন ঘ স্বাধীনতা আন্দোলন **গ**

২৭. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার মতামতের সাথে জড়িত— [অনুধাবন]
i. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্
ii. উত্তর প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতাগণ
iii. ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৮. বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলো— *[ব. বো. '১৫]*
i. একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ
ii. একটি ইতিহাস ও সংস্কৃতিভিত্তিক চেতনা
iii. একটি অ-সাম্প্রদায়িক চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আদীবা মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশনে খবর দেখছিল। এক নেতা ছাত্রদের এক সমাবেশে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সরকারের গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পক্ষে ঘোষণা দেন। সমাবেশের একটি অংশ না! না!! না!!! ধ্বনিতে এর প্রতিবাদ জানায়। *[চ. বো. '১৫]*

২৯. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতাদের বক্তব্য কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন
খ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
গ অসহযোগ আন্দোলন
ঘ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ **ক**

৩০. উক্ত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল—
i. জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া
ii. ভূখণ্ডের সীমানা নির্ধারণ করা
iii. পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩১. চিত্রটি কীসের পরিচয় বহন করে? [প্রয়োগ]
ক সিপাহি বিদ্রোহের খ ভাষা আন্দোলনের
গ গণঅভ্যুত্থানের ঘ মুক্তিযুদ্ধের **খ**

৩২. উক্ত ঘটনার চেতনার দরুনই পরবর্তীকালে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. '৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে
ii. '৬৬ এর ছয় দফা দাবি ব্যর্থ হয়
iii. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com

★★ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

৩৩. কত সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' মুসলিম শব্দটি বর্জন করে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ করে? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৩ খ ১৯৫৪
গ ১৯৫৫ ঘ ১৯৫৬ **গ**

৩৪. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? [জ্ঞান]
ক গোলাপ ফুল খ হারিকেন
গ নৌকা ঘ বাঘ **গ**

৩৫. যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি ছিল কত দফাভিত্তিক? [জ্ঞান]
ক ৬ দফা খ ৭ দফা
গ ১১ দফা ঘ ২১ দফা **ঘ**

৩৬. বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ মিলে কী গঠন করেন? [অনুধাবন]
ক মুসলিম লীগ খ যুক্তফ্রন্ট
গ মুসলিম আওয়ামী লীগ
ঘ আওয়ামী জনতা পার্টি **খ**

৩৭. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কত দফা কর্মসূচি ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৯ দফা খ ২০ দফা
গ ২১ দফা ঘ ২২ দফা **গ**

৩৮. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন প্রমাণ করে— *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউ এসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর]*
i. স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা
ii. মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব বৃদ্ধি
iii. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ ১৯৫৬ সালের সংবিধান

৩৯. ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তান সংবিধান কোন তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৪ আগস্ট খ ২৩ মার্চ
গ ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ ১২ মার্চ **খ**

৪০. ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধানে কোনটি গৃহীত হয়? [অনুধাবন]
ক এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা
খ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা
গ রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা
ঘ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা **খ**

৪১. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রদেশে কোন ব্যবস্থাটি রাখা হয়? [অনুধাবন]
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা খ সংসদীয় ব্যবস্থা
গ স্বৈরাচারী ব্যবস্থা ঘ রাষ্ট্রপতির শাসন **খ**

৪২. ১৯৫৬ সালে গঠিত গণপরিষদের ৮০ জন সদস্যের কোন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? [অনুধাবন]
ক প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন খ পরোক্ষ নির্বাচন
গ প্রত্যক্ষ নির্বাচন ঘ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন **খ**

৪৩. পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে সমস্যা হলো— *[ঢা. বো. '১৫]*
i. ভাষার ভিন্নতা
ii. কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন
iii. আইন সভার প্রতিনিধিত্ব সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৪. ১৯৫৬ সালে বাঙালিদের সমালোচনার বিষয় ছিল— [অনুধাবন]
i. প্রদেশে কেন্দ্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ
ii. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ব্যবস্থা
iii. প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অশুভ কর্মকাণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

৪৫. 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ'-কে জারি করেন? [জ্ঞান]
ক আইয়ুব খান খ মোনায়েম খান
গ জুলফিকার আলী ভুট্টো
ঘ ইয়াহিয়া খান **ক**

৪৬. ১৯৫৮ সালের কত তারিখ পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হয়? [জ্ঞান]
ক ৭ অক্টোবর খ ৯ অক্টোবর
গ ১২ নভেম্বর ঘ ১৪ ডিসেম্বর **ক**

৪৭. ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিলের সাথে জড়িত কোনটি? [অনুধাবন]
ক রাষ্ট্রপতির আদেশ
খ রাজনৈতিক বিক্ষোভ
গ রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা
ঘ রাজনৈতিক দলগুলোর পদত্যাগ **ক**

৪৮. বাংলাদেশের রাজনীতি বর্তমানে একদলীয় নয় বরং জোট সরকার বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের জন্যে কোন জোট পরোক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছে? [প্রয়োগ]
ক যুক্তফ্রন্ট
খ আওয়ামী লীগ ও কৃষক লীগ
গ মীর্জা ও লিয়াকত জোট
ঘ সোহরাওয়ার্দী ও গুরমানীর জোট **ঘ**

৪৯. ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির মূল কারণ কোনটি? [অনুধাবন]
ক বিদেশে পাকিস্তানের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়া
খ প্রশাসনিক দুর্নীতি
গ সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা
ঘ রাজনৈতিক দলাদলি **গ**

★★ ১৯৬৬ সালের ৬ দফা

৫০. ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ব বাংলা কোন দাবিতে সোচ্চার হয়? [অনুধাবন]
ক অর্থনৈতিক অধিকার
খ সামরিক নিরাপত্তা
গ রাজনৈতিক অধিকার
ঘ গণতান্ত্রিক অধিকার **খ**

৫১. ছয়-দফা দাবিতে নৌ-বাহিনী সদর দফতর কোথায় স্থানান্তর করার দাবি জানানো হয়? [জ্ঞান]
ক ঢাকায় খ খুলনায়
গ বরিশালে ঘ চট্টগ্রামে **ঘ**

৫২. ছয় দফা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে কোন রাজনৈতিক দলটি জড়িত? [অনুধাবন]
ক কৃষক লীগ খ আওয়ামী লীগ
গ জাসদ ঘ জাতীয়তাবাদী দল **খ**

http://teachingbd.com

৫৩. ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলার কারণ। এটি— [অনুধাবন]
i. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা
ii. বাঙালির ন্যায্য অধিকারের সনদ
iii. মৌলিক অধিকারের ভিত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৪. ছয় দফার মূল লক্ষ্য ছিল— *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
i. বাঙালি মুসলমানদের অধিকার আদায়
ii. বাঙালিদের অর্থনৈতিক মুক্তি
iii. স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৫৫ ও ৫৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির সব ধরনের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৫৫. বঙ্গবন্ধু এ সম্মেলনে কোন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন? [প্রয়োগ]
ক ৬ দফা কর্মসূচি
খ লাহোর প্রস্তাব
গ ১১ দফা কর্মসূচি
ঘ গণআন্দোলনের কর্মসূচি **ক**

৫৬. এ কর্মসূচি দেখে আইয়ুব খান শঙ্কিত হয়ে পড়ার কারণ হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. বৈদেশিক মুদ্রার ভাগ কমে যাবে
ii. পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে
iii. পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ছাত্র সমাজের ১১ দফা

৫৭. আইয়ুব খান কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন? [জ্ঞান]
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ মোনায়েম খান
গ ইয়াহিয়া খান ঘ জেনারেল নিয়াজি **গ**

৫৮. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে কে পদত্যাগ করেছিল? [জ্ঞান]
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ ইয়াহিয়া খান
গ আইয়ুব খান ঘ জেনারেল নিয়াজি **গ**

৫৯. রিন্টু এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়। এই আইনটি সম্পর্কে ছাত্রদের এগার দফায় কী দাবি ছিল? [প্রয়োগ]
ক বাস্তবায়ন খ শিথিলকরণ
গ রহিতকরণ ঘ সীমিতকরণ **গ**

৬০. ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণার সাথে জড়িত কোন সংগঠন? [অনুধাবন]
ক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
খ নাগরিক কমিটি
গ সম্মিলিত রাজনৈতিক জোট
ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি **ক**

★ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

৬১. কোন ঘটনার মাধ্যমে আগরতলা মামলার সব আসামি মুক্তি পান? *[চ. বো. '১৫]*
ক ১৯৬৬-এর ছয় দফা
খ ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান
গ ১৯৭০-এর নির্বাচন
ঘ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ **খ**

৬২. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৬৯ সাল বিখ্যাত হয়ে আছে কেন? *[পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
ক ছয় দফা দাবির জন্যে
খ আগরতলা মামলার জন্যে
গ ছাত্র আন্দোলনের জন্যে গণঅভ্যুত্থান
ঘ স্বাধীনতা লাভের জন্যে **গ**

৬৩. ৬ দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্যে শাসকরা কার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে? [জ্ঞান]
ক এ. কে. ফজলুল হক
খ শেখ মুজিবুর রহমান
গ ড. শামসুজ্জোহা ঘ জহুরুল হক **খ**

৬৪. আগরতলা মামলা করা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬৬ সালে খ ১৯৬৭ সালে
গ ১৯৬৮ সালে ঘ ১৯৭০ সালে **গ**

৬৫. গণঅভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক কারণ কোনটি? [অনুধাবন]
ক গুটি কয়েকের হাতে পুঞ্জিভূত সম্পদ
খ সামরিক বাহিনীর বেতন বৃদ্ধি
গ বৈদেশিক বিনিয়োগের অগ্রাধিকার
ঘ বৈদেশিক সাহায্যের আত্মসাৎ **ক**

★★ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

৬৬. শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয় কোন সালের কত তারিখে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি
খ ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি **ঘ**

৬৭. কে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন? [জ্ঞান]
ক মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
খ আবদুর রাজ্জাক
গ তোফায়েল আহমেদ
ঘ নূরে আলম সিদ্দিকী **গ**

৬৮. ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করার কারণ কী? [অনুধাবন]
ক শেখ মুজিবের বন্দি অবস্থা
খ সামরিক হামলা
গ আসাদের মৃত্যু ঘ ভাসানীর নেতৃত্ব **গ**

Teachingbd.com

৬৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় শহিদ আসাদ দিবসের বক্তৃতা হচ্ছিল। কোন তারিখে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি হয়েছিল? [প্রয়োগ]
ক ১২ জানুয়ারি খ ১৫ জানুয়ারি
গ ২০ জানুয়ারি ঘ ২৫ জানুয়ারি **গ**

৭০. গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল কোনটি? [অনুধাবন]
ক আইয়ুব খানের পতন
খ স্বাধীনতা লাভ
গ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন লাভ
ঘ সেনা অভ্যুত্থান **ক**

৭১. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় নেন? [জ্ঞান]
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান
গ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্
ঘ জেনারেল টিক্কা খান **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিশরীয় রাজতন্ত্রের নির্যাতন নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে মিশরীয় জনগণ তাদের শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ একসময় রাজতান্ত্রিক শাসকের পতন ঘটায়। ফলে মিশরে নতুন করে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

৭২. উদ্দীপকের মিশরীয় ঘটনাটির সাথে বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ? [প্রয়োগ]
ক ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
খ ভাষা আন্দোলন
গ ছয় দফা দাবি ঘ এগার দফা দাবি **ক**

৭৩. মিশরীয় জনগণের প্রতিবাদের সাথে বাংলার ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট ঘটনাটিতে বাংলার জনগণের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিবাদ ছিল— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. গণতন্ত্র বাস্তবায়ন
ii. অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান
iii. সামরিক চক্রের কর্তৃত্ব বিলুপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

৭৪. কবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়? *[সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল]*
ক ২ মার্চ খ ২ এপ্রিল
গ ২ মে ঘ ২ জুন **ক**

৭৫. 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬০ সালে খ ১৯৬৫ সালে
গ ১৯৬৯ সালে ঘ ১৯৭০ সালে **ঘ**

৭৬. ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশের আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা কত ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৬০টি খ ১৬৫টি
গ ১৬৯টি ঘ ১৭০টি **গ**

৭৭. ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রদত্ত ভোটের কত ভাগ আওয়ামী লীগ পায়? [জ্ঞান]
ক ৬০% খ ৭০%
গ ৭৫% ঘ ৭৮% **গ**

৭৮. বাঙালি একটি আলাদা জাতি প্রমাণিত হয় কত সালের নির্বাচনে? [অনুধাবন]
ক ১৯৭০ সালের খ ১৯৫৪ সালের
গ ১৯৬৮ সালের ঘ ১৯৬২ সালের **ক**

৭৯. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আগে কিছু করণীয় নীতিমালা পেশ করে। ইয়াহিয়ার এমন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হলো— [প্রয়োগ]
i. এক ব্যক্তি-এক ভোট
ii. পুরুষ ভোটাধিকার
iii. সর্বজনীন ভোটাধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১

৮০. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ তাজউদ্দীন আহমদ
গ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান
ঘ মনসুর আলী **খ**

৮১. রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে কী নামে পরিচিত? [জ্ঞান] *[কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, কুমিল্লা]*
ক রমনা পার্ক খ শিশু পার্ক
গ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
ঘ নন্দন পার্ক **গ**

৮২. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ায় সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন কে? [জ্ঞান]
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী **ক**

৮৩. ১৯৭১ সালে কত তারিখ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
ক ১ মার্চ খ ২ মার্চ
গ ৩ মার্চ ঘ ৪ মার্চ **গ**

৮৪. অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের উপলব্ধি কীরূপ হয়েছিল? [অনুধাবন]
ক স্বৈরাচারী শাসন অসম্ভব
খ স্বৈরাচারী শাসন উপযুক্ত
গ পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন
ঘ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি বিভাজিত **ক**

★★ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

৮৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্বখ্যাত কোন ভাষণের সাথে তুলনা করা হয়? *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]*
ক আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণ
খ হুগো শ্যাভেজের হাভানার ভাষণ
গ চে গুয়েভারার বুয়েন্স আয়ারস ভাষণ
ঘ নেলসন মেন্ডেলার ব্রিজ টাউনের ভাষণ **ক**

Teachingbd.com

৮৬. ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান মূলত কী চেয়েছিলেন? [অনুধাবন]
ক ক্ষমতা খ স্বাধিকার
গ যুদ্ধ ঘ আলোচনা **খ**

৮৭. বঙ্গবন্ধু কেমন মন নিয়ে ৭ই মার্চ ভাষণ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন? [জ্ঞান]
ক বিপ্লবী মন খ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন
গ আনন্দঘন মন ঘ উত্তেজিত মন **খ**

৮৮. 'আমরা যখন মরতে শিখেছি' এখানে 'আমরা' বলতে কাদের বোঝায়? [অনুধাবন]
ক আওয়ামী লীগের নেতাদের
খ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে
গ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে
ঘ সংগ্রামী নেতাদের **খ**

৮৯. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'— এই উক্তিটির সাথে জড়িত— [অনুধাবন]
i. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
ii. রেসকোর্স ময়দান
iii. স্বাধীনতার ঘোষণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

৯০. ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে গঠিত সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*
ক শেখ মুজিব খ সোহরাওয়ার্দী
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ তাজউদ্দীন আহমেদ **গ**

৯১. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র দেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? [জ্ঞান]
ক ৫টি খ ৭টি
গ ১০টি ঘ ১১টি **ঘ**

৯২. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কোন তারিখে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
খ ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল
গ ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল
ঘ ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল **ক**

৯৩. মুজিব নগর সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান কে? */কু. বো. '১৬; দি. বো., রা. বো. '১৫/*
ক অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ
খ অধ্যাপক ইউসুফ আলী
গ আব্দুল হান্নান ঘ মনি সিং **খ**

৯৪. 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
উদ্দীপকের ঘোষণায় কী শুরু হয়? */য. বো. '১৫/*
ক ছয়-দফা কর্মসূচি খ গণঅভ্যুত্থান
গ অসহযোগ ঘ মুক্তিযুদ্ধ **ঘ**

৯৫. 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী? */চ. বো. '১৫/*
ক দারিদ্র্য দূরীকরণ খ নির্বাচনি প্রচারণা
গ মূলধন গঠন ঘ নির্বিচারে মানুষ হত্যা **ঘ**

৯৬. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন কে? */চ. বো. '১৫/*
ক এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান
খ ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী
গ তাজউদ্দীন আহমেদ
ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম **খ**

৯৭. মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? */সি. বো. '১৫/*
ক মাওলানা ভাসানী
খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ তাজউদ্দীন আহমেদ **খ**

৯৮. বাংলাদেশের বিজয় দিবস কোনটি? */সি. বো. '১৫/*
ক ২৬ মার্চ খ ১৬ ডিসেম্বর
গ ১৬ এপ্রিল ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি **খ**

৯৯. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণায় যে বার্তাটি দিয়েছিলেন সেটিকে তিনি কী মনে করেছিলেন? [অনুধাবন]
ক শেষ বার্তা
খ ঠিকমতো পৌঁছাবে না এমন বার্তা
গ স্বাধীনতার দলিল ঘ গণহত্যার বার্তা **ক**

১০০. পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল কোথায়? [অনুধাবন]
ক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
খ রমনা পার্কে
গ বোটানিক্যাল পার্কে
ঘ জাতীয় স্মৃতিসৌধে **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তার দেশের স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই শোষক গোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জেলে কাটিয়েছেন। তার এ জেল-জুলুম, নির্যাতন ভোগের সফল পরিসমাপ্তি দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতার পরে দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। */রা. বো., দি. বো. '১৫/*

১০১. উদ্দীপকে নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে বাংলাদেশের কোন নেতার তুলনা করা যায়?
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী **ক**

১০২. স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা জাতির কাছে কী ধরনের সম্মান লাভ করেন?
i. জাতীয় নেতা হিসেবে
ii. জাতির পিতা হিসেবে
iii. রাজনৈতিক নেতা হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৩: রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব : বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

প্রশ্ন ▶১ শামসুল হুদা একজন সৎ ও সাহসী ব্যক্তি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় সোচ্চার। অত্যাচারী জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষায় তিনি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ১; উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. কত সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো মহান নেতার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গতি লাভ করে- বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হয় ১৯২৩ সালে।

খ বেঙ্গল প্যাক্ট হলো বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অনুভব করেছিলেন যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাবি অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ দিক বিবেচনা করে চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের সমর্থন ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বাংলার মুসলিম নেতারাও তাঁর সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এ.কে. ফজলুল হক, মৌলবি আবদুল করিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাদের উদ্যোগে ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হয়।

গ উদ্দীপকের শামসুল হুদার সাথে আমার পঠিত মহান নেতা শহিদ তিতুমীরের সাদৃশ্য রয়েছে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক শহিদ তিতুমীরের আসল নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। তিনি দেশের মানুষকে ইংরেজ, জমিদার এবং নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা চালান। তিনি কৃষকদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন এবং তাদেরকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি কৃষকদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি কলকাতার নিকটবর্তী নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে একটি বাঁশের কেল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করেন।

উদ্দীপকের শামসুল হুদার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তিনি একজন সৎ ও সাহসী ব্যক্তি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় সোচ্চার। অত্যাচারী জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষায় তিনি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ লক্ষ্য ও কার্যক্রমের সাথে আমার পঠিত শহিদ তিতুমীরের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ তিতুমীরের আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গতি লাভ করেছিল।

তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন ও বারাসাত বিদ্রোহ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিদ্রোহ। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, রক্তদান ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তাঁর পরিচালিত এ বিদ্রোহ ছিল জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তিনি নারিকেলবাড়িয়ার আশপাশের জমিদারদের পরাজিত করে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন এবং কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের আক্রমণ মোকাবিলার জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৮৩১ সালে ইংরেজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে তিতুমীরও শহিদ হন।

ইংরেজদের গোলাবারুদ এবং নীলকর ও জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিল সাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হতে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তিতুমীরের আন্দোলনের কারণেই পরবর্তী সময়ের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলো গতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶২ জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারান। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, দরিদ্র কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি আজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তার জীবনযাপন ছিল অতিসাধারণ। তাকে মজলুম জননেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। *[চা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কোন কর্মসূচিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব 'ক' এর সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন নেতার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষকদের স্বার্থ আদায় ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতার ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

খ ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তারা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ জনাব 'ক' এর সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মিল আছে।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অবহেলিত মানুষের জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন। অত্যাচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ছিল তার পথ চলা। এই অসাধারণ নেতার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে জনাব 'ক' এর মধ্য দিয়ে।

জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারান। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এই মানুষটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং দরিদ্রের স্বার্থ সংরক্ষণে আন্দোলন করেছেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনিও দরিদ্র পরিবারে

https://teachingbd24.com

জন্ম নিয়ে বাল্যকালে পিতা এবং কৈশোরে মাতাকে হারান। এরপর চাচার আশ্রয়ে কিছুদিন থেকে পরবর্তীতে ভবঘুরের মতো জীবনযাপন করেন। এ সময় ভাসানী অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। দুবেলা খাবার জোগাড়ের জন্য তিনি দিনমজুর ও কুলির কাজ করেছেন। তিনি কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন বদ্ধপরিকর। এ সংগ্রামে তিনি বার বার অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও উৎপীড়িত হয়েছেন। জনদরদি এই নেতা শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। এ কারণে তাকে মজলুম জননেতা বলে অভিহিত করা হয়। মওলানা ভাসানী ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ইত্যাদি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যায়, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীরই প্রতিফলন ঘটেছে জনাব 'ক' এর মধ্যে।

ঘ কৃষকদের স্বার্থ আদায় ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতা অর্থাৎ মওলানা ভাসানী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

মওলানা ভাসানী বাস্তব জীবনে দেখেছেন তৎকালীন জমিদার প্রথা ও বাঙালির ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াল চিত্র। তিনি নিজেও এসব নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ কারণেই তার কণ্ঠ জনগণের অধিকার আদায় এবং দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মওলানা ভাসানী রাজশাহীর ধুপঘাটের জমিদার, টাঙ্গাইলের সন্তোষের জমিদার, গৌরীপুরের মহারাজা এবং পাবনার সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন। তিনি নিরন্ন, অবহেলিত, অশিক্ষিত, অসহায় কৃষকদের অধিকার সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে কৃষক সম্মেলন করেন। ১৯৩৭ সালে আসামে 'লাইন প্রথা' নামে একটি নিপীড়নমূলক প্রথা চালু হয়। ভাসানী এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। অবশেষে ১৯৪৫ সালে এই প্রথা বাতিল হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে আসাম জুড়ে বাঙালির বিরুদ্ধে 'বাঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ সময় ভাসানী বাঙালিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। এছাড়া তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালায়। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক শাসন, মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভাসানী ছিলেন আপসহীন ও নিবেদিতপ্রাণ।

পরিশেষে বলা যায়, মওলানা ভাসানী ছিলেন কৃষক, শ্রমিক তথা সমগ্র জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। কৃষকদের স্বার্থে ও জনঅধিকার রক্ষায় তার আপসহীন ভূমিকা চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন ▶৩ সিরাজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও সমাজ সংস্কারক। তিনি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে একটি আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলেই যেন ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]*

ক. মীর নিসার আলী কে ছিলেন? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সিরাজুল ইসলামের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কোন ব্যক্তিত্বের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি কেবল ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলী, যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করে শহিদ হন।

খ সৃজনশীল ২নং প্রশ্নের 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সিরাজুল ইসলামের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। তিনি ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। উদ্দীপকের সিরাজুল ইসলামের আন্দোলনে আমরা অনুরূপ বিষয়টিই দেখতে পাই।

হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর মক্কায় অবস্থান করে ইসলাম শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদলে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলমান সমাজ থেকে জাত-পাত প্রথা উচ্ছেদ, অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণির বিলোপ ঘটিয়ে পীরপূজা, কবরপূজা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করার জোর চেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশি শাসন-শোষণ এবং নীলকর জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যার ফলে তাকে শাসক শ্রেণির রোষানলে পড়তে হয়। উদ্দীপকের সিরাজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও সমাজসংস্কারক। তিনি মানুষকে ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এবং কুসংস্কারমুক্ত করতে যে আন্দোলনের ডাক দেন তা ইতিহাসের হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সিরাজুল ইসলামের সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন কেবল ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না— বক্তব্যটি যথার্থ।

ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে থেকেই মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের অধঃপতনের পেছনে কুসংস্কার যেভাবে ভূমিকা রাখে তা বুঝিয়ে কুসংস্কার পরিহার করতে উৎসাহী করেন। তিনি নীলকর বণিকদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসন তা তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন, 'লাঙল যার জমি তার এবং এই জমিন আল্লাহর, সুতরাং খাজনা দেব আল্লাহকে।' ব্রিটিশ অথবা তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের কোনো খাজনা দেওয়া যাবে না। এছাড়াও তিনি সরকারি খাসমহলগুলো দখলে এনে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এভাবেই তিনি বাংলার নির্যাতিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেন। জনগণ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরায়েজি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলনই নয় বরং এটি কৃষক আন্দোলনও বটে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ ফয়সাল সাহেব দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেন। দেশে ফিরে তিনি এলাকার মানুষের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দেখে ধর্মীয় সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমান সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত অবস্থা দেখে তিনি দুঃখ পান। তিনি এলাকাবাসীকে সংগঠিত করে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? ১

খ. তিতুমীর কেন বাঁশের কেল্লা স্থাপন করেন? ২

গ. উদ্দীপকে ফয়সাল সাহেবের সাথে ইতিহাসের কোন মহৎ ব্যক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করেছিল। তুমি কি বিষয়টির সাথে একমত? যুক্তি দাও।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীই (১৮৮০-১৯৭৬) মজলুম জননেতা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

খ স্থানীয় অত্যাচারী জমিদার ও ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের বাহিনীকে প্রতিহত করতে এবং নিজের অনুসারীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তিতুমীর (সৈয়দ মীর নিসার আলী; ১৭৮২-১৮৩১) বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা তিতুমীর দরিদ্র কৃষকদের সাথে নিয়ে অত্যাচারী জমিদার এবং ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তার আন্দোলন চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলার কৃষক, তাঁতীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। একসময় সরকারসহ ক্ষমতাবানদের সাথে তাদের সংঘাত শুরু হয়। জমিদারদের বাহিনী এবং ব্রিটিশ সরকারের সেনাদল তিতুমীরের হাতে কয়েকবার পরাজিত হয়। তিতুমীর তার বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশ দিয়ে একটি কেল্লা নির্মাণ করেন।

গ ফয়সাল সাহেবের সাথে বাংলার ইতিহাসের অন্যতম মহৎ ব্যক্তি হাজী শরীয়তউল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০) মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ শৈশব থেকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কায় গিয়েছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর সেখানে অবস্থান করে ইসলামি শিক্ষা আয়ত্ত করেন। উদ্দীপকের ফয়সাল সাহেবের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়।

ফয়সাল সাহেব দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে ধর্মীয় সংস্কার এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহও মক্কা থেকে দেশে ফিরে মুসলমান সমাজে নানা কুসংস্কার দেখতে পান। পীরপূজা, কবর পূজা, মনসা-শীতলা পূজাসহ নানা ধরনের অনৈসলামিক কাজ মুসলমান সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল। এ অবস্থায় তিনি মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য অর্থাৎ ফরজ পালনের আহ্বান জানান। কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কাজকর্ম ত্যাগ করে ফরজ পালনের তাগিদ দেওয়া হতো বলে হাজী শরীয়তউল্লাহর এ প্রচারণা ফরায়েজি অন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ছিল— ১. মুসলিম সমাজকে ইসলামি মূলনীতি তথা ফরজ এর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা; ২. মুসলমানদের কুসংস্কারমুক্ত প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা দান; ৩. তাদেরকে অধিকার ও কর্তব্য পালনে সচেতন করে তোলা; ৪. মুসলমানদের ধর্মভীরু ও নৈতিক বলে বলীয়ান করা ও ৫. ইংরেজ বাহিনী ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আন্দোলন অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করেছিল— এ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

ব্রিটিশ শাসনামলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়রা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তবে শিক্ষায় অনগ্রসরতাসহ বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের অবস্থা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি পশ্চাদপদ। ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের মুসলমানরা ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি তাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়।

ফরায়েজি আন্দোলন মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে অনুপ্রবেশ করা কবরপূজা, পীরপূজা, মনসা-শীতলা পূজা ইত্যাদি অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন কুসংস্কার ত্যাগ করার তাগিদ দেয়। এছাড়া ইসলামের ফরজ কাজগুলো পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করে। হাজী শরীয়তুল্লাহ ঔপনিবেশিক সরকার ও অত্যাচারী জমিদারের নির্যাতন মোকাবেলা, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের বিষয়ে মুসলমানদের সচেতন করে তোলেন। তার আন্দোলন জমিদার, জোতদার, মহাজন, নীলকর ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। তখন বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের কারিগর, কৃষক, তাঁতি ও জেলে সম্প্রদায় জমিদার ও ব্রিটিশদের অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করত বেশি। ফরায়েজী আন্দোলনের ফলে এরা নিজেদের অধিকার আদায় ও ভাগ্য উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, ফরায়েজি আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম এবং দেশ ও সমাজ বিষয়ে বিদ্যমান অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে এবং তাদেরকে সংগ্রামী হতে সাহায্য করে। তাই এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ফরায়েজি আন্দোলন তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করেছিল।

প্রশ্ন ▶৫ কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো যাকে দেখে বলেছিলেন "আমি আপনাকে দেখেছি আমার আর হিমালয় পর্বত দেখার দরকার নেই।" যার ডাকে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। যিনি আমৃত্যু দেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কাকে বলে? ১

খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন নেতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত নেতার ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজী শরীয়তউল্লাহ সমাজে প্রচলিত পীরপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার ত্যাগ করে ফরজ পালনভিত্তিক যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা-ই ফরায়েজি আন্দোলন হিসেবে পরিচিত।

খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রমনা। রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারা চালু করার মানসে তিনি পাকিস্তানে প্রথম শক্তিশালী বিরোধী দলের জন্মদান করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের সূতিকাগার। তিনি জনগণের স্বাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সব সময় ভাবতেন শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপসহীন নেতা ছিলেন বলেই তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি ভাষা আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, কিউবার মহান নেতা ফিদেল কাস্ত্রো একজনকে দেখে বলেছিলেন, " আমি আপনাকে দেখেছি আমার আর হিমালয় পর্বত দেখার দরকার নেই।" এখানে মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কথা বলা হয়েছে। কারণ ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কেই এ মন্তব্যটি করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমেই বৃহত্তর পরিসরে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল তার নেতৃত্বে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল বের করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন আবার ঘোষণা করেন , উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ সময় জেলে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিবাদ জানান এবং কারাগারে বন্দি অবস্থায় 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে তিনি এবং মহিউদ্দিন আহমদ অনশন ধর্মঘট পালন করেন। এর ফলে ভাষা আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যন্য ভূমিকা পালন করেন। মূলত তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান শত্রুতে পরিণত হন এবং জেলে আটক থাকেন। তিনি বাঙালিকে ভালোবাসতেন বলে সকল বাধা, জুলুম, নির্যাতন সহ্য করে ও লক্ষ্যে অবিচল থেকে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণের পেছনে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত ছয় দফা দাবিতে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং বাঙালি নিজেদের অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। যার ফলাফল দেখা যায় ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্যে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করলেও বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় যেতে পারেননি। এর পর পাক-সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং সেখানে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি ভাষণে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাঁর এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে পাক-হানাদারদের নিকট বন্দি হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶৬ ফজর আলী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি হজব্রত পালন করার জন্য মক্কায় গমন করেন। দীর্ঘদিন পর তিনি দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে দেখেন তার এলাকার মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তাই তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। শুধু তাই নয় মুসলমানদের আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলামের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপরও সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' কাকে বলে? ১

খ. মুসলীম লীগ কেন গঠন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ফজর আলীর আন্দোলনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তৎকালীন সমাজে উক্ত আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দুটিকে পৃথক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির যে দাবি তুলেছিলেন তাকে দ্বিজাতি তত্ত্ব বলে।

খ মুসলমানদের দুরবস্থার অবসান করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ভারতের সব সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু নীতি ও সিদ্ধান্তের কারণে মুসলমানরা হতাশ এবং আশাহত হয়ে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। তারা নিজেদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের ফজর আলীর আন্দোলনের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাদৃশ্য আছে।

বাংলায় পরিচালিত বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম হলো ফরায়েজি আন্দোলন। ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমানদের জন্য পাঁচটি ফরজ কাজ অবশ্য পালনীয়। এগুলো পালনের উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তাই হলো ফরায়েজি আন্দোলন। উদ্দীপকের আন্দোলনটি এ আন্দোলনেরই নামান্তর।

উদ্দীপকের ফজর আলী ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ ও হজব্রত পালনের পর দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি কুসংস্কারে লিপ্ত মুসলমানদের ফরজ পালনের ওপর জোর দেন। এছাড়া তিনি একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনও পরিচালনা করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিক্ষক বাশারত আলীর সাথে মক্কায় হজ করতে যান। সেখানে তিনি বিশ বছর অবস্থান করে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা পীরপূজা, কবর পূজা, মানত, ওরশ ইত্যাদি কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের এসব রীতি পরিহারের উপদেশ দেন এবং তাদেরকে ইসলামের পাঁচটি ফরজ কাজ পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। তার এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ করার জন্য তিনি ফরায়েজি আন্দোলন নামে একটি সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। সুতরাং বোঝা যায়, উদ্দীপকের আন্দোলনটি ফরায়েজি আন্দোলনকেই ধারণ করছে।

Teachingbd24.com

ঘ তৎকালীন সমাজে উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

ফরায়েজি আন্দোলন তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। তারা নিজেদেরকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করে। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশুদ্ধির আহ্বানে তাদের জীবনে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়।

হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়া পিতার অসমাপ্ত কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুদু মিয়ার অপরিসীম সাংগঠনিক ক্ষমতা ও কর্মতৎপরতায় ফরায়েজি আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। তিনি নিজের সমর্থকদের নিয়ে ১৮৪৬ সালে পঞ্চচরের সুরক্ষিত নীলকুঠির ওপর দুঃসাহসিক আক্রমণ পরিচালনা করেন। ফলে অত্যাচারী নীলকর ও জমিদারদের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে। তবে দুদু মিয়া এসব তোয়াক্কা করেননি। বরং আমৃত্যু তিনি এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন।

মূলত, হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলন ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলন বাংলার মুসলমানগণের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। পরবর্তীকালে অনেক নেতা তার আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ আন্দোলন বাংলার মুসলমানদেরকে সুসংগঠিত করতে সক্ষম হয়। তারা নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এই সচেতনতা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭

[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রথমবার পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয় কখন? ১

খ. আগরতলা মামলার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলি কোন নেতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলির মাধ্যমে কি উক্ত নেতার সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়? মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথমবার পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর।

খ পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এ কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। মামলায় ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মওলানা ভাসানী সরকারি এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল বন্দির মুক্তির দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

গ ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি পাকিস্তান অন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। বাঙালি জাতির মুক্তির পেছনে তার অসাধারণ অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালি জাতির পিতা বলা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা। পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা, স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব পেশ করেন। এই ছয় দফার মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়নি। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে পাকিস্তানি শাসকদের আলোচনা বিফলে গেলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে অপারেশন সার্চ লাইট নামে গণহত্যা শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীও হন। তাই বলা যায় যে, ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলির সাথে বাংলাদেশের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

ঘ না, শুধু ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলির মাধ্যমে উক্ত নেতার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাই ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। পাকিস্তান ভারত পৃথক হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমেই পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কারাবন্দিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে

Teachingbd24.com

শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে ১৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন এবং সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। ১৯৬১ সালে তিনি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলাদেশের বাঙালি জাতির জনক প্রভৃতি বিষয়গুলোর মাধ্যমেই তার সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। উল্লিখিত ঘটনাবলিও তার রাজনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ তাপস সোম একজন রাজনীতিবিদ। তিনি সংকীর্ণতা ও গোড়ামির উর্ধ্বে মানবপ্রেমে বিশ্বাস করেন। মানুষের সেবাই তাঁর রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। আর তাই তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের উন্নয়নে কাজ করেন। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. তিতুমীরের পূর্ণ নাম কী? ১

খ. বেঙ্গল প্যাক্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের তাপস সোমের সাথে তোমার পঠিত কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অবদানের কারণে বাংলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত শক্তিশালী হয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের পূর্ণ নাম হলো সৈয়দ মীর নিসার আলী।

খ বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাক্ট।

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার ৬০ ভাগ জনগণ মুসলমান হলেও তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতার অধিকারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঙ্গল প্যাক্ট এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, স্যার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়। অচিরেই এ চুক্তি সি আর দাশ ফর্মুলা নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজনীতি, ধর্ম, কর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো বেঙ্গল প্যাক্টের মূলকথা। দেশবন্ধুর এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

গ হ্যাঁ, তাপস সোমের সাথে আমার পঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাদৃশ্য রয়েছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তিনি তাঁর অপূর্ব ত্যাগ, অসীম দেশপ্রেম ও অসাধারণ গুণাবলির মাধ্যমে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এই মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের তাপস সোমের মধ্যে।

রাজনীতিবিদ তাপস সোম সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির উর্ধ্বে মানবপ্রেমে বিশ্বাস করেন। মানুষের সেবা করাই তার রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। আর তাই তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ উন্নয়নে কাজ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়। মানুষের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। ধর্ম-বর্ণের সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িক বিবাদকে তিনি পছন্দ করতেন না। তার রাজনীতির মূল ভাবনাই ছিল মানুষের সেবা। এ জন্য তিনি স্বদেশি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা বিনা পয়সায় লড়তেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ১৯২৩ সালে সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাক্ট এ প্রচেষ্টার উদাহরণ। এছাড়া সাধারণ মানুষকে তিনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। তিনি মানুষের জন্য নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের বাড়িটিও সমাজসেবার জন্য দান করে যান। এসব কারণে বাংলার জনগণ তাকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাই বলা যায়, তাপস সোম রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ একটি চরিত্র।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অবদানের কারণে বাংলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত শক্তিশালী হয়- আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

বাংলার অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার বিভেদ বা অনৈক্য। আর এ সমস্যার মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। তিনি বিশ্বাস করতেন এদেশের মুক্তির জন্য দরকার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা চালান।

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৩ সালে বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে সাম্প্রদায়িকতা রোধে ব্রতী হন। তার এ ঐক্যের আহ্বান বাঙালিকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলে। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে স্বরাজ পার্টির সাথে সংযুক্ত করেন। তিনি বাংলা প্রদেশের মুসলমানদের সাথে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে এক ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে হিন্দু-মুসলিম সবার অধিকার প্রতিষ্ঠার শর্ত ছিল। এই চুক্তিটি দুই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এ বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমেই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিক হারে সুযোগদানের নীতি গ্রহণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মুখ্য প্রতিনিধিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তার বিভিন্ন প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে এ দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত শক্তিশালী হয়।

প্রশ্ন ▶ ৯ জনাব রহমত আলী হজব্রত পালন শেষে দেশে ফিরে এসে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কৃষকদেরকে জমিদার ও মহাজনদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলেন। সরকার তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তাকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। *[চা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব রহমত আলীর কার্যক্রমের সাথে উপমহাদেশের কোন সংস্কারকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত সংস্কারকের আত্মত্যাগ বাঙালিদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে'— যুক্তিসহ লেখ। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ।

খ ষাটের দশকে আইয়ুব শাসনবিরোধী আন্দোলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন এক জ্বালাময়ী কণ্ঠ। তিনি সর্বদাই সাম্যের কথা বলেছেন। কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় মাওলানা ভাসানী এক বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তার সুযোগ্য নেতৃত্বের কথা সর্বজনবিদিত। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু

https://teachingbd24.com

করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র ধারা তথা জনগণভিত্তিক রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থ নিয়ে তিনি আজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন। এ কারণে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রহমত আলীর কার্যক্রমের সাথে উপমহাদেশের অন্যতম সংস্কারক শহিদ তিতুমীরের সাদৃশ্য রয়েছে।

বীর যোদ্ধা, বিপ্লবী নেতা ও সফল সংগঠক সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর ১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৪ সালে তিতুমীর মক্কা থেকে ফিরে এসে নীলকর ইংরেজ বণিক এবং এদেশের সামন্ত জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা দেখে খুবই ব্যথিত হন এবং কৃষক ও গরিব-দুঃখী মানুষকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। মূলত তার আন্দোলন গড়ে ওঠে কৃষকদেরকে সাথে নিয়ে। দলে দলে হাজার হাজার কৃষক তার আন্দোলনে যোগ দেয়। কৃষকদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ শুরু করেন। এটি ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৮৩১ সালে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হন। এ উদ্দেশ্যে নারিকেল বাড়িয়ায় তার বিখ্যাত বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে কর্নেল স্টুয়ার্টের আধুনিক সমরাস্ত্রের মুখে টিকে থাকতে ব্যর্থ হন এবং এক পর্যায়ে যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেন।

উদ্দীপকের জনাব রহমত আলী হজব্রত পালন শেষে দেশে ফিরে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কৃষকদেরকে জমিদার ও মহাজনদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলেন। সরকার তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তাকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। তার এসব কর্মকান্ডের সাথে শহিদ তিতুমীরের সংস্কার ও সংগ্রামের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ঘ শহিদ তিতুমীর এমন একজন সংস্কারক যিনি অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যার আত্মত্যাগ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শহিদ তিতুমীরের আত্মত্যাগ এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সমাজের শোষিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করাই ছিল তিতুমীরের উদ্দেশ্য।

শহিদ তিতুমীর অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। মূলত তার আন্দোলন গড়ে ওঠে কৃষকদেরকে সাথে নিয়ে। দলে দলে হাজার হাজার কৃষক তার আন্দোলনে যোগ দেয়। কৃষকদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বারাসাত বিদ্রোহ শুরু করেন। ১৮৩১ সালে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং একপর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন।

যেকোনো নিপীড়নমূলক শাসনের বিরুদ্ধে তিতুমীর বাঙালিকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি ছিলেন বাঙালির সাহসের উৎস। তার আত্মত্যাগের আদর্শ মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা জোগায়, যার ফলে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶১০ পল্লি এলাকার মানুষের জনপ্রিয় নেতা কলিমুল্লাহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে তিনি সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাছাড়া ভূস্বামীদের কবল থেকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য অপর একটি আইন তিনি প্রণয়ন করেন। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বঙ্গভঙ্গপূর্ব অবিভক্ত প্রদেশটির নাম কী ছিল? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের যে নেতার অবদান প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নেতার সকল অবদান উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গপূর্ব অবিভক্ত প্রদেশটির নাম ছিল বাংলা।

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃত্বকে বুঝায়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত এবং অর্থ এ ত্রিবিধ বিষয়ের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিচার, পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ের কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এভাবেই ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। মূলত এটিই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

গ উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অবদান প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পল্লি এলাকার মানুষের জনপ্রিয় নেতা কলিমুল্লাহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে তিনি সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাছাড়া ভূস্বামীদের কবল থেকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য অপর একটি আইন তিনি প্রণয়ন করেন। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষককুলের ভাগ্যাকাশে তিনি ছিলেন এক উজ্জল নক্ষত্র যা বাংলার কৃষকদের মুক্তির পথের সন্ধান দেয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদখোর মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। আর তাই বাঙালি জনগণের হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

ঘ উক্ত নেতা তথা এ কে ফজলুল হকের সকল অবদান উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি, আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

উদ্দীপকের বর্ণনায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে অবদানের কথা বলা হয়েছে। তিনি কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও আরো নানা দিকে অবদান রেখেছেন। যেমন- ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এ সম্মেলনে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষা ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে জড়িত ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

এ কে ফজলুল হক সবসময় বাঙালির দাবি-দাওয়া আদায়ে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ফজলুল হকের অবদান খুবই তাৎপর্যমন্ডিত। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তাইতো ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলিমদের স্বার্থে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে

https://teachingbd24.com

বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।
উপরের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'X' নামক একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনাব কাশেম উপলব্ধি করেন যে, তার রাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত হবে। এজন্য তিনি শাসকগোষ্ঠীর সাথে বিরোধে না গিয়ে স্বজাতিকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি জনগণকে সংগঠিত করতে একটি রাজনৈতিক দল গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে জনাব কাশেমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনাব চৌধুরী ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন। তিনি সাধারণ জনগণকে সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং নির্দিষ্ট একটি এলাকাকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর প্রবল আক্রমণে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। *[চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে? ১
খ. বঙ্গভঙ্গের যেকোনো একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের জনাব কাশেমের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন ব্যক্তিত্বের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনাব চৌধুরী ব্যর্থ হলেও তিনি মুক্তিকামী জনগণের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন'— তোমার পঠিত বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৮ সালের আইনের (India Act) মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের শাসন শুরু হয়।

খ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে, এর অন্যতম হলো 'প্রশাসনিক' কারণ।

বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮৫ লাখ (১৯০৩)। এত বড় প্রদেশ কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। এছাড়া প্রদেশে প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রদেশকে ভাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এজন্য ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন।

গ উদ্দীপকের জনাব কাশেমের সাথে আমার পঠিত বইয়ের সমাজ সংস্কারক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নবাব স্যার সলিমুল্লাহর মিল রয়েছে।
উদ্দীপকের জনাব কাশেমের মতো স্যার নবাব সলিমুল্লাহও বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত হবে। এজন্য তিনি তাদের সাথে বিরোধে না গিয়ে মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার পাশাপাশি মিটফোর্ড হাসপাতাল, সলিমুল্লাহ এতিমখানা তৈরিসহ নানা কাজে তার অবদান ছিল। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অন্যতম রাজনৈতিক অবদান হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া। বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তার অবদান মুখ্য ছিল। এছাড়া মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন। তবে স্যার সলিমুল্লাহর সবচেয়ে মূল্যবান অবদান হচ্ছে, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব কাশেমের সাথে নবাব স্যার সলিমুল্লার মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব চৌধুরীর সাথে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ তিতুমীরের মিল রয়েছে। নির্যাতিত মানুষের মুক্তি এবং স্বাধীনতার জন্য তার সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তিনি মুক্তিকামী জনগণের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।
উদ্দীপকের জনাব চৌধুরী ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন এবং জনগণকে সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। শাসক গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ হলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর এই আন্দোলনের সাথে শহিদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নির্মাণ, ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের মিল রয়েছে। নারকেলবাড়িয়ার যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ, যা মুক্তিকামী জনগণকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দেবে।
ইংরেজদের গোলাবারুদ এবং নীলকর ও জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিল সাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে। বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিতুমীর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে পুরোপুরি সফল না হলেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার যে শিক্ষা বাঙালি তার কাছ থেকে পেয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি বিভিন্ন সময় বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব চৌধুরীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র শহিদ তিতুমীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ব্যর্থ হলেও মুক্তিকামী মানুষের জন্য চিরদিন তিনি প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব 'Ṙ' একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি লন্ডনের গ্রে'স ইন থেকে বার এট'ল সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি সদা সচেষ্ট। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি ছিলেন আপসহীন। তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়। তিনি উপমহাদেশের বিরোধী দলের স্রষ্টা। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। *[চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪; স্কলারসহোম, সিলেট। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বেঙ্গল প্যাক্ট কী? ১
খ. লাহোর প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন রাজনীতিবিদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদের অবদান তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' হলো হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি তৈরির জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি।

খ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সংবলিত যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তাই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।
লাহোর প্রস্তাবে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক 'একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র' গঠনের কথা বলেন। উক্ত প্রস্তাবের মাধ্যমেই তিনি সেদিন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধিকার অর্জনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

গ উদ্দীপকে অবিসংবাদিত রাজনীতিবিদ গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। তিনি লন্ডনের গ্রেইজ ইন থেকে বার এট'ল সম্পন্ন করেন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরেই তিনি রাজনীতিতে

Teachingbd24.com

যোগদান করেন। তিনি সবসময় গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তার রাজনৈতিক ভাবশিষ্য। সাধারণ মানুষের কল্যাণে সদা সচেষ্ট ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্যসমূহ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদ জনাব 'ক'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উপমহাদেশের অন্যতম প্রতিভাবান রাজনৈতিক সংগঠক হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদ হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৭) হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তার অনেক অবদান রয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী একজন শ্রমিক নেতা হিসেবে কলকাতায় রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে নাবিক, রেল কর্মচারী, পাটকল ও সুতাকল কর্মচারী, রিকশা ও গাড়িচালকসহ বিভিন্ন পেশার মেহনতি মানুষের জন্য প্রায় ৩৬ টি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। তিনি ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ চুক্তিটি ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দূর করার জন্য সম্পাদিত হয়েছিল।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ১৯৩৭-৪৩ সালে দলকে সুসংগঠিত করতে অসাধারণ অবদান রাখেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পাকিস্তানের প্রথম ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার আইনমন্ত্রী থাকা অবস্থায়ই পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় (পাকিস্তান সৃষ্টির ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে)। তার প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলার মানুষের মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক অবদান অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণাদায়ক আদর্শ রেখে গেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব আবুল হোসেন ব্যথিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিঋণ আইন, মহাজনি ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২; অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৪]

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? ১

খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আবুল হোসেনের সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঐ সকল কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মজলুম জননেতা ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি (বর্তমানে 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ') মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

খ ব্রিটিশ শাসনামলের শুরুর দিকে বাংলার শাসনভার সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করাই হলো দ্বৈত শাসন।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) পর লর্ড ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। দ্বৈত শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নামেমাত্র নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি ও জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার ইত্যাদি লাভজনক কাজ কোম্পানি নিজের হাতে রাখে। বলা হয়, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আবুল হোসেনের সাথে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কৃষকদের ওপর জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব আবুল হোসেন ব্যথিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিঋণ আইন, মহাজনী ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষকদের জন্য তিনি ছিলেন এক উজ্জল নক্ষত্র যা তাদের মুক্তির পথের সন্ধান দেয়। এজন্য বলা হয়, দক্ষিণাঞ্চলের মেধাবী যুবক তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদখোর মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। তাই বাঙালির হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

উদ্দীপকের বর্ণনায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে অবদানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরো নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। যেমন- ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এ সম্মেলনে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অবদান রেখেছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত ফজলুল হক একজন খাঁটি বাঙালি নেতা ছিলেন। তিনি সবসময় বাঙালির দাবি-দাওয়া আদায় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তাইতো ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলিমদের স্বার্থে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সকল কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ একদিন সাইফুল সাহেব তার মেয়েকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু দেখতে যান। তার মেয়ে বললো, এই বঙ্গবন্ধু সেতুর জন্যই সিরাজগঞ্জ বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, না, এই অঞ্চল এমন এক নেতার জন্মস্থান, যিনি ব্রিটিশ ভারতের কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বহু আন্দোলন করেছেন। শুধুমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।

[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩]

Teachingbd24.com

ক. দেশবন্ধু উপাধি দেয়া হয় কাকে? ১
খ. 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কৃষকদের কল্যাণে তার অবদান আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক অবদান আলোচনা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশবন্ধু উপাধি দেয়া হয় চিত্তরঞ্জন দাশকে।

খ ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি ছিল 'ভাগ কর, শাসন কর নীতি'।
ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে, ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত এবং টেকসই করার লক্ষ্যে তারা এই কৌশল অবলম্বন করত।

গ সৃজনশীল ২নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আসলাম সাহেব হজব্রত পালন শেষে দেশে ফিরে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কৃষকদেরকে জমিদার ও মহাজনদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলেন। সরকার তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তাকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আসলাম সাহেবের কার্যক্রমের সাথে উপমহাদেশের কোন সংস্কারকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্কারকের আত্মত্যাগ বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে— যুক্তিসহ লেখ। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃত্বকে বোঝায়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ এ বিষয়গুলোর কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিচার, পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ের কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এভাবেই ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। মূলত এটিই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

গ সৃজনশীল ৯নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আহসান সাহেব টেলিভিশনে একটি প্রামাণ্য চিত্রে দেখতে পেলেন 'ক' রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন সরকারের অন্যায় অবিচার, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একজন নেতা কীভাবে তার দেশের জনগণকে সংগঠিত করতে গিয়ে বার বার নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন, কারাবরণ করছেন। এই সংগ্রামী, নির্ভীক ও আপসহীন নেতা জনগণকে তাঁর ভাষণের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে 'খ' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিলো। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? ১
খ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট কেন গঠিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্ভীক, আপসহীন সংগ্রামী নেতার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নেতার সাদৃশ্য খুঁজে পাও? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উক্ত রাজনৈতিক নেতার প্রদত্ত ভাষণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন।

খ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়।
যুক্তফ্রন্ট বলতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে। চারটি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠন করা এই জোটটিই 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিতি। এর শরিক দলগুলো হলো— ১ আওয়ামী মুসলিম লীগ; ২. নেজাম-ই-ইসলাম; ৩. কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও ৪. গণতন্ত্রী দল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নির্ভীক, আপোসহীন ও সংগ্রামী নেতার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান অন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা তথা স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব পেশ করেন। এই ছয় দফার মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়নি। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনৈতিক নেতার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।
উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে। এ ভাষণ বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা-ই 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ' নামে পরিচিত। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরেন। এ ভাষণ বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।
বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর এক স্মরণীয় দলিল। এর ভাষা, বাক্য ও শব্দচয়ন একাধারে রাজনীতিবিদ, ভাষাবিদ, কূটনীতিবিদসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে

Teachingbd24.com

অভিভূত করেছে। ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এর ফলে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালি যোদ্ধায় পরিণত হয় এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে জয়ী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বঙ্গবন্ধু সেতুর সংলগ্নই সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জের জন্ম গ্রহণ করেছেন এক মহান ব্যক্তি। যিনি ব্রিটিশ ভারতে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বহু আন্দোলন করেছেন। মজলুম এই নেতার ঋণ জাতি চিরদিন স্মরণ করবে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ কত সালে জারি করা হয়? ১

খ. 'ভাগ কর শাসন নীতি' বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত নেতা কৃষকদের কল্যাণে যে অবদান রেখেছেন তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতার রাজনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

খ ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি ছিল 'ভাগ কর, শাসন কর নীতি'।

ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে, ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত এবং টেকসই করার লক্ষ্যে তারা এই কৌশল অবলম্বন করত।

গ কৃষকদের স্বার্থ ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতা তথা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অবদান অপরিসীম।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) নামটি কৃষক ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে কৃষকের সন্তান হওয়ায় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন। সজাত কারণেই তার সংগ্রাম দরিদ্র, অবহেলিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের স্বার্থে পরিচালিত হয়। তাই সত্যিকার অর্থে তাকে জনদরদি নেতা বলা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত মজলুম নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের বন্ধু। তিনি মনেপ্রাণে সামন্তবাদ বিরোধী। জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে তার সর্বাত্মক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। তিনি কৃষকদের ঐকবদ্ধ হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দেন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রথম কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। জমিদার, জোতদাররা ভাসানীকে নিজ নিজ এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেও তার সংগ্রামে ভাটা পড়েনি। ১৯৩৭ সালে আসাম সরকার কর্তৃক জারিকৃত 'লাইন প্রথা' কে তিনি 'কুখ্যাত আইন' হিসেবে অভিহিত করেন এবং তা রহিতকরণের জন্য এক আপোসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কৃষকদের স্বার্থ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কোনো বিকল্প নেই মনে করে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী থেকে শুরু করে সকল অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কৃষক শ্রমিকদের মুক্তি ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় ভাসানী এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

ঘ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মওলানা ভাসানী এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

১৯১৬-১৭ সাল থেকে ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯১৯ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রথম 'কৃষক প্রজা আন্দোলনের' সূত্রপাত ঘটান। আসামে 'লাইন প্রথা' চালু হলে তিনি এই নিপীড়নমূলক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৪ সালে তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ববাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

ইংরেজদের শাসনকালে তিনি যেমন ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, পাকিস্তানি শাসনামলেও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এবং ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৭ সালের তিনি 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠন করেন। এছাড়াও ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে, ১৯৭০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টনের জনসভায় এবং ১৯৭৬ সালের ১৬মে ঢাকা-রাজশাহী লংমার্চে অংশগ্রহণ করেন।

উপরের আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখত নেতা অর্থাৎ মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]

ক. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কাকে? ১

খ. 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' সম্পর্কে কী জান? বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান আলোচিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ব্যক্তিত্ব কি শিক্ষাক্ষেত্রেই অবদান রেখেছিলেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক নওয়াব আব্দুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়।

খ 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' হলো ভূমি নিয়ন্ত্রণে প্রজা ও জমিদারদের পারস্পরিক দায় ও অধিকার সংক্রান্ত আইন।

১৮৮৫ সালে ব্রিটিশরা ভূমি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" প্রণয়ন করে। তবে এ আইনে সাধারণ কৃষক ও বর্গাচাষিদের অধিকার রক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে নানা ঘটনা ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৮ এবং ১৯৩৮ সালে এ আইনে সংশোধনী আনা হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের সংশোধনীটি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় হয়েছিল। এ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি উক্ত আইনের দূর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করে সাধারণ কৃষক এবং বর্গাচাষিদের স্বার্থ রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

https://teachingbd24.com

গ পূর্ব-বাংলার জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত না হলে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ নিজ উদ্যোগে পুরোনো ঢাকায় আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি হল নির্মাণ করা হয়। নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই এই ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন।

উদ্দীপকের জনাব কাশেমের মতো স্যার সলিমুল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত হবে। এজন্য তিনি ব্রিটিশদের সাথে বিরোধে না গিয়ে মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্তারে মনোযাগী হন। আহসানউল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, সলিমুল্লাহ এতিমখানা প্রতিষ্ঠাসহ নানা কাজে তার অবদান ছিল। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র অন্যতম রাজনৈতিক অবদান হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া। বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তার অবদানই ছিল মুখ্য। তিনি জানতেন যে, বঙ্গভঙ্গ হলে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করবে। এজন্য বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার দিনই মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মধ্যেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির বীজ লুকায়িত ছিল। স্যার সলিমুল্লাহর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান হচ্ছে, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। যা উদ্দীপকের জনাব কাশেমের রাজনৈতিক দল গঠন ভূমিকার সাথে সাদৃশ্যর্পূণ।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, নবাব সলিমুল্লাহ শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৯ কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো যাকে দেখে বলেছিলেন, "আমি আপনাকে দেখেছি আমার আর হিমালয় পর্বত দেখার দরকার নেই।" যার ডাকে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। তিনি আমৃত্যু দেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন নেতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত নেতার ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মজলুম জননেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি।

খ ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তারা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচারের চিত্র দেখে জনাব মকবুল হোসেন ব্যথিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিঋণ আইন, মহাজনি আইন ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. তিতুমীরের পূর্ণ নাম কী? ১

খ. বেঙ্গল প্যাক্ট বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত জনাব মকবুল হোসেনের সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. ঐ সকল কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীর এর পূর্ণ নাম মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

খ বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাক্ট।

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার ৬০ ভাগ জনগণ মুসলমান হলেও তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতার অধিকারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঙ্গল প্যাক্ট এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, স্যার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়। অচিরেই এ চুক্তি সিআর দাশ ফর্মুলা নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজনীতি, ধর্ম, কর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো বেঙ্গল প্যাক্টের মূল উদ্দেশ্য।

গ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ মিঃ 'ক' ব্রিটিশ আমল থেকে রাজনীতি করেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, সবার আগে কৃষকদের দুঃখ-দুদর্শা লাঘব করতে হবে। তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক এবং খাঁটি বাঙালি। তাঁর চেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ২

গ. উদ্দীপকে মিঃ 'ক'-এর সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে কার (কোন ব্যক্তিত্বের) সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মিঃ 'ক'-এর মত তোমার পাঠ্যপুস্তকে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান আলোচনা কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহীদ তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী।

https://teachingbd24.com

খ ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তারা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ জনাব 'ক'-এর কাজের সাথে ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিবিদ, তদানীন্তন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাঙালির প্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'ক' একজন বাঙালি। তিনি ব্রিটিশ আমল থেকে রাজনীতি করেন। তার বিশ্বাস ছিল সবার আগে কৃষকের মনে প্রাণে শান্তি এবং তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। কেননা, কৃষকের উন্নতিই দেশের উন্নতি।

উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর মতোই বাংলার কৃষক, সাধারণ জনগণ, নিপীড়িত জনমানুষের কথা ভাবতেন এ. কে. ফজলুল হক। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, হিন্দু মুসলিম স্বার্থ সমন্বয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও লাহোর প্রস্তাব প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি কৃষকদের কল্যাণ সাধনে কৃষি ঋণ আইন প্রণয়ন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন, নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। তিনি ডাল-ভাত রাজনীতির প্রবক্তা ছিলেন। মূলত শেরে বাংলা তাঁর কার্যক্রম দ্বারা বাঙালির হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

ঘ মি. 'ক'-এর ন্যায় আমার পাঠ্যপুস্তকের ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তার প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষায় উন্নতি করতে না পারলে বাংলার মুসলমানদের কোনো উন্নতি হবে না। সে লক্ষ্যে তিনি ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের ডাক দেন। এই শিক্ষা সম্মেলনে তিনি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। ১৯১৩ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। শেরে বাংলার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কলকাতার টেইলর হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও বেকার হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠায় শেরে বাংলার অবদান অবিস্মরণীয়। ইসলামিয়া কলেজ ও মুসলিম শিক্ষা তহবিল গঠনে তার অবদান অনেক। এছাড়া মহিলাদের লেডি ব্রাবোর্ন ও ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সর্বত্র জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

উপরে প্রদত্ত তথ্যে সুস্পষ্ট যে, বাংলার মুসলমান তথা আপামর জনসাধারণের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶২২ পল্লী এলাকার মানুষের জনপ্রিয় নেতা কলিমুল্লাহ নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে তিনি সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাছাড়া ভূ-স্বামীদের কবল থেকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি অপর একটি আইন প্রণয়ন করেন এবং একটি সংগঠনও গড়ে তোলেন।

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. কোরাম কাকে বলে? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের যে নেতার অবদান প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে উক্ত নেতার অবদান উল্লেখ কর। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

খ ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বিচার বিভাগের ওপর আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকলে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও সর্বোপরি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গ উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের যে নেতার অবদান প্রতিফলিত হয়েছে তিনি হলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

ফজলুল হক ছিলেন একজন সত্যিকার মানবদরদি। তিনি বাংলার অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কৃষক সমিতি গঠন করে গরিব কৃষকদের জাগ্রত করেন। কৃষক ও প্রজাদের ঋণের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৭ সালে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার লক্ষ্যে তার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভায় ১৯৩৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। উদ্দীপকেও শেরে বাংলার এ সকল কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পল্লি এলাকার মানুষের জনপ্রিয় নেতা কলিমুল্লাহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির উপায় খুঁজেন। তিনি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। ভূ-স্বামীদের কবল থেকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য আইন পাস এবং একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। উদ্দীপকের নেতার এ সকল কাজ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। কারণ তিনিও কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। তিনি প্রজাস্বত্ব আইন পাস এবং কৃষক সমিতি গঠন করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অবদান প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে উক্ত নেতার অর্থাৎ শেরে বাংলার অবদান চির স্মরণীয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষকদের তিনি মুক্তির পথের সন্ধান দেন।

ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদখোর মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিঋণ আইন, মহাজনী ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। শেরে বাংলার এ সব অবদানের ফলে বাংলার কৃষি তথা কৃষকদের ভাগ্যের অনেক উন্নতি হয়। আর তাই বাঙালির হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলার কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে এ. কে. ফজলুল হক অনেক অবদান রেখেছেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৩ আব্দুর রহমান একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করে দেশে ফিরে আসেন। এসে তিনি দেখলেন তার এলাকার লোকজন পীরপূজা, কবর পূজা ইত্যাদি কুসংস্কারে লিপ্ত। তিনি এইসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেন এবং ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো করার পরামর্শ দেন। তার এ কার্যক্রম পরবর্তীতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী? ১

খ. তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে লেখ। ২

গ. জনাব আব্দুর রহমানের কার্যক্রমের সাথে তোমার পঠিত কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে; তার সম্পর্কে লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কর। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হলো— সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

খ তমদ্দুন মজলিস হলো ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের অধ্যাপকদ্বয় যথাক্রমে আবুল কাশেম ও নুরুল হক ভূঁইয়া বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষকে সাংগঠনিক রূপদানের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' গঠন করেন।

গ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী? ১

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে উক্ত ব্যক্তির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের প্রকৃত নাম হলো মীর নিসার আলী।

খ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার নির্ণায়ক ও আদর্শাশ্রয়ী একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ দ্বি-জাতি তত্ত্বের উন্মেষ ঘটান। তার মতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। তার এ মতবাদটিই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক নেতা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এদেশের মানুষ চরমভাবে তাদের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের অধিকার আদায়ের দাবিতে ১৯৫১ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব দেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

উদ্দীপকে এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, যিনি নবগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন, ভাষা আন্দোলনের সময় কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন এবং ৬ দফা দাবির উত্থাপক ছিলেন। সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, তিনি নিঃসন্দেহে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত নেতা অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনন্য ভূমিকা পালন করেন। মূলত তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান শত্রুতে পরিণত হন এবং জেলে আটকে থাকেন। তিনি বাঙালি জাতিকে ভালোবাসতেন বলে সকল বাধা, জুলুম, নির্যাতন সহ্য করেও লক্ষ্যে অবিচল থেকে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণের পেছনে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত ছয় দফা দাবিতে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং বাঙালি জাতি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। যার ফলাফল দেখা যায় ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্যে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করলেও বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় যেতে পারেননি। এরপর পাক-সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং সেখানে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর এ ডাক বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে পাক-হানাদারদের নিকট বন্দি হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৫ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

Teachingbd24.com

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী? ১
খ. নওয়াব আবদুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কেন? ২
গ. উল্লিখিত ছকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী।

খ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান ছিল বলেই তাকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নবাব আব্দুল লতিফ বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত বাংলার মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। এ কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

গ উল্লিখিত ছকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দলের যুগ্মসচিব নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তিনি ১৯৫২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন কার্যকর ছিল। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা উল্লিখিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই দাবিকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' শিরোনামে প্রচার করেছিলেন।

উল্লিখিত ছকে তথ্যগুলো হলো— নবগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রথম যুগ্মসম্পাদক, ভাষা আন্দোলন চলাকালে কারাগারে বন্দি এবং ছয়দফার উত্থাপক। এ তথ্যগুলো বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে বঙ্গবন্ধুকে এর যুগ্ম সম্পাদক করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলখানায় বন্দি ছিলেন। ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীন অর্জনে উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

মূলত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান শত্রুতে পরিণত হন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণের পেছনে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত ছয় দফা দাবিতে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং বাঙালি নিজেদের অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। যার ফলাফল দেখা যায় ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্যে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করলেও বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় যেতে পারেননি। এর পর পাক-সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে পাক-হানাদারদের নিকট বন্দি হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে বাবা মাকে হারান। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, দরিদ্র কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি আজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তাকে মজলুম জননেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবনের বিবরণ দাও। ২
গ. জনাব 'ক' এর সাথে তোমার পাঠ্য পুস্তকের কোন নেতার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কৃষকদের স্বার্থ আদায় ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতার ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান এবং মায়ের নাম সায়রা বেগম। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। বাবা, মা আদর করে তাকে খোকা বলে ডাকতেন। তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

গ জনাব 'ক' এর সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মিল আছে।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অবহেলিত মানুষের জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন। অত্যাচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ছিল তার পথ চলা। এই অসাধারণ নেতার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে জনাব 'ক' এর মধ্য দিয়ে।

জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারান। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এই মানুষটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং দরিদ্রের স্বার্থ সংরক্ষণে আন্দোলন করেছেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনিও দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়ে বাল্যকালে পিতা এবং কৈশোরে মাতাকে হারান। এরপর চাচার আশ্রয়ে কিছুদিন থেকে পরবর্তীতে ভবঘুরের মতো জীবনযাপন করেন। এ সময় ভাসানী অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। দুবেলা খাবার জোগাড়ের জন্য তিনি দিনমজুর ও কুলির কাজ করেছেন। তিনি কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন বদ্ধপরিকর। এ সংগ্রামে তিনি বার বার অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও উৎপীড়িত হয়েছেন। জনদরদি এই নেতা শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। এ কারণে তাকে মজলুম জননেতা বলে অভিহিত করা হয়। মওলানা ভাসানী ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের

https://teachingbd24.com

বিরুদ্ধে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ইত্যাদি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যায়, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীরই প্রতিফলন ঘটেছে জনাব 'ক' এর মধ্যে।

ঘ কৃষকদের স্বার্থ আদায় ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতা অর্থাৎ মওলানা ভাসানী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

মওলানা ভাসানী বাস্তব জীবনে দেখেছেন তৎকালীন জমিদার প্রথা ও বাঙালির ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াল চিত্র। তিনি নিজেও এসব নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ কারণেই তার কণ্ঠ জনগণের অধিকার আদায় এবং দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মওলানা ভাসানী রাজশাহীর ধুপঘাটের জমিদার, টাঙ্গাইলের সন্তোষের জমিদার, গৌরীপুরের মহারাজা এবং পাবনার সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন। তিনি নিরন্ন, অবহেলিত, অশিক্ষিত, অসহায় কৃষকদের অধিকার সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে কৃষক সম্মেলন করেন। ১৯৩৭ সালে আসামে 'লাইন প্রথা' নামে একটি নিপীড়নমূলক প্রথা চালু হয়। ভাসানী এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। অবশেষে ১৯৪৫ সালে এই প্রথা বাতিল হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে আসাম জুড়ে বাঙালির বিরুদ্ধে 'বাঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ সময় ভাসানী বাঙালিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। এছাড়া তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালায়। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক শাসন, মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়, স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভাসানী ছিলেন আপসহীন ও নিবেদিতপ্রাণ।

পরিশেষে বলা যায়, মওলানা ভাসানী ছিলেন কৃষক, শ্রমিক তথা সমগ্র জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। কৃষকদের স্বার্থে ও জনঅধিকার রক্ষায় তার আপসহীন ভূমিকা চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব আবুল হোসেন ব্যথিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষি ঋণ আইন, মহাজনী ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. কোন কর্মসূচীকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ১

খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আবুল হোসেনের সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐ সব কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরও অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ দফা কর্মসূচীকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রের অন্যতম সেবক। রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারা রচনা করার মানসে তিনি পাকিস্তানে প্রথম শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের সূতিকাগার। তিনি জনগণের স্বাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সব সময় ভাবতেন শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপোষহীন নেতা ছিলেন বলেই তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টন ময়দানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "আজ থেকে কলকারখানা অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে। রেলগাড়ির চাকা বন্ধ থাকবে, খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া চলবে না।" এই ধারাবাহিকতায় তিনি ৭ই মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. কত সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়? ১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে প্রথম অংশে বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রথম ও শেষ অংশে বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত? ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়।

খ ১৯৭০ সালে নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। তবে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮৩টি আসন লাভ করে পিপল্‌স পার্টি। তবে এ দল পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন লাভ করেনি। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। বাকি ১২টি আসনের ৯টিতে স্বতন্ত্র, ২টিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং একটিতে জামায়াতে-ই-ইসলামী জয় লাভ করে।

গ উদ্দীপকের প্রথম অংশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার টালবাহানা শুরু করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করে ৩ মার্চ, ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান হঠাৎ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় প্রবাহিত হয়। ঢাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল, পথসভা ও জনসভা করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র-জনতার সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

পরিশেষে বলা যায়, ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রদেশের সকল প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, কলকারখানা সবই বন্ধ হয়ে যায়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষণের প্রথম অংশ ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে অসহযোগ আন্দোলন এবং শেষ অংশে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে প্রচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা করেন।

উদ্দীপকে দুটি ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ৩ মার্চ এবং ৭ মার্চ পৃথক দুটি ভাষণ প্রদান করেন। প্রথম ও শেষ অংশে বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা দুটি পরস্পরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ক্ষমতাসীন সরকার টালবাহানা শুরু করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন ৩ মার্চ, ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ভূট্টো অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে ঢাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল, পথসভা ও জনসভা করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সরকারের বিক্ষুব্ধপূর্ণ অসহযোগের আহ্বান জানান। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সবই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রমনার রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন, এবারের সংগাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ ভাষণের মাধ্যমে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরিশেষে বলা যায়, বর্ণিত ভাষণ দুটি দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তাই ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ এবং ৭ মার্চের ভাষণ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২৯ মনির ছোটবেলা থেকেই সমাজজীবনের সকল শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। এজন্য তিনি শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে ১৮৩১ সালে বাঁশ ও মাটি দিয়ে একটি দূর্গ তৈরি করেন। ফলশ্রুতিতে শাসক দল তাকে দমনের জন্য সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে এক রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মনির শহিদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. হাজী শরীয়তউল্লাহর পুত্রের নাম কী? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২

গ. উদ্দীপকে মনির চরিত্রটির মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের কোন সংগ্রামী ব্যক্তির সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত ব্যক্তির নির্মিত দুর্গ ছিল অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিবাদ"— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজী শরীয়তউল্লাহর পুত্রের নাম দুদু মিয়া।

খ বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ফরায়েজি আন্দোলন ছিল অন্যান্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে পৃথক চরিত্রের। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়।

১. ফরায়েজি আন্দোলন এক ধরনের শুদ্ধি ও সংস্কার আন্দোলন।
২. এ আন্দোলন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আন্দোলন।
৩. এ আন্দোলন মূলত একটি এলাকাভিত্তিক আন্দোলন।
৪. এটি ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির আন্দোলন।
৫. এ আন্দোলন এক প্রকার সামাজিক দিক-নির্দেশনামূলক আন্দোলন।
৬. ফরায়েজি আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রটি ছিল ব্রিটিশবিরোধী।

গ উদ্দীপকে মনির চরিত্রটির সাথে পাঠ্যবইয়ের সংগ্রামী ব্যক্তি তিতুমীরের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মনির ছোটবেলা থেকে সমাজজীবনের সকল শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। এজন্য তিনি শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে ১৮৩১ সালে বাঁশ ও মাটি দিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ফলশ্রুতিতে শাসকদল তাকে দমনের জন্য সুসাজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মনির শহিদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়।

এ রকম ঘটনা তিতুমীরের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ও বিপ্লবী নেতা সৈয়দ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। তিনি ছোটবেলা থেকেই জুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে উদ্দীপকের মনিরের মতো সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। তাই তিনি দেশের সাধারণ জনগণকে জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হন। জমিদারদের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সাথে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হন। এ সংঘর্ষে ইংরেজ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ইংরেজদের সাথে অচিরেই ভয়াবহ যুদ্ধ অনিবার্য ভেবে তিতুমীর ব্রিটিশ আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এটি বাঁশের কেল্লা নামে পরিচিত। এটি বাঁশ এবং কাদা দিয়ে নির্মিত। এ প্রেক্ষিতে ইংরেজ বাহিনী এই বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করলে আধুনিক অস্ত্রের মুখে বাঁশের কেল্লার টিকে থাকা সম্ভব হয় না। অবশেষে তিতুমীর শহিদ হন এবং তার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মনির এবং শহিদ তিতুমীর একে অপরের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত ব্যক্তির তথা তিতুমীরের নির্মিত দুর্গ বাঁশের কেল্লা ছিল অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিবাদ— উক্তিটি যথার্থ।

সশস্ত্র প্রতিবাদ পরিচালিত হয় অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে। নিয়মতান্ত্রিক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে যখন অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে সরানো আর সম্ভব হয় না তখনই জনগণ বা জনসমর্থিত রাজনৈতিক দল এই পথ বেছে নেয়। এই ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তিতুমীর নির্মিত বাঁশের কেল্লা।

উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নির্মিত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের সমর্থিত অত্যাচারী ও শোষণকারী জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে। প্রতিরোধের জন্য তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি তার এ বাঁশের কেল্লা থেকে জমিদারদের অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ পরিচালনা করতেন । প্রথমদিকে গ্রামের নিরীহ ও অত্যাচারিত কৃষক শ্রেণিকে রক্ষা করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের হঠকারিতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেন। তার এই সিদ্ধান্তের ফল হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধ বাঁশের কেল্লা নিমাণ। বাঁশ এবং কাদা দিয়ে নির্মিত এ দ্বিস্তর বিশিষ্ট কেল্লা একসময় হয়ে উঠেছিল ন্যায়বিচারের প্রতীক। যে কারণে হিন্দু-মুসলমানসহ সকল শ্রেণির অত্যাচারিত ও নির্যাতিত জনগণ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই কেল্লা পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। বাঙালি জনগণ পাকিস্তানিদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের মুখেও তাদের অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা যুগিয়েছে এই কেল্লা।

সুতরাং বলা যায় যে, তিতুমীর কর্তৃক নির্মিত বাঁশের কেল্লা অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ যা পরবর্তীতে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩০ জনাব 'ক' একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার সময় দুটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। উক্ত রাজনৈতিক নেতার অক্লান্ত পরিশ্রমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিরোধপূর্ণ দুই ধর্মের নেতাদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চিন্তা-চেতনা ও মননে এই নেতা ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৬]

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? ১

খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডের সাথে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাক্টের কী সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার গুরুত্ব চিত্তরঞ্জন দাশের কর্মকাণ্ডের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জনগণই প্রকৃত ক্ষমতার উৎস; জনগণের ক্ষমতাই সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষমতা। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ ধরে সোহ্‌রাওয়ার্দী সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তি আনয়নে সচেষ্ট হন। রাজনীতিতে তিনি কখনও অনিয়মতান্ত্রিক বা ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি বিপ্লবের পরিবর্তে ব্যালটে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

গ জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডের সাথে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাক্ট এর পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' একজন রাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লক্ষ করেন দুটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। তাই এই রাজনৈতিক নেতার অক্লান্ত পরিশ্রমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিরোধপূর্ণ দুই ধর্মের নেতাদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশও ছিলেন চিন্তা চেতনা ও মননে একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। তার সময় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ঠিক না হলে কোনো সম্প্রদায়ই ভালো থাকবে না। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলায় হিন্দু মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য দূরদর্শী, অসাম্প্রদায়িক এই নেতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বরাজ দল ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে ১৯২৩ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ইতিহাসে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। অচিরেই এই চুক্তি সিআর দাস ফর্মূলা নামে খ্যাতি অর্জন করে।

স্যার আব্দুর রহিম, এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। দেশবন্ধুর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর কাজের সাথে চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সুশাসন হলো একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন। সুশাসনের মাধ্যমেই নাগরিকগণ তাদের আগ্রহ বা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে পারে, তাদের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদাগুলো মেটাতে পারে। এ কারণেই বলা যায়, রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক। যার ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের এই অসাম্প্রদায়িক নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উষ্ণ না হলে কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা হবে না। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুসলিম নেতাদের মধ্যে একটি চুক্তির স্বাক্ষর করান। বাংলাদেশের সমাজে ও রাজনীতিতে বেঙ্গল প্যাক্ট ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই চুক্তির ফলে মুসলমানদের সমর্থন পেয়ে স্বরাজ পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে সিআর দাসের এই পদক্ষেপ ছিল বাস্তবধর্মী ও প্রশংসনীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, অসাম্প্রদায়িক এই ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের ফলে সাম্প্রদায়িকতা রোধ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩১

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৩]

ক. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন হয় কত সালে? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটিতে বক্তৃতার নেতা যে ভাষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তার গুরুত্ব লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নেতাকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির জনক বলা হয় কেন? ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করা হয় ১৯৫৬ সালে।

খ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার নির্ণায়ক ও আদর্শাশ্রয়ী একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ দ্বি-জাতি তত্ত্বের উন্মেষ ঘটান। তার মতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। তার এ মতবাদটিই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে নির্দেশ করে। এ ভাষণ বাঙালির ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ও স্মরণীয় ঘটনা।

৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এ ভাষণের পরপরই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট এ ভাষণ অমর হয়ে থাকবে। ৭ মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। মাত্র ১৮ মিনিটের তেজস্বী এ ভাষণের পরেই বাঙালি

Teachingbd24.com

জাতির সামনে একটি গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায় আর তা হলো স্বাধীনতা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ডাক দেন। সে ডাকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণে বাঙালি জাতির পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিক নির্দেশনা ছিল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলা এবং যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা। এ ভাষণে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কলাকৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ ভাষণের ফলেই সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালি বস্তুত সশস্ত্র বাঙালিতে পরিণত হয় এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এ কারণেই এ ভাষণ বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয়। সম্প্রতি (৩১ অক্টোবর, ২০১৭) এই ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনা করে UNESCO একে 'Memory of The World International Register' এ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রে বক্তব্যরত নেতাই হলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু।

১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগদান করেন। পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলার নির্যাতিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এজন্য তাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদে পিছপা হননি। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ খ্যাত ছয় দফা পেশ করেন। এ ছয় দফা দাবির প্রতি ভীত হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা করে। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের চাপে পাক সরকার মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও তিনি পাক সরকারের সাথে কোনো আপোষ করেননি। ১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানান। তার ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার সকল স্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ফলে বাঙালি জাতি পায় স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন বাঙালি জাতির মুক্তি অর্জনে। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও বাঙালি জাতির জনক।

প্রশ্ন ▶ ৩২ জনাব 'R' একজন প্রখ্যাত রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি লন্ডনের গ্রেস ইন থেকে Bar At Law সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণের তিনি সদা সচেষ্ট। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি ছিলেন আপসহীন। তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়। তিনি উপমহাদেশের বিরোধী দলের স্রষ্টা। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৪]

ক. বেঙ্গল প্যাক্ট কী? ১

খ. নবাব আব্দুল লতিফকে কেন বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনীতিবিদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদের অবদান তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' হলো হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি তৈরির জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি।

খ মুসলমান সমাজের দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্গতি স্যার সৈয়দ আহমদকে চরমভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা ও উদাসীনতা তাদের দুঃখ দৈন্যের কারণ। তাই তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নবাব আব্দুল লতিফ অনুরূপ ভাবনা ভেবেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদের মতো তিনিও মুসলমানদের উন্নয়নে সমাজ সংস্কারমূলক ও শিক্ষা বিস্তারমূলক কাজ করেন। এ সকল কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১২নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের এক মেধাবী মানুষ জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে ব্যথিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় তৎকালীন সরকার কৃষিঋণ আইন, মহাজনী আইন ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস করে। এর ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল | প্রশ্ন নং ৪]

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা কে? ১

খ. বারাসাত বিদ্রোহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরও অনেক শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ।

খ ১৮২৫ সালে তিতুমীর প্রায় ৮৩ হাজার কৃষকদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেন তাই ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন এবং বারাসাত বিদ্রোহ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ। ১৮২৫ সালে চব্বিশ পরগনার কিয়দংশ, নদীয়া জেলার কিয়দংশ এবং ফরিদপুরের কিয়দংশ নিয়ে তিনি একটি স্বাধীন এলাকা গঠন করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিতুমীরের এ বিদ্রোহ ইতিহাসে 'বারাসাত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের এক মেধাবী মানুষ জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে ব্যথিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিঋণ আইন, মহাজনী ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। এ ঘটনাগুলো শেরে বাংলার কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদখোর মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

উদ্দীপকের বর্ণনায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে অবদানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরো নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অবদান রেখেছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তাইতো ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলিমদের স্বার্থে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নির্বাচনের প্রাক্কালে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন করেন এবং যুক্তফ্রন্টে যোগদান করেন।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, শেরে বাংলা কৃষক আন্দোলন ছাড়াও বাঙালি জাতির অগ্রগতি এবং অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৪

১৯৬৬ সালের ছয় দফা

↓

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ

↓

স্বাধীনতার ঘোষণা

↓

বাঙালি জাতির জনক

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ǀ প্রশ্ন নং ৫]

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি বলা হয় কেন? ২

গ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলি কোন নেতার সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নেতার বর্ণাঢ্য জীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশে উদ্দীপকটি কতখানি সার্থক? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

খ ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ৬টি দাবি সংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন যা ৬ দফা কর্মসূচি নামে পরিচিত।

ছয় দফা হচ্ছে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের একটি রূপরেখা। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকসহ সকল অধিকারের কথা তুলে ধরেছিল। বঙ্গবন্ধু এই দাবিকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' শিরোনামে প্রচার করেছিলেন।

গ সৃজনশীল ৭নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এক একজন মহান নেতা তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় জাতিকে সংগঠিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে লেনিন, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্র বসু, মাও সে তুং এদের নাম উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশেও শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র আর শাসন-শোষণের হাত থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে একজন মহান নেতার আবির্ভাব হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মহান নেতার ঘোষিত কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করছে।

[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ǀ প্রশ্ন নং-৩]

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী ছিল? ১

খ. নবাব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার স্যার সৈয়দ আহমদ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে কোন নেতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতের সাথে তুমি কী একমত? যুক্তি দাও। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের প্রকৃত নাম ছিল মীর নিসার আলী।

খ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো তার অবদান ছিল বলেই নওয়াব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

মুসলমান সমাজের দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্গতি স্যার সৈয়দ আহমদকে চরমভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা ও উদাসীনতা তাদের দুঃখ দৈন্যের কারণ। তাই তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নবাব আব্দুল লতিফ অনুরূপ ভাবনা ভেবেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। তাই নবাব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতের সাথে আমি একমত। উদ্দীপকের উক্ত নেতার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) জনসাধারণের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা বেসামরিক ও সামরিক চাকরি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি করে। বাঙালিরা এক সময় এ বৈষম্য অবসানের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবিকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এককথায় এটি ছিল বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায়ের সনদ।

৬ দফার মাধ্যমেই বাঙালির স্বাধিকারের দাবি একটি পরিণতি পায় এবং তাদেরকে স্বাধীনতার পথে চালিত করে। এজন্য ৬ দফা কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ।

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৬ জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারান। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি আজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তার জীবনযাপন ছিল অতি সাধারণ। তাকে মজলুম জননেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ▌প্রশ্ন নং-৪]*

ক. 'দেশবন্ধু' উপাধি দেয়া হয় কাকে? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব 'ক' এর সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন নেতার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষকদের স্বার্থ ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দেশবন্ধু' উপাধি দেয়া হয় চিত্তরঞ্জন দাশকে।

খ সৃজনশীল ২ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ জনাব মিরাজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে একটি আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলেই যেন ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থায় অনুসারী হয়। *[আল হেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), বেড়া, পাবনা ▌প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কে এবং কত সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দান করেন? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তোমার পঠিত কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? তাঁর সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তির আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আদর্শই ছিল না— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সভায় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়।

খ মৌলিক গণতন্ত্র হলো ১৯৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রবর্তিত একটি স্থানীয় সরকার পদ্ধতি।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনালের আইয়ুব খান একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেন। প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল— ১. ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি, ২. থানা পরিষদ, ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ এবং ৫. প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ।

গ সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ বিশ্ব রাজনীতিতে প্রায়ই দেখা যায়, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে একজন মহান নেতা তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা লেনিন, মহাত্মা গান্ধী সুভাষ চন্দ্র বসু, হো-চি-মিন এদের নাম উল্লেখ করতে পারি। আমাদের দেশেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র আর শাসন-শোষণের হাত থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে একজন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণের মতে, এ মহান নেতার ঘোষিত কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করছে। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর ▌প্রশ্ন নং ৪]*

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী? ১

খ. মজলুম জননেতা কাকে বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আমাদের দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে কোন নেতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণের মতের সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহিদ তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী।

খ মওলানা আব্দুল হামিদ খানকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

তিনি কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি সারাজীবন অত্যাচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। টাঙ্গাইলের জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি টাঙ্গাইল থেকে বিতাড়িত হন এবং আসামে চলে যান। সেখানে তিনি ব্রিটিশ ও অসমিয়া জাতিগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন। জনদরদি এই নেতা শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। এ কারণে তাকে মজলুম জননেতা বলে অভিহিত করা হয়।

গ সৃজনশীল ৭নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ ব্রিটিশ শাসনামলে একজন বাঙালি যুবক মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কা শরীফে যান। সেখানে তিনি ইসলামি শিক্ষা লাভ করেন এবং 'ওয়াহাবি' মতবাদে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হন। দেশে ফিরে তিনি সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি পীরপূজা, ওরশ, মানত পালন এবং কবর পূজাকে ধর্মীয় কুসংস্কার বলে ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের 'ফরজ' বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য পালনের আহবান জানান। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি একটি ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর ▌প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? ১

খ. কাকে কৃষককূলের মুক্তির অগ্রদূত বলা হয়? কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মনীষীর মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত মনীষীই ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বা 'বিধর্মীর রাজ্য' বলে ঘোষণা করেছিলেন? মতামত দাও। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড কার্জন।

খ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে কৃষককূলের মুক্তির অগ্রদূত বলা হয়।

বাংলার কৃষকদের শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি 'কৃষক সমিতি' গঠন করেন। কৃষক ও প্রজাদের ঋণের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৭ সালে 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করেন। শুধু তাই নয়, সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন' পাস করে। তিনি সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে কৃষকদের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। তিনি ধর্মীয় সংস্কারের

Teachingbd24.com

পাশাপাশি কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। উদ্দীপকের সিরাজুল ইসলামের আন্দোলনে আমরা অনুরূপ বিষয়টিই দেখতে পাই।

হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর মক্কায় অবস্থান করে ইসলাম শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদলে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলমান সমাজ থেকে জাতিপ্রথা উচ্ছেদ, অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণির বিলোপ ঘটিয়ে পীরপূজা, কবরপূজা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করার জোর চেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশি শাসন-শোষণ এবং নীলকর জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যার ফলে তাকে শাসক শ্রেণির রোষানলে পড়তে হয়। উদ্দীপকের বাঙালি যুবক মানুষকে ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এবং কুসংস্কারমুক্ত করতে যে আন্দোলনের ডাক দেন তা ইতিহাসের হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকের সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উক্ত মনিষীই তথা আমার পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত হাজী শরীয়তউল্লাহ ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বা 'বিধর্মীর রাজ্য' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহ তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান ছাড়া ভারতবর্ষের জনগণের মুক্তি অসম্ভব। তিনি ইসলামি জীবনাদর্শ সংবলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করার স্বপ্ন দেখেন। এজন্য তিনি তদানীন্তন ভারববর্ষকে 'দারুল হারব' বা বিধর্মীদের রাজ্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলন মুসলমানদের সামাজিক জীবনে গভীরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দলে দলে গ্রামবাংলার মুসলমানগণ ফরায়েজি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সমাজজীবন থেকে কুসংস্কারগুলো দূর করতে মুসলমানগণ ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। মহাজন, জমিদার ও নীলকর বণিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেয়। ইসলামি চেতনা ও দৃঢ় সংগ্রামী মনোবলে উজ্জীবিত মুসলমানদের কাছে মহাজন, জমিদার, নীলকর বণিক তথা অত্যাচারী শ্রেণি বিভিন্ন জায়গায় পরাজয় বরণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ সিরাজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও সমাজ সংস্কারক। তিনি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে একটি আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলেই যেন ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। *[লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মীর নিসার আলি কে ছিলেন? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সিরাজুল ইসলামের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কোন ব্যক্তিত্বের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি কেবল ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলী, যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করে শহিদ হন।

খ ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তারা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন কেবল ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না— বক্তব্যটি যথার্থ।

ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে থেকেই মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের অধঃপতনের পেছনে কুসংস্কার যেভাবে ভূমিকা রাখে তা বুঝিয়ে কুসংস্কার পরিহার করতে উৎসাহী করেন। তিনি নীলকর বণিকদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসন তা তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন, 'লাঙল যার জমি তার এবং এই জমিন আল্লাহর, সুতরাং খাজনা দেব আল্লাহকে।' ব্রিটিশ অথবা তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের কোনো খাজনা দেওয়া যাবে না। এছাড়াও তিনি সরকারি খাসমহলগুলো দখলে এনে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এভাবেই তিনি বাংলার নির্যাতিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেন। জনগণ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরায়েজি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলনই নয় বরং এটি কৃষক আন্দোলনও বটে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ জনাব 'ক' মনে করেন যে, সবার আগে কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করতে হবে, তাদের মুখে হাসি ফুটাতে হবে। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং খাঁটি বাঙালি। তার চেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মিল কতটুকু? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' এর ন্যায় শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের প্রকৃত নাম হলো মীর নিসার আলী।

খ 'ফরায়েজি আন্দোলন' হলো ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, যা হাজী শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। 'ফরজ' শব্দটি থেকে ফরায়েজি শব্দটি এসেছে। ফরজ শব্দের অর্থ অবশ্য পালনীয়।

মুসলমান সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার ও বিধর্মী আচার-অনুষ্ঠান বিরাজমান ছিল। এমতাবস্থায় হাজী শরীয়তউল্লাহ বাংলার অধপতিত মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড নিরসনের জন্য চেষ্টা করেন। তার এ প্রচেষ্টাই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

https://teachingbd24.com

গ জনাব 'ক'-এর কাজের সাথে ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিবিদ, তদানীন্তন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাঙালির প্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' একজন বাঙালি। তিনি ব্রিটিশ আমল থেকে রাজনীতি করেন। তার বিশ্বাস ছিল সবার আগে কৃষকের মনে প্রাণে শান্তি এবং তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। কেননা, কৃষকের উন্নতিই দেশের উন্নতি।

উদ্দীপকের জনাব 'ক'-এর মতোই বাংলার কৃষক, সাধারণ জনগণ, নিপীড়িত জনমানুষের কথা ভাবতেন এ. কে. ফজলুল হক। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, হিন্দু মুসলিম স্বার্থ সমন্বয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও লাহোর প্রস্তাব প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি কৃষকদের কল্যাণ সাধনে কৃষিঋণ আইন প্রণয়ন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন, নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। তিনি ডাল-ভাত রাজনীতির প্রবক্তা ছিলেন। মূলত শেরে বাংলা তাঁর কার্যক্রম দ্বারা বাঙালির হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

ঘ জনাব 'ক'-এর ন্যায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে— উক্তিটি যথার্থ।

শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নতি করতে না পারলে বাংলার মুসলমানদের কোনো উন্নতি হবে না। সে লক্ষ্যে তিনি ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের ডাক দেন। এই শিক্ষা সম্মেলনে তিনি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। ১৯১৩ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। শেরে বাংলার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কলকাতার টেইলর হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও বেকার হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠায় শেরে বাংলার অবদান অবিস্মরণীয়। ইসলামিয়া কলেজ ও মুসলিম শিক্ষা তহবিল গঠনে তার অবদান অনেক। এছাড়া মহিলাদের লেডি ব্রাবোর্ন ও ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সর্বত্র জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার মুসলমান তথা আপামর জনসাধারণের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৪২

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয় কত সালে? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলী কোন নেতার সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলীর মাধ্যমে কী উক্ত নেতার সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় যায়? মতামত দাও। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয় ১৯৫৮ সালে।

খ সৃজনশীল ৭ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা দরিদ্র কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব 'X' ব্যথিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষি ঋণ আইন, মহাজনী ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ১

খ. মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'X' এর সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐ সকল কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজি আন্দোলন হলো হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ইসলামি সংস্কার আন্দোলন।

খ মুসলমানদের দুরবস্থার অবসান করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ভারতের সব সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু নীতি ও সিদ্ধান্তের কারণে মুসলমানরা হতাশ এবং আশাহত হয়ে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। তারা নিজেদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্নভাবে তৎপর ছিলেন। যেমন বঙ্গভঙ্গসহ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. মজলুম জননেতা কাকে বলা হয়? ১

খ. নবাব আব্দুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান লেখ। ৩

ঘ. উক্ত ব্যক্তিত্ব শিক্ষা ক্ষেত্রে কী কী অবদান রেখেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মওলানা আব্দুল হামিদ খানকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

খ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নবাব আবদুল লতিফের অবদান ছিল বলেই তাকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নবাব আব্দুল লতিফও বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত বাংলার মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি

Teachingbd24.com

অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। এ কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর কথা বলা হয়েছে এবং তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা। তিনি উপলব্ধি করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট হিন্দু জমিদার, জোতদার, মহাজনদের শোষণ ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে বাংলার মুসলমানরা। হিন্দু জনগোষ্ঠী মুসলমানদের থেকে ব্যবসা বাণিজ্যে, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাথে প্রতিযোগিতা করে মুসলমানরা কোনোভাবেই পারছিলনা। এসময় তিনি বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ আসামকে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি প্রদেশ সৃষ্টি করেন। যার রাজধানী করা হয় ঢাকাকে।

বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে সচেতন ও শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এর বিরোধিতা করবে ভেবে তিনি বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলার মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার নেতৃত্বে এই সম্মেলনে ১৯০৬ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। বাংলার মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনব্যবস্থা সৃষ্টিতে স্যার সলিমুল্লাহ সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য ১৯০৬ সালে মুসলমানদের জন স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিতে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ১৯০৯ সালে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়।

ঘ উক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ পূর্ববাংলায় শিক্ষা বিস্তারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

পূর্ব-বাংলার জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত না হলে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এ লক্ষ্যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ নিজ উদ্যোগে পুরানো ঢাকায় আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এছাড়া তিনি মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি হল নির্মাণ করা হয়। নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই এই ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অসামান্য অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ জনাব আরজ আলী দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অল্প বয়সে তিনি বাবা মাকে হারিয়েছেন। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাননি। তবে মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছিলেন। এই জনপদের মানুষের অধিকার রক্ষা বিশেষত কৃষকদের নিয়ে তিনি বহু আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। ইতিহাস তাঁকে মজলুম জননেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। */আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ৭/*

ক. বাঁশের কেল্লা কি? ১

খ. ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের নেতার সাথে তোমার পঠিত কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানুষের অধিকার আদায়ে উক্ত নেতার অবদানসমূহ আলোনা কর। ৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় তিতুমীর যে দুর্গ নির্মাণ করেন ইতিহাসে এটি বাঁশের কেল্লা নামে পরিচিত।

খ বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ায় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ জন্যই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ২৬নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৬নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ সোলায়মান আলী ও আকবর আলী বিদেশী শাসনাধীন একটি রাষ্ট্রে বসবাস করেন। একজন ধার্মিক ও সংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে তিনি মনে করেন, সমাজের সকলেই ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে অবশ্য পালনীয় কাজগুলো পালন করবে। এর জন্য তিনি একটি আন্দোলন গড়ে তুলেন। অপর দিকে আকবর আলী বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদোহের ডাক দেন। তিনি তার আশপাশের কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেন।

/জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ১/

ক. বেঙ্গল প্যাক্ট কী? ১

খ. গণতন্ত্রের মানস পুত্র কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের সোলায়মান আলীর সঙ্গে তোমার পঠিত কোন আন্দোলনের মিল রয়েছে? উক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের আকবর আলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নেতা ছিলেন আমাদের মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণার উৎস'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' হলো হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি তৈরির জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি।

খ গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রমনা। রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারা চালু করার মানসে তিনি পাকিস্তানে প্রথম শক্তিশালী বিরোধী দলের জন্মদান করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের সূতিকাগার। তিনি জনগণের স্বাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সব সময় ভাবতেন শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপসহীন নেতা ছিলেন বলেই তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের সোলায়মান আলীর সঙ্গে আমার পঠিত ফরায়েজি আন্দোলনের মিল রয়েছে। মূল পাঠের আলোকে বলা যায়, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকে ফরায়েজি শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য অর্থাৎ, বাধ্যতামূলক কর্তব্য ও দায়িত্ব। হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের সকল প্রকার ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন। তাদের আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালন করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। এসব কারণেই তার এ আন্দোলনের নাম 'ফরায়েজি আন্দোলন'। মূলত সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন পরিচালনা করেন। সেসব উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে—

মুসলমান জাতিকে সকল প্রকার পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা; মুসলমানদেরকে ইসলামি মূলনীতি তথা ফরজ এর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা; ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ ও কুসংস্কার রোধে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা; মুসলমানদের সকল প্রকার নৈতিক বলে বলীয়ান করা প্রভৃতি। এছাড়াও মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য পালনে সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা; ইংরেজ সরকারের সকল জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানো; জমিদার শ্রেণির অত্যাচার-অনাচারের প্রতিবাদ করা; ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করা এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাও এ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারে ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

ঘ উদ্দীপকের আকবর আলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নেতা অর্থাৎ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ছিলেন আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণার উৎস।

উদ্দীপকের আকবর আলী ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। যদিও শাসক গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ হলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর এই আন্দোলনের সাথে শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নির্মাণ, ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের মিল রয়েছে। নারকেল বাড়িয়ার যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ যা মুক্তিকামী জনগণকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দিয়ে আসছে।

বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিতুমীর প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার না পেলেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার যে শিক্ষা বাঙালিরা তার কাছ থেকে পেয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই পাকিস্তানিদের বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিরা রুখে দাঁড়িয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। মূলত তিতুমীরের আত্মত্যাগই বাঙালিদের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। তিতুমীরই শিক্ষা দিয়েছেন, মহৎ অর্জনের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করতে হবে।

সুতরাং, উদ্দীপকে আকবর আলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র তথা তিতুমীর ব্যর্থ হলেও মুক্তিকামী জনগণের জন্য চির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ বৃটিশ শাসনামলে একজন বাঙালি যুবক মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কা শরীফ যান। সেখানে তিনি ১৯ বছর অবস্থান করেন। দেশে ফিরে তিনি সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি কবর পূজা ও পীরপূজা, মহরমের মাতম করাসহ সব ধরনের শিরক ও বিদআত কাজ পরিত্যাগ করে ফরজ কাজগুলো করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কাকে? ১

খ. বেঙ্গল প্যাক্ট কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তিটির সাথে তোমার পঠিত কোন ব্যক্তির মিল খুঁজে পাও? তার কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ব্যক্তি ইতিহাসে কোন আন্দোলনের নেতা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন? তার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় নবাব আব্দুল লতিফকে।

খ বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাক্ট।

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার ৬০ ভাগ জনগণ মুসলমান হলেও তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতার অধিকারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঙ্গল প্যাক্ট এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, স্যার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়। অচিরেই এ চুক্তি সি আর দাশ ফর্মুলা নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজনীতি, ধর্ম, কর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো বেঙ্গল প্যাক্টের মূলকথা। দেশবন্ধুর এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত যুবকটির সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর মক্কায় অবস্থান করে ইসলাম শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদলে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলমান সমাজ থেকে জাত-পাত প্রথা উচ্ছেদ, অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণির বিলোপ ঘটিয়ে পীরপূজা, কবরপূজা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করার জোর চেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশি শাসন-শোষণ এবং নীলকর জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যার ফলে তাকে শাসক শ্রেণির রোষানলে পড়তে হয়।

উদ্দীপকের যুবকটি মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কা শরিফ যান। তিনি সেখানে ১৯ বছর অবস্থান করেন। দেশে ফিরে তিনি সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করে। তিনি কবর পূজা, পীরপূজা, মহরমের মাতম প্রভৃতি পরিত্যাগ করে ফরজ পালন করতে নির্দেশ দেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের যুবকটির সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তিটি ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের অধঃপতনের পেছনে কুসংস্কার যেভাবে ভূমিকা রাখে তা বুঝিয়ে কুসংস্কার পরিহার করতে উৎসাহী করেন। তিনি নীলকর বণিকদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসন তা তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন, 'লাঙল যার জমি

https://teachingbd24.com

তার এবং এই জমিন আল্লাহর, সুতরাং খাজনা দেব আল্লাহকে।' ব্রিটিশ অথবা তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের কোনো খাজনা দেওয়া যাবে না। এছাড়াও তিনি সরকারি খাসমহলগুলো দখলে এনে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এভাবেই তিনি বাংলার নির্যাতিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেন। জনগণ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায়, ফরায়েজি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলনই নয়, বরং এটি কৃষক আন্দোলনও বটে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন জন নেতার নাম লেখো। ১

খ. দ্বৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটিতে বক্তৃতারত নেতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তিনি কে এবং কী কী দাবি উত্থাপন করেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটিতে বক্তব্যদানরত নেতাকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের প্রধান ৩ জন নেতা হলেন— মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি।

খ ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার শাসনভার সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক সংস্থার হাতে ন্যস্ত করাই হলো দ্বৈত শাসনব্যবস্থা।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দ্বৈত শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

গ উদ্দীপকের চিত্রটিতে বক্তৃতারত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি এ ঐতিহাসিক ভাষণে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি এ ভাষণে নিম্নোক্ত দাবিগুলো উত্থাপন করেন—

- সামরিক আইন 'মার্শাল ল' প্রত্যাহার করতে হবে।
- সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক জনগণের হত্যার তদন্ত করতে হবে।
- জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ রফিক একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বসবাস করেন। এজন্য তিনি শাসকগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি তার স্বজাতিকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে রফিকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আতিকুর রহমান বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন। তিনি সাধারণ জনগণকে সংগঠিত করেন এবং একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর প্রবল আক্রমণের মুখে তার বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। *[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বঙ্গভঙ্গ হয় কত সালে? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আতিকুর রহমানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমার পঠিত ব্রিটিশবিরোধী নেতার বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তিনি ছিলেন মুক্তিকামী বাঙালির প্রেরণার উৎস— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯০৫ সালে।

খ 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে বোঝায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে বিশেষ একটি শ্রেণির ভোটাধিকার।

আইয়ুব খান ছিলেন এই ধারণার জনক। তিনি সমগ্র পাকিস্তানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর হাতে ভোটাধিকার অর্পণ করেন। এই আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে আইন পরিষদের সদস্যদেরকেও নির্বাচন করতেন।

গ উদ্দীপকের রফিক চরিত্রের সাথে আমার পঠিত নবাব আব্দুল লতিফ-এর ব্যক্তিত্বের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের রফিক সাহেবের মতো নবাব আব্দুল লতিফও শাসক গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি উপনিবেশিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী হিসেবে শাসক গোষ্ঠীর সাথে কোনো বিরোধে না গিয়ে স্বজাতি অর্থাৎ মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগী হন। কেননা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলমানরা নানাভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকে। এর মূলে অন্যতম কারণ ছিল আধুনিক শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষায় অনীহা। মুসলমানদের এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য নবাব আবদুল লতিফ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলকাতায় মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। এছাড়া সামাজিক আচার-আচরণে শিক্ষিত হিন্দু ও ইংরেজদের সমকক্ষ করে তোলা।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের রফিক চরিত্রের সাথে আমার পঠিত নবাব আবদুল লতিফ চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আতিকুর রহমানের কর্মকান্ডের সাথে আমার পঠিত বইয়ের শহীদ তিতুমীরের সাথে মিল রয়েছে। তার সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তিনি মুক্তিকামী জনগণের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

আতিকুর রহমান ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন এবং জনগণকে সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। শাসক গোষ্ঠীর

Teachingbd24.com

সাথে যুদ্ধ হলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর এই আন্দোলনের সাথে শহিদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নির্মাণ, ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের মিল রয়েছে। নারকেল বাড়িয়ার যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ যা মুক্তিকামী জনগণকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দেয়।

ইংরেজদের গোলাবারুদ এবং নীলকর ও জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিল সাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে। বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিতুমীর প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার না পেলেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার যে শিক্ষা বাঙালিরা তার কাছ থেকে পেয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই পাকিস্তানিদের বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিরা রুখে দাঁড়িয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

সুতরাং, উদ্দীপকে আতিকুর রহমান সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র তথা তিতুমীর ব্যর্থ হলেও মুক্তিকামী জনগণের জন্য চির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

প্রশ্ন ▶ ৫০ জনাব রহমান একজন রাজনীতিবিদ। তিনি লন্ডনের গ্রে'স ইন থেকে বার.এট.ল সম্পন্ন করে ভারতে ফিরেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি সদা সচেষ্ট। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি ছিলেন আপোষহীন। তার রাজনৈতিক ভাবশিষ্য ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? ১

খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনীতিবিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "তার রাজনৈতিক ভাবশিষ্য ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি"— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৫০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।

খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রের অন্যতম সেবক।

রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারা রচনা করার মানসে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে প্রথম শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। তিনি জনগণের স্বাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সব সময় ভাবতেন শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে পিছপা হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপসহীন নেতা ছিলেন বলেই তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১২নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৩৮ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু। বাঙালি জাতির নেতৃত্বের প্রধান আসনে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও স্বাভাবিক উপায়ে ক্ষমতা না পেয়ে তিনি বুঝেছিলেন পাকিস্তানিরা স্বাভাবিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না, বরং আন্দোলনের মাধ্যমে তা আদায় করে নিতে হবে। তিনি সংবাদ সম্মেলন করে ১৯৭১ সালের ২ ও ৩ মার্চ হরতাল এবং ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভার কর্মসূচি দেন। যথাসময়ে হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় পুলিশ গুলি চালালে সাধারণ মানুষ আরও বিক্ষুব্ধ হয়। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে আন্দোলন এগিয়ে নিতে থাকেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। অবশেষে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। ৭ মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণা পাওয়া যায়।

এরপর থেকেই মূলত পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মান্য করে চলতে থাকে। এভাবেই শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতা সংগ্রাম, যার মূল ভূমিকায় ছিলেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

প্রশ্ন ▶ ৫১ মাওলানা আব্দুল্লাহ হজ পালন শেষে দেশে ফিরে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মুসলমানদেরকে কুসংস্কার পরিত্যাগ করে ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী পালনের আহ্বান জানান। তার ডাকে সাড়া দিয়ে বহু মুসলমান তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা সহজ হবে। *[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. 'দারুল হারব' কী? ১

খ. নওয়াব আবদুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ; বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আবদুল্লাহর কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত কোন মনীষীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত মনীষীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল" তুমি কী এই বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি দাও। ৪

৫১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দারুল হারব' হলো ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী অমুসলিম শাসিত রাষ্ট্র বা ভূ-খণ্ড।

খ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো অবদান ছিল বলেই নওয়াব আবদুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্গতি স্যার সৈয়দ আহমদকে চরমভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা ও উদাসীনতা তাদের দুঃখ দৈন্যের কারণ। তাই তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নওয়াব আব্দুল লতিফ অনুরূপ ভাবনা ভেবেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্যই তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। শিক্ষার প্রতি তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে। এ সকল কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। তিনি ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। উদ্দীপকের মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে আন্দোলনে আমরা অনুরূপ বিষয়টিই দেখতে পাই।

হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর মক্কায় অবস্থান করে ইসলাম শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদলে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলমান সমাজ থেকে জাত-পাত প্রথা উচ্ছেদ, অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণির বিলোপ ঘটিয়ে পীরপূজা, কবরপূজা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করার জোর চেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশি শাসন-শোষণ এবং নীলকর জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যার ফলে তাকে শাসক শ্রেণির রোষানলে পড়তে হয়। উদ্দীপকের মাওলানা আব্দুল্লাহ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও সমাজসংস্কারক। তিনি মানুষকে ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এবং কুসংস্কারমুক্ত করতে যে আন্দোলনের ডাক দেন তা ইতিহাসের হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ উক্ত মনীষীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল' আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে থেকেই মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের অধঃপতনের পেছনে কুসংস্কার যেভাবে ভূমিকা রাখে তা বুঝিয়ে কুসংস্কার পরিহার করতে উৎসাহী করেন। তিনি নীলকর বণিকদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসন তা তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন, 'লাঙল যার জমি তার এবং এই জমিন আল্লাহর, সুতরাং খাজনা দেব আল্লাহকে।' ব্রিটিশ অথবা তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের কোনো খাজনা দেওয়া যাবে না। এছাড়া তিনি সরকারি খাসমহলগুলো দখলে এনে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এভাবেই তিনি বাংলার নির্যাতিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেন। জনগণ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায়, ফরায়েজি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলনই নয় বরং এটি কৃষক আন্দোলনও বটে।

প্রশ্ন ▶ ৫২

এ. কে. ফজলুল হক

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু বলতে কি বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে যে মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে কৃষকদের কল্যাণ সাধনে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে মনীষীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৫২নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

খ পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মৌলিক গণতন্ত্র ছিল মূলত গণতন্ত্র ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র।

১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় এসে আইয়ুব খান তার ক্ষমতাকে স্থায়ী করার চিন্তা-ভাবনা করেন। এ চিন্তা থেকেই ১৯৫৯ সালে তিনি 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামের একটি তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি পকিস্তানের উভয় অঞ্চল থেকে মোট ৮০ হাজার ভোটার নির্বাচন করেন। রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ এবং দুটি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করত। মূলত এরা সবাই ছিল আইয়ুব খান ও তার সহযোগীদের অনুগত। এভাবে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের নামে সংসদীয় গণতন্ত্র বন্ধ করে গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র করেন।

গ উদ্দীপকের চিত্রে বাংলার অন্যতম মহান নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রতিকৃতি উল্লেখ রয়েছে। বাংলার কৃষকদের কল্যাণে তার অবদান অসামান্য।

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোট কথা বাংলার অবহেলিত কৃষকদের জন্য তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা তাদের মুক্তির পথের সন্ধান দেয়। এজন্য বলা হয়, দক্ষিণাঞ্চলের মেধাবী যুবক তথা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদখোর মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। আর তাই বাঙালির হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন বাঙালি কৃষককুলের মুক্তির দিশারী।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মনীষী অর্থাৎ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে কৃষি, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন।

শেরে বাংলা এ কে ফলজুল হক তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা কাজে লাগিয়ে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙালি জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে প্রয়োজন শিক্ষা। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী এবং জ্ঞানার্জনের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। এর ধারাবহিকতায় ১৯১২ সালে তিনি কলকাতায় মুসরিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন। গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য তিনি যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করতেন। শিক্ষাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে ১৯১৩ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও নারী শিক্ষায় অবদান রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখমন্ত্রী হিসেবে তিনি শিক্ষা দপ্তরের ভারও নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এর পর তিনি "মুসলিম এডুকেশন ফান্ড" এবং কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এডুকেশন এসোসিয়েশন', 'লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ', ১৯৪০ সালে বরিশালের চাখারে 'ফজলুল হক কলেজ', ঢাকায় 'ইডেন মহিলা কলেজ' ইত্যাদি তার অবদান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায়, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ জনাব সাদি একজন রাজনীতিবিদ। সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি সদা সচেষ্ট। দেশের উন্নয়নে তিনি কৃষিক্ষেত্রে কাজ করছেন। তিনি কৃষকদের ভাগ্যের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন। *[স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ফরায়েজী আন্দোলন কী? ১

খ. 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব সাদির কর্মকাণ্ডের সাথে শেরেবাংলা ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের মিল আছে কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়া শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের আর কী অবদান রয়েছে? বর্ণনা কর। ৪

৫৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজি আন্দোলন হলো হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরাজভিত্তিক আন্দোলন।

খ ভাগ কর ও শাসন কর ইংরেজ শাসকদের একটি কূটকৌশল বা কূটনীতি। এটি ব্রিটিশ সরকারের একটি চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি।

১৮৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতির অনুসরণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব সাদীর কর্মকাণ্ডের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তিনি বাংলার নিপীড়িত নির্যাতিত কৃষক-প্রজাকূলের মুক্তিদাতা হিসেবে খ্যাত। সাধারণ জনগণের জন্য 'ডাল-ভাত' কর্মসূচি ছিল তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ উদ্যোগটি উদ্দীপকের রফিকুল ইসলাম এবং ফজলুল হকের মধ্যে সাদৃশ্য রচনা করেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, রাজনীতিবিদ জনাব সাদির রাজনীতির মূলমন্ত্রী মানবতার কল্যাণ। ফজলুল হকের মতো তিনিও সকলের জন্য 'ডাল-ভাত' নিশ্চিত করতে কাজ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষকদের ভাগ্যের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। যেটি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকও বিশ্বাস করতেন। এক্ষেত্রে তিনি কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি ছিলেন কৃষক-প্রজার নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে দরিদ্র কৃষকদের উচ্চ হারের সুদ মওকুফ করে দিয়ে ঋণ পরিশোধের সুযোগ করে দেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাশ করার মাধ্যমে মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি সুদ বন্ধ করে। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষককূলের ভাগ্যাকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র যার অবদানের প্রেক্ষিতে বাংলার কৃষকরা মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব সাদির কর্মকাণ্ডের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অন্যতম অবদান কৃষকদের মুক্তি ও কৃষি উন্নয়নের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়া শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের শিক্ষাক্ষেত্রে, বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে ও রাজনীতিতে অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অবদান চিরস্মরণীয়। তার অবদানের জন্য বাঙালি জনগণ তার নিকট চিরঋণী। কৃষিক্ষেত্রে কেবল তার অবদান সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ও রাজনীতিতেও তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক শিক্ষার প্রসারে জোর দেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষা ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে জড়িত ছিলেন তিনি। তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে তার ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সবসময় বাঙালি জনগণের দাবি-দাওয়া আদায়ের এবং বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী এ নেতা ১৯১৬ সালে হিন্দু মুসলিমদের স্বার্থে লক্ষ্মৌ চুক্তি সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি তার 'লাহোর প্রস্তাব'-এর ভিত্তিতে হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, কৃষিবান্ধব কর্মকাণ্ড ছাড়াও শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক নানাবিধ জনহিতকর কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এক একজন মহান নেতা তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সংগ্রাম করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা লেলিন, মহাত্মা গান্ধী, সুভাস চন্দ্র বসু, হো-চি-মিন এদের নাম উল্লেখ করতে পারি। বাংলাদেশেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র আর শাসন-শোষণের হাত থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে একজন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মহান নেতার ঘোষিত কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করেছে।। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

Teachingbd24.com

ক. পাসিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ লোক পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত? ১

খ. ছয় দফা কর্মসূচির ৫ম দফাটি কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে কোন নেতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৫৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৫৬ শতাংশ লোক পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত।

খ ছয়দফা কর্মসূচির ৫ম দফাটি হলো— পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব থাকবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। দেশে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলে আমদানি-রপ্তানি হবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্কে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তিনি যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন তা বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করেছে।

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য যে সকল কাজ করেছেন তার মধ্যে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা কর্মসূচি অন্যতম। এই ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়। উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে পাঠ্যবইয়ের বর্ণনার মিল লক্ষ করা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী শাসন ও শোষণের মাধ্যমে চাকরি, কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে দুই পাকিস্তানের মধ্যে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি করে। পূর্ব বাংলা ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য কাঁচামালের যোগানদাতা একটি কলোনিতে পরিণত হয়। তখনই বাঙালিদের মুক্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। তিনি এ কর্মসূচিকে বাঙালিদের বাঁচার দাবি বলে অভিহিত করেন।

ঘ উদ্দীপকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মহান নেতার ঘোষিত কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করেছে— এই মতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

৬ দফা দাবি প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছেন, "৬ দফা বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি।" ৬ দফা কর্মসূচি ছিল মূলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ন্যায়ের পক্ষে সমর্থন করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই দাবি ছিল বাঙালিদের প্রাণের দাবি, বাঁচার দাবি। এ দাবি পূরণ করতে গিয়ে অজস্র বাঙালি বুকের তাজা রক্ত দিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ক্ষমতাসীন পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের নানা টালবাহানা ও নির্যাতন উপেক্ষা করে জনমত ক্রমেই ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে তা স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। এ কারণেই বলা হয়, ছয় দফা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও পরবর্তীতে যে আন্দোলনগুলো হয়েছে তার গতি প্রকৃতি নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তাই বলা যায়, ৬ দফা হলো বাঙালির মুক্তির সনদ বা বাঙালির ম্যাগনাকার্টা।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. বাঁশের কেল্লা কী? ১

খ. বেঙ্গল প্যাক্ট কী? ২

গ. ছকে উল্লেখিত ঘটনাবলি কোন নেতার সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নেতার বর্ণাঢ্য জীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশে উদ্দীপকটি কতখানি সার্থক? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে এক বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন যা বাঁশের কেল্লা নামে পরিচিত।

খ বাংলার হিন্দু মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলে বেঙ্গল প্যাক্ট।

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার ৬০ ভাগ জনগণ মুসলমান হলেও তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে চিত্তরঞ্জন দাস 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর উদ্যোগে গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ. কে ফজলুল হক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, স্যার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ জনাব তারেক একজন রাজনীতিবিদ। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে দেশকে উন্নত করতে হলে সবার আগে কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে হবে। তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। পাশাপাশি তিনি এলাকার লোকদের শিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. তিতুমীর কে ছিলেন? ১

খ. ফরায়েজী আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব তারেকের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন নেতার মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'দেশের উন্নয়নের জন্য জনাব তারেকের মতো যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলী। যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করে শহিদ হন।

খ সৃজনশীল ২১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

ঘ অর্থ উপার্জন করা গ

★★ হাজী শরীয়তউল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০)

১. **হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন এ দেশকে কী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন?** [জ্ঞান]
ক দারুল আমান খ দারুল ইসলাম
গ দারুল হারব ঘ দারুল ফারায়েজ গ

২. **ফরায়েজি আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কীভাবে?** [অনুধাবন]
ক মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
খ আন্দোলনের নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে
গ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
ঘ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার মাধ্যমে গ

৩. **ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য কী ছিল?** *[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]*
ক কুসংস্কার দূর করা
খ অর্থনৈতিক মুক্তি
গ মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ
ঘ রাজনৈতিক মুক্তি ক

৪. **হাজী শরীয়তউল্লাহ্ কোন মতবাদে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?** [জ্ঞান]
ক শিয়া খ সুন্নি
গ সুফি ঘ মালেকি গ

৫. **হাজী শরীয়তউল্লাহ্র ক্ষেত্রে নিচের কোন বিষয়টি যুক্ত?** [অনুধাবন]
ক ওহাবী আন্দোলন খ ফরায়েজি আন্দোলন
গ বারাসাত বিদ্রোহ ঘ মুসলিম লীগ খ

৬. **হাজী শরীয়তউল্লাহ্র পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কে?** [জ্ঞান]
ক দুদু মিয়া খ তিতুমীর
গ ফকির মজনু শাহ ঘ শাহ্ ওয়ালী উল্যা ক

৭. **হাজী শরীয়তউল্লাহ্র আন্দোলনের মূল বিরোধিতা কীসের বিরুদ্ধে ছিল?** [অনুধাবন]
ক কুসংস্কারের খ নফল ইবাদতের
গ হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘ দেশীয় হিন্দুদের ক

৮. **নিচের বিষয়গুলো বাংলার একজন সংগ্রামী নেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন——** [প্রয়োগ]
১. তিনি ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন
২. ১২ বছর বয়সে তিনি শিক্ষালাভের জন্যে মক্কা শরীফ গমন করেন
৩. অসাধারণ সাংগঠনিক গুণের অধিকারী ছিলেন
উপরোক্ত বিষয়সমূহ কোন নেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক দুদু মিয়া খ হাজী শরীয়তউল্লাহ্
গ তিতুমীর ঘ মজনু শাহ ক

৯. **ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল——** [অনুধাবন]
i. কুসংস্কার দূর করা
ii. মুসলমানদের ধর্মমুখী করা
iii. শাসকদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আলীপুর গ্রামের লোকজন নানা রকম কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত। জনাব বাকের গ্রামের মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। *[ব. বো. '১৫]*

১০. **জনাব বাকেরের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ব্যক্তির সাথে মিল খুঁজে পাও?**
ক নবাব আব্দুল লতিফ
খ শহীদ তিতুমীর
গ হাজী শরীয়তউল্লাহ
ঘ স্যার সলিমুল্লাহ্ গ

১১. **উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তির আন্দোলনের ধরন ছিল——**
i. সামাজিক ii. ধর্মীয়
iii. রাজনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

★ শহিদ তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)

১২. **বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে কে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন?** [জ্ঞান]
ক ভবানী পাঠক খ দেবী চৌধুরানী
গ তিতুমীর ঘ হাজী শরীয়তউল্লাহ্ গ

১৩. **সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়?** [জ্ঞান]
ক ১৭৭৬ সালে খ ১৭৮২ সালে
গ ১৮৩৭ সালে ঘ ১৮৫৭ সালে ঘ

১৪. **বাঁশের কেল্লার সাথে পরিচিত নেতা কে?** [জ্ঞান]
ক স্যার সলিমুল্লাহ্ খ নওয়াব আব্দুল লতিফ
গ শহিদ তিতুমীর ঘ সৈয়দ আহমেদ গ

১৫. **তিতুমীরের বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি কোথায় ছিল?** [জ্ঞান]
ক নদীয়া খ বিহার
গ পশ্চিমবঙ্গ ঘ উড়িষ্যা ক

১৬. **মুসলমানদের দাড়ির ওপর কর আরোপকারী কৃষ্ণদেব কোথাকার জমিদার ছিলেন?** [জ্ঞান]
ক পূর্ণিয়ার খ করাইয়ের
গ চব্বিশ পরগণার ঘ নদীয়ার ক

১৭. **সাঈদ তিতুমীরকে অন্য বিপ্লবীদের থেকে আলাদা করে দেখে। তিতুমীরের কোন দিকটি তার এই ধারণার পেছনে কাজ করে?** [প্রয়োগ]
ক প্রথম সংস্কারক খ প্রথম শহিদ
গ প্রথম বিদ্রোহ
ঘ প্রথম মুসলিম সংস্কারক খ

১৮. **তিতুমীর কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন?** [জ্ঞান]
ক জগৎ শেঠ খ রায় দুর্লভ
গ ঈশানচন্দ্র রায় ঘ কৃষ্ণদেব রায় ঘ

১৯. **তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শহিদ হন। তাঁর আন্দোলনের মূলধারা কী ছিল?** [উচ্চতর দক্ষতা]
ক হিন্দুদের দমন করা
খ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা
গ স্বাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা

Teachingbd.com

২০. তিতুমীরের আন্দোলনের সাথে জড়িত— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা বিস্তারে অনুকূল চেতনা সৃষ্টি
ii. জমিদার ও নীলকরদের বিরোধিতা
iii. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা দান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ ii ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ঘ

★ নবাব আবদুল লতিফ খান (১৮২৮- ১৮৯৩)

২১. সরকার কর্তৃক 'বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন কে? [জ্ঞান]
ক শহিদ তিতুমীর   খ নবাব আব্দুল লতিফ
গ আহসান উল্লাহ   ঘ চিত্তরঞ্জন দাস   খ

২২. কে 'জাস্টিস অব-পিস' পদে অধিষ্ঠিত হন? [চ. বো. ১৫]
ক নবাব আব্দুল লতিফ
খ স্যার সৈয়দ আহমদ
গ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
ঘ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস   ক

২৩. কত সালে নবাব আব্দুল লতিফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন? [জ্ঞান]
ক ১৮৪৯ সালে   খ ১৮৫০ সালে
গ ১৮৫১ সালে   ঘ ১৮৫২ সালে   ক

২৪. নবাব আব্দুল লতিফ কত সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন? [জ্ঞান]
ক ১৮৫৪ সালে   খ ১৮৬২ সালে
গ ১৮৬৭ সালে   ঘ ১৮৬৯ সালে   খ

২৫. কত সালে নবাব আব্দুল লতিফ সি. আই. ই খেতাবে ভূষিত হন? [জ্ঞান]
ক ১৮৮০ সালে   খ ১৮৮২ সালে
গ ১৮৮৪ সালে   ঘ ১৮৮৩ সালে   ঘ

২৬. কে নবাব আব্দুল লতিফকে 'ধর্মীয় নেতা ও সমাজ সংস্কারক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন? [জ্ঞান]
ক এফ.আই. গ্লাউড   খ ই. এম. হোয়াইট
গ ডব্লিউ এস. ব্লান্ট   ঘ ফ্রেডরিক জেমন গুড   গ

২৭. 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'র সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল? [জ্ঞান]
ক দুই শতাধিক   খ চার শতাধিক
গ পাঁচ শতাধিক   ঘ সাত শতাধিক   গ

২৮. নবাব আবদুল লতিফের প্রথম হওয়ার গৌরব কোনটিতে? [অনুধাবন]
ক ধর্মীয় সংস্কারক   খ সশস্ত্র বিপ্লবী
গ বঙ্গীয় আইন পরিষদ সদস্য
ঘ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত   গ

২৯. মাহমুদের দাদা তার ছোটবেলার গল্প বলতে গিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কথা বলেন। এ অবস্থার পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন— [প্রয়োগ]
i. এ. কে. ফজলুল হক
ii. স্যার সৈয়দ আহমদ
iii. নওয়াব আবদুল লতিফ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   গ

৩০. নবাব আবদুল লতিফের অবদান হলো— [অনুধাবন]
i. হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর
ii. মুহসীন ফান্ডকে শিয়া-সুন্নি সকলের জন্যে উন্মুক্ত করা
iii. নিজের জমিদারিতে বিলাসী জীবনযাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii
গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফেতুল্লা গুলেন একজন তুর্কি শিক্ষাবিদ, সংগঠক, সমাজ সংস্কারক। তিনি তুর্কিবাসীদের রক্ষণশীলতা পরিহার করে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং গতানুগতিক শিক্ষাকে পরিহার করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। তার অবদানের জন্যে তাকে তুরস্কে সৈয়দ আহমদ বলে অভিহিত করা যায়।

৩১. উল্লিখিত ব্যক্তিকে নিম্নে কোন ব্যক্তিত্বের সাথে তুলনা করা যায়? [প্রয়োগ]
ক স্যার সলিমুল্লাহ   খ এ. কে. ফজলুল হক
গ হাজী শরীয়তউল্লাহ   ঘ নবাব আব্দুল লতিফ   ঘ

৩২. বাংলা অঞ্চলের উক্ত ব্যক্তিত্বের গৃহীত পদক্ষেপ হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করা
ii. মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করা
iii. হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরে সহায়তা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ ii ও iii
গ i ও iii   ঘ i, ii ও iii   ঘ

★★ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১ - ১৯১৫)

৩৩. কোন সংস্থা গঠনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির বীজ লুকায়িত ছিল? [অনুধাবন]
ক সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ
খ মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন
গ আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
ঘ মিটফোর্ড হাসপাতাল   খ

৩৪. বঙ্গভঙ্গ রদকে নবাব সলিমুল্লাহ কী বলে অভিহিত করেছিলেন? [জ্ঞান]
ক ইংরেজদের স্বার্থপরতা
খ ইংরেজদের হঠকারিতা
গ ইংরেজদের দ্বিমুখী নীতি
ঘ ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতা   ঘ

৩৫. নবাব সলিমুল্লাহর পিতার নাম কী ছিল? [জ্ঞান]
ক নবাব খাজা আলীমুল্লাহ
খ নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ
গ নবাব খাজা আহসান উল্লাহ
ঘ খাজা হাসান আশকারী   গ

৩৬. শিক্ষা সমাপ্ত করে নবাব সলিমুল্লাহ সরকারি চাকরির কোন পদে যোগ দিয়েছিলেন? [জ্ঞান]
ক ডেপুটি কালেক্টর   খ এসডিও
গ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট   ঘ ডেপুটি কমিশনার   গ

Teachingbd.com

৩৭. ইংরেজদের ঘোষিত 'বঙ্গভঙ্গ একটি প্রতিষ্ঠিত ঘটনা'-এর ভঙ্গ হয় কার মাধ্যমে? [জ্ঞান]
ক লর্ড কার্জন খ ওয়ারেন হেস্টিংস
গ লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ পঞ্চম জর্জ **ঘ**

৩৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কে? [জ্ঞান]
ক লর্ড কার্জন খ লর্ড হার্ডিঞ্জ
গ লর্ড ব্যাটেন ঘ লর্ড মিন্টো **খ**

৩৯. মুসলমানদের প্রকৃত উন্নয়নের পথ হিসেবে কোনটিকে নবাব সলিমুল্লাহ গুরুত্ব দিয়েছিলেন? [অনুধাবন]
ক শিক্ষাবিস্তার খ রাস্তাঘাটের উন্নয়ন
গ কলকারখানা স্থাপন
ঘ আরবি ভাষা শিক্ষা **ক**

৪০. দীর্ঘ এক শতাব্দী পরেও রাহাতের ইতিহাস শিক্ষক মনে করেন বঙ্গভঙ্গ এ অঞ্চলের জন্যে সুখকর ছিল। তার বিবেচিত বিষয় হলো— [প্রয়োগ]
i. হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা
ii. বঙ্গভঙ্গের সাত বছরে এ অঞ্চলের উন্নয়ন
iii. চাকরিতে এ অঞ্চলের মানুষের সফলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০ – ১৯২৫)

৪১. কে দেশবন্ধু নামে খ্যাত? *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*
ক শেখ মুজিব খ চিত্তরঞ্জন দাশ
গ আমীর আলী ঘ হাজী মোঃ মহসিন **খ**

৪২. চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]*
ক লাঙল খ নারায়ণ
গ কাগজ ঘ দৈনিক বার্তা **খ**

৪৩. 'বেঙ্গল প্যাক্ট' এর রূপকার বা মূল ব্যক্তিত্ব কে ছিলেন? *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা; সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট]*
ক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
খ মহাত্মা গান্ধী
গ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
ঘ মাওলানা শওকত আলী **গ**

৪৪. কত সালে মহাত্মা গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯১৮ সালে খ ১৯১৯ সালে
গ ১৯২০ সালে ঘ ১৯২১ সালে **গ**

৪৫. কত সালে চিত্তরঞ্জন দাস ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসেন? [জ্ঞান]
ক ১৮৬৫ সালে খ ১৮৭০ সালে
গ ১৮৯৩ সালে ঘ ১৯০০ সালে **গ**

৪৬. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কমিশনের সদস্য কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক জওহরলাল নেহেরু
খ চিত্তরঞ্জন দাস
গ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
ঘ রাজা রামমোহন রায় **খ**

৪৭. কোন ইংরেজের শাসনকালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল? [অনুধাবন]
ক জেনারেল ডায়ারের খ লর্ড কার্জনের
গ লর্ড মার্লর ঘ লর্ড হার্ডিঞ্জের **ক**

৪৮. ১৯২৪ সালের কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল ৭৫টির মধ্যে ৫৫টি আসন লাভ করে? [জ্ঞান]
ক স্বরাজ পার্টি
খ মোহামেডান লিটারেরি পার্টি
গ বাংলা চুক্তি পার্টি
ঘ বঙ্গীয় প্রজাসত্ব কমিটি **ক**

৪৯. চিত্তরঞ্জন দাস দেশে ফিরে আসেন — [অনুধাবন]
i. ১৮৯৩ সালে
ii. ব্যারিস্টার-এট-ল ডিগ্রি লাভ করে
iii. ইনার টেম্পল থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫০. বেঙ্গল প্যাক্ট হলো— *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
i. হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ানোর চেষ্টা
ii. হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বাড়ে
iii. হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩ – ১৯৬২)

৫১. শেরে বাংলা খেতাব কে দান করে? [জ্ঞান]
ক বাংলার জনগণ খ লাহোরের জনগণ
গ পাকিস্তানের জনগণ
ঘ ঢাকার জনগণ **খ**

৫২. ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশনে কে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন? [জ্ঞান]
ক এ. কে. ফজলুল হক
খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ মাওলানা ভাসানী
ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **ক**

৫৩. এ. কে. ফজলুল হক কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [জ্ঞান]
ক ১৯৬০ সালে খ ১৯৬১ সালে
গ ১৯৬২ সালে ঘ ১৯৬৪ সালে **গ**

৫৪. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষকদের প্রতি ভালোবাসার পেছনে কোনটি ক্রিয়াশীল ছিল? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা
খ বিলাসী জীবনযাপন
গ ভোট লাভের আকুলতা
ঘ মানবদরদি গুণ **ঘ**

Teachingbd.com

৫৫. 'কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক) ১৯১০ সালে খ) ১৯১১ সালে
গ) ১৯১২ সালে ঘ) ১৯১৩ সালে **গ**

৫৬. প্রথা উচ্ছেদের দিক থেকে কোনটির সাথে শেরে বাংলার নাম জড়িয়ে আছে? [অনুধাবন]
ক) সতীদাহ প্রথা খ) বাল্যবিবাহ প্রথা
গ) জমিদারি প্রথা ঘ) পণ পথা **গ**

৫৭. শেরে বাংলা কী উচ্ছেদের জন্যে ফ্লাউড কমিশন গঠন করেন? [অনুধাবন]
ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
খ) প্রজাস্বত্ব আইন
গ) দশশালা বন্দোবস্ত
ঘ) চাষি খাতক আইন **ক**

৫৮. কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এ. কে. ফজলুল হক—
i. বঙ্গীয় ঋণ আইন পাস করেন
ii. প্রজাসত্ব আইন সংশোধন করেন
iii. মহাজনী আইন পাস করেন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

৫৯. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নাম জড়িয়ে আছে— [অনুধাবন]
i. বেকার হোস্টেল প্রতিষ্ঠার সাথে
ii. মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে
iii. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আদিনা ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রহিম সাহেব একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি কৃষক দরদি ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। কৃষকের কল্যাণার্থে তিনি বহু কালা-কানুন বাতিল করেন এবং নতুন আইন প্রবর্তন করেন। /কু. বো. ১০/

৬০. উদ্দীপকে বর্ণিত রহিম সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়?
ক) নবাব আব্দুল লতিফ
খ) শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
গ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
ঘ) মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী **খ**

৬১. রহিম সাহেবের এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে তদানীন্তন ভারতবর্ষের কৃষকেরা—
i. জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা পায়
ii. বন্ধকি জমি ফিরে পায়
iii. রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **খ**

★ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২ – ১৯৬৩)

৬২. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কত সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন? [জ্ঞান]
ক) ১৯৩০ সালে খ) ১৯৩২ সালে
গ) ১৯৩৬ সালে ঘ) ১৯৪০ সালে **গ**

৬৩. সোহ্‌রাওয়ার্দী শ্রম, বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন কার মন্ত্রিসভায়? [জ্ঞান]
ক) জিন্নাহ্ মন্ত্রিসভায়
খ) নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভায়
গ) ফজলুল হক মন্ত্রিসভায়
ঘ) সাত্তার মন্ত্রিসভায় **গ**

৬৪. সোহ্‌রাওয়ার্দীর 'অবিভক্ত বাংলা আন্দোলন' ব্যর্থ হলে তিনি কোনটি বেছে নেন? [অনুধাবন]
ক) পাকিস্তান বিরোধিতা
খ) কংগ্রেস বিরোধিতা
গ) একাকী রাজনীতি ঘ) পাকিস্তান আন্দোলন **ঘ**

৬৫. কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনীতির ফসল? [অনুধাবন]
ক) ফজলুল হক খ) মাওলানা ভাসানী
গ) তাজউদ্দিন আহমদ
ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **ঘ**

৬৬. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে কোন নেতা অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন? [জ্ঞান]
ক) শেরে বাংলা খ) খাজা নাজিমউদ্দিন
গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ) আবুল হাশিম **গ**

৬৭. সোহ্‌রাওয়ার্দীর সরকারবিরোধী রাজনীতির প্রকাশ— [অনুধাবন]
i. নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতা
ii. আওয়ামী লীগ গঠন
iii. জ্বালাও পোড়াও নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

৬৮. ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান পথ রুদ্ধ করেছিলেন— [অনুধাবন]
i. শহীদ সোহরাওয়ার্দীর
ii. এ. কে. ফজলুল হকের
iii. আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
'ক' একজন মহান নেতা যিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাজনীতির ব্যাপারে তিনি বুলেটের চেয়ে ব্যালটের শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের মানসপুত্র। /ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

৬৯. উদ্দীপকের মহান নেতা কে? [প্রয়োগ]
ক) ফজলুল হক খ) ভাসানী
গ) চিত্তরঞ্জন ঘ) সোহরাওয়ার্দী **ঘ**

http://teachingbd.com

৭০. ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি আন্দোলন করেছিলেন— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. যুক্ত বাংলার সপক্ষে
ii. অবিভক্ত বাংলার সপক্ষে
iii. বাংলা বিভক্তির সপক্ষে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০ – ১৯৭৬)

৭১. মাওলানা ভাসানীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯১৫ সালে খ ১৯১৬ সালে
গ ১৯১৭ সালে ঘ ১৯১৮ সালে **গ**

৭২. ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে মাওলানা ভাসানীর দায়িত্ব কী ছিল? [জ্ঞান]
ক সভাপতি খ সহ-সভাপতি
গ সাধারণ সম্পাদক ঘ সাংগঠনিক সম্পাদক **ক**

৭৩. জন্মলগ্নে মুসলিম লীগের কয়টি লক্ষ্য ছিল? [জ্ঞান]
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **খ**

৭৪. মাওলানা ভাসানীর আমরণ অনশনের মূল কারণ কী ছিল? [অনুধাবন]
ক বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ
খ 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের প্রতিবাদ
গ পাকিস্তানি শোষণের প্রতিবাদ
ঘ স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষাবলম্বন **খ**

৭৫. ১৯৭৬ সালের লংমার্চে মাওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেন? [অনুধাবন]
ক গঙ্গার পানি বণ্টনের দাবিতে
খ সামরিক সরকারের বিরোধিতায়
গ ফারাক্কা বাঁধের প্রতিবাদে
ঘ সীমান্ত গুলি বন্ধের দাবিতে **গ**

৭৬. বিনয় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে যার সাথে মাওলানা ভাসানীর স্মৃতি জড়িত। বিনয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে? [প্রয়োগ]
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাহাত খান একটি দলের রাজনীতি করে প্রতারিত হয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি নতুন একটি দল গঠন করে তার পূর্বের রাজনৈতিক দলকে পরাজিত করেন। নতুন রাজনৈতিক দল ও আদর্শের জন্যে তিনি জনস্বার্থে অনেক কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৭৭. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে কোন নেতার আদর্শের মিল পাওয়া যায়? [প্রয়োগ]
ক মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
খ এ. কে. ফজলুল হক
গ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী **ক**

৭৮. অনুচ্ছেদে যে রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলা হয়েছে, বাংলার কোন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রেক্ষাপট এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? [প্রয়োগ]
ক আওয়ামী লীগ খ আওয়ামী মুসলিম লীগ
গ কৃষক প্রজা পার্টি ঘ যুক্তফ্রন্ট **খ**

★★ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০ - ১৯৭৫)

৭৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু কে? [জ্ঞান]
ক শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
খ মাওলানা ভাসানী
গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ খাজা নাজিমউদ্দীন **গ**

৮০. স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি কে? [জ্ঞান]
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
গ তিতুমীর
ঘ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী **ক**

৮১. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি কার রচনা? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক ভাসানী খ ডা. মো. শহীদুল্লাহ
গ আল মাহমুদ
ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **ঘ**

৮২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার কোথায় বাস করতেন? [জ্ঞান]
ক গুলশান ৩২ নম্বর খ বনানী ৩২ নম্বর
গ ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ঘ কলাবাগান ৩২ নম্বর **গ**

৮৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ মাওলানা ভাসানী **গ**

৮৪. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির কোন লক্ষ্যটি স্থির হয়? [অনুধাবন]
ক একতাই মুক্তি খ স্বাধীনতা
গ স্বাধীনতার জন্যে গণভোট
ঘ ভারতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন **খ**

৮৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা কোন ভাষায় ছিল? [জ্ঞান]
ক বাংলা খ ইংরেজি
গ উর্দু ঘ আরবি **খ**

৮৬. বাংলাদেশে প্রথমে কে সংবিধান প্রণয়নের কথা ভাবেন এবং কার্যক্রম শুরু করেন? [জ্ঞান]
ক ড. কামাল হোসেন খ মাওলানা ভাসানী
গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ আতাউল গণি ওসমানী **গ**

৮৭. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যে সকল নির্দেশনা ছিল সেগুলো হলো— [অনুধাবন]
i. অস্থায়ী সরকার গঠন
ii. যুদ্ধের কলা-কৌশল
iii. শত্রু মোকাবেলার উপায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৪: বাংলাদেশের সংবিধান

প্রশ্ন ▶১ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। যা গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে তোমার পঠিত কোনো দেশের সংবিধানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধান অনুযায়ী "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হলো চারটি।

খ মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ হয় সেইগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মৌলিক অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো মৌলিক অধিকার।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি সংবিধান থাকে। কারণ সংবিধানের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ কারণেই স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশের একটি সংবিধান প্রণীত হয়। এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনই 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা লাভের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। এর মূলনীতি হিসেবে যে বিষয়গুলোকে গণ্য করা হয় সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। আর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। এরপর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পর পরই তিনি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অনতিবিলম্বে সংবিধান প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর এটি গণপরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ৪টি বিষয়কে নির্দিষ্ট করা হয়। এগুলো হলো বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে গণতন্ত্র। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ ও সকল ধর্মের মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা। এ আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সংবিধান এবং 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানের সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধান অনুযায়ী অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'— বক্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সংবিধানের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ সংবিধানে জনগণের সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে— 'জনগণই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস'। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবে। অর্থাৎ এ সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন রয়েছে। গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ঘোষণা করে সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের ক্ষমতায়ন স্বীকার করে নেয়ার পাশাপাশি মৌলিক অধিকারকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। আইন ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না যাতে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। সর্বক্ষেত্রে জনগণের ক্ষমতায়ন হলেও দেশ আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আইনের দ্বারা প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিধিব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে দেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, এর যে কোনো স্থানে বসবাস, শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার, শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার সকলের থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এর প্রতি অদম্য স্পৃহাই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই সংবিধানে গণতন্ত্র তথা জনগণের ক্ষমতায়নকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]

ক. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কাকে বলে? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত '?' চিহ্নিত স্থানে রাষ্ট্র পরিচালনার কোন বিষয়টি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রজাতন্ত্রের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত বা অবসর, অর্থদণ্ড, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি যে প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে তাকে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলে।

খ তৃনমূল পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অত্যন্ত জরুরি।

Teachingbd24.com

কোনো এলাকার সমস্যা স্থানীয় সরকারই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে এবং সে অনুযায়ী সমাধানের ব্যবস্থাও দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে পারে। এমনকি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃনমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়। এসব প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রের খুঁটিস্বরূপ এবং এগুলোর মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকশিত হয়। তাই বলা যায়, আধুনিককালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ৮ম থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদে এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যে সব মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তির জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এ সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হবে। উদ্দীপকে এ মূলনীতিগুলোরই উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দীপকে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ চারটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা বাংলাদেশে সংবিধানের মূলনীতি। জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মূলনীতির প্রধান ও প্রথম নীতি। একই মূল্যবোধ ও মানসিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যে ঐক্য তাই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রাণ। ১৯৭২-এর বাংলাদেশে সংবিধানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও ন্যায়ানুগ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত এ মূলনীতিটি সংক্ষেপে সমাজতন্ত্র হিসেবে পরিচিত। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মালিক হবে জনগণ তথা রাষ্ট্র। তবে ব্যক্তিগত মালিকানা বহাল থাকবে। আবার বাংলাদেশ সংবিধানে গণতন্ত্রকেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। উপরে আলোচিত এ চারটি বিষয়ই উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থাৎ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য অপরিসীম।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত বা অলিখিত বিধি-বিধানের সমষ্টি। একটি রাষ্ট্রের সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য এবং উভয়ের সম্পর্কের প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকে। বাংলাদেশের শাসন পরিচালনার জন্যেও ১৯৭২ সালে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সংবিধানে চারটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। যথা- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না। এখানে জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। এ দেশে বসাবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালন, চর্চা ও প্রচার করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীকে যেমন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না তেমনি তার প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণও করা যাবে না। মোটকথা, সমাজজীবন থেকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হবে এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।

তাই বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার তাৎপর্য অপরিসীম। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল মানুষ সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং কারও প্রতি কোনোরূপ ধর্মীয় বৈষম্য করা হয় না।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব রশিদ একটি সংগঠনের প্রধান নির্বাহী। দায়িত্ব নেবার পর তিনি সংগঠনটি পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেন। সংগঠনটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা ও অন্যান্য সংগঠনের নীতিমালা পর্যালোচনা করে নীতিমালাটি তৈরি করা হয়। নীতিমালায় সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য, সংগঠন পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে নীতিমালাটি বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. স্থানীয় শাসন কাকে বলে? ১

খ. মৌলিক অধিকার কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিমালার সাথে বাংলাদেশ সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগত মিল কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত নীতিমালাটির সংশোধন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব আদায় এবং সরকারি নীতি, আদর্শ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকে স্থানীয় শাসন বলে।

খ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা এবং সুস্থ, সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য মৌলিক অধিকার প্রয়োজন।

যেসব অধিকার পূরণ ব্যতীত মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাই মৌলিক অধিকার। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার। এসব অধিকার পূরণ ছাড়া নাগরিকরা সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

গ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের দিক বিবেচনায় উদ্দীপকের নীতিমালার সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের পদ্ধতিগত মিল রয়েছে।

১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পরিচালনার মূল দলিল হিসেবে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরে গণপরিষদ আদেশ জারি ও সংবিধান কমিটি গঠন করা হয় এবং যাচাই-বাছাই শেষে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এ সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। উদ্দীপকের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সংগঠনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে জনাব রশিদ সংগঠনটি পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এক্ষেত্রে সদস্যদের সাথে আলোচনা, অন্যান্য সংগঠনের নীতিমালা পর্যালোচনা প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। সংবিধান রচনার জন্য ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন। এ আদেশবলে গণপরিষদ প্রথম অধিবেশনে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কয়েকজন সদস্য যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ সফর করে তাদের সংবিধান পর্যালোচনা করেন। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর

Teachingbd24.com

গণপরিষদে তারা একটি খসড়া সংবিধান বিল উত্থাপন করেন। এটি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পাঠ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ৪ নভেম্বর গৃহীত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রেখে এটি এ পর্যন্ত ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের নীতিমালা প্রণয়নের সাথে বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে।

ঘ উক্ত নীতিমালাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— উক্তিটি যথার্থ।

সরকারের বিভিন্ন কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মনোভাব, আইনের শাসন, শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ এসব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়, আইনের শাসন নিশ্চিত হয় এবং মানুষের মৌলিক অধিকার একটি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আসে। এজন্য সংবিধানকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করা আবশ্যক।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক শক্তি হচ্ছে একটি উত্তম সংবিধান। সমাজ ও রাজনীতি যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি সংবিধানও নিয়ত পরিবর্তনশীল। গতিশীল রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকে খাপখাওয়াতে কখনো কখনো দেশের সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমাজ ও রাজনীতির অগ্রগতি ও প্রগতির সাথে সাথে যদি সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সূচিত না হয় তাহলে সমাজ স্থবির হয়ে পড়ে এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ব্যাহত হয়। সর্বোপরি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। কাজেই সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের সংবিধানে সংশোধনী এসেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। পরিশেষে বলা যায়, সংবিধান সংশোধন যদি জনগণের কল্যাণে হয় তবে সংবিধান সংশোধন সুশাসন বয়ে আনে।

প্রশ্ন ▶ ৪ 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মৌলিক অধিকার কী? ১

খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো সংবিধানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্র প্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধা, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

খ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে এমন সংবিধানকে বোঝায় যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধতি জটিল হয়। সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে এ সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ— বাংলাদেশের সংবিধানের কথা বলা যায়। এ সংবিধানের কোনো ধারার পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন। এটি কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিও থাকতে হবে। সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদে এ সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়েছে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংবিধান অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংবলিত সর্বোচ্চ দলিল। এর মাধ্যমেই জনগণের দাবি পূরণ, রাষ্ট্রের উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের সার্বিক কার্য সম্পাদিত হয়। তাই সংবিধান এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিই পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি করা হয়েছে। এতে জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে। এ সংবিধানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শোষণমুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় বাংলাদেশের সংবিধান থেকে। এছাড়া এ সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার তথা সকল প্রকার ধর্মীয় বৈষম্য বিলোপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়েছে। এতে জনগণের সব ধরনের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি বিপ্লব, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে যা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণের সার্বিক স্বার্থ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান।

প্রশ্ন ▶ ৫ সুমাইয়ার দেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইত্যাদি এ 'সংবিধানের' মূল বৈশিষ্ট্য। এ সংবিধান সংশোধনের জন্য আইনসভার তিন-চতুর্থাংশের সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন। সংবিধানটিতে জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্র চালনার 'মূলনীতির' কোনো উল্লেখ নেই। *[চা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪; চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়? ১

খ. বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম-তুমি কি একমত? যুক্তি দিয়ে লেখো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়।

খ বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তন। নতুন এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেন। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে বলে বলা হয়। মন্ত্রিপরিষদ তার কার্য ও নীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। মোটকথা, দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সংকুচিত করে প্রধানমন্ত্রীকে অসীম ক্ষমতাশালী করা হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ২৬-৪৭নং অনুচ্ছেদে।

উদ্দীপকের সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে লিখিত সংবিধান, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে, যেগুলোর সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম— বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকে সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো— লিখিত সংবিধান, সংসদীয় সরকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার। তথাপি উদ্দীপকের সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ সন্নিবেশিত আছে; যা সুমাইয়ার দেশের সংবিধানে নেই। এই দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করা আছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি হলো— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বাংলাদেশের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। এবং বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহজও নয়, আবার কঠিনও নয়। যা সুমাইয়ার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেয়। এই দিক থেকেও বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। তাই উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ থাকায় বাংলাদেশের সংবিধান উদ্দীপকের সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ▶৬ রাইমার দেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং শক্তিশালী মন্ত্রিপরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। আইনসভার সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। *[বি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কত তারিখে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়? ১

খ. পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতিতে কী পরিবর্তন আনা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানে বাংলাদেশ সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয়নি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাইমার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির তুলনায় তোমার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। উক্তিটির সপক্ষে তোমার মতামত পেশ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

খ পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধানের ৪টি মূলনীতির মধ্যে গণতন্ত্র ছাড়া বাকি তিনটিতেই পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

পঞ্চম সংশোধনীতে জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা আনা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আনা হয়। পঞ্চম সংশোধনীতে সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার হিসেবে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাইমার দেশের সংবিধানে বাংলাদেশ সংবিধানের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি। নিচে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো-

১. **সর্বোচ্চ আইন :** বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়, তাহলে ঐ আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। রাইমার দেশের সংবিধানে এ ধরণের কিছু বলা হয়নি।

২. **প্রজাতন্ত্র :** বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগ ছিল নতুন প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ। এটি বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে। এতে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা, রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় ফুল এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। রাইমার দেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

৩. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** রাইমার দেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা কিছু না বলা হলেও বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২২নং অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয় এর নাম হবে সুপ্রিম কোর্ট।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা রাইমার দেশের সংবিধানে বলা হয়নি।

ঘ রাইমার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির তুলনায় আমার দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আমি উক্তিটির সাথে একমত।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাইমার দেশের আইনসভার সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ বিধি অনুযায়ী সংবিধান পরিবর্তন করতে সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পাওয়া একটি দুঃসাধ্য বিষয়। মোটকথা, এটি আধুনিককালে গ্রহণযোগ্য কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করতে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। যেমন- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

(১) এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও

(ক) সংসদের আইনের দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামায় এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হবে বলে স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ গৃহীত না হলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে না;

(খ) উপরিউক্ত উপায়ে কোনো বিল গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তা উপস্থাপিত হলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে।

উপরিউক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাইমার দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৭ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বৎসরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এই সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।' *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সংবিধান কী? ১

খ. সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের সাথে কোন দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত ও অলিখিত কিছু মৌলিক নিয়ম-নীতি হলো সংবিধান।

খ সংসদীয় গণতন্ত্র এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। এখানে শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ তাদের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইনবিভাগের নিকট দায়বদ্ধ। কারণ তারা একই সাথে শাসনবিভাগের এবং আইনবিভাগের সদস্য। এছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিপরিষদ।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৮ দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম করে 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ব্রিটেন ও ভারতের সংবিধানের উত্তম বিষয়সমূহের অনুকরণে একটি সংবিধান রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত সংবিধানে সংসদীয় ব্যবস্থার উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহও প্রতিফলিত হয়। এ সংবিধান দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশোধন করা যায়। *[চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশ সংবিধান কবে হতে কার্যকর হয়? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানের যে কোনো একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্যসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানটি কি উত্তম সংবিধান? তবে কেন? যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

খ বাংলাদেশের অন্যতম মূলনীতি হলো জাতীয়তাবাদ।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদের ধারণা পাওয়া যায়। এখানে বলা আছে যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে; বাঙালি জাতির সেই ঐক্য ও সংহতিই হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। আমরা বাঙালি, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র। এ জাতীয়তাবাদ এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, আমরা একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতি।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৯ মজিদ মোল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে অধ্যয়নরত। বিভিন্ন দেশের সংবিধানের বিবর্তনের ইতিহাস পড়তে গিয়ে সে দেখল একটি দেশ অতি দ্রুততার সাথে একটি অনন্য প্রকৃতির সংবিধান রচনা করেছে। সংবিধানে নাগরিকদের আইনের দৃষ্টিতে সমতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। *[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয় কোন সালে? ১

খ. বাংলাদেশ সংবিধানের যেকোনো একটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সাথে কোন দেশের সংবিধান রচনার মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশটির সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ছাড়াও তোমার দেশের সংবিধানে আর যেসব মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয় ৩০ জুন, ২০১১ সালে।

খ বাংলাদেশে সংবিধানের ৪টি মূলনীতির অন্যতম হলো জাতীয়তাবাদ।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদের ধারণা পাওয়া যায়। এখানে বলা আছে যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে; সেই ঐক্য ও সংহতিই হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। আমরা বাঙালি, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা। এ জাতীয়তাবাদ এটাই প্রমাণ করে, আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি, আমরা একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সাথে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার মিল পাওয়া যায়। কারণ বাংলাদেশ অতি দ্রুততার সাথে একটি অনন্য প্রকৃতির সংবিধান রচনা করেছে। বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করতে মাত্র নয় মাস সময় লাগে এবং সেখানে জনগনের সকল অধিকার সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে আইন মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ৭৪টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান বিল উত্থাপন করে যা, গণপরিষদে বিস্তারিত আলোচনা শেষে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয়।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, উদ্দীপকের দেশটির সংবিধান রচনার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের দেশটির সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সাথে আমার দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার ছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানে আরো কিছু মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত আছে। এগুলো হলো—

১) সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে এবং পাশাপাশি ২৮ থেকে ৩০ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৮: কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন।

অনুচ্ছেদ ২৯ : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৩১ : আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার।

Teachingbd24.com

অনুচ্ছেদ ৩২ : জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার।
অনুচ্ছেদ ৩৩ : গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ।
অনুচ্ছেদ ৩৪ : জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।
অনুচ্ছেদ ৩৭ : সমাবেশের স্বাধীনতা।
অনুচ্ছেদ ৩৯ : চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা।
অনুচ্ছেদ ৪০ : পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা।
অনুচ্ছেদ ৪২ : সম্পত্তির অধিকার।
অনুচ্ছেদ ৪৩ : গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ।
অনুচ্ছেদ ১০২ : মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।

প্রশ্ন ▶ ১০ আয়ান উচ্চ শিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যায়। সেই দেশের সংবিধান অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয়। শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। সেখানে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান ও আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। সে দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থা বিদ্যমান। *[বি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৫; আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), বেড়া, পাবনা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মৌলিক অধিকার কী? ১
খ. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বৈসাদৃশ্য লক্ষ কর, তার বর্ণনা দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রপ্রদত্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য সেগুলোই মৌলিক অধিকার।

খ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলো কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করাই এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য । এ জন্য সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতকগুলো মৌলিক নীতি নির্ধারণ করা থাকে। এ নীতিগুলো হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। সরকার এই মূলনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ড নামক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে তা হলো–

প্রথমত, উদ্দীপকে উক্ত দেশের মত বাংলাদেশেও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে রাষ্ট্রপতি হবেন নামমাত্র শাসক। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নামে যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করেন।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সংবিধান উদ্দীপকের দেশের ন্যায় এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সকল সরকারি ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করে।

তৃতীয়ত, উক্ত দেশের ন্যায় বাংলাদেশে সংবিধান অনুসারে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়েছে।

চতুর্থত, বাংলাদেশ সংবিধানে বলা হয়েছে যে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এতে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের সকল কার্যাবলি পরিচালিত হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।

পঞ্চমত, বাংলাদেশ সংবিধানে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নর-নারীর ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এতে কোনো রকম বৈষম্য করা হয় নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ড নামক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত। প্রথা, রীতিনীতি এবং আদর্শের উপর ভিত্তি করে দেশটি পরিচালিত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত এবং সংক্ষিপ্ত।
২. যেহেতু ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত, সেহেতু এই দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। অপরদিকে বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত হওয়ায় এটি দুষ্পরিবর্তনীয়। এই সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে গৃহীত ও কার্যকর হয়।
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। এতে রাজা বা রানি রাষ্ট্রপ্রধান। অন্যদিকে বাংলাদেশ সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপ্রতি পদটি নামমাত্র। তার নামে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সকল রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ সুফিয়া অর্থাভাবে তার ১২ বছরের মেয়ে কাজলীর পড়ালেখার খরচ বহন করতে পারছিল না। তাই সে সাহায্যের জন্য শহরে তার ধনী আত্মীয়ের বাড়ি যায়। তিনি তার মেয়ের পড়াশোনার ভার নেন। মেয়েকে আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যায়। এক বছর পর সে জানতে পারে কাজলী লেখাপড়ার কোনো সুযোগই পায়নি। তাকে জোরপূর্বক বাড়ির সব কাজ করানো হয়। তাই সুফিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে বাংলাদেশের একটি আদালতের শরণাপন্ন হয়। *[বি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান কে? ১
খ. গণভোট বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজলী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত কোন অধিকার হতে বঞ্চিত? সেই অধিকারসমূহ উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কাজলীর মতো অসহায় মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের কোন বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে এবং কীভাবে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব।

খ গণভোট বলতে কোনো বিষয়ে জনমত যাচাইকে বোঝানো হয়। যদি কোনো বিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের আইনই যথেষ্ট বলে মনে না হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের পূর্বে রাষ্ট্রপতি জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেন। এটাই গণভোট নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজলী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেসব অধিকার পূরণ করা অপরিহার্য সেগুলোই মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

এখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া নাগরিকের কর্মের অধিকার থাকবে এবং রাষ্ট্র যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিবে। পাশাপাশি নাগরিকের বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার থাকবে। তাছাড়া রাষ্ট্র নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এছাড়া সংবিধানে তৃতীয় ভাগে কতিপয় মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো–

১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, ২. সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, ৩. উপাধী, সম্মান ও ভূষণের বিলোপ সাধন, ৪. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, ৫. জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ৬. গ্রেফতার বা আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, ৭. জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ, ৮. বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ, ৯. চলাফেরার স্বাধীনতা, ১০. সমাবেশের

Teachingbd24.com

স্বাধীনতা, ১১. সংগঠনের স্বাধীনতা, ১২. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা, ১৩. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ১৪. ধর্মীয় স্বাধীনতা, ১৫. সম্পত্তির অধিকার, ১৬. গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ ইত্যাদি।
উদ্দীপকে দেখা যায়, কাজলী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া তাকে দিয়ে জোরপূর্বক বাড়ির কাজ করানো হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, কাজলী সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ঘ উদ্দীপকে কাজলীর মতো অসহায় মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকর করার সকল দায়িত্ব হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ মর্মে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে।
এক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজলী তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে উক্ত বিভাগের শরণাপন্ন হতে পারবে। অপরদিকে যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ দেশের সকল অধস্তন আদালন ও ট্রাইব্যুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন; সেহেতু উদ্দীপকের কাজলী অধস্তন আদালতের মাধ্যমেও হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মৌলিক অধিকার ফিরে পেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১২ অধ্যাপক নাজমা আক্তার শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে গিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। ইচ্ছে করলেই সংবিধান সংশোধন করা যায় না। এটি সংশোধন করার পদ্ধতি স্পষ্ট করে সংবিধানর 'দশম ভাগ' এ উল্লেখ রয়েছে। সেখানে সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধান পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতাই চরম ও চূড়ান্ত। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কোনটি? ১
খ. প্রজাতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশ সংবিধান পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান।

খ যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন তাকে প্রজাতন্ত্র বলে।
প্রজাতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকারের একটি রূপ। তবে সব প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি একইরূপ নয়। কোনো কোনো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতিটি হলো সংশোধন প্রক্রিয়া।
প্রত্যেক দেশের সংবিধানে এর সংশোধনের বিধান থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদে সংশোধনের নিয়মাবলি বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। বাংলাদেশ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় এবং একে সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় না, বরং বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই সংশোধন করা যায়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৪২নং অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন করে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদ সংবিধানের যেকোনো বিধানকে সংশোধন করতে পারে। সংবিধান সংশোধনের কোনো বিলই সংসদের বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না, যদি না উক্ত বিলের শিরোনামে সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে। সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট পেশ করা হবে। এরূপে সংসদে গৃহীত কোনো সংবিধান সংশোধনী বিল যখন রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয় তখন তিনি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতিদান করবেন। কিন্তু তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য করা হবে।

ঘ বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা শুধু জাতীয় সংসদের।
বাংলাদেশ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধানে লিখিত আছে যে, জাতীয় সংসদ সংবিধানের যেকোনো বিধানকে সংশোধন করতে পারে। সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট পেশ করা হবে। সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এরূপ কোনো বিলই সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে না, যদি না এটি সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়।" এভাবে সংসদে গৃহীত কোনো সংশোধনী বিল যখন রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয়, তখন তিনি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য করা হবে। বিলটি বিধিবদ্ধ ও কার্যকর হবে।
রাষ্ট্রপতির ১৫তম সংশোধন আদেশে (১৯৭৮) বলা হয়, "সংবিধান প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সংশোধন প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হলে রাষ্ট্রপতি এক গণভোটের আয়োজন করবেন। গণভোটে ওই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরতে হবে। অন্যথায়, তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করবে না।" দ্বাদশ সংশোধন আইনের ক্ষেত্রে এভাবে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ১৫ অক্টোবর। তবে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে 'গণভোট' ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।
বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধনের উপর্যুক্ত নিয়মাবলি থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, একমাত্র জাতীয় সংসদই মূলত সংবিধান সংশোধন বা রহিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠিত হয়। এ কমিটি ১০ জুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে। ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তা ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। এ পর্যন্ত এ সংবিধানের ষোলটি সংশোধনী করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সংবিধানের একটি সংশোধনীকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছে। উক্ত সংশোধনী রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আমূল পরিবর্তন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করেছিলো। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. কে, কখন 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন? ১
খ. গণপরিষদ গঠন করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পূর্বের ও পরের অবস্থানের তুলনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীকে সর্বোচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং তা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করেছিল? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

Teachingbd24.com

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশ জারি করেন।

খ সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণপরিষদ গঠন করা হয়।
সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এ আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হবে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ জন সদস্য, সর্বমোট ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্য থেকে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এর মধ্যে ৪০০ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়, একজন ন্যাপ (মোজাফফর) এবং অন্য ২ জন ছিলেন স্বতন্ত্র।

গ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পূর্বের ও পরের অবস্থানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।
জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির প্রধান ও প্রথম নীতি। সংবিধানের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সংযোজিত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' সংশোধন করে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা পুনরায় 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'কে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি) কথাগুলো সংযোজন করা হয়। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংশোধন করে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এবং 'সমাজতন্ত্রের' স্থলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার-সংযোজন করা হয়। এছাড়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'মুক্তি সংগ্রাম' এর পরিবর্তে 'স্বাধীনতাযুদ্ধ' শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনরায় রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতিগুলো ফিরিয়ে আনা হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে সর্বোচ্চ আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং উক্ত সংশোধনী মূলনীতিগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করেছিল।
জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির প্রধান ও প্রথম নীতি। সংবিধানে বর্ণিত আছে যে, ভাষা ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, বাঙালি জাতির সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। এখানে জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের আসল পরিচয় ছিল তারা বাঙালি। ধর্ম নিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনাকে বিনষ্ট করা হয়েছিল। ওই সময়ের শাসকরা সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।
ওপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৪ এক রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্রে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হয়। সংবিধানটি ছিল লিখিত এবং এতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. শহীদ তিতুমীরের নাম কী? ১
খ. '৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে যে দেশের সংবিধানের মিল আছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষ উক্তিটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহীদ তিতুমীরের নাম ছিল সৈয়দ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

খ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো:
১. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন উক্ত সালের ১৪ আগস্ট হতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায় এবং ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তান এবং ভারত ইউনিয়ন নামক দুটি নতুন ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে। আইনটি ডোমিনিয়ন দুটির আইনগত সার্বভৌমত্বও সেই সাথে স্বীকার করে নেয়।
২. ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন দুটি— ডোমিনিয়নের জন্য দুটি পৃথক গণপরিষদ গঠন করে। এই গণপরিষদ দুটির উপর দুই দেশের শাসনতন্ত্র রচনার ভার অর্পণ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত শাসনতন্ত্র প্রণীত না হবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত গণপরিষদ দুটি স্ব স্ব দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ রূপে কাজ করবে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়? ১
খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো সংবিধানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়।

খ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।
প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচারব্যবস্থা হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।"

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৬ টুম্পা দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্রী। সে তার খাতায় একটি দেশের সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখে। তথ্যগুলো হলো— লিখিত সংবিধান, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, প্রজাতন্ত্র এবং মৌলিক অধিকার। *[হলি ক্রস কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মূলনীতির নাম লিখ। ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের তথ্যগুলো কোন দেশের সংবিধানে রয়েছে? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত টুম্পার লেখা তথ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের সকল বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেনি-বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী টুম্পা খাতায় একটি দেশের সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লেখে। যেমন i. লিখিত সংবিধান, ii. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, iii. প্রজাতন্ত্র, iv. মৌলিক অধিকার; যা বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো—

লিখিত সংবিধান: বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত। মোট ৮২ পৃষ্ঠার এ সংবিধানে আছে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, যা ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং যাতে ১টি প্রস্তাবনা ও ৭টি তফসিল আছে।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধানের কোনো ধারা বা অংশবিশেষ পরিবর্তন করতে হলে সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন হয়।

প্রজাতন্ত্র: বাংলাদেশ একটি প্রজাতন্ত্র। একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান। যার নামে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হবে এবং তিনি সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

মৌলিক অধিকার: বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে। সেখানে নাগরিকদের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে।

ঘ টুম্পার লেখা তথ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি।

টুম্পার লেখা তথ্য ছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানের আরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সবকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদ হবে শাসনকার্য পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। এর মাধ্যমে জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে।

এছাড়া ন্যায়পাল, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সর্বজনীন ভোটাধিকার, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, মালিকানা রীতি ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, টুম্পার লেখা তথ্যে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি বিষয় থাকলেও সকল বিষয় এতে ফুটে ওঠেনি।

প্রশ্ন ▶ ১৭ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি রাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলছিলেন। উক্ত রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। রাষ্ট্রটিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। *[হলি ক্রস কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে? ১

খ. সচিবালয় বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে— তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

খ সচিবালয় বলতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহ নিয়ে গঠিত প্রশাসনিক সংস্থাকে বোঝায়।

সচিবালয় হলো একটি দেশের তথা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। সরকারি যাবতীয় কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম সচিবালয়ে গৃহীত হয়। সচিবালয় বিভিন্ন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে। সর্বোপরি দেশের প্রশাসন যন্ত্রকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদনকারী দপ্তরই হলো সচিবালয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের সাথে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো—

সরকার ব্যবস্থা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। অপরদিকে বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

শাসন পদ্ধতি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই রাষ্ট্র পরিচালনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের সর্বময় নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

আইনসভা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান। একটি হলো উচ্চকক্ষ বা সিনেট এবং আরেকটি হলো নিম্নকক্ষ। আর বাংলাদেশ সংবিধানে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান। বাংলাদেশ আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত রাষ্ট্র অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত। নিচে এই দুটি শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক। কিন্তু সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী সরকার পরিচালনা করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে আইনসভা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। আইনসভা ইচ্ছা করলে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে অপসারণ করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতে আইনসভা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। আইনসভা সংবিধানের নির্দিষ্ট পথে বিশেষ অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন ও অপসারণ করতে পারে না।

Teachingbd24.com

মন্ত্রিপরিষদ সরকারে মন্ত্রিসভা তাদের সকল নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ সাধারণত আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে ক্ষমতা একত্রীকরণ ঘটে। এখানে আইনসভা ও শাসন বিভাগ পৃথক সত্তা হিসেবে অবস্থান করে না। অন্যদিকে, আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব আইনসভার আস্থার ওপর নির্ভরশীল। আইনসভার আস্থা হারালে প্রধানমন্ত্রীসমেত মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতে আইনসভা সংবিধান লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে না।
আলোচনা শেষে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। যা গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. যুক্তফ্রন্ট এর নেতৃত্বে কে ছিলেন? ১
খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে তোমার পঠিত কোন দেশের সংবিধানের সাদৃশ্য আছে? উক্ত দেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধান অনুযায়ী "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

খ মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য।
মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ করা হয়, সেগুলোই মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

গ উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।
উদ্দীপকে রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর এক বছরের মধ্যে রাষ্ট্রটি একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এ সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। এ সংবিধনে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান রাখা হয়েছে এ সংবিধানে। জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ থেকে ৪৪ নং অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।
এই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ৪টি বিষয়কে নির্দিষ্ট করা হয়। এগুলো হলো বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে গণতন্ত্র। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ ও সকল ধর্মের মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা। আর এসব মূলনীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংবিধান গোটা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ 'ক' দেশের নাগরিকগণ তাদের ইচ্ছামতো ধর্ম চর্চা করতে পারে। এছাড়াও সে দেশের সংবিধানে জনগণের চলাফেরার, বাক, স্বাধীনতার অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে সেদেশের নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারে না। *[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বাংলাদেশের বিভাগ কয়টি ও কী কী? ১
খ. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ২টি কাজ লিখ। ২
গ. 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কতটুকু মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান কোন অর্থে 'ক' দেশের সংবিধান থেকে অধিক গণতান্ত্রিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বিভাগ ৮টি। এগুলো হলো— ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও ময়মনসিংহ।

খ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দুটি কাজ উল্লেখ করা হলো—
১. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে এ সংস্থা যাচাই ও পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।
২. সুষ্ঠুভাবে সরকারি কর্ম পরিচালনার জন্য নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগতভাবে কর্মচারি মনোনয়ন ও নিয়োগ করার দায়িত্ব সরকারি কর্মকমিশনের ওপর ন্যস্ত।

গ 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।
'ক' দেশের নাগরিকগণ ইচ্ছেমতো ধর্মচর্চা করে। তার দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার অর্থাৎ জনগণের চলাফেরার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানেও মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। ধর্ম ,বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী, পুরুষ ভেদে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।
সকল নাগরিক সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, এর যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করতে পারে। তবে জনগণের স্বার্থে আইনের দ্বারা এই স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ আরোপ করা যাবে। অতএব বলা যায় যে, 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'ক' দেশের সংবিধানে জনগণের চলাফেরার অধিকার ও বাক স্বাধীনতার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সে দেশের নাগরিকগণ ইচ্ছামতো ধর্ম চর্চা করতে পারেন কিন্তু তা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত কি না সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয় নি। তাছাড়া সে দেশের নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারেন না। অর্থাৎ সে দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই।
বিপরীত দিকে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত প্রধান মৌলিক অধিকারগুলো হলো- আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী প্রভৃতি কারণে বৈষম্যহীনতা, সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে

Teachingbd24.com

রক্ষাকবচ, জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধকরণ, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, গৃহে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার।

অর্থাৎ 'ক' দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সংবিধানে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলো মূলত ভোগ করে থাকে দেশের নাগরিকগণ। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও উদ্দেশ্য হলো নাগরিক সুযোগ সুবিধাকে নিশ্চিত করা। এ আলোচনার দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়, মৌলিক অধিকারের অর্থে 'ক' দেশের সংবিধান থেকে বাংলাদেশের সংবিধান অধিক গণতান্ত্রিক।

প্রশ্ন ▶ ২০ সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয় এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন। আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। *[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মৌলিক অধিকার কী? ১

খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন সাধন করে? বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র প্রদত্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য সেগুলোই মৌলিক অধিকার।

খ ধর্মনিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্ম পালনের যেকোনো প্রকার বৈষম্যের স্বীকার হতে রক্ষা পাওয়ার অধিকার।

ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না। এখানে জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। রাষ্ট্রে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ধর্মপালন, চর্চা ও প্রচার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীকে যেমন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না, তেমনি তার প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণও করা যাবে না। মোট কথা, সমাজ জীবন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হবে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী এবং এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করে।

১৯৯১ সালের ২ জুলাই তৎকালীন আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সংবিধান সংশোধন বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট দ্বাদশ সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয় গৃহীত হয়। এর ফলে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংক্ষিপ্তকরণ, রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে স্পিকারের দায়িত্ব পালন, উপরাষ্ট্রপতি উপপ্রধানমন্ত্রী পদ বিলোপ ইত্যাদি সংশোধনী কার্যকর হয়। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেন। আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী দ্বাদশ সংশোধনী ফলে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী এবং এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ১৬ বছর পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনিই হন সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করা হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের উপর ন্যাস্ত করা হয় এবং উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণের ব্যবস্থা রাখা হয়। আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংসদ পরিচালনার বিধান রাখা হয়। উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ করার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে একক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিধানাবলী এবং সংশোধনীর সাথে ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনী সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ সংশোধনী দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিপরিষদ এবং স্থানীয় শাসনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তন আনয়ন করে সমগ্র সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করা হয় এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন এবং আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন কে? ১

খ. মৌলিক অধিকার কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত সংশোধনীটি বাংলাদেশের সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন ড. কামাল হোসেন।

খ মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ করা হয়, সেগুলোই মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী এবং তা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা চালু করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক, উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত এবং প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন। পাঠ্য বইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি পদকে নিয়মতান্ত্রিক, উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত এবং প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে ওঠে এবং পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হয়। অতএব উদ্দীপকের সাথে পাঠ্য বইয়ের দ্বাদশ সংশোধনীর হুবহু মিল রয়েছে।

https://teachingbd24.com

১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারি তা বাতিল করা হয়। এরপর দীর্ঘ ১৬ বছর পর ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হয়। এ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট নামমাত্র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নামে যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

ঘ প্রশ্নে উল্লিখিত উক্ত সংশোধনী বলতে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীকে বোঝানো হয়েছে। এ সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তা হলো-

১. **জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ:** বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে শব্দগুলো সন্নিবেশিত হয়।

২. **রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত:** দ্বাদশ সংশোধনী আইনে সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সকল কাজ করবেন। তার কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। তাছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের জন্যে তিনি জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে অভিশংসিত হয়ে অপসারিত হবেন।

৩. **উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলোপ:** দ্বাদশ সংশোধনী (১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন) আইন দ্বারা উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিধান করা হয় কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বা তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে জাতীয় সংসদের স্পিকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. **প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত:** দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক ও সরকার প্রধানে পরিণত হন। জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে দেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালিত হবে।

৫. **উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ:** দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ ঘোষণা করা হয়।

৬. **জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত:** সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। এছাড়া ৭০ নং এবং ১৪৫ এর (ক) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, এ সংশোধনী বাংলাদেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২২ বব ডিলানের দেশের সংবিধান একটি 'সংবিধান প্রণয়ন কমিটির' মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়। এ সংবিধান লিখিত এবং সংসদীয় সরকার, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা উল্লেখ আছে। কিন্তু এটি অনেকবার সংশোধন হয়েছে এবং আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সমর্থনে তা সংশোধন হয়।

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল | প্রশ্ন নং ৬]

ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি ও কী কী? ১

খ. রাষ্ট্রপতির অপসারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বব ডিলানের দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের সংবিধান বব ডিলানের দেশের সংবিধানের চেয়ে উত্তম'— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি। যথা- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

খ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় অভিশংসন।

সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি সংবিধান থাকে। কারণ সংবিধানের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ কারণেই স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই বিষয়টি উদ্দীপকের বব ডিলানের দেশের সংবিধানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। এতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ রয়েছে। বব ডিলানের দেশের সংবিধানও লিখিত এবং এতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে। ডিলানের দেশের সংবিধানও অনেক বার সংশোধন করা হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের সংবিধান বব ডিলানের দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম– বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকে বব ডিলানের দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো– আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণয়ন, লিখিত সংবিধান, সংসদীয় সরকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। তথাপি উদ্দীপকের বব ডিলানের দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। কেননা বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ সন্নিবেশিত আছে; যা বব ডিলানের দেশের সংবিধানে নেই। এই দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি হলো— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বাংলাদেশের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট এবং বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহজও নয়, আবার কঠিনও নয়। যা বব ডিলানের দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেয়। এই দিক থেকেও বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধান উদ্দীপকের বাব ডিলানের দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ২৩ দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম করে 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ব্রিটেন ও ভারতের সংবিধানের উত্তম বিষয়সমূহের অনুকরণে একটি সংবিধান রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত সংবিধান সংসদীয় ব্যবস্থার উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহও প্রতিফলিত হয়। এ সংবিধান দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশোধন করা যায়।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৭]

Teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশ সংবিধান কবে হতে কার্যকর হয়? ১
খ. বাংলাদেশের সংবিধানের যেকোনো একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্যসমূহ আলোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানটি কি উত্তম সংবিধান? যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

খ বাংলাদেশের অন্যতম মূলনীতি হলো জাতীয়তাবাদ।
বাংলাদেশের সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদের ধারণা পাওয়া যায়। এখানে বলা আছে যে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে; বাঙালি জাতির সেই ঐক্য ও সংহতিই হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। আমরা বাঙালি, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এ সংবিধানের উল্লেখ আছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।' *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৮]*
ক. সংবিধান কী? ১
খ. সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের সাথে কোন দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৃজনশীল ৭ নং এর 'ক' প্রশ্নোত্তর দেখো।

খ সৃজনশীল ৭ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে আইন বিভাগের ক্ষমতা লোপ পায়। *[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৫]*
ক. বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ কয়টি? ১
খ. সংবিধান রাষ্ট্রপরিচালনার মূল দলিল— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংশোধনীটি বাংলাদেশে সরকার ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫৩টি।

খ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক বিধি-বিধান তথা একটি জাতির সমগ্র জীবন পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়। তাই একে রাষ্ট্রের দর্পণও বলা হয়। সংবিধান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে এটি কতগুলো লিখিত বা অলিখিত মৌলিক বিধিমালা, যা কোনো রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার ও বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীকে নির্দেশনা করে এবং এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।
বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন। রাষ্ট্রপতিকে তার যাবতীয় কাজে সাহায্য করার জন্য একজন উপরাষ্ট্রপতির পদ প্রবর্তন করা হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদকে রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ করা হয়। যেকোনো মন্ত্রীকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়। এমনকি মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হয়। এ সংশোধনীতে বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতীয় দল গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ দলটি গঠিত হবার সাথে অন্যান্য দলগুলো বাতিল হয়ে যাবে বলেও ঘোষণা করা হয়। সংসদ সদস্যদের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে সকল ক্ষমতার উৎস করা হয়। এ সংশোধনীতে উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয় এবং আইন বিভাগের ক্ষমতা লোপ পায়। এ সবকিছুই বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে দেখা যায়। তাই বলা যায় উদ্দীপকের সংবিধানের সংশোধনীটি চতুর্থ সংশোধনী এবং তা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যাবস্থা চালু করে।

ঘ উক্ত সংশোধনীটি অর্থাৎ চতুর্থ সংশোধনীটি বাংলাদেশে সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।
বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়। এ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতিকে সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদকে রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ করা হয়। যেকোনো মন্ত্রীকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়। এমনকি মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হয়। রাষ্ট্রপতিকে যাবতীয় কাজে সহযোগিতার জন্য একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়।
এ সংশোধনীতে বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতীয় দল গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ দলটি গঠিত হবার সাথে অন্যান্য দলগুলো বাতিল হয়ে যাবে বলেও ঘোষণা করা হয়। সংসদ সদস্যদের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সংসদের মেয়াদ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংশোধিত সংবিধানের অধীনে পূর্ণ ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।
পরিশেষে বলা যায়, চতুর্থ সংশোধনী বাংলাদেশে সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ 'ক' দেশটি জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে তা আইনসভায় পাস করে। উক্ত সংবিধান অনুসারে দেশটির জাতীয় ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং বিচার বিভাগের জনবল শাসন বিভাগের মাধ্যমে নিয়োগের বিধান রাখা হয়। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং-৫]*

https://teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত সরকার ব্যবস্থা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল সাদৃশ্যটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' দেশটির তুলনায় বাংলাদেশের সংবিধান কী উত্তম? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা।

খ বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো এতে প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন। তার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য হয়। তবে এ ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়া হয় এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক বা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশটির সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল সাদৃশ্য হলো সর্বজনীন ভোটাধিকার।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' দেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় যে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে তাতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের উল্লেখ আছে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থার জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। এছাড়া সংবিধানের সপ্তম ভাগের ১২১-১২২ নং অনুচ্ছেদে ভোটার হওয়ার নিয়ম ও যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে উদ্দীপকের 'ক' দেশের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। যখন তখন সংবিধান সংশোধনের নিয়ম নেই। সংবিধানের পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য দশম ভাগে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। বলা হয় যে, সংবিধান সংশোধনের অধিকার কেবল জাতীয় সংসদের।

[লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৫]

ক. জাতীয় সংসদের বর্তমান আসন সংখ্যা কত? ১

খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সর্বশেষ উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের সর্বমোট আসন সংখ্যা ৩৫০টি।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনে গৃহীত বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের শাসনকাজ সম্পাদনের মূল উৎস হলো সংবিধান। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সংবিধান পরিবর্তনও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। এ সংবিধানকে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে পরিবর্তন করা যায়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা সংবিধানের যেকোনো বিধান সংশোধন বা রহিতকরণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের কোনো বিলই সংসদের বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না, যদি না উক্ত বিলের দীর্ঘ শিরোনামে সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া অনুরূপ বিল সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হলে তাতে সম্মতিদানের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হয়। বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের সাত দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করবেন। সম্মতিদানে অসমর্থ হলে উক্ত সাত দিন মেয়াদের অবসানে তিনি বিলে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'সংবিধান সংশোধনের অধিকার কেবল জাতীয় সংসদের সর্বশেষ উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সংবিধানে লিখিত আছে যে, জাতীয় সংসদ সংবিধানের যেকোনো বিধানকে সংশোধন করতে পারে। সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট পেশ করা হবে। সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এরূপ কোনো বিলই সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে না, যদি না এটি সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়।" এভাবে সংসদে গৃহীত কোনো সংশোধনী বিল যখন রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয়, তখন তিনি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য করা হবে। বিলটি বিধিবদ্ধ ও কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির ১৫তম সংশোধন আদেশে (১৯৭৮) বলা হয়, "সংবিধান প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সংশোধন প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হলে রাষ্ট্রপতি এক গণভোটের আয়োজন করবেন। গণভোটে ওই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরতে হবে। অন্যথায়, তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করবে না।" দ্বাদশ সংশোধন আইনের ক্ষেত্রে এভাবে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালের ১৫ অক্টোবর। তবে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে 'গণভোট' ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ ও যথোপযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৮ সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ হওয়ায় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করে উপ-রাষ্ট্রপতির পদকে বিলুপ্ত করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন এবং আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৫]

https://teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি কে ছিলেন? ১
খ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনী সংবিধানের কততম সংশোধনীকে ইঙ্গিত করছে? উক্ত সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. "উক্ত সংশোধনীটি বাংলাদেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন।

খ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে বুঝায় একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
সাধারণত যেকোনো প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত বিদায়ী সরকারের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রথা লক্ষণীয়। এ স্বল্পস্থায়ী সরকার দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে এবং নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে, যাতে এ সরকারের কার্যাবলি নির্বাচনের ফলাফলে কোনো প্রভাব সৃষ্টি না করে। এ সরকার একটি অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে।

গ প্রশ্নে উল্লিখিত উক্ত সংশোধনী বলতে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীকে বোঝানো হয়েছে। এ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-
প্রথমত, বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে শব্দগুলো সন্নিবেশিত হয়।
দ্বিতীয়ত, দ্বাদশ সংশোধনী আইনে সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সকল কাজ করবেন। তার কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। তাছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের জন্য তিনি জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে অভিশংসিত হয়ে অপসারিত হবেন।
তৃতীয়ত, দ্বাদশ সংশোধনী (১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন) আইন দ্বারা উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিধান করা হয় কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বা তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে জাতীয় সংসদের স্পিকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
চতুর্থত, দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক ও সরকার প্রধানে পরিণত হন। জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে দেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালিত হবে।
পঞ্চমত, দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ ঘোষণা করা হয়।
ষষ্ঠত, সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। এছাড়া ৭০ নং এবং ১৪৫ এর (ক) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়।

ঘ 'উক্ত সংশোধনীটি অর্থাৎ দ্বাদশ সংশোধনী বাংলাদেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল' মন্তব্যটি যথার্থ।
বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ সংশোধনীর ফলে দেশে ১৭ বছর পর আবার সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দ্বাদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় রীতি অনুসারে প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। তিনিই হন সরকার প্রধান। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করা হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয় এবং উপ-রাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্ত করা হয়।
সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইনের ৫৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। ৬০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়, জাতীয় সংসদ স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবে।
আলোচনা শেষে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ এবং স্থানীয় শাসনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তন আনয়ন করে সমগ্র সরকার ও শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয় করতে সক্ষম হয়। যা গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়।
[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? ১
খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে তোমার পঠিত কোনো দেশের সংবিধানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হলো চারটি।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধান অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি একটি উত্তম সংবিধানের দৃষ্টান্ত বহন করে। এ সংবিধানের মাধ্যমে মূলত অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথনির্দেশনা দেয়ার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়।
১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। এ সংবিধানর কোনো ধারা বা অংশবিশেষ পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ সংবিধানের ২৭ থেকে ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া এ সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের ধারার সাথে রাষ্ট্রের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পায়।
১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— এতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ২য় ভাগের ৮নং অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া এ সংবিধানর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা ও মালিকানা নীতি স্বীকার করা হয়েছে। এ সংবিধানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

Teachingbd24.com

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত নতুন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। ১৯৭২ সালে প্রণীত এ সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি প্রজ্ঞা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বাধীন দেশের জন্য একটি বাস্তবধর্মী এবং যুগোপযোগী সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶৩০ একটি রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রয়োজনের নিরিখেই ১৯৭২ সালে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? ১

খ. আগরতলা মামলা কেন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩

ঘ. উক্ত সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে কতটুকু সহায়ক ব্যাখ্যা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য অন্য যেকোনো দেশের সংবিধান থেকে আলাদা।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। প্রণীত হয় ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। বিভিন্ন ধাপে সংবিধান প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ করার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। ১৫৩টি অনুচ্ছেদবিশিষ্ট ৮২ পৃষ্ঠার এ সংবিধান ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং এর একটি প্রস্তাবনাসহ ৪টি তফসিল আছে। সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ হবে একটি এককেন্দ্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং তার নামে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী হবেন দেশের প্রধান নির্বাহী এবং শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসনকাজ পরিচালনার ভার অর্পিত হবে। তবে এগুলো ছাড়াও উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশটির সংবিধানের আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারগুলো বর্ণিত হয়েছে তা জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।

মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি যা নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে উল্লিখিত থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ থেকে ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, ধর্মীয়, সরকারি নিয়োগে সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, সংগঠনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা, পেশাগত স্বাধীনতা প্রভৃতি। এ মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। কেননা, যেকোনো দেশের সাধারণ জনগণের জন্য এ অধিকারগুলো ন্যায্য অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। সরকার যদি এগুলো প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয় তবে নাগরিকের বিচার, বুদ্ধি, বিবেক ইতিবাচকভাবে বিকশিত হয়। অর্থাৎ সে সুনাগরিক হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯নং অনুচ্ছেদে সরকারি নিয়োগে সমতার কথা বলা হয়েছে। এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম-বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক বৈষম্যের শিকার হবে না। অর্থাৎ নাগরিকের এ অধিকার যদি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে সে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও যোগ্য হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালাবে। এছাড়া মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিকদের জীবনের যেকোনো অনিশ্চয়তার থেকে মুক্তি দেয়। এর ফলে নাগরিকরাও রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶৩১ মানুষে মানুষে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে একটি সুখী দেশ গঠনের জন্যই মুক্তিযুদ্ধে এত মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। তাই স্বাধীনতার ১ম বছরেই সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এক বছরের মধ্যেই প্রণীত হয় সংবিধান। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ কয়টি? ১

খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে সংবিধানের কথা বলা হয়েছে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. যেই স্বপ্নে মুক্তিযোদ্ধারা ত্যাগ স্বীকার করেছিল সংবিধানে তার কিরূপ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আছে।

খ ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়, বরং সকল ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ করা।

ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো বিশেষ ধর্মকে উৎসাহ প্রদান, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবেও ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। কেউ যাতে কারো ধর্ম পালনে বাধা দিতে না পারে সেজন্য ধর্ম নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য অন্য যেকোনো দেশের সংবিধান থেকে আলাদা।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। প্রণীত হয় ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। বিভিন্ন ধাপে সংবিধান প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ করার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়।

https://teachingbd24.com

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। ১৫৩টি অনুচ্ছেদবিশিষ্ট ৮২ পৃষ্ঠার এ সংবিধান ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং এর একটি প্রস্তাবনাসহ ৪টি তফসিল আছে। সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ হবে একটি এককেন্দ্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং তার নামে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী হবেন দেশের প্রধান নির্বাহী এবং শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসনকাজ পরিচালনার ভার অর্পিত হবে। তবে এগুলো ছাড়াও উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশটির সংবিধানের আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ঘ মুক্তিযোদ্ধার যে স্বপ্নে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন সংবিধানে তার আশানুরূপ প্রতিফলন ঘটেছে।

মৌলিক অধিকার হলো রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি যা নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে উল্লিখিত থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ থেকে ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, ধর্মীয়, সরকারি নিয়োগে সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, সংগঠনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা, পেশাগত স্বাধীনতা প্রভৃতি। এ মৌলিক অধিকারগুলোই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীন দেশের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। কেননা, যেকোনো দেশের সাধারণ জনগণের জন্য এ অধিকারগুলো ন্যায্য অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। সরকার যদি এগুলো প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয় তবে নাগরিকের বিচার, বুদ্ধি, বিবেক ইতিবাচকভাবে বিকশিত হয়। অর্থাৎ সে সুনাগরিক হয়ে উঠবে। সংবিধানের ২৯নং অনুচ্ছেদে সরকারি নিয়োগ সমতার কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম-বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক বৈষম্যের শিকার হবে না। অর্থাৎ নাগরিকের এ অধিকার যদি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে সে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও যোগ্য হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালাবে। এছাড়া মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিকদের জীবনের যেকোনো অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দেয়। এর ফলে নাগরিকরাও রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶৩২ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর 'ক' রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এই সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। *[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সংবিধান কী? ১

খ. সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানের সাথে কোন দেশের সংবিধানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত ও অলিখিত কিছু মৌলিক নিয়ম-নীতি হলো সংবিধান।

খ সংসদীয় গণতন্ত্র এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ তাদের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। কারণ তারা একই সাথে শাসন বিভাগের এবং আইন বিভাগের সদস্য। এছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিপরিষদ।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৩ 'ক' নামক রাষ্ট্র দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে উক্ত অঞ্চলটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদ দীর্ঘসময় ব্যয় করে সংবিধান তৈরি করলেও তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল না এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়নি। তা ছাড়া সংবিধানে একটি বিশেষ ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান জনমনে হতাশা সৃষ্টি করে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো কী কী? ১

খ. সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কি কোনো মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম'- উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো হলো— ১. জাতীয়তাবাদ, ২. গণতন্ত্র, ৩. সমাজতন্ত্র ও ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা।

খ সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ হয় সেইগুলোই নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। নাগরিক অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের নাগরিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো নাগরিক অধিকার।

গ না, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কোনো মিল নেই।

বাংলাদেশ অতি দ্রুততার সাথে একটি অনন্য প্রকৃতির সংবিধান রচনা করে। বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করতে মাত্র নয় মাস সময় লাগে এবং সেখানে জনগণের অধিকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হয়েছে। কেননা এটিতে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এছাড়া সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিচার বিভাগকে জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় একমাত্র রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করে, সংবিধানের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশ সংবিধানে

Teachingbd24.com

ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ ও সকল ধর্মের মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' নামক রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘসময় ব্যয় করে একটি সংবিধান তৈরি করলেও তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। কেননা, সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল না এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়নি। এছাড়া সংবিধানে একটি ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়। সুতরাং উক্ত রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কোনো মিল নেই।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংবলিত সর্বোচ্চ দলিল। এর মাধ্যমেই জনগণের দাবি পূরণ, রাষ্ট্রের উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের সার্বিক কার্য সম্পাদিত হয়। তাই সংবিধান এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিই পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি করা হয়েছে। এতে জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে। এ সংবিধানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শোষণমুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় বাংলাদেশের সংবিধান থেকে। এছাড়া এ সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার তথা সকল প্রকার ধর্মীয় বৈষম্য বিলোপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়েছে। এতে জনগণের সব ধরনের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। কেননা, এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল না এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়নি। এছাড়া সংবিধানে একটি বিশেষ ধর্মকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়।

তাই বলা যায় যে, 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ 'ক' দেশের নাগরিকগণ তাদের ইচ্ছামতো ধর্ম চর্চা করতে পারে। এছাড়াও সে দেশের সংবিধানে জনগণের সরকারি নিয়োগ লাভের সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, চলাফেরা ইত্যাদিও অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে সে দেশের নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারে না।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশের সরকারের বিভাগ কয়টি ও কী কী? ১

খ. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দুটি কাজ লেখো। ২

গ. 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের কতটুকু মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান কোন অর্থে 'ক' দেশের সংবিধান থেকে অধিক গণতান্ত্রিক— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সরকারের বিভাগ ৩টি— আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

খ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১১৯ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান দুটি কাজ হলো— ১. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও ২. রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের অনেকাংশেই মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাসহ বেশ কিছু মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানেও রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতির অন্যতম। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লিখিত ১৮টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে জনগণের সরকারি নিয়োগ লাভের সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে যা উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধানেও রয়েছে।

তবে একটি বিষয়ে 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের অমিল লক্ষ্য করা যায়। তা হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৯নং অনুচ্ছেদে এ মৌলিক অধিকারটি থাকলেও 'ক' দেশের সংবিধানে সেটা নেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে আলোচিত 'ক' দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সামান্য অমিল থাকলেও বেশ কিছু মিল পরিলক্ষিত হয়।

ঘ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধানের মৌলিক পার্থক্য হলো চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা। এ পার্থক্যের কারণেই মূলত বাংলাদেশের সংবিধান 'ক' দেশের সংবিধান থেকে অধিক গণতান্ত্রিক।

উদ্দীপকে 'ক' দেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাসহ মোট চারটি মূলনীতি রয়েছে। আর তা হলো— জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। নিঃসন্দেহে এগুলো 'ক' দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধানকে অধিক গণতান্ত্রিক করে তুলেছে। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১৮টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যা উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধানের উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহের চেয়ে অধিক গণতান্ত্রিক অধিকার দেয়। যথা— চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় এবং বাক স্বাধীনতাসহ মৌলিক অধিকারের বিবেচনায় বাংলাদেশের সংবিধান উদ্দীপকের 'ক' দেশের সংবিধান অপেক্ষা অধিক গণতান্ত্রিক ও উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ পলাশ ও শিমুল দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তারা দুজন 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা করছিল। পলাশ 'X' সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনকে প্রশংসা করেন। শিমুল 'Y' সংশোধনী সম্পর্কে বলেন যে, প্রায় ৪০ বছর পর এ সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে? ১

খ. বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'X' সংশোধনীর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শিমুলের মন্তব্যটি 'Y' সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশ সংবিধানের অনুরূপ সংশোধনীটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মতামত দাও। ৪

Teachingbd24.com

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

খ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সংযোজন বাংলাদেশের সংবিধানের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশেও বলা হয়েছে, আমরা অঙ্গীকার করছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এ সংবিধানের মূলনীতি হবে।

গ উদ্দীপকের 'X' সংশোধনীর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর সাদৃশ্য আছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত 'X' সংশোধনীর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মিল রয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ১৭ বছর পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমেই দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমেই বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হন প্রধানমন্ত্রী, আর রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানে পরিণত হন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের 'Y' সংশোধনীটির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রায় ৪০ বছর পূর্বের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশের সংশোধনী হলো পঞ্চদশ সংশোধনী।

বাংলাদেশ সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর প্রায় ৪০ বছর পরে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রণীত হয়। ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের বেশির ভাগ ধারা ফিরে আসে এবং সংবিধানে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র-এর পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা-এর পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা পুনরায় সংবিধান প্রণয়নকালীন সময়ের মূলনীতিতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো সরকার ব্যবস্থা উল্লেখ ছিল না। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান যুক্ত করা হয়েছিল।একটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নির্বাচন কমিশনের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছিল। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে পুনরায় ১৯৭২ সালের সংবিধানের অনুরূপ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়।

আলোচনার শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' সংশোধনীর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর যথেষ্ট পরিমাণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মৌলিক দলিল। 'ক' রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে উক্ত দলিলটি রচিত হয়। দলিলটিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বেশকিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলটি জাতীয় প্রয়োজনে কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। *[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানের একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্র বলতে কোন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিল সংশোধনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

খ গণতন্ত্রের প্রতি অদম্য স্পৃহাই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে।' প্রশাসনের সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্র বলতে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছর পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং প্রণয়নের পর থেকে জাতীয় প্রয়োজনে ১৬ বার তা সংশোধনও করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে 'ক' রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে মৌলিক দলিল রচনা করে। জাতীয় প্রয়োজনে মৌলিক দলিলটি কয়েকবার সংশোধন করা হয়। সুতরাং 'ক' রাষ্ট্রের মৌলিক দলিল বলতে এখানে বাংলাদেশের সংবিধান বোঝানো রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো–

- **লিখিত সংবিধান:** বাংলাদেশ সংবিধান লিখিত। এ সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ৮২ পৃষ্ঠা ও ১১টি ভাগে বিভক্ত এবং এর একটি প্রস্তাবনাসহ ৪টি তফসিল রয়েছে।
- **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান:** বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সাধারণত সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব পাস করানো যায়।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত রাষ্ট্রটি অর্থাৎ বাংলাদেশের মৌলিক দলিল সংশোধনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা হলো-

সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের দর্পণ। এতে একটি জাতির জীবন পদ্ধতি মূর্ত হয়ে ওঠে। এরিস্টটল বলেছেন, 'সংবিধান হলো এমন একটি জীবন পদ্ধতি, যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে'। জীবন যেমন গতিশীল, রাষ্ট্রও তেমনি গতিশীল। মানব সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তা থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনধারা বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে ১৬ বার সংবিধান সংশোধন করার মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিল এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে অপরাধী তাদের বিচারের প্রয়োজনীয়তা থেকে প্রথম সংশোধনী পাস করা হয়। নতুন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে

Teachingbd24.com

আনতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা দেওয়া হয় দ্বিতীয় সংশোধনীতে। সংসদীয় ঐতিহ্যের অভাব, অর্থনৈতিক সংকট, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও শোষণমুক্ত সমাজের জন্য চতুর্থ সংশোধনী পাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন করা হয়। যা সুশাসনের জন্য উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। সবচেয়ে বড় সংশোধনী হলো পঞ্চদশ সংশোধনী। এই সংশোধনীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই সংশোধনী দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি ছাড়া সরকার পরিচালনা করার অধিকার কারো নেই- সংবিধানের এই মর্মবাণীকে সমুন্নত রাখা হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মৌলিক দর্শন তথা সংবিধান সংশোধন করা ছিল সময়ের চাহিদানুযায়ী যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ 'বিজয়' একটি সামাজিক সংগঠন। সংগঠনটি একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। উক্ত সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধান নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জনাব একাব্বর বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ বিশেষ করে গ্রেপ্তার ও আটক, বিচার ও দণ্ড এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা বিষয়ের ওপর ব্যাখা দিলেন। *[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. কবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়? ১

খ. সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল বলতে কী বুঝ? ২

গ. জনাব একাব্বর যে বিষয়সমূহের উপর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব একাব্বর কর্তৃক বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষার উপায় কী কী? ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালে।

খ বিচারকরা যদি সংবিধান লঙ্ঘন কিংবা অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হন, সে ক্ষেত্রে তাদের অপরাধ তদন্ত এবং অপসারণের জন্য যে কমিশন গঠন করা হয় তাকে জুডিশিয়াল কাউন্সিল বলা হয়।

প্রধান বিচারপতি এবং জ্যেষ্ঠ দুজন বিচারকদের সমন্বয়ে মোট ৩ জন সদস্য নিয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি যদি কোনো ব্যক্তি বা অন্যকোনো সূত্রে কোনো বিচারকের আচরণের বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ করেন তাহলে প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগের পরবর্তী দুই জ্যেষ্ঠ বিচারককে নিয়ে তদন্ত করবেন। তদন্তে যদি প্রাথমিকভাবে দেখা যায় অভিযোগের প্রাথমিক ভিত্তি রয়েছে, তখন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির উক্ত অভিযোগ কাছে প্রেরণ করবেন।

গ জনাব একাব্বর যে বিষয়সমূহের ওপর ব্যাখ্যা দিয়েছে সেগুলো হলো মৌলিক অধিকার।

মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকার অপরিহার্য বিষয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। মূলত গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিমূল হলো মৌলিক অধিকার। নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকগণও রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে উৎসাহ বোধ করে। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষাকবচ, চলাফেরার স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সংবিধান অনুযায়ী একজন নাগরিক আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী অধিকার লাভ করতে পারবে। গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না। আইন ভঙ্গ করার অপরাধ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এক অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না। ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হবেন। সংবিধানের ৩৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাকস্বাধীনতা বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব একাব্বর কর্তৃক বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষার উপায় হলো আইনের শাসন।

মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন অত্যাবশ্যক। আইনের শাসন না থাকলে সমাজে অনাচার, অরাজকতা সৃষ্টি হয়। আইনের শাসন অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য কিছুই থাকে না। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে— কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। আইনের চোখে সবাই সমান। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করবে।

আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে। আইনের শাসন দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অভাবে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং দেশে নানা রকম অনিয়ম, অপরাধ, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিরাজ করে। আর বিশৃঙ্খলা, অশান্তি ও হানাহানি সমাজের শক্ত ভিতকে দুর্বল করে দেবে। সুতরাং জনগণের মৌলিক অধিকার এবং সমাজকে অনাচার ও অরাজকতা হতে রক্ষায় আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড।

আলোচনা শেষে বলা যায়, মৌলিক অধিকার রক্ষার উপায় হলো ন্যায় বিচার তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ সুমাইয়ার দেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইত্যাদি এ সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য। এ সংবিধান সংশোধনের জন্য আইনসভার তিন-চতুর্থাংশের সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন। সংবিধানটিতে জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্র চালনার 'মূলনীতির' কোনো উল্লেখ নেই। *[নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কত সালের কত তারিখে বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয়েছে? ১

খ. বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু কী ছিল ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম— তুমি কী একমত? যুক্তি দিয়ে লেখ। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়েছে।

খ বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

Teachingbd24.com

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেন। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে বলে বলা হয়। মন্ত্রী পরিষদ তার কাজের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকবে। মোট কথা, দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংকুচিত করে প্রধানমন্ত্রীকে অসীম ক্ষমতাশালী করা হয়।

গ সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বেশ কিছু মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে। সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়া আছে। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ২৬ থেকে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে।

সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। যেগুলোর সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের মিল রয়েছে। তবে কিছু অমিলও রয়েছে। যেমন— সুমাইয়ার দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, কিন্তু বাংলাদেশের আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট। এতসত্ত্বেও সাদৃশই বেশি দেখা যাচ্ছে।

ঘ বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম— বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকে সুমাইয়ার দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব মিল রয়েছে তা হলো- লিখিত সংবিধান, সংসদীয় সরকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার। এরপরও সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ আছে। যা সুমাইয়ার দেশের সংবিধান নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের সংবিধান উত্তম।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবন্ধ করা আছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি হল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দিক থেকে সুমাইয়াদের দেশের সংবিধান অপেক্ষা বাংলাদেশের সংবিধান শ্রেয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং এককক্ষকবিশিষ্ট আইন সভার উল্লেখ থাকায় বাংলাদেশের সংবিধান সুমাইয়ার দেশের সংবিধান অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ ফারিয়া একজন প্রতিবন্ধী। তার দুটি হাতই তিনি দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন। তারপরও তিনি লিখতে পারেন, অনেক কাজও করতে পারেন। তিনি একটি সরকারি চাকরির ভাইভা দিতে গেলে তাকে চাকরি দেওয়া হবে না বলে ভাইভা বোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হয়।

[হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. কত তারিখে বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয়? ১

খ. সংবিধানের মূলনীতি কয়টি? ২

গ. উদ্দীপকে ফারিয়া বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত? তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফারিয়ার উক্ত অধিকারগুলো কীভাবে রক্ষা করা যাবে বলে তুমি মনে কর? বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয়।

খ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সংযোজন বাংলাদেশের সংবিধানের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবন্ধ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি চারটি। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

গ উদ্দীপকে ফারিয়া বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী পেশাগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

ফারিয়া একজন প্রতিবন্ধী। দুর্ঘটনায় তিনি দুটি হাত হারিয়ে ফেললেও তার লিখতে কোন অসুবিধা হয় না। ফারিয়া লিখতে ও অন্যান্য কাজও করতে পারেন। তবুও ভাইভা বোর্ড তাকে চাকরিদানে অস্বীকৃতি জানায়। এতে করে তাকে তার পেশাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৪০ নম্বর ধারা অনুসারে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন আইনগত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার থাকবে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের যেকোন নাগরিক আইনানুগ পেশা অবলম্বন ও আইনসংগত ব্যবসা পরিচালনা বা চাকরি করতে পারেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলো মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার। তাই বলা যায় উদ্দীপকে ফারিয়াকে চাকুরীর সুযোগ না দেওয়ায় তার পেশাগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

ঘ আলোচ্য উদ্দীপকে ফারিয়ার উক্ত অধিকারগুলো রক্ষা করার জন্য মৌলিক অধিকার, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

ফারিয়াকে চাকরি না দিয়ে তার মৌলিক অধিকারগুলো খর্ব করা হয়েছে। এখানে ফারিয়ার অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য মৌলিক অধিকার সমূহ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। মৌলিক অধিকার নাগরিকের পবিত্র অধিকার। রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাধীনতার প্রয়োজনে অনেক সময় মৌলিক অধিকার সমূহের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ফারিয়া একজন প্রতিবন্ধী বলে তাকে চাকরি দানে অস্বীকৃতি জানানো যাবে না। চাকরি করার জন্য যেমন গুণ বা যোগ্যতা থাকা দরকার ফারিয়ার মধ্যে তার সবই বিদ্যমান ছিল। তাই তার চাকরি লাভের জন্য সংবিধান অনুযায়ী যেসব অধিকার রয়েছে তা বলবৎ করতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরের এই বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সদয় হতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে ইতিবাচক। সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে অবহেলিত জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধন করা হবে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।

পরিশেষে বলা যায়, ফারিয়ার চাকরি লাভের জন্য যেসব অধিকার খর্ব করা হয়েছে, সেসব অধিকারগুলো সংবিধানের মাধ্যমে যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অধিকার রক্ষা করতে হবে।

Teachingbd24.com

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের সংবিধান

★★ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

১. কত তারিখে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি হয়? [জ্ঞান]
ক ২১ মার্চ ৭২ খ ২২ মার্চ ৭২
গ ২৩ মার্চ ৭২ ঘ ২৪ মার্চ ৭২ **গ**

২. নূরুল আমিন ও রাজা ত্রিদিব রায় বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য হতে পারেন নি। কেননা— [অনুধাবন]
ক তারা বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন
খ তারা আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন না
গ তারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন
ঘ তারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না **গ**

৩. সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ ড. কামাল হোসেন
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ তাজউদ্দিন আহমেদ **খ**

৪. "রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে সংবিধান"- উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক প্লেটো খ এরিস্টটল
গ জে. লাস্কি ঘ স্যাকিয়াভেলি **খ**

৫. সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান কে ছিলেন? [জ্ঞান] *[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]*
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ ড. কামাল হোসেন
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ তাজউদ্দিন আহমেদ **খ**

৬. স্বাধীনতা লাভের পর কোন রাষ্ট্রটি সবচেয়ে দ্রুততার সাথে সংবিধান রচনা করে? *[আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক পাকিস্তান খ বাংলাদেশ
গ ভারত ঘ নেপাল **খ**

৭. পাকিস্তানি কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে মুক্তি লাভ করেছিলেন? [জ্ঞান]
ক ৮ জানু. ১৯৭২ খ ৯ জানু. ১৯৭২
গ ১০ জানু. ১৯৭২ ঘ ১২ জানু. ১৯৭২ **গ**

৮. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক রাজিয়া বানু খ আনোয়ারা বেগম
গ নূরজাহান মোরশেদ
ঘ বদরুন্নেসা আহমেদ **ক**

৯. স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিবনগর সরকার ঢাকায় এসে কত তারিখে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে? [জ্ঞান]
ক ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
খ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১
ঘ ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ **খ**

১০. 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' অনুযায়ী বাংলাদেশে কী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? [অনুধাবন]
ক রাষ্ট্রপতি শাসিত খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ঘ একনায়কতান্ত্রিক **গ**

১১. ১৯৭২ সালের গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন কে? [জ্ঞান]
ক শাহ আব্দুল হামিদ
খ মোহাম্মদ উল্লাহ
গ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
ঘ রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া **খ**

১২. 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২' এ বর্তমান সুপ্রিম কোর্টকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল? [জ্ঞান]
ক সর্বোচ্চ আদালত খ হাইকোর্ট
গ ট্রাইব্যুনাল ঘ আন্তর্জাতিক আদালত **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সোহেল তাজের বাবা মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ প্রধান ছিলেন। তিনি এবং আরও কয়েকজন দেশপ্রেমিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।

১৩. সোহেল তাজের বাবার নাম কী? [প্রয়োগ]
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ তাজউদ্দীন আহমদ
গ খন্দকার মোশতাক আহমদ
ঘ এম মনসুর আলী **খ**

১৪. উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত কয়েকজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। তারা হলেন— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. খন্দকার মোশতাক আহমদ
ii. এম মনসুর আলী
iii. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৫. বাংলাদেশ সংবিধানে মোট কতটি অনুচ্ছেদ আছে? [জ্ঞান]
ক ১৫৩টি খ ১৫৪টি
গ ১৫৫টি ঘ ১৫৬টি **ক**

১৬. কোনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নয়? *[দি. বো. '১৫]*
ক রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
খ সাংবিধানিক প্রাধান্য
গ সংসদীয় গণতন্ত্র
ঘ অলিখিত সংবিধান **ঘ**

১৭. বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সকল ক্ষমতার মালিক কে? *[রা. বো. '১৫]*
ক সরকার খ জনগণ
গ রাষ্ট্র ঘ রাজনৈতিক দল **খ**

১৮. ন্যায়পাল কীরূপ ক্ষমতার অধিকারী? *[দি. বো. '১৫; রা. বো. '১৫]*
ক প্রধান মন্ত্রীর ন্যায়
খ সংসদ সদস্যের ন্যায়
গ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের ন্যায়
ঘ আইনমন্ত্রীর ন্যায় **খ**

Teachingbd.com

১৯. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে "ন্যায়পাল" প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে? /ব. বো. '১৫/
ক ৬৫ খ ৭০
গ ৭৭ ঘ ৮১ **গ**

২০. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাংলাদেশ সংবিধানের কত ভাগে উল্লেখ আছে? [জ্ঞান]
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ **খ**

২১. বাংলাদেশ সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান নাগরিকের কী ধরনের কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক অন্যতম কর্তব্য খ পবিত্র কর্তব্য
গ অবশ্য কর্তব্য ঘ নিয়মিত কর্তব্য **খ**

২২. বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে? [অনুধাবন]
ক সরকার খ রাষ্ট্র
গ সুপ্রিমকোর্ট ঘ জাতীয় সংসদ **খ**

২৩. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ বলে মৌলিক বিধান সংশোধন অযোগ্য বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৫(খ) খ ৬(খ)
গ ৭(খ) ঘ ৮(খ) **গ**

২৪. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ করা হয়েছে। এটি কোন সংসদ থেকে কার্যকর করা হয়েছে? [অনুধাবন]
ক ৭ম জাতীয় সংসদ খ ৮ম জাতীয় সংসদ
গ ৯ম জাতীয় সংসদ ঘ ১০ম জাতীয় সংসদ **গ**

২৫. বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের— [অনুধাবন]
i. জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি
ii. নাগরিকগণ বাংলাদেশি
iii. নাগরিকগণের জাতীয়তা হবে বাঙালি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৬. বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো– /ব. বো. '১৫/
i. ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা
ii. জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষা
iii. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ

২৭. বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল উৎস কোনটি? /সি. বো. '১৫/
ক ভাষা খ ধর্ম
গ একই সংবিধান ঘ ঐতিহ্যগত ঐক্য **ক**

২৮. বাংলাদেশ সংবিধানের তফসিল কয়টি? [অনুধাবন] /সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া/
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৭টি **ঘ**

২৯. বাংলাদেশ সংবিধানের কত ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক প্রথম ভাগে খ দ্বিতীয় ভাগে
গ তৃতীয় ভাগে ঘ চতুর্থ ভাগে **খ**

৩০. বাংলাদেশ সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে কী নামে অভিহিত করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক ন্যায়বিচার
খ অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার
গ সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
ঘ শোষণমুক্তি **গ**

৩১. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১০ নং খ ১১ নং
গ ১২ নং ঘ ১৩ নং **গ**

৩২. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্যে যে বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে তন্মধ্যে অন্যতম হলো— [অনুধাবন]
i. আইনের শাসন
ii. মৌলিক মানবাধিকার
iii. স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৩-৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে রেখা ম্যাডাম বললেন, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গঠন কাঠামো ও কর্মপরিসর জটিল ও ব্যাপক। এ কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল ও নীতিগুলি সুস্পষ্ট ও লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বীমা দাঁড়িয়ে বলল, ম্যাডাম বাংলাদেশে কি এ রকম লিখিত সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে যা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ম্যাডাম বললেন হ্যাঁ। /ব. বো. '১৫/

৩৩. বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়—
ক গণপরিষদের মাধ্যমে
খ ডিগ্রি জারীর মাধ্যমে
গ প্রথার ভিত্তিতে
ঘ নির্বাহী আদেশে **ক**

৩৪. বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হলো—
i. গণতন্ত্র
ii. বাঙালি জাতীয়তাবাদ
iii. ধর্ম নিরপেক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ

৩৫. বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত "আইনের দৃষ্টিতে সমতা" একটি- /ব. বো. '১৫/
ক সামাজিক অধিকার খ মৌলিক অধিকার
গ ধর্মীয় অধিকার ঘ অর্থনৈতিক অধিকার **খ**

Teachingbd.com

৩৬. নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধা যা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক মানবাধিকার খ মৌলিক অধিকার
গ নাগরিক অধিকার ঘ নাগরিক স্বার্থ **খ**

৩৭. বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে কত নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৪৪ নং খ ৪৫ নং
গ ৪৬ নং ঘ ৪৭ নং **ঘ**

৩৮. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হতে উপাধি, খেতাব, সম্মান গ্রহণে কোনটি প্রয়োজন? [অনুধাবন]
ক প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন
খ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পূর্বানুমোদন
গ রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন
ঘ স্থানীয় প্রশাসনের পূর্বানুমোদন **গ**

৩৯. মৌলিক অধিকার পরিপন্থি যেকোনো পদক্ষেপকে বাতিল ঘোষণা করতে পারবে কোন বিভাগ?
ক জজকোর্ট খ আপিল বিভাগ
গ হাইকোর্ট ঘ দায়রা জজ আদালত **গ**

৪০. মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্যে অপরিহার্য শর্ত
ii. সংবিধান হতে প্রাপ্ত
iii. আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

উদ্দীপকটি পড়ে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সৌখিন 'ক' নামক একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে সে তার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আর এ সুবিধাগুলো তাকে ব্যক্তিত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*

৪১. উদ্দীপকে সৌখিন তার রাষ্ট্র কর্তৃক যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তা কোন অধিকারের অন্তর্ভুক্ত?
ক ব্যক্তিগত অধিকার
খ মৌলিক অধিকার
গ সামাজিক অধিকার
ঘ রাজনৈতিক অধিকার **খ**

৪২. উক্ত অধিকার ক্ষুণ্ন করা যায় না—
i. সরকারের ইচ্ছা ছাড়া
ii. সংবিধান সংশোধন ছাড়া
iii. জরুরি অবস্থা জারি ছাড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

৪৩. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী করার যৌক্তিক কারণ নিচের কোনটি? *[সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল]*
ক রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান
খ প্রধানমন্ত্রীকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান
গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান
ঘ আইনমন্ত্রীকে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রদান **ক**

৪৪. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; সুমিমুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক দ্বাদশ খ ত্রয়োদশ
গ চতুর্দশ ঘ পঞ্চদশ **ক**

৪৫. সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু হলো— *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*
ক গণভোট খ ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা
গ উপজেলা পরিষদ বিল
ঘ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার **ঘ**

৪৬. এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সংবিধানের কয়টি সংশোধনী আনা হয়েছে? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক ১২টি খ ১৩টি
গ ১৪টি ঘ ১৬টি **ঘ**

৪৭. বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয় কবে? *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৯৯০ সালে খ ১৯৯১ সালে
গ ১৯৯২ সালে ঘ ১৯৯৩ সালে **খ**

৪৮. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পুনঃপ্রবর্তিত হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে? *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*
ক দশম সংশোধনী খ দ্বাদশ সংশোধনী
গ চতুর্দশ সংশোধনী ঘ ষোড়শ সংশোধনী **খ**

৪৯. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক পঞ্চম খ ত্রয়োদশ
গ চতুর্দশ ঘ পঞ্চদশ **ঘ**

৫০. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে কত করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৪৬ খ ৪৭
গ ৫০ ঘ ৬০ **গ**

৫১. দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
ক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন
খ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন
গ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন
ঘ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ **গ**

৫২. বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কত সালে গৃহীত হয়? *[কু. বো. '১৫]*
ক ১৯৭৩ খ ১৯৭৪
গ ১৯৭৫ ঘ ১৯৭৯ **ক**

৫৩. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়? *[চ. বো. '১৫]*
ক তৃতীয় খ চতুর্থ
গ পঞ্চম ঘ দশম **খ**

৫৪. বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয় কবে? *[কু. বো. '১৫]*
ক ১৯৯০ সালে খ ১৯৯১ সালে
গ ১৯৯২ সালে ঘ ১৯৯৩ সালে **খ**

৫৫. কার শাসনামলে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী আনয়ন করা হয়? [জ্ঞান]
ক জেনারেল জিয়াউর রহমান
খ জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ
গ বেগম খালেদা জিয়া
ঘ খন্দকার মোশতাক আহমদ **ক**

http://teachingbd.com

৫৬. সংবিধানের কততম সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়? [জ্ঞান]
ক দশম খ একাদশ
গ দ্বাদশ ঘ ত্রয়োদশ **ঘ**

৫৭. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' প্রবর্তন করা হয়? [অনুধাবন]
ক চতুর্থ খ পঞ্চম
গ একাদশ ঘ দ্বাদশ **খ**

৫৮. যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন সংবিধানের কত তম সংশোধন? [জ্ঞান]
ক তৃতীয় খ পঞ্চম
গ সপ্তম ঘ প্রথম **ঘ**

৫৯. পঞ্চম সংশোধন আইনে জাতীয় সংসদ যদি অর্থ বরাদ্দে ব্যর্থ হয় তবে কত দিনের জন্যে রাষ্ট্রপতি অর্থের মঞ্জুরি দান করবেন? [জ্ঞান]
ক ৯০ দিন খ ১০০ দিন
গ ১১০ দিন ঘ ১২০ দিন **ঘ**

৬০. বিরোধীদলীয় নেতৃবর্গের কাছে ক্ষমতাসীন সরকারের স্থায়ীকরণের পন্থা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে কোন সংশোধনীটি? [জ্ঞান]
ক সপ্তম খ অষ্টম
গ নবম ঘ দশম **গ**

৬১. দ্বাদশ সংশোধন আইনে কোন পদের বিলুপ্তি ঘটে? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রপতির খ উপমন্ত্রীর
গ উপ-রাষ্ট্রপতির ঘ প্রতিমন্ত্রীর **গ**

৬২. কখন রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন সম্মতি দান করেন? [জ্ঞান]
ক ২ জুন ২০১১ তারিখে
খ ২৮ জুন ২০১১ তারিখে
গ ৩ জুলাই ২০১১ তারিখে
ঘ ১৮ জুলাই ২০১১ তারিখে **গ**

৬৩. বাংলাদেশ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আইন কখন জাতীয় সংসদে পাস হয়? [জ্ঞান]
ক ৬ আগস্ট ১৯৯১ খ ২৭ মার্চ ১৯৯৬
গ ১৬ মে ২০০৪ ঘ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ **ঘ**

৬৪. ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সীমান্ত নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়— [অনুধাবন]
i. হিলি-বেরুবাড়ি ii. সিলেট-ত্রিপুরা
iii. ফেনী নদী সীমান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৫. ত্রয়োদশ সংশোধন অনুযায়ী অন্যান্য উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর— [অনুধাবন]
i. পদমর্যাদা পাবেন
ii. পারিশ্রমিক পাবেন
iii. সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৬. বাংলাদেশে পনেরবার সংবিধান সংশোধনী হয়েছে। পনেরতম সংশোধনীর ক্ষেত্রে যেটি করা হয়েছে- *[দি. বো. '১৫; রা. বো. '১৫]*
i. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা
ii. সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫টি করা
iii. সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫০টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনী ও সুশাসন

৬৭. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৩ সালে
গ ১৯৭৪ সালে ঘ ১৯৭৫ সালে **ঘ**

৬৮. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ করা হয়েছে। এটি কোন সংসদ থেকে কার্যকর করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৭ম জাতীয় সংসদ খ ৮ম জাতীয় সংসদ
গ ৯ম জাতীয় সংসদ ঘ ১০ম জাতীয় সংসদ **ঘ**

৬৯. বাংলাদেশ সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসনের কথা বলা হয়েছে? *[আনসার পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ **ঘ**

৭০. একটি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত হয়েছে বলে কোনো আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না মর্মে বিধান করা হয়। এ বিষয়টিকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? [অনুধাবন]
ক উন্নয়নের গতিশীরতা
খ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি
গ সুশাসনের অন্তরায়
ঘ অনুন্নয়ন **গ**

৭১. সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়— [অনুধাবন]
i. সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ
ii. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার রোধ
iii. বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭২. বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো — *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*
i. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
ii. কার্বন নি:সরণ বন্ধ করা
iii. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন রাজনীতি বিশ্লেষক বলেছিলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবিধান সংশোধনী দলীয় স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে, গোষ্ঠী স্বার্থে সম্পন্ন হয়েছে।

৭৩. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তি স্বার্থে আনীত সংবিধান সংশোধনী কোনটি? [প্রয়োগ]
ক পঞ্চদশ খ ত্রয়োদশ
গ দ্বাদশ ঘ ষষ্ঠ **ঘ**

৭৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বক্তার বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয় যে সকল সংশোধনীর ক্ষেত্রে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. পঞ্চদশ
ii. দ্বাদশ
iii. সপ্তম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৫: বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

প্রশ্ন ▶ ১ আবুল কালাম 'Y' রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী। তাঁকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তিনি এমন এক সূর্য যার চারদিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয়।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ৬; উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]

ক. মন্ত্রণালয় কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আবুল কালামের সাথে তোমার পঠিত কোনো পদের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক- বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয় হলো সচিবালয়ের একটি প্রশাসনিক শাখা।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে বিচারকদের স্বাধীনভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

কোনো দেশের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা বিচারের মাপকাঠি হলো সে দেশের বিচার বিভাগ কার্য সম্পাদনে কতটুকু স্বাধীন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবিধান এবং আইন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জরুরি।

গ উদ্দীপকের আবুল কালামের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী। তিনি হলেন শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা গঠিত ও পরিচালিত হয়। তার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধান করেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারালে কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। তিনি একাধারে দলের নেতা, সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার মধ্যমণি, রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা এবং জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রতীক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবুল কালাম 'Y' রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তিনি এমন এক সূর্য যার চার দিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয়। উদ্দীপকের 'Y' এর মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাঁর নেতৃত্বেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হয়। আর তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পদের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

একটি দেশের জনগণ তাদের সরকারের ওপরই সর্বোতভাবে নির্ভরশীল। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। এ ব্যবস্থায় জনগণ প্রধানমন্ত্রীকেই তাদের মূল আশ্রয় বলে মনে করে। তার ওপর দেশের উন্নতি, অবনতিত, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন প্রভৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই প্রধানমন্ত্রী এ দেশের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পর্যন্ত সব বিষয়ের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট। দেশের উন্নয়নে সব ধরনের পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন। সরকারের যেকোনো ব্যর্থতা তার ওপর বর্তায়। এ কারণে তৃণমূল থেকে জাতীয় সব পর্যায়েই তাকে নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। তিনি জরুরি পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক সংকট প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনগণের পাশে দাঁড়ান, সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে ভরসা দেন। জাতীয় নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

বাংলাদেশের মতো সংসদীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর যথাযথ ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জনগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পদটি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হলেন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

প্রশ্ন ▶ ২ রাজধানীর শ্যামপুর থানার একটি মামলায় বিনা বিচারে প্রায় দেড় দশক ধরে কারাগারে ছিলেন চান মিয়া। এ বিষয়ে বেসরকারি একটি চ্যানেলে সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনেন দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত চান মিয়াকে জামিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতকে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। *[চা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান কে? ১

খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কী? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এর গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালতের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন কিংবা শাসন বিভাগের কাজ সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা বিচার বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করার ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক। সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষাকারী হিসেবে বিচার বিভাগ এর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে। বিচার বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ, তাহলে তা বাতিল করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের রয়েছে। তেমনি শাসন বিভাগের কোনো কাজ সংবিধানসম্মত না হলে বিচার বিভাগ তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা বজায় রাখতে বিচার বিভাগ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। যথা: (ক) আপিল বিভাগ ও (খ) হাইকোর্ট বিভাগ।

রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজনবোধ করবেন ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের নিয়ে আপিল বিভাগ গঠিত হবে এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট এবং স্থায়ী বেঞ্চ

Teachingbd24.com

গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ কোনো কারণে শূন্য হলে আপিল বিভাগের প্রবীণতম বিচারক অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন।

সুতরাং সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আর বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

ঘ উল্লিখিত উদ্দীপকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আদালত বা বিচার বিভাগের ভূমিকা অনন্য।

বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ বা আদালত ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। আদালত ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রান্তিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আইনের শাসনের রক্ষক ও অভিভাবক হলো সংবিধান, আর সংবিধানের রক্ষক হলো আদালত। কোনো আইন সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন করলে বিচার বিভাগ বা আদালত তার সুরাহা করে। সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে আইনের শাসন বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে আদালত নানা কৌশল প্রয়োগ করে। আইন অমান্যকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সরকার, মানবাধিকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুতর অন্যায়, অধিকার লঙ্ঘন, ক্ষতি হলে বিচার বিভাগ স্বেচ্ছায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রুল জারি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নিষ্পত্তি করার জন্য আদালত স্ব-প্রণোদিত হয়ে সুয়োমোটো রুল জারির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার দিয়ে থাকে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অতএব বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা আদালত বা বিচার বিভাগের কাজ।

প্রশ্ন ▶৩ ব্রিটেনের সরকার প্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সে দেশের সরকার প্রধান আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দেন। তবে তিনি আইনসভায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধানের নামে সকল কার্য সম্পাদিত হয়। *[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন? ১

খ. বাংলাদেশের আইনসভার গঠন লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্রিটেনের সরকার প্রধানের সাথে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধানের পদমর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয় কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি।

খ বাংলাদেশের আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। এছাড়া ৫০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এরা সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্রিটেনের সরকার প্রধানের সাথে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের বেশকিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান এবং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তার নিয়োগ এবং কাজের সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের মিল লক্ষণীয়।

ব্রিটেনের সরকার প্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। সংবিধান অনুযায়ী যে সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয় নেতাকেই রাষ্ট্রপতি সংসদের আস্থাভাজন সদস্য বলে মনে করেন। আবার, ব্রিটেনের সরকার প্রধান আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দেন। তবে তিনি আইনসভায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই জাতীয় সংসদের নেতা বলে বিবেচিত হন। সংসদ নেতা হিসেবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাই মুখ্য। সংসদের উত্থাপিত কোনো বিল পাস না হলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। তবে এতো ক্ষমতা সত্ত্বেও তার কাজের জন্য আইনসভায় তাকে জবাবদিহি করতে হয়। এই আলোচনা থেকেই উদ্দীপকের সরকার প্রধান এবং বাংলাদেশের সরকার প্রধানের সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বেশকিছু পদমর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রধান, সরকার প্রধান নন। রাষ্ট্রপ্রধান রূপে তিনি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করেন। তিনি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো কর্ম করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন নামমাত্র শাসক। উদ্দীপকের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পদমর্যাদা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছু বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকের রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু বাংলাদেশে এ রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে।

আবার উদ্দীপকের ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধান তার কাজের জন্য আইনসভায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কারো নিকট দায়বদ্ধ নন। তিনি আইনসভার নিকটও জবাবদিহি করেন না। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। তিনি সংবিধান অনুসারে তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করেন। কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের ক্ষেত্র ছাড়া সব সময়ই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো কিছু করা বা না করার জন্য তাঁকে আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রপতি নিয়োগ ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ও উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪ 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথক। কিন্তু নিম্ন আদালতের বিচারকরা সরকারের আজ্ঞাবহ। বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিসহ সবকিছুই মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত। বিচার বিভাগের জন্য আলাদা কোনো সচিবালয় নেই। বিচারকরাও তাদের দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

https://teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? ১
খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ কি স্বাধীন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশের বিচার বিভাগের সাথে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন বিধিবিধানের আলোকে সরাসরি যেসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে বোঝায়।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকার তথা নির্বাহী বিভাগ কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না এরা স্বাধীনভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। এই সংস্থাগুলোর সভাপতি ও সদস্যগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ স্বাধীন নয়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য শর্ত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই বিভাগের স্বাধীনতার জন্য যে বিষয়গুলো আবশ্যক উদ্দীপকের বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে সেগুলো অনুপস্থিত।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের নিম্ন আদালতের বিচারকরা সরকারের আজ্ঞাবহ, এদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিসহ সবকিছুই মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত। এ খানের বিচারকরা তাদের দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়। অথচ স্বাধীন বিচারবিভাগ সুষ্ঠুভাবে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার করতে পারে। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও অন্যান্য শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পাদন করাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। স্বাধীন বিচার বিভাগের বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এছাড়া রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারণ করা যাবে না। তবে বিচারকগণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারবেন। বিচারকগণের বদলি পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির মতামতই কার্যকর করা হয়। স্বাধীন বিচার বিভাগের এই বিষয়গুলো 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে নেই। তাই 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে স্বাধীন বলা যায় না।

ঘ উদ্দীপকের দেশের বিচার বিভাগের সাথে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কিছু মিল থাকলেও যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের একটি বিভাগ হিসেবে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছে। 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হলেও অন্যান্য বিষয়গুলো বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশে আইনের বিধান অনুযায়ী অধস্তন আদালত রয়েছে। রাষ্ট্রপতি এসব আদালতের বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশ ক্রমে জেলা বিচারক নিয়োগ প্রদান করেন। বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণ, কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান ও অন্যান্য বিষয়ে শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশে 'ক' রাষ্ট্রের ন্যায় বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় না থাকলেও বিচারকগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণপূর্বক যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও করণীয় নির্ধারণ করে থাকে। তারা অন্যায়ের শাস্তিবিধান এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে অন্যায় ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা, প্রকৃত অর্থ ও কার্যকারিতা নির্ধারণ এবং আইনকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করে থাকে। আর এভাবে এটি নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে সদা তৎপর থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অপেক্ষা বাংলাদেশের বিচার বিভাগ অধিক স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করছে।

প্রশ্ন ▶৫ মি. জেমস জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি তাকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। পদমর্যাদা অনুযায়ী তিনি দেশের প্রকৃত শাসক। তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭; য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইনজীবী কে? ১
খ. সচিবালয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যক্তির সাথে বাংলাদেশের কোন পদের নিয়োগ ও পদমর্যাদা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির পদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারের প্রধান আইনজীবী হলেন এটর্নি জেনারেল।

খ সচিবালয় বলতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহ নিয়ে গঠিত প্রশাসনিক সংস্থাকে বোঝায়।

সচিবালয় হলো একটি দেশের তথা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। সরকারি যাবতীয় কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম সচিবালয়ে গৃহীত হয়। সচিবালয় বিভিন্ন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে। সর্বোপরি দেশের প্রশাসন যন্ত্রকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদনকারী দপ্তরই হলো সচিবালয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের নিয়োগ ও পদমর্যাদার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই এদেশ পরিচালনা করেন। এই সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই একজন প্রধানমন্ত্রী হন। আর তিনিই দেশের শাসনব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। উদ্দীপকটিতে উল্লিখিত নিয়োগ পদ্ধতি ও পদমর্যাদা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উদ্দীপকের মি জেমস সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা অর্জন করেছেন। এ কারণে রাষ্ট্রপতি তাকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিয়েছেন। পদমর্যাদা অনুযায়ী তিনি দেশের প্রকৃত শাসক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি। সাধারণ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ দান করেন। যদি কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তবে রাষ্ট্রপতি এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন যিনি সংসদের সমর্থন লাভ করেন। নিয়োগ লাভের পর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকার তথা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তিনিই বাংলাদেশ সরকারের প্রধান। তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী যদিও রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হন তবুও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কাজ করেন। মোটকথা প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান, সংসদের নেতা ও মন্ত্রিসভার প্রধান। অর্থাৎ দেশের শাসনব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। সুতরাং, দেখা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জেমস এর নিয়োগ ও পদমর্যাদা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ও পদমর্যাদার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিচে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী হলেন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভার যে তালিকা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন তারাই মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ দান করেন। আইন, বিচার, শাসন ও পররাষ্ট্রবিষয়ক সকল কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। মন্ত্রিসভার নেতা হিসেবে মন্ত্রিসভায় কারা থাকবেন এবং কতজন থাকবেন তা প্রধানমন্ত্রীই নির্ধারণ করেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে স্পিকার সংসদের কার্যসূচি নির্ধারণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সরকারি উচ্চপদে কর্মচারী, বিচারক, রাষ্ট্রদূত ও সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রী কেবল সংসদের নেতা নন, তিনি তার নিজ দলেরও প্রধান। দলের স্বার্থ রক্ষা, ঐক্য ধরে রাখা, দলের সাফল্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা তার কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। এ জন্য তিনি সরকারি কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন এবং সময়োপযোগী বিবৃতি ও বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরিশেষে বলা যায়, সংসদীয় সরকারের সফলতা প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি ও কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে। তাই বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে প্রভূত ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব 'X' ও জনাব 'Y' দেশের দুটি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত। সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা জনাব 'X' এর নামে গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এমনকি দেশের সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দানের জন্যও তাকে জনাব 'Y' এর সাথে পরামর্শ করতে হয়।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. কোরাম কাকে বলে? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'X' এর সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তির মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'Y' এর পদমর্যাদা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যক্রম শুরু করা যায় তাকে কোরাম বলে।

খ ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বিচার বিভাগের ওপর আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকলে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও সর্বোপরি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭

জনাব 'ক'	জনাব 'খ'
↓	↓
রাষ্ট্রের প্রধান	সরকারের প্রধান
↓	↓
নাম সর্বস্ব ক্ষমতা	প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী
↓	↓
সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত
↓	↓
তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না	দল ও জাতির নেতা
↓	↓
বছরের প্রথম অধিবেশনে সংসদে ভাষণ দেন	পররাষ্ট্র নীতির রূপকার

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. কোরাম কাকে বলে? ১

খ. স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) কীভাবে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব 'ক' এর সাথে বাংলাদেশের কোন পদাধিকারীর মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'খ' এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের কাজ যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

খ স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) বৃহত্তর সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পেছনে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) এর ভূমিকা বেশ প্রশংসার দাবিদার। স্থানীয় পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর জন্য মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচিসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত এবং আইনের শাসন সুসংহত করার ক্ষেত্রে এ সংস্থার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

গ উদ্দীপকের জনাব 'ক' এর সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। তিনি সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কাজ পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের জনাব 'ক' বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিরই নামান্তর মাত্র।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' রাষ্ট্রের প্রধান। তবে তার ক্ষমতা নাম সর্বস্ব। তিনি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত। তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না। তিনি বছরের প্রথম অধিবেশনে সংসদে ভাষণ দেন। একই ভাবে জনাব 'ক' এর মতো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তার নামে নির্বাহী কার্য সম্পাদন করা হলেও তিনি মূলত কিছুই করেন না। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাই সকল দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। প্রতিটি নতুন সংসদের শুরুতে এবং ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করবেন। রাষ্ট্রপতি অবস্থায় তিনি কোনো কাজ করলে বা না করলে

Teachingbd24.com

সেজন্য তাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হয় না। তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি মামলা করা যাবে না এবং তাঁকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারবে না। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের জনাব 'ক' এর সাথে বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক প্রধান রাষ্ট্রপতিই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৮

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কাকে বলে? ১

খ. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. '?' চিহ্নিত বিভাগটির কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নির্দেশিত ছকে (?) চিহ্নিত বিভাগটি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?— বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের ১১৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মচারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য সংসদীয় আইনের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলে।

খ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা। যে কারণে এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। সমগ্র জনতা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের প্রতিহত করতে থাকে। মূলত তার এ ভাষণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তার আহ্বানে সাড়া দিয়েই বাঙালি জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এজন্য বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

গ '?' চিহ্নিত বিভাগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাইকোর্ট বিভাগ।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ নিয়ে গঠিত। হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা অধস্তন সকল আদালত তথা দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাখা তদারকি ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ছকে (?) চিহ্নিত বিভাগটি দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ছকে উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্ট এর দুটি বিভাগ (?) চিহ্নিত ও আপিল বিভাগ। (?) চিহ্নিত বিভাগটির অধীনে দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাখা, যেটি হাইকোর্ট বিভাগেরও অধস্তন শাখা। শাসনতন্ত্র ও আইন দ্বারা প্রদত্ত সকল আদি ও আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত। এছাড়া শাসনতন্ত্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকরী করার সকল দায়িত্ব হাইকোর্ট বিভাগের। এ মর্মে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপর্যুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে। (খ) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং স্বয়ং মামলাটি মীমাংসা করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ সকল অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তাই বলা যায়, (?) চিহ্নিত বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাইকোর্ট বিভাগের কার্যাবলীর পরিধি বিস্তৃত।

ঘ (?) চিহ্নিত বিভাগটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাইকোর্ট বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় হাইকোর্ট বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুশাসন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এটি নিশ্চিতকরণে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। বিচারব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। আর বাংলাদেশ বিচারব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, এটি হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের সময়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দায়িত্ব ন্যস্ত। হাইকোর্ট বিভাগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার সহায়তায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন সংরক্ষণ করতে পারে। কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার খর্ব হলে তিনি হাইকোর্ট বিভাগের আশ্রয় নিতে পারেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যেন সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে সে ব্যাপারেও হাইকোর্ট বিভাগ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কেউ বঞ্চিত হলে হাইকোর্ট বিভাগ তাকে যথাযথ সহায়তা দিয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও হাইকোর্ট বিভাগ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৯ কাজল অনেকদিন থেকে প্রবাস জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশে বেড়াতে এসে তিনি প্রবাস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কথা বলছিলেন। তার বক্তব্য সেখানকার সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসকের ক্ষমতা প্রদান করেছে। রাষ্ট্রপতি যে কাউকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিতে পারেন, আবার যে কাউকে পদচ্যুত করতে পারেন। অর্থাৎ তার প্রবাস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশ সরকার প্রধানের পদ কী? ১

খ. বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদের গঠন বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পার্থক্য দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশে কি কখনও উদ্দীপকে বর্ণিত সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকার প্রধানের পদ প্রধানমন্ত্রী।

খ বাংলাদেশে সরকার পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এর নেতা। তিনি যেরূপ সংখ্যক প্রয়োজন মনে করবেন, সেরূপ সংখ্যক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রিগণ সাধারণত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন। তবে এর সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার এক দশমাংশের বেশি হবে না। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থেকে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের কাজলের বক্তব্য অনুসারে তার প্রবাস রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমরা জানি, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের লোকদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। উদ্দীপকের কাজলের প্রবাস রাষ্ট্রে আমরা অনুরূপ সরকার কাঠামোই লক্ষ করি।

নিচে উদ্দীপকের রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পার্থক্য দেখানো হলো-

উদ্দীপকের রাষ্ট্রপতিকে সেখানকার সংবিধানে প্রকৃত শাসকের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করেনি। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হলেও কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। আবার উদ্দীপকের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যে কাউকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ, আবার যে কাউকে পদচ্যুত করতে পারলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। উদ্দীপকের প্রবাস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের রাষ্ট্রপতি তার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান আসলে নামমাত্র প্রধান।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশে উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা চালু ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রথমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হলেও সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মুশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার শাসনকাল ছিল সংক্ষিপ্ত। পরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব লাভ করেন বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম। এরপর ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান জয়লাভ করেন এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ নামের রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালের ২৯ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়া নিহত হলে সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হন। আবদুস সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ শাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতবিহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি স্বৈরশাসক হিসেবে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে তার পতনের পর সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরায় চালু হলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার অবসান হয়।

এভাবে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মূলত সেনা শাসন আমলেই দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা চালু ছিল। দেশে সেনা শাসন বহাল রেখে সুবিধামতো সময়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদ নির্বাচন সম্পন্ন করে বেসামরিক শাসন চালু করেন। বস্তুত তাদের অগণতান্ত্রিক শাসন, জনগণের ভোটাধিকার হরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কার্যকলাপ দেশের জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অবশেষে ১৯৯১ সালে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসিত তথা সেনা শাসনের পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার অন্তরালে সেনাশাসন চালু ছিল। তখন রাষ্ট্রপতি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে পরিচালনা করতো।

প্রশ্ন ▶ ১০ রাশেদ তার ভাই-এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে ভাই রাশেদের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার নিম্ন আদালতের রায়ে রাশেদ সন্তুষ্ট নন। ফলে তিনি ঢাকার উচ্চ আদালতে আপিল করেন। মামলার শুরু থেকে আপিলের রায় পর্যন্ত মোট ১৪ বছর অতিবাহিত হয়। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্য পদের ন্যূনতম বয়স কত বছর? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. রাশেদ যে আদালতে আপিল করেন তার গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "উক্ত আদালত জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্য পদের ন্যূনতম বয়স ২৫ বছর।

খ মৌলিক অধিকার বলতে আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বুঝি যা ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎকৃত হয় সেইগুলোই মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত।

মৌলিক অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো মৌলিক অধিকার।

গ উদ্দীপকের রাশেদ যে আদালতে আপিল করেন তার নাম হলো সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্ট হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এটি ঢাকা শহরের রমনায় অবস্থিত। সুপ্রিম কোর্ট সচরাচর হাইকোর্ট নামে পরিচিত; কারণ স্বাধীনতার পূর্বে এই ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চ আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। উদ্দীপকের রাশেদ এ আদালতেই আপিল করেন। নিচে রাশেদের আপিলকৃত আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের গঠন বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত, যথা: হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ বিচার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ঘ উক্ত আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে। উক্তিটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকরী করার সকল দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ মর্মে সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করতে এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে। (খ) হাইকোর্টের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত; তখন হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করে নিয়ে স্বয়ং মীমাংসা করবেন।

https://teachingbd24.com

সংবিধানের ১০৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে আপিল বিভাগের।

তাছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ কোনো মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে, এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নিকট। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের ঘোষিত রায় পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও ন্যায়বিচার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভা প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধানের পরিপন্থি হয় তাহলে সে আইনকে বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সামনে কেউ যদি বিচার প্রার্থী হয়ে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধানবিরোধী এবং সেই অবৈধ আইন দ্বারা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাহলে বিচারকরা সেই আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ নূরুল ইসলাম 'ক' রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তাকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? ১

খ. শাসন বিভাগ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নূরুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার কোনো পদের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক— বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

খ আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের তিনটি অঙ্গ বা বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ একটি।

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই দেশ পরিচালনা করেন। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়। এই সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনিই শাসনব্যবস্থার মূলস্তম্ভ। তার নেতৃত্বে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ জলি সরকারের এমন একটি বিভাগের প্রধান,যে বিভাগ দেশ পরিচালনার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে। উক্ত বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত কর ধার্য বা মওকুফ করা যায় না। নির্বাহী বিভাগও উক্ত বিভাগের নিকট দায়ী। *[ঢা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৫; নওয়াব ফাইজুন্নেছা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জলি সরকারের যে বিভাগের সদস্য সেটির কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের কোন বিভাগের কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জলির যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপরই ঐ বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল'— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিশংসন হলো সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচার।

খ আইনসভা প্রণীত আইন ও শাসন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা বিচার বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। যদি আইনটি বা সিদ্ধান্তটি সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় তবে বিচার বিভাগ তা বাতিল করে দিতে পারে। বিচার বিভাগের এ ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গ উদ্দীপকে জলি সরকারের যে বিভাগের সদস্য সেটির কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল আছে।

উদ্দীপকের জলি তার দেশের যে বিভাগের প্রধান সে বিভাগ নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের আইন বিভাগও আইন সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত।

সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনেক। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে ঐ বছরের জন্য অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ বা বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করে আইন বিভাগ। তদ্রূপ জলি তার দেশের যে বিভাগের প্রধান সেই বিভাগের কাজও হলো সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা।

কর ধার্য বা মওকুফের দিক থেকেও জলির দেশের আইন বিভাগের সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কর ধার্য করা যায় না এবং কোনো ব্যয়ও করা সম্ভব হয় না।

জলির দেশের নির্বাহী বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী। বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের সাথে এ বিষয়েও মিল রয়েছে। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী।

ঘ জলি আইন বিভাগের প্রধান তথা স্পিকার। 'জলির যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপরই আইন বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল' আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

সংসদ সদস্যরা সংসদের প্রাণ। প্রতিটি সংসদ সদস্যই আইন প্রণেতা। তাদের সঠিক ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের উপরই দেশের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে। আর এই সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান স্পিকার। স্পিকারের ভোটকে কাস্টিং ভোট বলা হয়। আইনসভায় যে আইন পাস হয় তার পক্ষে-বিপক্ষে সংসদ সদস্যরা অংশ নিয়ে থাকে। এতে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হয় যে, পক্ষ-বিপক্ষ সমান ভোট দিয়েছে। তখন এক পক্ষে ভোট দিয়ে স্পিকার তার মীমাংসা করেন, যা কাস্টিং ভোট নামে পরিচিত। কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে স্পিকার সংসদে বিবাদের মীমাংসা করে থাকেন। যে বিধি দ্বারা সংসদ পরিচালিত হয় তাই কার্যপ্রণালি বিধি। আর কার্যপ্রণালি বিধি নিয়ন্ত্রণ করেন স্পিকার। সুতরাং, স্পিকারের যথাযথ ভূমিকা পালনের উপরই আইন বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা তার অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাজের দায়িত্ব পালন করেন স্পিকার।

সুতরাং, বিষয়টি সহজেই অনুমেয় যে, স্পিকার উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে আইন বিভাগকে সফল করে তোলেন। আর এ কারণেই বলা যায়, স্পিকার 'জলির যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপরই আইন বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল'।

প্রশ্ন ▶ ১৩ একটি সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দান করেন। সভাপতির নামে সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সাধারণ সম্পাদকই মূলত যাবতীয় কার্যাবলির সফলতা-ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনটির নেতৃত্ব প্রদান করলেও এর সদস্যদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সভাপতি হ্রাস-বৃদ্ধি বা রহিত করতে পারেন। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

https://teachingbd24.com

ক. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়? ১

খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে তোমার দেশের শাসন বিভাগের কোন পদাধিকারীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তোমার দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

খ অভিশংসন বলতে সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচারকে বোঝায়।

সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ সাংবিধানিক পদের অধিকারী ব্যক্তিকে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থনে অভিশংসন করতে পারে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক—আমি এ বক্তব্যকে সমর্থন করি।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করবার এবং যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। কেননা অনেক সময় ভুলে বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে বা হুমকি ও ভীতি থেকে বাঁচতে, অর্থের প্রলোভনে কিংবা আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে, উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বিচারকগণ রায় দিয়ে থাকেন। ফলে প্রকৃত অপরাধী শাস্তির আড়ালে থাকেন এবং নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা পান। এরূপ ভুল সংশোধন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির পুনঃবিবেচনা ক্ষমতা সত্যিকার অর্থেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

সুতরাং উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভা ৫০০ সদস্যবিশিষ্ট। ৩০০ জন সদস্য ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ১০০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মহিলা ভোটারদের ভোটে এবং ১০০ জন সংখ্যালঘু ও উপজাতি সদস্য জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের আইনসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে? ১

খ. কোরাম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভার সাথে তোমার দেশের আইনসভার গঠন পদ্ধতির কী কী সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তোমার দেশের আইনসভার তুলনায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনসভাটি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক। উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের আইনসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে।

খ কোরাম বলতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে বোঝায়। কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ সদস্য বৈঠকে উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদের বৈঠক স্থগিত রাখেন কিংবা মুলতবি ঘোষণা করেন।

গ 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভার সাথে আমার দেশের তথা বাংলাদেশের আইনসভার গঠন পদ্ধতির বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

সাদৃশ্যসমূহ : 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভা ও বাংলাদেশের আইনসভা উভয় ক্ষেত্রে ৩০০ জন করে সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। সদস্য সংখ্যার তারতম্য থাকলেও মহিলা সদস্যদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

বৈসাদৃশ্যসমূহ : 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভা গঠিত হয় ৫০০ সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ১০০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মহিলা ভোটারদের ভোটে এবং ১০০ জন সংখ্যালঘু ও উপজাতি সদস্য জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের আইনসভা গঠিত হয় ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ৫০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংসদ সদস্যদের মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এখানে সংখ্যালঘু ও উপজাতি সদস্যদের আলাদাভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই।

ঘ আমার দেশের তথা বাংলাদেশের আইনসভার তুলনায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনসভাটি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভা গঠিত হয় ৫০০ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ১০০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মহিলা ভোটারদের ভোটে এবং ১০০ জন সংখ্যালঘু ও উপজাতি সদস্য জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের আইনসভা গঠিত হয় ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ৫০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংসদ সদস্যদের মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এখানে সংখ্যালঘু ও উপজাতি সদস্যদের আলাদাভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। এতে করে বাংলাদেশের আইনসভায় সংখ্যালঘু ও উপজাতি এলাকার জনসংখ্যা অনুপাতে জনপ্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ কম। অথচ সংখ্যালঘু, উপজাতি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের অগ্রসর গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি সুযোগ দেওয়ার বিধান থাকা উচিত ছিল।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি বলা অধিক যুক্তিযুক্ত, আমার দেশের তথা বাংলাদেশের আইনসভার তুলনায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনসভাটি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ শাহেদ ও জাহেদ দু'জন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। শাহেদের রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু জাহেদের রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ১]*

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? ২

গ. জাহেদের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে শাহেদের রাষ্ট্রের কোনো সাদৃশ্য আছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

Teachingbd24.com

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিশংসন হলো সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচার।

খ বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। অর্থ্যাৎ প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদ সদস্যদের দ্বারা মূলত তিনি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

গ জাহেদের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসনকর্তা হিসেবে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন। এখানে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সেবকমাত্র। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা সাহায্য দান করতে কোনো মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকতে পারে। এরূপ মন্ত্রিরা বা উপদেষ্টারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারেই নিযুক্ত বা অপসারিত হন। তারা সমস্ত কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। মূলত তারা রাষ্ট্রপতির কর্মচারি হিসেবে কাজ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান।
জাহেদের রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। এছাড়া তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধও নন যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার অনুরূপ। তাই বলা যায়, জাহেদের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে শাহেদের রাষ্ট্রের সাদৃশ্য আছে।
শাহেদের রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এরূপ রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত। শাহেদের রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশেও সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। তার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একই সময়ে আইনসভারও সদস্য থাকেন। মন্ত্রীরা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন। কারণ আইনসভার আস্থা হারালে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। এই সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান এক ব্যক্তি থাকেন না। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তাদের সকল কাজকর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রীগণ তাদের নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে শাহেদের রাষ্ট্রের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়াও বিভিন্নভাবে অপর একটি অঙ্গের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক করে। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. অধ্যাদেশ কে জারি করেন? ১
খ. অর্থবিল বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের অঙ্গটির সাথে বাংলাদেশের সাদৃশ্যপূর্ণ অঙ্গটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের অঙ্গটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের অঙ্গটিও অপর একটি অঙ্গের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে- বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি জারি করেন।

খ অর্থবিল হচ্ছে সেই বিল যাতে কর ধার্য, তার পরিবর্তন, ঋণ গ্রহণ বা ঋণ পরিশোধ, ব্যয়ের মঞ্জুরি প্রভৃতি আলোচিত হয়। কোনো বিল অর্থ বিল কি না তা নির্ধারণ করেন সংসদের স্পিকার। এ বিষয়ে তার মতামতই চূড়ান্ত। তবে কোনো অর্থবিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত জাতীয় সংসদে পেশ করা যাবে না।

গ সৃজনশীল ১২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের আইনবিভাগ নামক অঙ্গটির সাদৃশ্য রয়েছে। এই আইন বিভাগ বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কারণ বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান। শাসন বিভাগ তাদের গৃহিত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভা কতদিন ক্ষমতায় থাকবে তা নির্ভর করে আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর। সংবিধান অনুযায়ী আইন বিভাগ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের সমস্ত কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মূলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যদের আস্থা হারালে যে কোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবে সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রাফিন তার বাবার সাথে টেলিভিশনে বাজেট অধিবেশন দেখছিল। বাজেট আলোচনায় সংসদ সদস্যগণ অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন। তিনি সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। রাফিন তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, অর্থমন্ত্রী কি সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য? বাবা বললেন, মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করে সংসদীয় কর্তৃত্বকে স্বীকার করেছেন। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন কে? ১
খ. পঞ্চদশ সংশোধনীর পর জাতীয় সংসদের গঠন বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সংসদের কোন কার্যটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যটি ছাড়া সংসদ আর কী কী কাজ করতে পারে? আলোচনা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংসদ অধিবেশন আহবান করেন রাষ্ট্রপতি।

খ পঞ্চদশ সংশোধনীর পর জাতীয় সংসদের গঠন সম্পর্কিত বিষয়টি ৬৫ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত।
সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের- (ক) (৩) দফার 'পঁয়তাল্লিশ আসন' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'পঞ্চাশটি আসন' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে। অর্থাৎ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের নারী আসন সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করা হয়। যার ফলে জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৩৫০।

গ উদ্দীপকে সংসদের অর্থ সংক্রান্ত কার্যটি ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী বাজেট আলোচনায় সংসদ সদস্যগণ অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন। তিনি সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কাজ তথা অর্থের ওপর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনেক। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে ঐ বছরের জন্য অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ বা বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করতে হয়। সেখানে বাজেটের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী বাজেট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেন। তারপর তা অনুমোদিত হয়। তাছাড়া মঞ্জুরি দাবি সংসদে পেশ করা হয় এবং সংসদ এরূপ দাবি অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান বা তাতে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করতে পারবে। বাজেট পেশ করার পর যদি কোনো অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে জাতীয় সংসদ অগ্রিম মঞ্জুরি দানের ব্যবস্থা করতে পারে। উদ্দীপকের আলোচনাতে সংসদের অর্থ সংক্রান্ত এরূপ আলোচনারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থ সংক্রান্ত কার্যটি ছাড়া সংসদ আরো নানাবিধ কার্যাদি সম্পাদন করে।

বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংসদ যে কোনো আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে তা বিলের আকারে সংসদে পেশ করতে হয়। আইনের খসড়াকে বিল বলে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কর ধার্য করা যায় না এবং কোনো ব্যয়ও করা সম্ভব হয় না। সংবিধানের ৮৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, 'সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেত্র মতো সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা থেকে অর্থ প্রত্যাহার এবং এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।' বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী। সংসদে যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা পাস হয় তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধান সংশোধনের একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সংসদেরই রয়েছে। সংসদ মোট সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করতে পারে। এছাড়া, চাকরি, নির্বাচন, অধ্যাদেশ সংক্রান্ত প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশ্ন তথা অর্থ সংক্রান্ত কার্যটি ছাড়া সংসদ আরো নানাবিধ কার্যাদি সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব তায়েজুল হক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই মুখ্য। তারই দলের মনোনীত প্রার্থী জনাব আরিফুল ইসলাম রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন। জনাব তায়েজুল হক আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ করতে না পারলেও জনাব আরিফুল ইসলাম তা পারেন।

[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি? ১

খ. কোরাম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব আরিফুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের যে পদের ব্যক্তির মিল রয়েছে তার পদমর্যাদা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জনাব তায়েজুল হকই বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি— তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি।

খ কোরাম বলতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে বোঝায়। কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ সদস্য বৈঠকে উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদের বৈঠক স্থগিত রাখেন কিংবা মূলতবি ঘোষণা করেন।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ জনাব তায়েজুল হকই 'বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি'— আমি এই বক্তব্যের সাথে একমত।

সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী। তিনি হলেন সমগ্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ করতে পারলেও এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাই মুখ্য। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ও পরিচালিত হয়, ক্ষমতায় টিকে থাকে এবং ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। প্রধানমন্ত্রী। পদত্যাগ করলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকেই পদত্যাগ করেছেন বলে গন্য হয়। জাতীয় সংসদের নেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা হারালে কিংবা অন্য কোন কারণে প্রয়োজনবোধে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রধান করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, বিচারক, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি নিয়োগ করতে পারলেও কার্যত তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন তার নিজ দলের নেতা। প্রধানমন্ত্রী শুধু সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার মধ্যমণি, দলের নেতা, রাষ্ট্রপতির পরামর্শ দাতাই নন; তিনি হলেন জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার তিনি হলেন মধ্যমণি, মন্ত্রিসভার মূল স্তম্ভ। তিনি হলেন এমন একটি সূর্য যার চারদিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয়।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তায়েজুল হকই বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রফিক ও সুমন দুই বন্ধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রফিকের বাবা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি। সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেন। আর সুমনের বাবা একটি মহানগরীর মেয়র। তিনি জনগণের ভোটে এ পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]

ক. গণতন্ত্রের মানসপুত্র কাকে বলা হয়? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. রফিকের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'সুমনের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠান জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।' তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে।

খ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বলতে ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসনকে বোঝায়।

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। Oxford Dictionary -এর সজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'স্থানীয় জনগনের কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনই হল স্থানীয় শাসন'। সুতরাং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বলতে এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা বোঝায় যা ছোট ছোট এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত, যা আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং নির্বাচিত।

গ রফিকের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি হলো সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণ।

২. কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মরত কোনো ব্যক্তিকে বেআইনি কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার বা আইনানুযায়ী তার করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে।

৩. কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে আটক কোনো ব্যক্তিকে তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে এবং বেআইনিভাবে আটক থাকলে তাকে মুক্ত করার নির্দেশ দিতে পারে।

উদ্দীপকে রফিকের বাবা সংবিধানের ৯৫নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত যা পাঠ্য বইয়ের সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সুমনের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার গঠিত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশনের সাদৃশ্য রয়েছে। সুমনের বাবা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র। সুমনের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠান জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহন করে থাকে। আমি এই বক্তব্যের সাথে একমত।

মহানগর এলাকার উন্নয়ন, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে সিটি কর্পোরেশনগুলো নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

জনস্বাস্থ্যঃ কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিভিন্ন স্থানে শৌচাগার নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, প্রস্রাবখানা নির্মাণ, ময়লা ও আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন নির্মাণ ও জমাকৃত আবর্জনা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে। সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্যের জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্যক্লিনিক, মাতৃসদন, শিশুসদন নির্মাণ, ডিসপেনসারি ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা করে থাকে।

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ: মহানগরীতে ভেজালযুক্ত খাদ্যদ্রব্য, মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় রোধ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকে।

পানি সরবরাহ: মহানগরীর জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, কুপ, ও নলকুপ খনন, শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ড্রেন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে থাকে।

নগর পরিকল্পনা: মহানগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সিটি কর্পোরেশন রাস্তাঘাট, পার্ক, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন, পার্কের চারপাশে আকর্ষনীয় প্রাচীর নির্মাণ এবং আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়ন্ত্রণ গেট নির্মাণ ও প্রহরার ব্যবস্থা করে থাকে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি: মহানগরীর নিরক্ষরতা দূরীকরণে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, বয়স্কদের শিক্ষাদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করে থাকে।

এছাড়া সিটি কর্পোরেশন জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট ও যানবাহন সংক্রান্ত, বন, বৃক্ষরোপণ ও পার্ক সংক্রান্ত, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সুমনের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠান তথা সিটি কর্পোরেশন জীবযাত্রার মানোন্নয়নে বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২০ একটি রাষ্ট্রে দু'টি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামান। জনাব বদর উদ্দিনের নামে সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি উচ্চপদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও তাকে জনাব কামরুজ্জামানের সাথে পরামর্শ করতে হয়।

[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও আপোষহীনতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব বদর উদ্দিনের কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তির মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামানের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ বিচারকার্য সম্পাদনকালে বিচারকগণ যখন দলমতের উর্ধ্বে উঠে ন্যায়বিচারের স্বার্থে দ্বিধাহীন চিত্তে বিচারকার্য সম্পাদন করেন তখনই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও আপোষহীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোনো দল বা ব্যক্তির লেজুড়বৃত্তি না হয়ে, কিংবা ভয় না করে বা অর্থের প্রলোভনে প্রলোভিত না হয়ে, শক্তি ও ক্ষমতার কাছে নত না হয়ে বিচারকগণ যে বিচারকার্য সম্পাদন করেন তাই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও আপোষহীনতা। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও আপোষহীনতার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয় এবং জনজীবনে শৃঙ্খলা আসে।

গ জনাব বদর উদ্দিনের কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের রাষ্ট্রপতির মিল আছে।

দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে হ্রাস করা হয়েছে। নির্বাহী বিভাগের যাবতীয় কাজ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মাধ্যমে কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, আইনে সম্মতি দান, অধ্যাদেশ জারি, দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস ইত্যাদি সকল কাজে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামান দুজনেই সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন । জনাব বদর উদ্দিনের নামে সরকারের সকল নিবার্হী ক্ষমতা গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি উচ্চপদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও তাকে জনাব কামরুজ্জামানের সাথে পরামর্শ করতে হয় যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাজের অনুরূপ।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব বদর উদ্দিনের কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের রাষ্ট্রপতির মিল আছে।

ঘ জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামানের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাথে তুলনীয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় শাসনবিভাগের প্রকৃত প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। আর নামমাত্র প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তাই শাসন বিভাগের যাবতীয় কাজ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। যেমন :

- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- রাষ্ট্রপতি সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন।
- কোনো কারণে জাতীয় সংসদ বাজেট পাস করতে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ৬০ দিন মেয়াদের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন।
- বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ক-ভাগের ১৪১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ বা অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে দেশের নিরাপত্তা বা শান্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হয়। সংসদ অধিবেশন না থাকলে অধিবেশন হলে তখন তা পাস করিয়ে নিতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামানের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাথে তুলনীয়।

প্রশ্ন ▶ ২১ রেজোয়ান সমুদ্র উপকূলে বাস করে। ২০০৭ সালে সিডরে তার এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। রাস্তাঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যায়। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট একটি আবেদন জানানো হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

Teachingbd24.com

ক. রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন কেন? ১
খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রেজোয়ানের এলাকার যে স্থানীয় সরকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রেজোয়ানের আবেদন তার এলাকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক ছিল? তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশে সংসদ আছে কিন্তু সংসদ অধিবেশন নেই, এমতাবস্থায় দেশের জরুরি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন।

খ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।
এটি প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১১৭ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।' সংবিধানের ১১৭ (১) (ক) ও (খ) নং অনুচ্ছেদে অর্থদণ্ড বা অন্যদণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি; যে কোনো রাষ্ট্রায়াত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ কর্মসহ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

গ রেজোয়ানের এলাকার যে স্থানীয় সরকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো জেলা প্রশাসন।
উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, রেজোয়ান সমুদ্র উপকূলে বাস করে। ২০০৭ সালে সিডরে তার এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। রাস্তাঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যায়। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট একটি আবেদন জানানো হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনা মতে, জেলা প্রশাসন গঠিত হয় একজন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) ও তার অধস্তন অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে। বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের অন্যতম প্রধান স্তর এই জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন ডিসি। তিনি জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে এবং অধস্তন উপজেলার মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করেন। জেলা প্রশাসনকে কেন্দ্র করেই সমগ্র জেলার প্রশাসন পরিচালিত ও আবর্তিত হয়।

ঘ রেজোয়ানের আবেদন তার এলাকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক ছিল। আমি এ উক্তির সাথে একমত।
রেজোয়ান আবেদন করেছিল জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তা ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক বা ডিসির কাছে। ডেপুটি কমিশনার অন্যান্য কাজের সাথে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদিও সম্পাদন করে থাকেন, যা রেজোয়ানের সমস্যা সমাধানের সাথে সম্পৃক্ত। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং গুদামজাতকরণে সহায়তা করে থাকেন। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা এবং খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন। দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ ও নীতিমালা, বিভিন্ন পরিচয়পত্র, প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন জেলা প্রশাসক। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষণিক পরিদর্শন, দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি ও বাস্তবায়ন, ভিজিএফ/ভিজিডি বাস্তবায়ন ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করেন।
সুতরাং রেজোয়ানের আবেদন তার এলাকার সমস্যা সমাধানের সহায়ক ছিল এজন্য যে, রেজোয়ান যে কারণে আবেদন করেছিল তা জেলা প্রশাসকের কাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২২ আসলাম সাহেব বিভিন্ন দেশের সংবিধান এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। তিনি বিভিন্ন দেশের সংবিধান পাঠ করে বুঝতে পেরেছেন যে, পৃথিবীর সব দেশের সরকার পদ্ধতি এক রকম নয়। এ জন্যই সব দেশে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা একইরূপ নয়। এমনকি পৃথিবীর সব দেশের প্রশাসনিক কাঠামোও একইরূপ নয়। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদকাল কত বছর? ১
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাথে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা তুলনা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের সাথে পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান ও সরকার ব্যবস্থার মধ্যে তুমি বেশি মিল খুঁজে পাও? ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদকাল ৫ বছর।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে বিচারকদের স্বাধীনভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়।
কোনো দেশের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা বিচারের মাপকাঠি হলো সে দেশের বিচার বিভাগ কার্য সম্পাদনে কতটুকু স্বাধীন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবিধান এবং আইন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জরুরি।

গ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাথে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।
প্রথমত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান, তার ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ও আলংকারিক। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি প্রকৃত নির্বাহী কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান।
দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রকাশ্য ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন আমেরিকার আইনসভার ২টি কক্ষ সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের সমানসংখ্যক এবং আরও ৩ জন নির্বাচিত সদস্য সহযোগে গঠিত নির্বাচন সংঘ বা Electoral College কর্তৃক।
তৃতীয়ত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল ৫ বছর। অপরপক্ষে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল ৪ বছর।
চতুর্থত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত রাখতে পারেন। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নন; কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নেই।
পঞ্চমত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো পালন করে থাকেন। কিন্তু আমেরিকায় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী কাজ করেন।

ঘ বাংলাদেশের সাথে গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সংবিধান ও সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
বাংলাদেশ ও ভারতে সংসদীয় ধরনের সরকারব্যবস্থা বর্তমান। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মতো ভারতের রাষ্ট্রপতিও সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাদের ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ও অলংকারিক মাত্র। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালও ৫ বছর। অপরপক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালও ৫ বছর। উভয় দেশে প্রধানমন্ত্রীই সকল নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকেন।
উভয় দেশেই আইনসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচন করে থাকেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতে পালন করে থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতিও তার কর্তব্য পালনে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রণা অনুযায়ী কাজ করেন।

https://teachingbd24.com

উভয় দেশেই রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিকভাবে কতিপয় ক্ষেত্রে দায়মুক্তির বিধান রয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদটি উভয় দেশেই সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ।
ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভারতের সংবিধান ও সরকারব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান ও সরকারব্যবস্থার মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ নূরুল ইসলাম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আবুল কালাম রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন। নুরুল ইসলাম আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ করতে না পারলেও আবুল কালাম তা পারেন।
[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি ও কি কি? ১
খ. মৌলিক অধিকার বলতে কি বুঝায়? ২
গ. আবুল কালামের কাজের সঙ্গে বাংলাদেশের কোন বিভাগের কোন ব্যক্তির কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'আবুল কালাম নয়' নুরুল ইসলামই শাসনব্যবস্থার মধ্যমনি' — তুমি কি এর সঙ্গে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি। যথা: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

খ মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।
মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ হয় সেগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মাহমুদ সরকারের এমন একটি বিভাগের প্রধান যে বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে। উক্ত বিভাগের অনুমোদন ছাড়া কর ধার্য বা মওকুফ করা যায় না। নির্বাহী বিভাগও উক্ত বিভাগের নিকট দায়ী।
[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. ন্যায়পাল কী? ১
খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কি বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মাহমুদ সরকারের যে বিভাগের সদস্য সেটির কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের কোন বিভাগের কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মাহমুদের যথাযথ ভূমিকা পালনের উপরই ঐ বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল"— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধান-এর ৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ন্যায়পাল কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোনো কাজ সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা করবেন এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে পালন করবেন।

খ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন কিংবা শাসন বিভাগের কাজ সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা বিচার বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করার ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।
বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক। সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষাকারী হিসেবে বিচার বিভাগ এর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে। বিচার বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ, তাহলে তা বাতিল করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের রয়েছে। তেমনি শাসন বিভাগের কোনো কাজ সংবিধানসম্মত না হলে বিচার বিভাগ তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা বজায় রাখতে বিচার বিভাগ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

গ উদ্দীপকে মাহমুদ সরকারের আইন বিভাগের সদস্য ও প্রধান। এ বিভাগটির সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল রয়েছে।
উদ্দীপকে মাহমুদ তার সরকারের আইন বিভাগের প্রধান। তার বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে। এই বিভাগের অনুমোদন ছাড়া কর নির্ধারণ বা মওকুফ করা যায় না। এমনকি নির্বাহী বিভাগও উক্ত বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। বাংলাদেশের আইন বিভাগ ও উপরোল্লিখিত সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের আইন সভায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন ও সংশোধন হয়। সরকারের অর্থ বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগও আইনসভার কাছে দায়ী।
সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকের মাহমুদের সরকারের উল্লিখিত বিভাগের সাথে বাংলাদেশ সরকারের আইনসভার কাজের মিল রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ হালিমা ও ফরিদা বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ নিয়ে আলাপ করছিল। হালিমা বলে, বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার হওয়ায় এখানে এমন একটি পদ আছে যিনি প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হয়েও একজন নাম সর্বস্ব প্রধান মাত্র। তবে প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়? ১
খ. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন বলতে কী বুঝ? ২
গ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সবার উপর কে স্থান লাভ করেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের সর্বোচ্চ নির্বাহী ব্যক্তি সকল কাজই করেন অথচ কোন কাজই করেন না।"— যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বাদশ সংশোধনীয় মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করা হয়।

খ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।
সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ বাংলাদেশে সবার উপরে স্থান লাভ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। তিনি সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কাজ পরিচালিত হয়।

Teachingbd24.com

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাই সকল দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। প্রতিটি নতুন সংসদের শুরুতে এবং ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করবেন। রাষ্ট্রপতি অবস্থায় তিনি কোনো কাজ করলে বা না করলে সেজন্য তাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হয় না। তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি মামলা করা যাবে না এবং তাঁকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারবে না।

ঘ "উদ্দীপকের সর্বোচ্চ নির্বাহী ব্যক্তি সকল কাজই করেন অথচ কোনো কাজই করেন না" – উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সরকারের নামসর্বস্ব প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। কেননা রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীই হলেন প্রকৃত শাসন প্রধান। রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পন্ন করা হলেও মূলত কাজগুলো সম্পাদন করেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দিলেও এক্ষেত্রে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ দিতে বাধ্য থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও সম্মতি ছাড়া তিনি তার কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারেন না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীই শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। তিনিই বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও শাসনব্যবস্থার প্রধান। আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রধান মাত্র। তার পদমর্যাদা সর্বোচ্চ হলেও তার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের নামসর্বস্ব ও অলঙ্কারিক প্রধান।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সুমন ও কাদের দুই বন্ধু একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নিয়ে আলোচনা করছিল। উক্ত কর্মকর্তা প্রশাসনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেকেই তাকে জেলা প্রশাসনের বন্ধু, পরিচালক ও পথ প্রদর্শক হিসেবে অভিহিত করে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কর্ম কমিশনের সদস্যদের কে নিয়োগ দেন? ১

খ. নির্বাচন কমিশন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তার কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যাবলি আলোচনা কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্ম-কমিশনের সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন।

খ যে কমিশন দেশের বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে সেই কমিশনকে নির্বাচন কমিশন বলে। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করে থাকে।

গ জেলা প্রশাসক জনগণের বন্ধু।

সরকারের মাঠ প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক। তাকে কেন্দ্র করেই জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। তিনি জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে তিনি জনগণের যোগসূত্র স্থাপনের প্রধান মাধ্যম। তার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

জেলা প্রশাসক শুধু একজন প্রশাসকই নন, তিনি জনগণের প্রকৃত বন্ধুও। তিনি জেলার সকল প্রকার বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি দুর্যোগ হলে জেলা প্রশাসক জেলার ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। তাই বলা যায়, জেলা প্রশাসক তার কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করেন।

ঘ জেলা প্রশাসকের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলে অভিহিত করা হয়।

বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে কেন্দ্র করেই জেলার যাবতীয় সরকারি কার্যাবলি পরিচালিত হয়। প্রশাসন সংক্রান্ত সকল দায়-দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত। এছাড়া তিনি জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন দপ্তর ও প্রশাসনিক সংস্থার কাজ তদারক করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল সার্জন, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, স্কুলসমূহের পরিদর্শক, কারাগার পরিদর্শকসহ ও জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

জেলা প্রশাসক জেলার বিচারকও বটে। তিনি একজন প্রথম শ্রেণির বিচারক হিসেবে ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি দু'বছর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করতে পারেন। জেলা প্রশাসক সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সংক্রান্ত কাজও করে থাকেন। তিনি জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সরকারি সকল দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। জেলা প্রশাসক জেলার উন্নয়নের জন্য জেলার গণ্যমান্য লোকদের সাথে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

উল্লিখিত কার্যাবলি ছাড়াও জেলা প্রশাসক রাজস্ব সংক্রান্ত, স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত, মানবতামূলক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ও শান্তিরক্ষামূলক কাজসহ আরও কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

আর এ কারণেই জেলা প্রশাসককে জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭

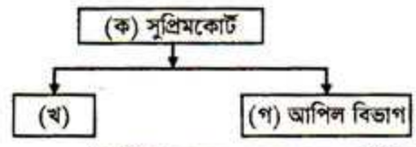

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন কে? ১

খ. সুপ্রিমকোর্টের বিচারক পদের জন্য দুইটি যোগ্যতা লিখ। ২

গ. 'খ' বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'খ' বিভাগের রায়ের পর কোন বিভাগে আবেদন করা যায়? কোন কোন ক্ষেত্রে করা যায়? লিখ। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

খ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ নম্বর অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগের যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। দুইটি যোগ্যতা হলো:

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২. সুপ্রিম কোর্টে অন্তত দশ বছর কাল অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করতে হবে।

গ 'খ' বিভাগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাইকোর্ট বিভাগ।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ নিয়ে গঠিত। হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা অধস্তন সকল আদালত তথা দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাখা তদারকি ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ছকে 'খ' বিভাগটি দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

Teachingbd24.com

শাসনতন্ত্র ও আইন দ্বারা প্রদত্ত সকল আদি ও আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত। এছাড়া শাসনতন্ত্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকর করার সকল দায়িত্ব হাইকোর্ট বিভাগের। এ মর্মে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপর্যুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে। (খ) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং স্বয়ং মামলাটি মীমাংসা করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ সকল অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তাই বলা যায়, 'খ' চিহ্নিত বিভাগ অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগের কার্যাবলির পরিধি বিস্তৃত।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' বিভাগ অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগের পর আপিল বিভাগে আবেদন করা যায়।

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পরিচালিত হয়। হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির ও তা নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আপিল বিভাগের রয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়–

ক. যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করে যে, মামলাটির সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, অথবা,

খ. হাইকোর্ট বিভাগকে অবমাননার দায়ে উক্ত বিভাগ কোনো বিভাগকে দণ্ড প্রদান করছে।

গ. জাতীয় সংসদ দ্বারা আইনের অন্যান্য ক্ষেত্রে।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে উল্লিখিত কারণে কোনো আপিল না চললেও আপিল বিভাগ আপিলের অনুমতি দান করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাজেট প্রণয়ন ছাড়াও অপর একটি অঙ্গের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট নিয়েও বিতর্ক করে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের অঙ্গটির সাথে বাংলাদেশের সাদৃশ্যপূর্ণ অঙ্গটির কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগটি কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে? আলোচনা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে।

খ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার নির্ণায়ক ও আদর্শাশ্রয়ী একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ দ্বি-জাতি তত্ত্বের উন্মেষ ঘটান। তার মতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। তার এ মতবাদটিই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের অঙ্গটির সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল আছে।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের অঙ্গটি নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের আইন বিভাগও আইন সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত।

সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনেক। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে ঐ বছরের জন্য অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ বা বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করে আইন বিভাগ।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কর ধার্য করা যায় না এবং কোনো ব্যয়ও করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের আইনবিভাগ নামক অঙ্গটির সাদৃশ্য রয়েছে। এই আইনবিভাগ বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কারণ বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান। শাসনবিভাগ তাদের গৃহিত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভা কতদিন ক্ষমতায় থাকবে তা নির্ভর করে আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর। সংবিধান অনুযায়ী আইনবিভাগ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের সমস্ত কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মূলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যদের আস্থা হারালে যে কোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবে সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি. 'X' জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি তাকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। পদ মর্যাদা অনুযায়ী তিনি দেশের প্রকৃত শাসক। তারা ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. কোরাম কাকে বলে? ১

খ. অভিসংশন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যক্তির সাথে বাংলাদেশের কোন পদের নিয়োগ ও পদমর্যাদা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির পদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের কাজ যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে পরিচালনা করা যায়, তাকে কোরাম বলা হয়।

খ অভিশংসন বলতে সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচারকে বোঝায়।

সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অভিশংসন করতে পারে।

গ সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩০ মিঃ গোর 'ঘ' রাষ্ট্রের একজন আইনসভার সদস্য। তিনি সরকারের মন্ত্রিপরিষদেরও সদস্য। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আইনসভার আস্থা হারালে তিনিসহ পুরো মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য। মিঃ গোরই তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। */হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১/*

ক. বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ কীভাবে গঠন করা হয়? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে অপসারণ করা হয়, বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন্ সরকার ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মিঃ গোরই হলেন তার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর সমন্বয়ে।

খ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।

সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ উদ্দীপকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হয়।

এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একাধারে আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের আস্থা হারালে প্রধানমন্ত্রীসহ সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

মি. গোরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি তার রাষ্ট্রের আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া তিনি তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। রাষ্ট্রের আইনসভার আস্থা হারালে তিনিসহ পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন, যা সংসদীয় সরকার পদ্ধতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কথাই বলা হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩১

/হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/

ক. মন্ত্রণালয়ের প্রধান কে? ১

খ. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গঠন লিখ। ২

গ. ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে কোন্ ধরনের প্রশাসন নির্দেশ করে এবং এ স্তরের প্রধান প্রশাসকের ২টি কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকে '?' চিহ্নিত স্থানের প্রশাসক খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন-এর যথার্থতা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান হচ্ছে মন্ত্রী।

খ বাংলাদেশের আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এদের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। বাকী ৫০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এরা সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

গ ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসনের জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ করে।

শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি বিভাগকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৪টি জেলা রয়েছে। যিনি জেলার প্রশাসন পরিচালনা করেন, তিনিই হচ্ছেন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক। বিভাগীয় কমিশনারের পরেই ডেপুটি কমিশনারের স্থান। ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা। তাঁকে কেন্দ্র করে জেলার সমগ্র প্রশাসন আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক জেলার শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে জেলা প্রশাসকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের যাবতীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত হয় এবং তিনি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালনা করেন। জেলা প্রশাসকের দুটি কাজ হলো—

১. প্রশাসনিক কাজ: জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত। বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রেরিত সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা তিনি তাঁর অধঃস্তন সহকর্মীদের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করেন। জেলার প্রশাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে থাকেন।

২. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা: জেলা প্রশাসক জেলার সমস্ত শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (ADC), ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (SP) তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। জেলার পুলিশ, আনসার ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

ঘ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ করা হয়েছে। মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট হলো জেলা প্রশাসন।

সরকারের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এই জেলা প্রশাসন। সকল নির্বাহী কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন জনগণ ও সরকারের কেন্দ্রিয় অংশের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। মূলতঃ জেলা প্রশাসনকে ঘিরেই জেলা পর্যায়ে সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কাজ পরিচালিত হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ট্রেজারী, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন ইত্যাদি কাজগুলো জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে অনেকাংশেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সমগ্র বাংলাদেশকে ৬৪টি জেলায় বিভক্ত করে মাঠ প্রশাসনকে সাজানো হয়েছে। সকল জেলার সুষ্ঠ পরিবেশের উপরই সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। তাই জেলা প্রশাসনের ওপর সরকার অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ সকল কারণেই জেলা প্রশাসনকে বাংলাদেশের প্রশাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় জেলা প্রশাসকের প্রশাসন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩২ মি. 'ক' জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মি. 'খ' রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছেন। মি. 'ক" জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় অধ্যাদেশ জারি করতে না পারলেও মি. 'খ' তা পারেন। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? ১

খ. রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল কোনটি? এটি কীভাবে সংশোধন করা হয়? ২

গ. মি. 'খ' এর কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তির কাজের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'খ' নন 'ক'-ই শাসন ব্যবস্থার মধ্য-মনি তুমি কি এর সাথে একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎকৃত হয় সেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলা হয়।

খ রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের নিয়ম বা পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। তিনি সাতদিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং বিলটি বিধিবদ্ধ ও কার্যকর হবে।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৩ মি: গোর ঘ রাষ্ট্রের একজন আইনসভার সদস্য। তিনি সরকারের মন্ত্রিপরিষদেরও সদস্য। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আইন অবস্থা হারালে তিনিসহ পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য। মি: গোরই তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। *[বি. এন. কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ কীভাবে গঠন করা হয়? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে অপসারণ করা হয়? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সরকার ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি: গোরই হলেন তার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি? উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর সমন্বয়ে।

খ সৃজনশীল ৩০ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩০ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৪ ঝিলমিল টেলিভিশনে দেখলো একজন সংসদ সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করল। উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। *[বি. এন. কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বাংলাদেশের আইন সভা (জাতীয় সংসদ) কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১

খ. সচিবালয় বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ ছাড়াও জাতীয় সংসদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির মন্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইন সভা (জাতীয় সংসদ) ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ সচিবালয় বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র।

সচিবালয় গঠিত হয় মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে। সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সচিবালয়ে। অধীন দপ্তর বা বিভাগগুলো সবিচালয়ের নির্দেশে পরিচালিত হয়। কোন বিভাগীয় প্রধান সচিবের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট কোনো কিছু পাঠাতে পারে না। যদি একান্তভাবে কোনো বিষয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয় তবে আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো আগে সচিবকে অবহিত করতে হয়। সচিবালয় সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এবং সকল বিভাগ, দপ্তর ও অধীন সংস্থাগুলো সবিচালয়ের মুখাপেক্ষী।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ অর্থাৎ আইন সংক্রান্ত কার্যাবলি ছাড়াও জাতীয় সংসদ বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। আইন, শাসন, বিচার, সংবিধান, নির্বাচন, আলোচনা-বিতর্ক, অর্থনৈতিক, চাকরি, অধ্যাদেশ, সামরিক ক্ষমতা, জরুরী অবস্থা ঘোষণা, মৌলিক অধিকার রক্ষা সহ অন্তরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে জাতীয় সংসদ। সরকারের তিনটি শাখা-আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য জাতীয় সংসদকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয়। সংসদে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতাদের দায়িত্বপূর্ণ কার্যক্রম দ্বারা জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য এক হয়ে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ অর্থাৎ জাতীয় সংসদের আইন ও শাসন সংক্রান্ত কাজ দ্বারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির মন্তব্য দ্বারা জাতীয় সংসদের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদ একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। সংসদ যেকোনো আইন-প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাশ করতে হলে তা বিলের আকারে সংসদে পেশ করা হয়। আইনের খসড়াকে বিল বলে। সংসদে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত মূলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় কমিটি গঠন, উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেশের কল্যাণ ও শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান করা হয়। এভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

প্রশ্ন ▶৩৫ জনাব এহসান সরকারের তিনটি বিভাগের অন্যতম একটি বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তার বিভাগ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। মার্কিন সংবিধানে উক্ত বিভাগ আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করে থাকে। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এ বিভাগের স্বাধীনতা জরুরী। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

Teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশের আইন সভার নাম কী? ১
খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগের স্বাধীনতা —ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিভাগের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।
এটি প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১১৭ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।'

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগটি হলো বিচার বিভাগ।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বাংলাদেশ সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে আলাদা হয়ে কাজ করবে।সংবিধান অনুসারে বিচার বিভাগকে সরকার অপর দুটি বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক করেছে।বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি, চাকরির নিরাপত্তা, বেতন, পদমর্যাদা এবং বিচারকদের দক্ষতা, জ্ঞান ও সাহসিকতার ওপর।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধান ও আইন সংরক্ষণে খুবই জরুরি। এ বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একে সরকার অপর দুটি বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক করেছে। কোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা বিচারের মাপকাঠি হলো সে দেশের বিচার বিভাগের উৎকর্ষ। বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যহীন আইনকে বাতিল বলে গণ্য করতে পারবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে নিশ্চিত হলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

ঘ উল্লিখিত উদ্দীপকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিভাগ অর্থাৎ বিচার বিভাগের ভূমিকা অনন্য।
বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রান্তিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
আইনের শাসনের রক্ষক ও অভিভাবক হলো সংবিধান. আর সংবিধানের রক্ষক হলো বিচার বিভাগ। কোনো আইন সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন করলে বিচার বিভাগ বা আদালত তার সুরাহা করে। আইন অমান্যকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সরকার, মানবাধিকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুতর অন্যায়, অধিকার লঙ্ঘন, ক্ষতি হলে বিচার বিভাগ স্বেচ্ছায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রুল জারি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নিষ্পত্তি করার জন্য আদালত স্ব-প্রণোদিত হয়ে সুয়োমোটো রুল জারির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার দিয়ে থাকে।
অতএব বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা আদালত বা বিচার বিভাগের কাজ।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ জনাব 'M' বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মানজনক পদে নিযুক্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহীক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন।
[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. অধ্যাদেশ জারি করেন কে? ১
খ. সুপ্রিম কোর্টের গঠন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'M' বাংলাদেশের কোন নির্বাহীপদে অধিষ্ঠিত? তার পদের যোগ্যতা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত নির্বাহী পদ এবং বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা একসূত্রে গাঁথা— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

খ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত যা আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত।
১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন, কার্যাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দান করে। মোট কথা আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত এবং বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

গ জনাব 'M' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।
উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান জনাব 'M' কে নিয়োগ দেন। জনাব 'M' সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ ও জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। তাই বলা যায়, জনাব 'M' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।
নিচে প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা বর্ণনা করা হলো—
i. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
ii. অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।
iii. তার নাম সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
vi. আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করলে প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য হবেন না।
v. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন।
vi. নিজ দলের সংসদ নেতা হিসেবে মনোনয়ন প্রাপ্তি।
উল্লিখিত যোগ্যতার অধিকারী হলে কোনো ব্যক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

ঘ 'উক্ত নির্বাহী পদ এবং বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা একসূত্রে গাঁথা'— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করা হলো:
প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার কেন্দ্রবিন্দু। মন্ত্রিসভার উত্থান ও পতন সবই তার ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ নং অনুচ্ছেদের ২ নং দফায় বলা হয়েছে যে, 'প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অথবা তার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হবে।' প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনার দ্বারা প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:
প্রথমত, প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, আবার তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভার পতন হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী যেকোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করাতে পারেন।
দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভার কর্মসূচি ও সংসদের আইন প্রণয়ন পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই রচিত।

Teachingbd24.com

তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী গোটা শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। প্রধানমন্ত্রীই সকল প্রকার কার্যের মধ্যমণি।
চতুর্থত, প্রধানমন্ত্রী তার ব্যক্তিত্ব ও দলীয় নেতা হিসেবে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষ গুণাবলি প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলে।
পঞ্চমত, জরুরি অবস্থা চলাকালে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দান করেন।
ষষ্ঠত, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং এক প্রকার ঐক্যসূত্র গড়ে তোলেন।
সপ্তমত, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির প্রতীক। জাতীয় প্রতিরক্ষা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।
অষ্টমত, প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।
নবমত, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। তার নেতৃত্বে ও পরামর্শে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
উক্ত আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা একসূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ বাংলাদেশের প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর পরই অবস্থান হলো সচিবের। সচিব মন্ত্রণালয়ের সঠিক নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান মন্ত্রীকে সরবরাহ করে থাকেন। কেন্দ্রের সাথে বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনিক ইউনিটের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. কবে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়? ১
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. একটি ছকের সাহায্যে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. জেলা প্রশাসন হলো জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা। উক্তিটির সত্যতা নির্ণয় কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো হলো কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের জন্য একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
বাংলাদেশের প্রশাসন কাঠামোকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১. কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং ২. স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসন। বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। সমগ্র দেশকে কেন্দ্র থেকে শাসন করা হয় এবং নীতি নির্ধারণ করা হয়। মাঠ প্রশাসন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নীতিমালা ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

কেন্দ্রীয় প্রশাসন	মাঠ প্রশাসন
রাষ্ট্রপতি	বিভাগীয় প্রশাসন
প্রধানমন্ত্রী	জেলা প্রশাসন
মন্ত্রিপরিষদ	উপজেলা প্রশাসন
সচিবালয়	
মন্ত্রণালয়	
বিভাগ	
শাখা সমূহ	

ঘ জেলা প্রশাসন হলো জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা— উক্তিটি যথার্থ।
বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার মাঠ প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তরে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মৌলিক ও প্রাথমিক একক। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। প্রতিটি জেলার শাসন ভার একজন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের উপর ন্যাস্ত। জেলা প্রশাসনকে কেন্দ্র করেই সমগ্র জেলার প্রশাসন পরিচালিত ও আবর্তিত হয়। সাধারণত জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য হয়ে থাকেন।
জেলা প্রশাসন জেলার মধ্যমণিরূপে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনারসহ প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তরকে প্রত্যক্ষভাবে সমন্বয় ও পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও পরোক্ষভাবে জেলার শিক্ষা অফিস, জেলা খাদ্য সরবরাহ অফিস, গণ স্বাস্থ্য অফিস, গণপূর্ত বিভাগীয় অফিস, মৎস বিভাগীয় অফিস, বন বিভাগীয় অফিস, কৃষি অফিস, পুলিশ বিভাগ, রেজিস্ট্রেশন বিভাগ, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন, সমবায়, কারাগার বিচার বিভাগ, ব্যাংক বীমা অফিসসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি বিভাগ নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করে থাকেন। জেলা প্রশাসন জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথার ন্যায় জনশৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, পর্যটন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও বাতিল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, সংবাদ প্রকাশনা, নির্বাচন,.খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ও শ্রম বিষয়ক কর্ম, যুব, ক্রীড়া ও নাগরিক বিনোদন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন দ্রুত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। ফলে জেলা প্রশাসন জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথার ন্যায় জেলার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিদর্শন করে থাকে। এভাবে জেলা প্রশাসক হয়ে উঠেন জেলার বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জনাব আসাদুজ্জামান জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার দল থেকে মনোনীত হয়ে জনাব সহিদুল ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আসাদুজ্জামান আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ করতে না পারলেও সহিদুল ইসলাম তা পারেন।

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল | প্রশ্ন নং ৭]

ক. অধ্যাদেশ জারি করেন কে? ১
খ. কোরাম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব সহিদুল ইসলামের কাজের সঙ্গে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তির কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব সহিদুল ইসলাম নন, জনাব আসাদুজ্জামানই শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি।— তুমি কি এর সঙ্গে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

খ যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।
কোরাম শব্দের অর্থ ন্যূনতম উপস্থিতি সংখ্যা। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা হয়। সংসদের অধিবেশন চলাকালে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা যদি ৬০ জনের চেয়ে কম হয় এবং সে মর্মে যদি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার অধিবেশন স্থগিত রাখবেন বা সংসদ মুলতবি ঘোষণা করবেন।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৯ রাজধানীর শ্যামপুর থানার একটি মামলায় বিনা বিচারে প্রায় দেড় দশক ধরে কারাগারে ছিলেন চান মিয়া। এ বিষয়ে বেসরকারি একটি চ্যানেলে সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনেন দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত চান মিয়াকে জামিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতকে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান কে? ১

খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কী? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এর গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালতের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন কিংবা শাসন বিভাগের কাজ সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা বিচার বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করার ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক। বিচার বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ, তাহলে তা বাতিল করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের রয়েছে। তেমনি শাসন বিভাগের কোনো কাজ সংবিধানসম্মত না হলে বিচার বিভাগ তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা বজায় রাখতে বিচার বিভাগ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। যথা: (ক) আপিল বিভাগ ও (খ) হাইকোর্ট বিভাগ।

রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজনবোধ করবেন ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের নিয়ে আপিল বিভাগ গঠিত হবে এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট এবং স্থায়ী বেঞ্চ গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ কোনো কারণে শূন্য হলে আপিল বিভাগের প্রবীণতম বিচারক অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন।

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আর বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

ঘ উল্লিখিত উদ্দীপকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আদালত বা বিচার বিভাগের ভূমিকা অনন্য।

বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ বা আদালত ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। আদালত ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রান্তিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আইনের শাসনের রক্ষক ও অভিভাবক হলো সংবিধান, আর সংবিধানের রক্ষক হলো আদালত। কোনো আইন সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন করলে বিচার বিভাগ বা আদালত তার সুরাহা করে। সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে আইনের শাসন বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে আদালত নানা কৌশল প্রয়োগ করে। আইন অমান্যকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সরকার, মানবাধিকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুতর অন্যায়, অধিকার লঙ্ঘন, ক্ষতি হলে বিচার বিভাগ স্বেচ্ছায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রুল জারি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নিষ্পত্তি করার জন্য আদালত স্ব-প্রণোদিত হয়ে সুয়োমোটো রুল জারির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার দিয়ে থাকে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অতএব বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা আদালত বা বিচার বিভাগের কাজ।

প্রশ্ন ▶ ৪০ জয় ও বিজয় দুজন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। জয়ের রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইনসভার নিকট দায়ী। কিন্তু বিজয়ের রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৬]

ক. অধ্যাদেশ জারি করেন কে? ১

খ. 'প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের মূল নেতা' ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিজয়ের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে জয়ের রাষ্ট্রের কোন মিল আছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

খ মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মুখ্য শাসক ও সরকার প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পরিচালিত হয়। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের নিয়োগ, রাষ্ট্রের উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন এবং সকল দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। সর্বোপরি বলা যায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের মূল নেতা।

গ বিজয়ের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসনকর্তা হিসেবে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। এখানে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সেবকমাত্র। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা সাহায্য দান করতে কোনো মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকতে পারে। মন্ত্রীরা বা উপদেষ্টারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারেই নিযুক্ত বা অপসারিত হন। তারা সমস্ত কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। মূলত তারা রাষ্ট্রপতির কর্মচারী হিসেবে কাজ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান।

বিজয়ের রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। এছাড়া তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধও নন যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার অনুরূপ। তাই বলা যায়, বিজয়ের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বিদ্যমান।

Teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে জয়ের রাষ্ট্রের সরকারের সাদৃশ্য আছে।

যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের ওপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। জয়ের রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এরূপ রাষ্ট্রে সরকারপ্রধান আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত। জয়ের রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশেও সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। তার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একই সময়ে আইনসভারও সদস্য থাকেন। মন্ত্রীরা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন। কারণ আইনসভার আস্থা হারালে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। এই সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান এক ব্যক্তি থাকেন না। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তাদের সকল কাজকর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রীগণ তাদের নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে জয়ের রাষ্ট্রের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ রাজশাহীর মতিহার থানার একটি মামলায় বিনা বিচারে প্রায় দেড় দশক ধরে কারাগারে ছিলেন আনা মিয়া। এ বিষয়ে বেসরকারি একটি চ্যানেলে সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনেন দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত আনা মিয়াকে জামিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতকে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন।

[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং-৬]

ক. জাতীয় সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কতটি আসন? ১

খ. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এর গঠন বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালতের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০টি।

খ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন জাতীয় সংসদের নেতা।

জাতীয় সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তার নেতৃত্বে ও পরামর্শে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তার পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান, মুলতুবি ও স্থগিত করেন। তাকে জাতীয় সংসদে সরকারের নীতি, লক্ষ্য ও কার্যক্রমের সপক্ষে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ও গতিপ্রবাহ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। বাজেট অনুমোদনেও প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪২ মি. স্টিফেন তার দেশের আইনসভার একজন সদস্য। তিনি মন্ত্রিসভারও নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হয়। আইন সভার আস্থা হারালে তিনি ও তার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মি. স্টিফেন-ই তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি।

[নায়েল স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. অধ্যাদেশ কে জারি করেন? ১

খ. রাষ্ট্রপতির অভিসংশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মি. স্টিফেন এর কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার কোন পদের সাদৃশ্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. স্টিফেনের অনুরূপ পদ বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন।

খ সৃজনশীল ২৫ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব 'ক' তার জমি-জমা বিরোধ মীমাংসার জন্য বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে একটি মামলা করেন। তিনি আশা করেছিলেন এখান থেকে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন। কিন্তু আদালতের রায়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁর বিরোধী বিবাদি অনেক অর্থ সম্পদের মালিক। মামলার রায়ে তিনি মনে করেন বিচারক নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। তিনি ভাবলেন বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ কিছু দিককে প্রাধান্য না দিলে জনগণ কখনও ন্যায়বিচার পাবেন না।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদমর্যাদা কী? ১

খ. অধ্যাদেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব 'ক' যে আদালতে মামলা করেছেন তার কার্যপ্রণালি ও কাজের পরিধি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে বিচারকদের নিরপেক্ষ থাকা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বলে তুমি মনে কর। বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদমর্যাদা হলো তিনি সরকার প্রধান।

খ অধ্যাদেশ বা Ordinance হলো জরুরি আইন। জাতীয় সংসদে যখন অধিবেশন থাকবে না, তখন যদি জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনামতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে জরুরি আইন প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন, সেগুলোকেই অধ্যাদেশ বলা হয়। এ সব অধ্যাদেশ আইনের মতোই কার্যকর হয়। তবে জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে উপস্থাপনের ৩০ দিন পর তা বাতিল হয়ে যাবে। আবার এসব অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদিত হলে তা আইনে পরিণত হবে।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক' ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্গত হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করেছেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে তিনটি এখতিয়ার থাকবে। ১. আদি এখতিয়ার ২. আপিল এখতিয়ার এবং ৩. অন্যান্য এখতিয়ার।

আদি ও আপিল এখতিয়ার: সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দায়িত্ব হাইকোর্টের ওপর ন্যস্ত।

১. সংবিধান ও অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের মৌলিক আপিল সংক্রান্ত এবং অন্যান্য ক্ষমতা ও এখতিয়ার থাকবে।

২. কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কোনো কাজ করা হতে বিরত রাখতে অথবা করণীয় কাজ করার জন্যে আদেশ বা নির্দেশ দান করতে পারবে।

Teachingbd24.com

৩. কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তির কার্যধারাকে আইনসঙ্গত নয় বা আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করতে পারবে।

৪. হাইকোর্ট বিভাগ কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে এবং কোনো ব্যক্তি কোন কর্তৃত্ব বলে কোন পদমর্যাদায় আসীন রয়েছেন তার প্রমাণ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করতে পারে।

৫. হাইকোর্ট যদি মনে করে অধীনস্থ কোনো আদালতের মোকদ্দমায় সংবিধানের ব্যাখ্যাদানজনিত আইনের জটিল প্রশ্ন জড়িত তবে মামলাটি তুলে নিয়ে এসে নিজেই মীমাংসা করতে পারবে।

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত তথা হাইকোর্ট বিভাগ অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালনা করবে এবং সকল অধস্তন আদালতের জন্যে কার্যবিধি প্রণয়ন করবে।

ঘ জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিচারকদের নিরপেক্ষ থাকা নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বলে আমি মনে করি।

বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি: বিচারকদের নিরপেক্ষতা বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার ব্যবস্থা পৃথক হলে বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে সক্ষম হন।

আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণ: বিচার বিভাগের ওপর যেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি না হয়, নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্যে কেউ যাতে অশুভ প্রচেষ্টা চালাতে না পারে, বিচারকরা যাতে ঘুষ দুর্নীতিতে লিপ্ত না হন সেসব বিষয়ে আইনজীবীদের সতর্ক থাকতে হবে।

বিচারকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগদান করা উচিত। কেননা আইন বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ দিলে, তার পক্ষে সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণ মানুষকে যোগ্য করে তোলে। বিচারক পদে যারা নিয়োগ লাভ করবেন তাদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

সততা: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সৎ ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ দিতে হবে।

বিচারকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা এবং সামাজিক মর্যাদা: বিচারকদের আকর্ষণীয় বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করলে তারা সহজে দুর্নীতিগ্রস্ত হবে না। সৎ ও নির্লোভ থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশরক্ষা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগ নিয়ে 'ক' রাষ্ট্রটির নির্বাহী বিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রটির রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান, সরকার প্রধান নন। প্রধানমন্ত্রী দেশটির শাসনব্যবস্থার মধ্যমনি, মন্ত্রিসভার মূলস্তম্ভ।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাহী কর্তৃত্ব কার হাতে ন্যস্ত? ১

খ. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন পদ্ধতি কীরূপ? ২

গ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাথে উল্লেখিত 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কতটুকু মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মিল কতটুকু তা ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত।

খ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।

সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। তিনি সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কাজ পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের জনাব 'ক' বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিরই নামান্তর মাত্র।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। তবে তার ক্ষমতা নাম সর্বস্ব। তিনি বছরের প্রথম অধিবেশনে সংসদে ভাষণ দেন। একই ভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিও সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাই সকল দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। প্রতিটি নতুন সংসদের শুরুতে এবং ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করবেন। রাষ্ট্রপতি অবস্থায় তিনি কোনো কাজ করলে বা না করলে সেজন্য তাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হয় না। তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে প্রকার ফৌজদারি মামলা করা যাবে না এবং তাঁকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারবে না। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের জনাব 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক প্রধান রাষ্ট্রপতির পদ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে প্রধানমন্ত্রী দেশটির শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি, মন্ত্রিসভার মূলস্তম্ভ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করলেও আমরা তাই দেখতে পাই।

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, আবার তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভার পতন হয়। প্রধনমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। প্রধানমন্ত্রী যেকোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভার কর্মসূচি ও সংসদের আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই রচিত।

তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী গোটা শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তিনি সকল প্রকার কার্যের মধ্যমণি।

চতুর্থত, প্রধানমন্ত্রী তার ব্যক্তিত্ব ও দলীয় নেতা হিসেবে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী।

পঞ্চমত, জরুরি অবস্থা চলাকালে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন।

ষষ্ঠত, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং এক প্রকার ঐক্যসূত্র গড়ে তোলেন।

সপ্তমত, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির প্রতীক। জাতীয় প্রতিরক্ষা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। জাতীয় নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের সংহতির জন্য তিনি সম্ভাব্য সবকিছু করে থাকেন।

অষ্টমত, প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত কোনো চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

Teachingbd24.com

নবমত, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। তার নেতৃত্বে ও পরামর্শে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তার পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান, মুলতুবি ও স্থগিত করেন।

দশমত, প্রধানমন্ত্রী জাতির নেতা। তিনি সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বিবৃতি ও বক্তৃতা দান করে জনগণকে অবহিত করেন। জাতীয় স্বার্থ ও সুষ্ঠু রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান রাখার লক্ষ্যে জাতীয় ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৫

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশের আইন সভার নাম কী? ১

খ. 'কোরাম' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত স্থানে বাংলাদেশ সরকারের কোন সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চিত্রে প্রদর্শিত বিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ-এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ কোরাম বলতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে বোঝায়।

কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ সদস্য বৈঠকে উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদের বৈঠক স্থগিত রাখেন কিংবা মুলতবি ঘোষণা করেন।

গ চিত্রে প্রদর্শিত স্থানটি হচ্ছে জাতীয় সংসদ ভবন। এখানে বাংলাদেশের আইনসভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

জাতীয় সংসদ জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রণকারী। সংসদের অনুমোদন ছাড়া সরকার কোনো প্রকার অর্থ ব্যয় করতে পারে না। প্রত্যেক অর্থবছরে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংবলিত বাজেট সংসদে পেশ করতে হয়। সংসদের অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী সরকারকে চলতে হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদকে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়, জবাবদিহি করতে হয় এবং সংসদের অধিকাংশ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন করলে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সংসদে মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আর প্রধানমন্ত্রী সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে।

জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতি, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনের মহিলা সদস্যগণও জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে। প্রয়োজনে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও ন্যায়পালকে অপসারণের ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে। আবার জাতীয় সংসদ রাষ্ট্র ও জনগণের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজন অনুযায়ী সংবিধানের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন করে থাকে। এর পাশাপাশি সংসদ সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য অধঃস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদনের ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে।

ঘ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চিত্রে প্রদর্শিত বিভাগ তথা আইন বিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় সংসদ যেভাবে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হলো—

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা: জাতীয় সংসদের সদস্যগণ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সংসদ মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে সংযত রাখেন।

মুলতবি প্রস্তাব: জাতীয় সংসদ সদস্যগণ প্রয়োজনে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে।

নিন্দাসূচক প্রস্তাব: শাসন বিভাগের কোনো নীতি, কর্মসূচি সম্পর্কে জাতীয় সংসদ নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনয়ন করে এবং তা পাস করে শাসন বিভাগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ছাঁটাই প্রস্তাব গ্রহণ: জাতীয় সংসদ ছাঁটাই প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ: জাতীয় সংসদ সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয় সংসদ সরকারের আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব সম্বলিত বাজেট পাস করে শাসন বিভাগরে ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী আলোচনা: রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করে থাকেন। সংসদ সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অনাস্থা প্রস্তাব: মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করাই হলো শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান উপায়। জাতীয় সংসদে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকারের পতন ঘটে।

উপরে আলোচিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আইন বিভাগ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ মিঃ গোর 'ঘ' রাষ্ট্রের একজন আইনসভার সদস্য। তিনি সরকারের মন্ত্রিপরিষদেরও সদস্য। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হচ্ছে। আইন সভার আস্থা হারালে তিনিসহ পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য। মিঃ গোরই তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, মুরাদনগর, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জাতীয় সংসদের কার্যকাল কত বছর? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে অপসারণ করা হয়? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সরকার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিঃ গোরই হলেন তার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি — উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

খ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।

সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ সৃজনশীল ৩০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪৭ জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। একাধারে তিনি প্রশাসক, তত্ত্বাবধায়ক, বিচারক, সমন্বয়কারী আবার অন্যদিকে তিনি জনগণের বন্ধু এবং সেবকও বটে। জেলা প্রশাসনে এরূপ বহুমুখী ভূমিকা ও কাজের জন্য তাকে জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলে অভিহিত করা হয়। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দুর্নীতি কী? ১

খ. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন পদ্ধতি লিখ। ২

গ. 'জেলা প্রশাসক জনগণের বন্ধু' ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জেলা প্রশাসককে 'জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলে অভিহিত করা হয়'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি।

খ রাষ্ট্রপতির অভিশংসন হলো তাঁকে অপসারণ করার একটি পদ্ধতি। সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ সৃজনশীল ২৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৮ জনাব রওশন সিদ্দিক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই মুখ্য। তারই দলের মনোনীত, প্রার্থী জনাব হামিদুজ্জামান সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন। জনাব রওশন সিদ্দিক আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ করতে না পারলেও জনাব হামিদুজ্জামান তা পারেন।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৭]

ক. বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা কে? ১

খ. সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য কী? ২

গ. জনাব হামিদুজ্জামানের সাথে বাংলাদেশের যে পদের ব্যক্তির মিল রয়েছে তার পদ মর্যাদা ও ক্ষমতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রওশন সিদ্দিকই বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু- তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

খ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সার্ক গঠন করা হয়।

সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা।পারস্পরিক কল্যাণ ও আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক (SAARC) গঠন করা হয়। বর্তমান বিশ্ব আঞ্চলিক সহযোগিতার বিশ্ব। বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৯ জনাব আনিস একটি দেশের সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হয়। তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না। অন্যদিকে জনাব মকবুল এই দেশের সরকার প্রধান। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই তিনি প্রদান করে থাকেন। জনাব আনিস দু একটি বিষয় ছাড়া প্রায় সব বিষয়ে জনাব মকবুলের পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কোরাম কাকে বলে? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আনিসের পদের ৩টি কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. জনাব আনিস ও জনাব মকবুলের ক্ষমতার তুলনা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, তাকে কোরাম বলে।

খ ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বিচার বিভাগের ওপর আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও সর্বোপরি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গ জনাব আনিসের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের রাষ্ট্রপতির মিল আছে। নিচে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলি দেয়া হলো—

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে হ্রাস করা হয়েছে। নির্বাহী বিভাগের যাবতীয় কাজ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মন্ত্রিসভার সদস্যদের মাধ্যমে কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, আইনে সম্মতি দান, অধ্যাদেশ জারি, দন্ড মওকুফ বা হ্রাস ইত্যাদি সকল কাজে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আনিস সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না। জনাব আনিসের নামে সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। এমনকি উচ্চপদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও তাকে জনাব মকবুলের সাথে পরামর্শ করতে হয় যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাজের অনুরূপ।

ঘ জনাব আনিস ও জনাব মকবুলের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাথে তুলনীয়। যেমন—

- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- রাষ্ট্রপতি সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।
- কোনো কারণে জাতীয় সংসদ বাজেট পাস করতে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ৬০ দিন মেয়াদের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন।

Teachingbd24.com

- বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগের ১৪১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ বা অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে দেশের নিরাপত্তা বা শান্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ঘোষণার আগেই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হয়। সংসদ অধিবেশন না থাকলে অধিবেশন হলে তখন তা পাস করিয়ে নিতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব আনিস ও জনাব মকবুলের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাথে তুলনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৫০ জনাব 'ক' একজন সিনিয়র আইনজীবী। তিনি সরকারের পক্ষে যেকোনো আদালতে তার বক্তব্য প্রদান করে থাকে। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের মত মর্যাদা ভোগ করবেন। তবে গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্রপতি অপসারন করতে পারবেন।

[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশের জাতীয় অর্থের অভিভাবক কে? ১

খ. কর্ম কমিশন কিভাবে কাজ করে থাকে? ২

গ. উদ্দীপকে যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তাঁর কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠান কিভাবে কাজ করতে পারে— ব্যাখ্যা কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় অর্থের অভিভাবক হলো জাতীয় সংসদ।

খ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানত ৪ ধরনের কাজ করে থাকে। যথা:

- প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা।
- নিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শমূলক কাজে
- বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান ও
- আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ।

গ উদ্দীপকে যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলি নিচে বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি মূলত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি, আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগের পর্যালোচনা ও ক্ষমতা। শাসনতন্ত্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকরী করার সকল দায়িত্ব হাইকোর্টের ওপর ন্যস্ত। সুপ্রিম কোর্টের আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার আপিল বিভাগের। আইনসভা প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধান পরিপন্থি হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট সেই আইন বাতিল করতে পারে। এছাড়া, সুপ্রিম কোর্ট 'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে কাজ করে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রপতি আইনের কোনো জটিল প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাইতে পারেন। এভাবে মতামত চাওয়া হলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তা জ্ঞাপন করবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ আদালত ও এর কার্যাবলির পরিধি বিস্তৃত।

ঘ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এটি নিশ্চিতকরণে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

বিচারব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। আর বাংলাদেশ বিচারব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, এটি হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দায়িত্ব ন্যস্ত। হাইকোর্ট বিভাগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার সহায়তায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন সংরক্ষণ করতে পারে। কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার খর্ব হলে তিনি হাইকোর্ট বিভাগের আশ্রয় নিতে পারেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যেন সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে সে ব্যাপারেও হাইকোর্ট বিভাগ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কেউ বঞ্চিত হলে হাইকোর্ট বিভাগ তাকে যথাযথ সহায়তা দিয়ে থাকে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৫১ একটি সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন পদে নিয়োগদান করেন। সভাপতির নামে সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সাধারণ সম্পাদকই মূলত যাবতীয় কার্যাবলির সফলতা-ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনটির নেতৃত্ব প্রদান করলেও এর সদস্যদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সভাপতি হ্রাস-বৃদ্ধি বা রহিত করতে পারেন। *[স্কলারসহোম সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়? ১

খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে তোমার দেশের শাসন বিভাগের কোন পদাধিকারীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তোমার দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। তুমি কী এ বক্তব্য সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

খ অভিশংসন বলতে সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচারকে বোঝায়।

সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ সাংবিধানিক পদের অধিকারী ব্যক্তিকে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থনে অভিশংসন করতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী। তিনি হলেন শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা গঠিত ও পরিচালিত হয়। তার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারালে কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। তিনি একাধারে দলের নেতা, সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার মধ্যমণি, রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা এবং জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রতীক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাধারণ সম্পাদকই মূলত সংগঠনটির যাবতীয় সফলতা-ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। এছাড়া তিনি সংগঠনটির নেতৃত্বও দিয়ে থাকেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— আমি এ বক্তব্যকে সমর্থন করি।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করবার এবং যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। কেননা অনেক সময় ভুলে বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে বা হুমকি ও ভীতি থেকে বাঁচতে, অর্থের প্রলোভনে কিংবা আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে, উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বিচারকগণ রায় দিয়ে থাকেন। ফলে প্রকৃত অপরাধী শাস্তির আড়ালে থাকেন এবং নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা পান। এরূপ ভুল সংশোধন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির পুনঃবিবেচনা ক্ষমতা সত্যিকার অর্থেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

সুতরাং উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার দেশের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৫২ মাহমুদুল হাসান সাহেব একটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। সবাই তাঁকে ইউ, এন, ও নামেই চেনে। তিনি উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করেন। উপজেলায় বর্তমানে অনেক সরকারি কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া রয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা ইউ, এন, ও উপজেলা পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। *[স্কলারসহোম সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. 'উপজেলা' ব্যবস্থা কে, কখন প্রবর্তন করেন? ১

খ. এন.জি.ও. বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। উভয় শাসনের পার্থক্য নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'উপজেলা পরিষদ' এর কাজগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮৩ সালে।

খ এন.জি.ও হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।

এনজিওগুলো ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের বিশেষ করে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা, নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ করা, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে সাধারণ মানুষকে সচেতন করাসহ নানা কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।এ সংস্থাগুলো গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের নিকট টেকসই ও সমন্বিত ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিনসেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন, দূষিত পানি এবং অনিরাপদ স্বাস্থ্য অভ্যাসের কারণে সৃষ্ট দূষণ চক্রের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

গ স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে গঠন এবং কার্যক্রমের দিক থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

স্থানীয় শাসন হলো অঞ্চলভিত্তিক শাসনব্যবস্থা আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হলো নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসন।স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা।স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাচিত কর্মকর্তাদের লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন।

স্থানীয় শাসন হচ্ছে সেই প্রশাসন যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি প্রশাসককে নিয়োগ দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নই এর প্রধান কাজ। যেমন— বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। অপরদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে বোঝায় এমন ধরনের সরকারব্যবস্থা যা ছোটো ছোটো এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এবং আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। তাই বলা যায়, স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাননের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

ঘ সরকারের প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে উপজেলা পরিষদ বহুবিদ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদ গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কাজ, জনশৃঙ্খলা রক্ষামূলক কাজ, জনকল্যাণ ও সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দফতরের কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে।

সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্যজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে। স্যানিটেশন, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানীয় ব্যবস্থা করে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা প্রদান করে। কৃষি উন্নয়নে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়ও করে থাকে উপজেলা পরিষদ।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপজেলা পরিষদ জনকল্যাণে অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ জনাব জাভেদ আলী ও জনাব আব্দুল মতিন দেশের দুটি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত। সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা জাভেদ আলীর নামে গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন না। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আব্দুল মতিনের সিদ্ধান্তই মুখ্য। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. মন্ত্রণালয় কী? ১

খ. বাংলাদেশের প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র কোনটি এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আব্দুল মতিনের সঙ্গে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন পদের সাদৃশ্য রয়েছে? এই পদের নেতৃত্বদান সংক্রান্ত কাজটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জাভেদ আলী ও আব্দুল মতিনের কাজের সমন্বয়ের ওপরই রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভরশীল'— তোমার মতামত দাও। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা।

খ সচিবালয় বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

সচিবালয় গঠিত হয় মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে। সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সচিবালয়ে। অধীনস্থ দপ্তর বা বিভাগগুলো সচিবালয়ের নির্দেশে পরিচালিত হয়। কোনো বিভাগীয় প্রধান সচিবের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট কোনো কিছু পাঠাতে পারে না। যদি একান্তভাবে কোনো বিষয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হয় তবে আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো আগে সচিবকে অবহিত করতে হবে। বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন সরাসরি

Teachingbd24.com

সচিবালয়ের সঙ্গে যুক্ত। সচিবালয় হতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের সচিবালয় সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এবং সকল বিভাগ, দপ্তর ও অধীনস্থ সংস্থাগুলো সচিবালয়ের মুখাপেক্ষী। এজন্য সচিবালয়কে সরকারের মুখপাত্র বলে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৪

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের আইনসভা কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১

খ. ন্যায়পাল সম্পর্কে কী জান? ২

গ. চিত্রে উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি সংসদীয় ব্যবস্থায় কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভা ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ ন্যায়পাল বলতে এমন একজন সরকারি মুখপাত্র বা প্রতিনিধি বা সরকারি কর্মকর্তাকে বোঝায় যিনি যে কোনো বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছিল। ন্যায়পাল তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হবে।

গ চিত্রে উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদ।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনসংক্রান্ত সব কাজ পরিচালনা করে থাকে। অর্থাৎ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থাও বলা যায়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই দেশের শাসন বিভাগ পরিচালিত হয়।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসনবিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে। সংসদে যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয় তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মুলতবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ ক্ষেত্রে বিরাধীদলের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করছে।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। নিম্নে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

১. **আইন সংক্রান্ত:** জাতীয় সংসদ একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের নিকট ন্যস্ত।

২. **শাসন সংক্রান্ত:** শাসন বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে।

৩. **সংবিধান সংক্রান্ত:** বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানের বিধানসমূহ সংশোধন বা রহিত করা যায়।

৪. **নির্বাচনী কার্য:** জাতীয় সংসদ কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করে। যেমন: রাষ্ট্রপতি, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন।

৫. **অর্থ সংক্রান্ত কাজ:** জাতীয় সংসদ জাতীয় অর্থভাণ্ডারের রক্ষক, অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। প্রত্যেক অর্থবছরের প্রারম্ভে অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট পেশ করেন।

৬. **চাকরিসংক্রান্ত:** জাতীয় সংসদ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বা চাকরিতে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭. **অধ্যাদেশ সংক্রান্ত:** জাতীয় সংসদের অনুমতি পেলে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয়।

৮. **সামরিক ক্ষমতা ও কাজ:** জাতীয় সংসদ আইনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের গঠন, সংরক্ষণ ও কমিশন প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ নিচের ছবিটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জাতীয় সংসদ ভবন	সুপ্রিম কোর্ট
চিত্র-১	চিত্র-২

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কতবার সংশোধন করা হয়েছে? ১

খ. 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' দিবস ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য নিরুপন কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চিত্র ১ নামক প্রতিষ্ঠান এবং চিত্র-২ নামক প্রতিষ্ঠান উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে? যুক্তি দেখাও। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে।

খ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বলতে বুঝায় পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তিদান করে। এরপর লন্ডন ও নতুন দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তার প্রিয় মাতৃভূমিতে, তার স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। তখন থেকে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

গ চিত্র-১ এবং চিত্র-২ অর্থাৎ জাতীয় সংসদ এবং সুপ্রিম কোর্ট-এর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য নিচে আলোকপাত করা হলো—

জাতীয় সংসদ এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। আর সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত। জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। ৩০০ জন সাধারণ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একক নির্বাচনি এলাকা হতে নির্বাচিত হন এবং বাকি ৫০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। মহিলা সদস্যগণ সংসদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। পক্ষান্তরে, প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগের আসন গ্রহণ করার জন্য

Teachingbd24.com

প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। বিচারকদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করবেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্টে আসন গ্রহণ করবেন। জাতীয় সংসদের সদস্য হতে হলে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে হলে সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বছর এ্যাডভোকেট থাকতে হবে, অথবা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্যূন দশ বছরকাল কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে। অথবা, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা থাকতে হবে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, দেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চিত্র-১ ও চিত্র-২ অর্থাৎ জাতীয় সংসদ ও সুপ্রিম কোর্ট উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাতীয় সংসদ একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের নিকট ন্যস্ত। সংসদ যেকোনো আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। দেশ বা জনগণের প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ নতুন আইনের প্রচলন এবং প্রচলিত আইন সংশোধনের বিল উত্থাপন করে থাকে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। আর সংসদে পাসকৃত আইনগুলো বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্ট তথা বিচার বিভাগের।

বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ বা সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। আদালত ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রান্তিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অতএব বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সংসদ ও সুপ্রিম কোর্ট বা বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৫৬ জনাব রফিকুল ইসলাম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই মূখ্য। তার দলের মনোনীত প্রার্থী তরিকুল ইসলাম রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পদে নির্বাচিত হয়েছেন। জনাব রফিকুল ইসলাম আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড মওকুফ করতে না পারলেও জনাব তরিকুল ইসলাম তা পারেন। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. জাতিসংঘ দিবস কোনটি? ১

খ. কোরাম বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব তরিকুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের কোন পদের মিল রয়েছে? উক্ত পদের পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রফিকুল ইসলাম' শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘ দিবস ২৪ অক্টোবর।

খ কোরাম বলতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে বোঝায়। 'কোরাম' সংখ্যা ৬০ অর্থাৎ কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ সদস্য বৈঠকে উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদের বৈঠক স্থগিত রাখবেন কিংবা সংসদের বৈঠক মুলতুবি ঘোষণা করবেন।

গ উদ্দীপকের জনাব তরিকুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। তিনি সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কাজ পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের জনাব তরিকুল ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিরই নামান্তর মাত্র।

উদ্দীপকের জনাব তরিকুল ইসলাম রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড মওকুফ করতে পারেন। একই ভাবে জনাব তরিকুল ইসলাম এর মতো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তার নামে নির্বাহী কার্য সম্পাদন করা হলেও তিনি মূলত কিছুই করেন না। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাই সকল দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। প্রতিটি নতুন সংসদের শুরুতে এবং ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করবেন। রাষ্ট্রপতি অবস্থায় তিনি কোনো কাজ করলে বা না করলে সেজন্য তাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হয় না। তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি মামলা করা যাবে না এবং তাঁকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারবে না। এছাড়া তিনি আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস করতে পারেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের জনাব তরিকুল ইসলাম এর সাথে বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক প্রধান রাষ্ট্রপতিই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫৭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

তাহের ও জিং জিয়ান দুজন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। তাহের এর রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু জিং জিয়ান এর রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান একই ব্যক্তি। তিনি আইন সভার নিকট দায়বদ্ধ নয়। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১

খ. "Divide and Rule Policy" কী ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জিং জিয়ান এর রাষ্ট্রে কী ধরণের সরকার বিদ্যমান। উক্ত সরকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে তাহের এর রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতি একই— তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ 'Divide and Rule Policy' হলো 'ভাগ কর, শাসন কর নীতি'। এটি ব্রিটিশ শাসকদের একটি কূটকৌশল।

১৮৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের 'Divide and Rule Policy' এর অনুসরণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে।

গ জিং জিয়ানের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান।

রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসনকর্তা হিসেবে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন। এখানে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সেবকমাত্র। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা সাহায্য দান করতে কোনো মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকতে পারে। এরূপ মন্ত্রিরা বা

Teachingbd24.com

উপদেষ্টারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারেই নিযুক্ত বা অপসারিত হন। তারা সমস্ত কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। মূলত তারা রাষ্ট্রপতির কর্মচারি হিসেবে কাজ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান।
জিং জিয়ানের রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। এছাড়া তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধও নন যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার অনুরূপ। তাই বলা যায়, জিং জিয়ানের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে তাহেরের রাষ্ট্রের সাদৃশ্য আছে।
তাহেরের রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এরূপ রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাহেরের রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশেও সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। তার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একই সময়ে আইনসভারও সদস্য থাকেন। মন্ত্রীরা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন। কারণ আইনসভার আস্থা হারালে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। এই সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান এক ব্যক্তি থাকেন না। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তাদের সকল কাজকর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রীগণ তাদের নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে তাহেরের রাষ্ট্রের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ রাজধানীর শ্যামপুর থানার একটি মামলায় বিনা বিচারে প্রায় দেড় দশক ধরে কারাগারে ছিলেন চান মিয়া। এ বিষয়ে বেসরকারি একটি চ্যানেলে সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনেন দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত চান মিয়াকে জামিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতকে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান কে? ১
খ. বাংলাদেশের আইনসভার গঠন লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এর গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালতের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ বাংলাদেশের আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদের ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। এছাড়া ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তারা সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। যথা: (ক) আপিল বিভাগ ও (খ) হাইকোর্ট বিভাগ।
রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজনবোধ করবেন ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের নিয়ে আপিল বিভাগ গঠিত হবে এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট এবং স্থায়ী বেঞ্চ গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ কোনো কারণে শূন্য হলে আপিল বিভাগের প্রবীণতম বিচারক অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন।
উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আর বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

ঘ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অনন্য।
বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। আর সুপ্রিম কোর্ট হলো বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার মধ্যমণি।
সুপ্রিম কোর্ট ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রান্তিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
আইনের শাসনের রক্ষক ও অভিভাবক হলো সংবিধান, আর সংবিধানের রক্ষক হলো সুপ্রিম কোর্ট। কোনো আইন সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন করলে সুপ্রিম কোর্ট তার সুরাহা করে। সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে আইনের শাসন বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে সুপ্রিম কোর্ট নানা কৌশল প্রয়োগ করে। আইন অমান্যকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সরকার, মানবাধিকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুতর অন্যায়, অধিকার লঙ্ঘন, ক্ষতি হলে সুপ্রিম কোর্ট স্বেচ্ছায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রুল জারি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নিষ্পত্তি করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট স্ব-প্রণোদিত হয়ে সুয়োমোটো রুল জারির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার দিয়ে থাকে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
পরিশেষে বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা সুপ্রিম কোর্টের কাজ।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ হাসানের দেশের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। এখানে একজন নির্বাহী বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি আছেন অথচ তিনি নামে প্রধান। তিনি সরকার প্রধানদের পরামর্শ অনুযায়ী সীমিত ক্ষমতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকার নন, নামে মাত্র প্রধান।

[আলফেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়? ১
খ. অভিশংসন কাকে বলে? ২
গ. হাসানের দেশের নির্বাহী প্রধানের সাথে বাংলাদেশের নির্বাহী প্রধানের সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. হাসানের দেশের নির্বাহী প্রধান, সরকার প্রধান নন বরং নামে মাত্র প্রধান— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

Teachingbd24.com

খ সৃজনশীল ১৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হাসানের দেশের নির্বাহী প্রধান সরকার প্রধান নন বরং নামেমাত্র প্রধান- উক্তিটি যথার্থ।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি সরকার প্রধান নন। এ শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। রাষ্ট্রপতি দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি সরকার প্রধান নন।

নির্বাহী বিভাগের যাবতীয় কাজ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মাধ্যমে কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, আইনে সম্মতি দান, অধ্যাদেশ জারি, দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস ইত্যাদি সকল কাজে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৬০ শাওনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা হলে নিম্ন আদালত স্বাক্ষী প্রমানের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিচার কার্য সম্পন্ন করে তার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে। এ রায় তার মনোপুত না হওয়ায় সে উচ্চ আদালতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শরনাপন্ন হন।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে কে শপথ পাঠ করান? ১

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ২

গ. শাওন যে উচ্চ আদালতে শরনাপন্ন হয়েছিল তার নাম গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত আদালত জনগণের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক ও সংবিধানের অভিভাবক— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রধান বিচারপতিকে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন বিধিবিধানের আলোকে সরাসরি যেসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে বোঝায়।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকার তথা নির্বাহী বিভাগ কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এরা স্বাধীনভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। এই সংস্থাগুলোর সভাপতি ও সদস্যগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

গ উদ্দীপকের শাওন যে আদালতে আপিল করেন তার নাম হলো সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্ট হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এটি ঢাকা শহরের রমনায় অবস্থিত। উদ্দীপকের শাওন এ আদালতেই আপিল করেন। নিচে শাওনের আপিলকৃত আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের গঠন বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত, যথা: হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অনান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ বিচার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ঘ উক্ত আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে। উক্তিটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকরী করার সকল দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ মর্মে সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করতে এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে। (খ) হাইকোর্টের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত; তখন হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করে নিয়ে স্বয়ং মীমাংসা করবেন।

সংবিধানের ১০৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে আপিল বিভাগের।

তাছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ কোনো মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে, এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নিকট। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের ঘোষিত রায় পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও ন্যায়বিচার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভা প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধানের পরিপন্থি হয় তাহলে সে আইনকে বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সামনে কেউ যদি বিচার প্রার্থী হয়ে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধানবিরোধী এবং সেই অবৈধ আইন দ্বারা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাহলে বিচারকরা সেই আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৬১ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়াও বিভিন্নভাবে অপর একটি অঙ্গের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক করে। *[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অধ্যাদেশ কী? ১

খ. অর্থ বিল বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগটি অন্য একটি বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সেই বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৪

Teachingbd24.com

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ হলো সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদের অধিবেশন মুলতুবি থাকাকালে বিশেষ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা আদেশ।

খ অর্থ বিল হচ্ছে সেই বিল যাতে কর ধার্য, তার পরিবর্তন, ঋণ গ্রহণ বা ঋণ পরিশোধ, ব্যয়ের মঞ্জুরি প্রভৃতি আলোচিত হয়।
কোনো বিল অর্থ বিল কি না তা নির্ধারণ করেন সংসদের স্পিকার। এ বিষয়ে তার মতামতই চূড়ান্ত। তবে কোনো অর্থবিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত জাতীয় সংসদে পেশ করা যাবে না।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলির সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল আছে।
বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত।
সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনেক। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে ঐ বছরের জন্য অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ বা বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করে আইন বিভাগ। তদ্রূপ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির কাজও হলো সরকারের আয়-ব্যায় নির্ধারণ করা।
উদ্দীপকের বিভাগ নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের আইন বিভাগও আইন সংক্রান্ত নানাবিধ কার্য্যাদি সম্পাদন করে থাকে। 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী। বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের সাথে এ বিষয়েও মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগটি অর্থাৎ আইন বিভাগ শাসনবিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। নিচে শাসন বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি দেওয়া হলো।
শাসন বিভাগ হলো সরকারের সেই বিভাগ যারা প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে শাসনবিভাগ গঠিত। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান এবং তাকে কেন্দ্র করে শাসন বিভাগ আবর্তিত হয়। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আবার তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রীসভার পতন হয়। মন্ত্রীসভার কর্মসূচি ও সংসদের আইন প্রণয়ন পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই রচিত। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং এক প্রকার ঐক্যমত গড়ে তোলেন। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির জন্য কাজ করে থাকেন। আর রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সরকারের নাম সর্বস্ব প্রধান। তিনি সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী রূপে নিয়োগ দেন। তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান ও সদস্যবৃন্দ প্রমুখদের নিয়োগ ও তাদের কার্যাবলির বিধি-বিধান নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার নিয়োগ দেন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের গ্রহণ করেন।
পরিশেষে বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী শাসনবিভাগের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাকে ঘিরেই শাসনব্যবস্থা আবর্তিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬২ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ। এখানে রাষ্ট্রপতিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। দেশের শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিই নিয়ে থাকেন। কিন্তু ভারতে এ দায়িত্ব পালন করেন প্রধানমন্ত্রী।

[শহীদ বীর উত্ত লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. অভিশংসন কী? ১
খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? ২
গ. উদ্দীপকের দেশটির রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অবস্থানগত বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভারতের মত অনুরূপ দায়িত্ব বাংলাদেশে যিনি পালন করে তার কার্যাবলি মূল্যায়ন কর। ৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রপতির অভিশংসন হলো তাঁকে অপসারণ করার একটি পদ্ধতি।

খ জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে এবং তাদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।
বর্তমান সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৪৮ (১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, তিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। তবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রের সকল কার্য সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং দুই মেয়াদের অধিক সময় কোনো রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

গ উদ্দীপকের দেশটির রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অবস্থানগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হলেও কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি যে কাউকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান এবং পদচ্যুত করতে পারেন। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দপ্তর বণ্টন করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদ কংগ্রেসের কাছে দেশের সার্বিক অবস্থা অবহিত করতে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান, তিনি নিজস্ব নির্বাহী ক্ষমতা বলে প্রয়োজনীয় ঘোষণা, নির্দেশ, অধ্যাদেশ, বিধিবিধান ও আদেশ জারি করতে পারেন। অপরদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সরকারি ঘোষণা দ্বারা সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, কংগ্রেস প্রণীত আইন, বিচারালয়ের রায় প্রভৃতি যথাযথ প্রয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান।
উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। কারণ মার্কিন রাষ্ট্রপতি সে দেশের প্রকৃত শাসক কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নামমাত্র শাসক।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো অনুরূপ দায়িত্ব বাংলাদেশের যিনি পালন করেন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী।
ভারতের মতো বাংলাদেশেও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। আর সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সব দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রায় একই ধরনের কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকেন। সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী হলেন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভার যে তালিকা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন তারাই মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ দান করেন।
প্রধানমন্ত্রীই দেশের মুখ্য শাসক ও সরকার প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই সার্বিক প্রশাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। আইন, বিচার, শাসন ও

https://teachingbd24.com

পররাষ্ট্র বিষয়ক সকল কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। প্রধানমন্ত্রী সরকারি কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন এবং সময়োপযোগী বিবৃতি ও বক্তৃতা প্রদান করেন। সে হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারের মূল স্তম্ভ।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

প্রশ্ন ▶ ৬৩ জনাব মোরশেদ এলাহী ও সাফিনা রহমান দেশের দু'টি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত। সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা মোরশেদ এলাহীর নামে গৃহীত হলেও তিনি কোন ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারেন না। এমনকি দেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও তাকে সাফিনা রহমানের সাথে পরামর্শ করতে হয়। *[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সার্ক-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখ। ২

গ. জনাব মোরশেদ এলাহীর কাজের সাথে বাংলাদেশের কোন পদাধিকারীর কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব মোরশেদ এলাহী ও সাফিনা রহমানের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্ক-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮টি।

খ স্থানীয় পর্যায়ের শাসনব্যবস্থা বলতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে বোঝায়। সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বলে। এটি এমন এক ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ রাজু তার বাবার সাথে টেলিভিশনে সংসদ অধিবেশন দেখছিল। অধিবেশনের সংসদ সদস্যগণ সরকারি দলের একজন মন্ত্রীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন। তিনি সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। রাজু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, মন্ত্রী মহোদয় কী সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। বাবা বললেন, মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করে সংসদীয় কর্তৃত্বকে স্বীকার করেছেন। *[শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. কোরাম কী? ১

খ. বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে সংসদের কোন কার্যটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যটি ছাড়া সংসদ আর কী কী কাজ করতে পারে? বর্ণনা কর। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

খ সুপ্রিম কোর্ট হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গঠন, কার্যাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতির আসন এবং প্রত্যেক বিভাগের আসন গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে।

গ উদ্দীপকে জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতা সংক্রান্ত কাজটি ফুটে ওঠেছে।

শাসনবিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে। জাতীয় সংসদে মন্ত্রীসভাকে তার কাজে জন্য জবাবদিহি করতে হয়। সংসদে যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয় তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজু তার বাবার সাথে টেলিভিশনে সংসদ অধিবেশন দেখছিল। তারা দেখতে পায় সংসদ সদস্যগণ সরকারি দলের একজন মন্ত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন এবং তিনি সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় তারা টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের শাসনসংক্রান্ত কাজটি প্রত্যক্ষ করছিল। কারণ মন্ত্রিসভাকে তার কাজের জবাবহিদিতা চাওয়া বা প্রশ্ন করা জাতীয় সংসদের শাসনসংক্রান্ত কাজের অন্তর্গত। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ তাদের নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজটি ছাড়াও জাতীয় সংসদের আরো কিছু কাজ রয়েছে।

বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংসদ যে কোনো আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে তা বিলের আকারে সংসদে পেশ করতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কর ধার্য করা যায় না এবং কোনো ব্যয়ও করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া, চাকরি, নির্বাচন, অধ্যাদেশ সংক্রান্ত প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশ্ন তথা জবাবদিহিতা সংক্রান্ত কার্যটি ছাড়া সংসদ আরো নানাবিধ কার্যাদি সম্পাদন করে।

জাতীয় সংসদ কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করে। সংসদ একটি বিতর্কসভা হিসেবে কাজ করে এবং এর ব্যাপক আলোচনামূলক ক্ষমতা রয়েছে। সংসদ সদস্যগণ যেকোনো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিতর্ক করতে পারেন। জাতীয় সংসদ জাতীয় অর্থভাণ্ডারের রক্ষক, অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সংসদ কর্তৃক পাসকৃত আইনের মাধ্যমেই কর ধার্য করা হয় এবং সংসদই আবার ব্যয়ের অর্থ অনুমোদন করে। সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য যে ব্যয় হবে তা রাষ্ট্রপতির সুপারিশক্রমে সংসদে পেশ করতে হবে। বাজেট পেশ করার পর যদি কোনো বছর অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তবে সংসদ তার জন্য অগ্রিম মঞ্জুরি দানের ব্যবস্থা করতে পারবে। সংসদ আইন বলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে বা চাকরিতে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতা সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও আরো অনেক কাজ রয়েছে।

https://teachingbd24.com

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

★★ জাতীয় সংসদের গঠন

১. **কতজন সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে 'কোরাম' হবে?** [জ্ঞান]
ক ৪০ খ ৫০
গ ৬০ ঘ ৭০ **গ**

২. **জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা কত?** [জ্ঞান]
ক ৩০ খ ৪০
গ ৪৫ ঘ ৫০ **ঘ**

৩. **সংরক্ষিত আসনে মহিলারা কীভাবে নির্বাচিত হন?** [অনুধাবন]
ক জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
খ সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে
গ জনগণের পরোক্ষ ভোটে
ঘ সংসদ সদস্যদের হস্তান্তরযোগ্য ভোটে **ঘ**

৪. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কোন প্রকৃতির?** [অনুধাবন]
ক এককক্ষবিশিষ্ট খ দুই-কক্ষবিশিষ্ট
গ ডায়ার্কি ঘ ওয়েস্ট মিনিস্টার **ক**

৫. **নির্বাচনের পর নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে কতদিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে হবে?** [জ্ঞান]
ক ৭০ দিন খ ৮০ দিন
গ ৯০ দিন ঘ ৯২ দিন **গ**

৬. **সাবেক সংসদ সদস্য সোহেল তাজ নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র কার নিকট জমা দিয়েছিলেন?** [প্রয়োগ]
ক প্রধানমন্ত্রী খ আইনমন্ত্রী
গ সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ঘ স্পিকার **ঘ**

★ জাতীয় সংসদের কার্যাবলি

৭. **সংসদীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র কোনটি?**
ক শাসনবিভাগ খ বিচার বিভাগ
গ জাতীয় সংসদ ঘ সচিবালয় **গ**

৮. **সংসদ সদস্য নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পত্র কার কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারেন?**
ক স্পিকার খ প্রধানমন্ত্রী
গ রাষ্ট্রপতি ঘ দলীয় প্রধান **ক**

৯. **রহিম সাহেব একজন সংসদ সদস্য। তিনি নিচের কোন ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারেন?**
ক মন্ত্রীকে খ সেনা প্রধানকে
গ ডেপুটি স্পিকারকে ঘ বিচারপতিকে **গ**

১০. **কোনটি জাতীয় সংসদের কাজ নয়?** /চ. বো. '১৫/
ক আইন প্রণয়ন খ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
গ সংবিধান সংশোধন ঘ মন্ত্রিসভা গঠন **ঘ**

১১. **জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং ভোট' বলতে কী বুঝায়?** /সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ/
ক পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ভোট
খ পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে স্পিকার প্রদত্ত ভোট
গ পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভোট
ঘ পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে স্পিকার প্রদত্ত ভোট **খ**

১২. **সংসদীয় ভাষায় 'বিল' বলতে বোঝায়?** /সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর/
ক প্রতিদিনের খরচের হিসাব
খ সাপ্তাহিক খরচের হিসাব
গ আইনের প্রাথমিক প্রস্তাব
ঘ উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রস্তাব **গ**

১৩. **বেসরকারি বিল বলতে কী বুঝ?** /মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ/
ক সাধারণ সাংসদ কর্তৃক উত্থাপিত বিল
খ মন্ত্রীগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিল
গ সংসদ উপনেতা কর্তৃক উত্থাপিত বিল
ঘ সংসদ সভাপতি কর্তৃক উত্থাপিত বিল **ক**

১৪. **জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিল কত প্রকার?** [জ্ঞান]
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার **ক**

১৫. **বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি কোন রাষ্ট্রের আইন পদ্ধতির ন্যায়?** [অনুধাবন]
ক যুক্তরাষ্ট্রের খ ব্রিটেনের
গ সুইজারল্যান্ডের ঘ চেক প্রজাতন্ত্রের **খ**

১৬. **আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিলটি সংসদে পুনর্বিবেচনাপূর্বক প্রেরিত হলে রাষ্ট্রপতিকে কতদিনের মধ্যে সম্মতি দিতে হবে?** [জ্ঞান]
ক ৫ দিন খ ৭ দিন
গ ৯ দিন ঘ ১১ দিন **খ**

১৭. **সোহেলের বাবা জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। তিনি নিচের কোন কাজটিতে অংশ নিতে পারছেন?** [প্রয়োগ]
ক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা
খ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা
গ দুর্যোগময় মুহূর্তে সেবা করা
ঘ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা **ঘ**

১৮. **জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে—** /ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ/
i. মুলতবি প্রস্তাবের মাধ্যমে
ii. নিন্দা প্রস্তাবের মাধ্যমে
iii. সংসদ বয়কট করার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং পরবর্তী ১৯ ও ২০ দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশের একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'X' দল ২৩০ 'Y' দল ৩০ এবং 'Z' দল ২৭টি আসন লাভ করে। /দি. বো. '১৫/

১৯. **'Y' দল জাতীয় সংসদে কোন পদটি লাভ করবে?**
ক স্পিকার
খ ডেপুটি স্পিকার
গ বিরোধী দলীয় নেতা
ঘ সংসদ নেতা **গ**

Teachingbd

http://teachingbd.com

২০. জাতীয় সংসদে 'X' দল এককভাবে করতে পারবে—
i. সংবিধান পরিবর্তন
ii. সংবিধান সংশোধন
iii. শান্তি মওকুফ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২১. জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ করেন কে? *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*
ক সুপ্রিম কোর্ট খ অর্থ মন্ত্রণালয়
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ জাতীয় সংসদ **ঘ**

২২. দায়িত্বগত দিক থেকে জাতীয় সংসদের প্রাণ বলা হয় কাকে? [জ্ঞান]
ক স্পিকারকে
খ সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের
গ হুইপকে
ঘ সংসদ সদস্যদের **ঘ**

২৩. কোনটির মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারেন? [জ্ঞান]
ক সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে
খ জনমত গঠন করে
গ রোডমার্চের মাধ্যমে
ঘ বিবৃতি দানের মাধ্যমে **ক**

২৪. জাতীয় সংসদে গঠনমূলক সমালোচনা ও কার্যকর ভূমিকা রাখেন কারা? [জ্ঞান]
ক বিচারকগণ
খ আমলাগণ
গ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণ
ঘ সংসদ সদস্যগণ **গ**

২৫. সংসদ ও এর সদস্যদের বিশেষ অধিকার হলো—[অনুধাবন]
i. সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে
ii. সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে
iii. সদস্যদের বেতন ও ভাতা সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা

২৬. জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ জাতীয় সংসদে প্রতিফলিত হয় কার মাধ্যমে? [জ্ঞান]
ক বিরোধী দলের মাধ্যমে
খ প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে
গ সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে
ঘ সাধারণ জনগণের মাধ্যমে **গ**

২৭. জাতীয় সংসদের কোনো সদস্য কোনো মন্ত্রণালয় বা দপ্তর সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হলে কত দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়? [জ্ঞান]
ক ৭ দিন খ ১০ দিন
গ ১৫ দিন ঘ ৩০ দিন **গ**

২৮. জাতীয় সংসদ কোন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে প্রয়াসী হন? [জ্ঞান]
ক প্রধান বিচারপতির খ বি.সি. এস ক্যাডারের
গ ন্যায়পালের ঘ মহাহিসাব নিরীক্ষকের **গ**

২৯. সংসদ সদস্যগণ অর্থবিলের ওপর যে সকল ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন তা হলো—[অনুধাবন]
i. নীতি অনুমোদন ছাঁটাই
ii. মিতব্যয় ছাঁটাই
iii. প্রতীক ছাঁটাই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ প্রধানমন্ত্রী ও তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৩০. প্রধানমন্ত্রী 'সংসদীয় দলের নেতা' কারণ তিনি— *[দি. বো. '১৫, রা. বো. '১৫]*
ক মন্ত্রিসভাকে পরিচালনা করেন
খ সংসদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেন
গ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা
ঘ তার ওপর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে **গ**

৩১. বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত? [জ্ঞান]
ক একনায়কতান্ত্রিক সরকার
খ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
গ সামরিক সরকার ঘ সংসদীয় সরকার **ঘ**

৩২. শাসন বিভাগের মুখ্য শাসক কে? [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি **ক**

৩৩. 'জাতীয় সংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করলে প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হবে, অন্য কোনো পন্থায় নয়'— সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৫৫নং অনুচ্ছেদে খ ৫৬নং অনুচ্ছেদে
গ ৫৭ নং অনুচ্ছেদে ঘ ৫৮ নং অনুচ্ছেদে **গ**

★★ মন্ত্রিপরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

৩৪. মন্ত্রণালয়ে 'মুখ্য হিসাব নিরীক্ষক' কে? [জ্ঞান]
ক মন্ত্রী খ প্রতিমন্ত্রী
গ উপমন্ত্রী ঘ সচিব **ঘ**

৩৫. কোনটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর প্রধান কাজ? *[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, খুলনা]*
ক দলের পক্ষে কথা বলা
খ সচিবকে সাহায্য করা
গ সচিবদের কাজে তদারকি করা
ঘ প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করা **ঘ**

৩৬. মন্ত্রিপরিষদে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ কত শতাংশ হয়ে থাকে? [জ্ঞান]
ক এক-পঞ্চমাংশ খ এক-ষষ্ঠাংশ
গ এক-সপ্তমাংশ ঘ এক-দশমাংশ **ঘ**

৩৭. কে মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেন? [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী খ প্রতিমন্ত্রী
গ উপমন্ত্রী ঘ স্পিকার **ক**

৩৮. সংসদে উত্থাপিত নীতিগুলো কী নামে পরিচিত? [জ্ঞান]
ক সরকারি নীতি খ বেসরকারি নীতি
গ বৈদেশিক নীতি ঘ আঞ্চলিক নীতি **ক**

উদ্দীপকটি পড়ে পরবর্তী ৩৯ ও ৪০নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
'ক' রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে তাদের কাজের জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে 'খ' রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার জবাবদিহিতা শাসন বিভাগের কাছে ন্যস্ত। *[চা. বো. '১৫]*

৩৯. উদ্দীপকের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতি হলো-
ক রাষ্ট্রপতি শাসিত
খ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ রাজতান্ত্রিক **খ**

Teachingbd.com

৪০. উদ্দীপকের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি 'খ' রাষ্ট্রের চাইতে অধিকতর উপযোগী। কারণ—
i. আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা
ii. অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা
iii. বিচার বিভাগের প্রাধান্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৪১. রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
ক জাতীয় সংসদ সদস্যগণের ভোটে
খ মন্ত্রিসভার সদস্যগণের ভোটে
গ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক
ঘ স্পিকার কর্তৃক **ক**

৪২. রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে কমপক্ষে কত বছর বয়স্ক হতে হবে? [অনুধাবন]
ক ৩০ বছর খ ৩২ বছর
গ ৩৪ বছর ঘ ৩৫ বছর **ঘ**

৪৩. রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের জন্য কী পরিমাণ ভোটের প্রয়োজন? *[কু. বো. '১৬; চ. বো. '১৫; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী; হলিক্রস কলেজ, ঢাকা]*
ক সকল খ এক-তৃতীয়াংশ
গ দুই-তৃতীয়াংশ ঘ তিন-চতুর্থাংশ **গ**

৪৪. কে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দেন? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; হলিক্রস কলেজ, ঢাকা]*
ক আইনমন্ত্রী খ প্রধানমন্ত্রী
গ রাষ্ট্রপতি ঘ স্পিকার **গ**

৪৫. কে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন? [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ চিফ হুইপ **খ**

৪৬. রাষ্ট্রপতি পদে থাকার সর্বোচ্চ সীমা কত বছর? [জ্ঞান]
ক ৫ বছর খ ৮ বছর
গ ৯ বছর ঘ ১০ বছর **ঘ**

৪৭. কোন সংশোধনীতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি দুই মেয়াদ পর্যন্ত তার পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন? [জ্ঞান]
ক ৫ম খ ৬ষ্ঠ
গ ৯ম ঘ ১০ম **গ**

৪৮. 'ক' বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের নবম সংশোধনী অনুযায়ী তিনি কত বছর রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারবেন? [প্রয়োগ]
ক সর্বোচ্চ দশ বছর খ পাঁচ বছর
গ ১ মেয়াদ ঘ দশ বছরের বেশি **ক**

৪৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি কী? [জ্ঞান]
ক চ্যান্সেলর খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ প্রধানমন্ত্রী **খ**

৫০. রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তার অনুপস্থিতিতে কে দায়িত্ব পালন করবেন? [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
গ এ্যাটর্নি জেনারেল ঘ স্পিকার **ঘ**

৫১. ড. ইউনূস বিদেশে কোনো সম্মান বা উপাধি গ্রহণ করতে হলে কার অনুমতি প্রয়োজন? [প্রয়োগ]
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘ স্পিকার **খ**

৫২. বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না— *[রা. বো. '১৫; দি. বো. '১৫]*
i. টাকা-পয়সা
ii. সাহায্য-সহযোগিতা
iii. উপাধি, ভূষণ বা সম্মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ iii **ঘ**

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৫৩ ও ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

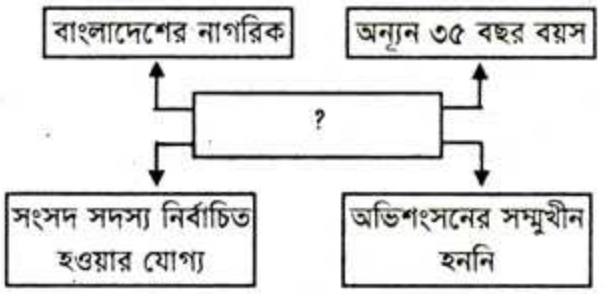

[চ. বো. '১৫]

৫৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিটি হলেন-
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ এ্যাটর্নি জেনারেল ঘ প্রধান বিচারপতি **ক**

৫৪. (?) চিহ্নিত ব্যক্তি নিম্নে কোন কাজটি করে থাকেন?
ক বাজেট পেশ খ অধ্যাদেশ জারি
গ মন্ত্রিসভা গঠন ঘ নির্ণায়ক ভোট প্রদান **খ**

★★ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো

৫৫. আইনের শাসন নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হলো— *[ব. বো. '১৫]*
ক শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংযুক্তি
খ আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংযুক্তি
গ শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ
ঘ আইন ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ **গ**

৫৬. দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যিনি কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন হবেন না— *[য. বো. '১৫]*
ক স্পিকার খ প্রধান বিচারপতি
গ মন্ত্রী ঘ এটর্নি জেনারেল **খ**

৫৭. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? [জ্ঞান]
ক জজ কোর্ট খ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
গ হাইকোর্ট ঘ সুপ্রিমকোর্ট **ঘ**

৫৮. 'বিচার বিভাগের দক্ষতাই সরকারের শাসন ক্ষমতার দক্ষতা ও যোগ্যতার মানদণ্ড'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক অধ্যাপক লাস্কি খ জন স্টুয়ার্ট মিল
গ লর্ড ব্রাইস ঘ অধ্যাপক গার্নার **গ**

৫৯. সংবিধান বহির্ভূত কোনো বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করে কে? [জ্ঞান]
ক সুপ্রিম কোর্ট খ জাতীয় সংসদ
গ সালিশি আদালত ঘ জেলা জজ আদালত **ক**

৬০. বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২০ নম্বর খ ২২ নম্বর
গ ২৩ নম্বর ঘ ২৫ নম্বর **খ**

Teachingbd.com

৬১. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা হলো— *[চা. বো. '১৫; দি. বো. '১৫]*
i. বিচারক নিয়োগ দেয়া
ii. আইনের বৈধতা বিচার
iii. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★ সুপ্রিম কোর্টের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৬২. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? [জ্ঞান]
ক জজ কোর্ট খ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
গ হাইকোর্ট ঘ সুপ্রিম কোর্ট **ঘ**

৬৩. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগ প্রদান করেন? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ স্পিকার
ঘ আইন ও বিচারবিষয়ক মন্ত্রী **ক**

৬৪. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিশেষত্ব কোনটি? [অনুধাবন]
ক সংসদের নিয়ন্ত্রক
খ আইন প্রণয়নের সংস্থা
গ দেশের সর্বোচ্চ আদালত
ঘ দেশের সর্বোচ্চ শাসন বিভাগ **গ**

৬৫. বিচারকদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে কে? [জ্ঞান]
ক জনগণ খ অর্থমন্ত্রী
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ জাতীয় সংসদ **ঘ**

৬৬. কোন বিভাগের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার রয়েছে? [জ্ঞান]
ক হাইকোর্টের খ আপিল বিভাগের
গ আইন বিভাগের ঘ শাসন বিভাগের **খ**

৬৭. সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়েছে— [অনুধাবন]
i. আপিল বিভাগ নিয়ে
ii. হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে
iii. শাসন বিভাগ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ অধস্তন আদালতের কাঠামো

৬৮. জেলা বিচারক নিয়োগ করেন কে? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রপতি
খ প্রধানমন্ত্রী
গ স্পিকার
ঘ আইন ও বিচারবিষয়ক মন্ত্রী **ক**

৬৯. জেলা বিচারকের পদের জন্যে যেকোনো ব্যক্তির ন্যূনতম কয় বছর কাল এ্যাডভোকেট হিসেবে কর্মরত থাকার যোগ্যতা থাকতে হবে? [জ্ঞান]
ক পাঁচ খ সাত
গ দশ ঘ বার **গ**

৭০. মৃত্যুদণ্ড দিতে গেলে কার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়? [জ্ঞান]
ক জেলা জজ আদালতের
খ দায়রা জজ আদালতের
গ আপিল বিভাগের ঘ সুপ্রিম কোর্টের **ঘ**

৭১. সরকারি কর্মকমিশনের দ্বারা নিযুক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ তাদের কর্মের শর্তাবলি সংক্রান্ত বিষয় কার এখতিয়ারভুক্ত? [অনুধাবন]
ক সুপ্রিম কোর্টের খ হাইকোর্টের
গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের
ঘ অধস্তন আদালতের **গ**

৭২. দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জন্যে জেলার সর্বোচ্চ আদালত— [অনুধাবন]
i. জেলা আদালত
ii. হাইকোর্ট
iii. দায়রা জজের আদালত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ

৭৩. বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের যৌক্তিকতা কোনটি? *[দি. বো. '১৫, রা. বো. '১৫]*
ক বিচারকদের মর্যাদা বৃদ্ধি
খ বিচার বিভাগের উৎকর্ষ বৃদ্ধি
গ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
ঘ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা **ঘ**

৭৪. বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কীসের মাধ্যমে? [অনুধাবন]
ক আইন বিভাগের অধীনতায়
খ বিচার বিভাগের পৃথকীকরণে
গ বিচারপতি নিয়োগে
ঘ আইনজীবীদের রাজনীতির অনুপস্থিতিতে **খ**

৭৫. বিচার ব্যবস্থার উন্নতমান সংরক্ষণের জন্যে বিচারক ও আইন কর্মকর্তাদের কোনটি অপরিহার্য? [অনুধাবন]
ক উন্নতমানের আবাসন সুবিধা
খ উন্নতমানের প্রশিক্ষণ
গ উপযুক্ত বেতন ভাতা
ঘ নৈতিকতার আবহ সৃষ্টি **খ**

৭৬. কোনটি সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে? [জ্ঞান]
ক বিচার বিভাগ খ আইনের শাসন
গ সেশন জজ ঘ যুগ্ম জজ **ক**

★★ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

৭৭. প্রশাসনিক পদসোপানে সচিবের পরই কার অবস্থান? [জ্ঞান]
ক অতিরিক্ত সচিব খ যুগ্ম সচিব
গ উপসচিব ঘ সহকারী সচিব **ক**

৭৮. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান কে? [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী খ মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গ রাষ্ট্রপতি ঘ প্রধান বিচারপতি **গ**

৭৯. সকল মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয়সাধন করেন কে? [জ্ঞান]
ক অর্থমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ মন্ত্রিপরিষদ ঘ প্রধানমন্ত্রী **ঘ**

★★ সচিবালয়ের গঠন ও কার্যাবলি

৮০. প্রশাসনিক পদসোপানে অতিরিক্ত সচিবের পরই কার অবস্থান? [জ্ঞান]
ক যুগ্মসচিব খ উপসচিব
গ সহকারী সচিব ঘ প্রশাসনিক কর্মকর্তা **ক**

৮১. মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের কাজ কারা সম্পাদন করে থাকেন? [জ্ঞান]
ক সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ
খ মন্ত্রীগণ
গ বিচারপতিগণ ঘ প্রধানমন্ত্রী **ক**

৮২. একটি মন্ত্রণালয়ে কয়জন যুগ্ম সচিব থাকেন? [জ্ঞান]
ক ১ জন খ ২ জন
গ ৩ জন ঘ একাধিক **ঘ**

http://teachingbd.com

★★ বিভাগীয় প্রশাসন

৮৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রের পরেই কীসের স্থান? [জ্ঞান]
ⓚ বিভাগীয় প্রশাসন ⓚ জেলা প্রশাসন
ⓖ উপজেলা প্রশাসন ⓖ ইউনিয়ন পরিষদ **ক**

৮৪. জেলা প্রশাসকগণের কাজের সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করেন কে? [জ্ঞান]
ⓚ বিভাগীয় কমিশনার
ⓚ যুগ্ম সচিব
ⓖ সচিব ⓖ উপসচিব **ক**

৮৫. বিভাগীয় কমিশনার কাদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয়সাধন করেন? [জ্ঞান]
ⓚ জেলা প্রশাসকদের ⓚ কমিশনারদের
ⓖ মেয়রদের ⓖ চেয়ারম্যানদের **ক**

৮৬. কোনো কর্মকর্তার কাজে অগ্রগতি পরিলক্ষিত না হলে বিভাগীয় কর্মকর্তা কী করবেন? [উচ্চতর দক্ষতা]
ⓚ তাকে পদচ্যুত করবেন
ⓚ তাকে অকার্যকর করবেন
ⓖ তাকে বদলির সুপারিশ করবেন
ⓖ তাকে পদোন্নতি দেবেন **গ**

৮৭. বিভাগীয় কমিশনারের সেবামূলক কাজ হলো— [অনুধাবন]
i. দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস
ii. খাল খনন
iii. বন্যাদুর্গতদের সহযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii **খ**

★ জেলা প্রশাসন

৮৮. জেলা প্রশাসনের প্রধান কে? [জ্ঞান]
ⓚ যুগ্ম সচিব ⓚ জেলা প্রশাসক
ⓖ সহকারী কমিশনার
ⓖ অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার **খ**

৮৯. জেলা প্রশাসনের চাবিকাঠি কে? [জ্ঞান]
ⓚ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
ⓚ জেলা প্রশাসক
ⓖ সহকারী কমিশনার
ⓖ সিনিয়র সহকারী কমিশনার **খ**

৯০. কোন শাসক সর্বপ্রথম প্রশাসন ও কর আদায়ের সুবিধার্থে প্রদেশকে কতকগুলো 'সরকারে' বিভক্ত করেন? [জ্ঞান]
ⓚ সম্রাট আকবর ⓚ সম্রাট বাবর
ⓖ শেরশাহ ⓖ সম্রাট হুমায়ূন **ক**

৯১. বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক একক কোনটি? [জ্ঞান]
ⓚ বিভাগ ⓚ মন্ত্রণালয়
ⓖ জেলা ⓖ সচিবালয় **গ**

৯২. 'ক' কুমিল্লা জেলার একজন জেলা প্রশাসক। তিনি কতদিনে একবার তার জেলা ঘুরে দেখবেন? [প্রয়োগ]
ⓚ তিন মাসে ⓚ চার মাসে
ⓖ এক বছরে ⓖ দুই বছরে **গ**

৯৩. জেলা প্রশাসক আপিল শ্রবণ করেন— [অনুধাবন]
i. প্রথম শ্রেণির ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট থেকে
ii. দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট থেকে
iii. তৃতীয় শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii **গ**

৯৪. ডেপুটি কমিশনার যে কাজ করেন— [দি. বো. '১৩, রা. বো. '১৩]
i. জেলার সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ
ii. দণ্ড মওকুফ
iii. ফৌজদারি মামলা পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii **ঘ**

★★ উপজেলা প্রশাসন

৯৫. বাংলাদেশে কতটি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে? [জ্ঞান]
ⓚ ৪৮০টি ⓚ ৪৮২টি
ⓖ ৪৮৯টি ⓖ ৪৯০টি **গ**

৯৬. ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা কোন প্রশাসনের কাজ? [জ্ঞান]
ⓚ ইউনিয়ন পরিষদ ⓚ উপজেলা পরিষদ
ⓖ জেলা পরিষদ ⓖ ভূমি উন্নয়ন পরিষদ **খ**

৯৭. উপজেলা প্রশাসন পরিচালিত হয় কাদের দ্বারা? [জ্ঞান]
ⓚ স্থানীয় জনগণ দ্বারা
ⓚ রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা
ⓖ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা
ⓖ বিরোধী দলীয় নেতাদের দ্বারা **গ**

৯৮. কোনটি উপজেলা প্রশাসনে বিশেষ অবদান রাখে? [জ্ঞান]
ⓚ সময় ও অর্থসংস্থান
ⓚ কৃষি উন্নয়ন
ⓖ জন স্বাস্থ্য রক্ষা ⓖ বিচারকার্য সম্পাদন **খ**

৯৯. উপজেলা প্রশাসন যেসব ভাতা প্রদান করে— [অনুধাবন]
i. বয়স্ক ভাতা
ii. বেকার ভাতা
iii. প্রতিবন্ধী ভাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii **খ**

★★ মাঠ প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক

১০০. বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার নীতি নির্ধারণের মূল কেন্দ্র কোনটি? [জ্ঞান]
ⓚ মন্ত্রণালয় ⓚ মন্ত্রীপরিষদ
ⓖ সচিবালয় ⓖ আইন পরিষদ **গ**

১০১. কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নির্দেশনা উপজেলা প্রশাসনে কোন প্রশাসনের মাধ্যম হয়ে আসে? [জ্ঞান]
ⓚ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ⓚ জেলা প্রশাসন
ⓖ বিভাগীয় প্রশাসন
ⓖ পৌর প্রশাসন **খ**

১০২. গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় কোনটি? [জ্ঞান]
ⓚ সুশিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী
ⓚ জনমতের বিকাশ না ঘটা
ⓖ নির্বাচন
ⓖ ব্যালট বাক্স বিতরণ **গ**

১০৩. বর্তমানে কেন্দ্রের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে— [অনুধাবন]
i. বিভাগ ii. জেলা
iii. থানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৬: স্থানীয় শাসন

প্রশ্ন ▶১ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'X' প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১টি। 'X' স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল, স্বাস্থ্যক্লিনিক ও ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি দিয়ে থাকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও জনগণের সক্রিয় ভূমিকায় 'X' প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাধিত হয়।

[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. পৌরসভার প্রধানকে কী বলা হয়? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান? উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'X' প্রতিষ্ঠানকে অধিক কার্যকর করার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরসভার প্রধানকে মেয়র বলা হয়।

খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর প্রতিনিধিগণ এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা নিজ নিজ এলাকার জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকের 'X' হলো সিটি কর্পোরেশন নামক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর মধ্যে সিটি কর্পোরেশন অন্যতম। বিভিন্ন স্থানের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ নগরীর পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়েছে। এটি মূলত একটি নগরভিত্তিক স্থানীয় সংস্থা। উদ্দীপকে এ প্রতিষ্ঠানটিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'X'-এর সংখ্যা হলো ১১। এ প্রতিষ্ঠানটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যক্লিনিক ও ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি দিয়ে থাকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও জনগণের সক্রিয় ভূমিকায় এ সংস্থার কার্যক্রম সাধিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১১ টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। যথা: ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও গাজীপুর। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ অর্থাৎ মেয়র, কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলররা সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদন করেন। এসব কাজে জনগণও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মহানগরীর উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য সিটি কর্পোরেশন বহুবিধ কাজ করে থাকে। সন্ত্রাস দমন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই রোধের জন্য এ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মহানগরীর জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সিটি কর্পোরেশন বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে। যেমন— হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও নির্মাণের অনুমতি প্রদান, শৌচাগার নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ইত্যাদি। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে— রাস্তাঘাট নির্মাণ, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ, বিশ্রামাগার নির্মাণ, মোটরগাড়ি ও ট্রাক ছাড়া অন্য সকল প্রকার যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান ও চলাচল ইত্যাদি। এ সংস্থাটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, সাহায্য ও পুনর্বাসনেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এছাড়াও জনকল্যাণ এবং মহানগরের উন্নয়নে সংস্থাটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

ঘ 'X' প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশনকে অধিক কার্যকর করার ক্ষেত্রে জনগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সিটি কর্পোরেশন মহানগরের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এর মেয়র ও কাউন্সিলরদের জনগণ সরাসরি নির্বাচন করতে পারে। এর ফলে সিটি কর্পোরেশনে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারাও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিটি কর্পোরেশনের সীমিত জনবলের পক্ষে মহানগরের মতো বিশাল এলাকার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জনগণ নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ও আবর্জনা ফেলে ও নিজ দায়িত্বে নিজেদের বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করে। মহানগরের জনগণের বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পূরণের জন্য সিটি কর্পোরেশন গভীর ও অগভীর নলকূপ খনন করে। জনগণ পানির অপচয় রোধ করে সকলের জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করে। এসব কাজে এলাকার জনগণ সম্পৃক্ত হয়ে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কর্পোরেশনকে সহযোগিতা করে। ভূমি অধিগ্রহণ, বাড়িঘর স্থানান্তর ইত্যাদি কাজেও জনগণ কর্পোরেশনকে সাহায্য করে। এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে জনগণ সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন সংগ্রহ করে। রাস্তাঘাটে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার ব্যাপারেও এ প্রতিষ্ঠানটিকে জনগণ সহযোগিতা করে।

পরিশেষে বলা যায়, মহানগরের উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সিটি কর্পোরেশন যেসব কাজ করে তা মূলত জনগণের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। এ কারণে জনগণও এসব কাজে সহযোগিতা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶২ বিধান সরকার একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ (তেরো) জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. স্থানীয় শাসন কী? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বিধান সরকার কোন ধরনের সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় শাসন হচ্ছে অঞ্চলভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, যেটি গঠিত হয় স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে।

খ সৃজনশীল ১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের বিধান সরকার গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন

Teachingbd24.com

পরিষদ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের বিধান সরকার একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকারও কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। বিধান সরকারের এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, বিধান সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বক্তব্যটি সঠিক।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে। নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে। জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। সর্বোচ্চ পাঁচ (০৫) হাজার টাকা মূল্যের দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৩ রফিক সাহেব গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনিসহ আরো কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে ঐ প্রতিষ্ঠান গঠিত। দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য একজন সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারিও নিযুক্ত। রফিক সাহেব অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তার নির্বাচনি এলাকার সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কিছু সীমাবদ্ধতাও অনুভব করেন। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বাংলাদেশের তিনটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নাম লিখ। ১

খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব রফিক কোন পদে আসীন? তার প্রতিষ্ঠানের গঠন বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রফিকের প্রতিষ্ঠান কী কাজ করে? প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের তিনটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো— ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা।

খ স্থানীয় সরকার বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

স্থানীয় সরকার হলো সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ। সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও নীতিনির্ধারণি ক্ষমতা থাকে না। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ জনাব রফিকের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের স্বার্থে বহুবিধ কাজ করে থাকে। তবে এই কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। জনবহুল গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ দুই ধরনের কাজ করে। যেমন: ১. মৌলিক কাজ, ২. উন্নয়নমূলক কাজ।

ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাকরির কার্যকাল ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে। এ সংস্থাটি ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে। সরকারের নীতি বা কর্মসূচি জনগণকে জানানোও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। ইউনিয়নে কোনো অপরাধ ঘটলে এ প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে জানায়। অপরাধ নিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতাও করে। ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও করে। যেমন: রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, পার্ক, পুকুর, কবরস্থান, ইত্যাদি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়া জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্যোগের সময় সেবামূলক কাজ এবং নিরাপত্তামূলক কাজ করাও ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। আবার বৃক্ষরোপণ, কৃষি-শিল্পের উন্নয়ন সাধন, বিনোদন ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের কাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

জনগণের কল্যাণে কাজ করা হলেও কখনো কখনো ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি কিছু সীমাবদ্ধতার শিকার হয়। যেমন— সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনগণ যদি অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের হয় তাহলে চেয়ারম্যান যতোই আন্তরিক হোক না কেন, তার পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সভলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। ইউনিয়ন পরিষদের আরেকটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হলো— নিজস্ব পর্যাপ্ত জনবল না থাকা। এছাড়া পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সচিব ও চৌকিদারদের বেতন বা সম্মানী নামমাত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক কাজ করার আগ্রহ খুবই কম। তাছাড়া করের পরিমাণ কম হওয়ায় পরিষদের নিজস্ব আয়ও তেমন নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নে বহুবিধ কার্য সম্পাদন করলেও তার অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান

↓

৯ জন নির্বাচিত সদস্য + ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য

↓

সচিব

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]

https://teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গঠন উল্লেখ করো। ১
খ. কীভাবে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা যায়? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোন স্তরের প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে— তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত।

খ কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্টের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা যায়।
মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটিয়ে সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতে তার এখতিয়ারে স্থানীয় সীমার মধ্যে কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিফলন ঘটেছে।
বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন- গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এর মধ্যে গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। এই ইউনিয়ন পরিষদ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। উদ্দীপকেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে মূলত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, যার মধ্যে ৯ জন সাধারণ আসনের সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য। চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকে। তবে উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। নয়টি সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীগণও অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিষদের একজন সদস্য বলে গণ্য হন। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন বেতনভুক্ত সচিব থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে- এ কথার সাথে আমি একমত।
বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা হয় এবং গণতন্ত্রের ভিত আরো শক্তিশালী হয়। কেননা গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। আর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯ অনুসারে, প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে ওয়ার্ডসভা গঠিত হয়। এর বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম উপস্থাপন করে। ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। এর ফলে ওয়ার্ড পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ঘটে। ওয়ার্ড পর্যায়েই প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কিম এবং উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিরূপণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। তাছাড়া বয়স্কভাতা, ভর্তুকিসহ বিভিন্ন ভাতা তাদেরকে কীভাবে দেওয়া হবে তা ওয়ার্ডসভাতে বসে ঠিক করা হয়। এছাড়াও যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ওয়ার্ডসভা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে গতি আসবে, গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৫

'ক' শাসন ব্যবস্থা	'খ' শাসনব্যবস্থা
↓	↓
কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট	নিজস্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
↓	↓
জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই	জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ আছে
↓	↓
মূল লক্ষ্য সুশাসন	মূল লক্ষ্য স্ব-শাসন
↓	↓
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই	নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে নির্বাচন হয়
↓	↓
সরকারিভাবে নীতি নির্ধারিত হয়	স্থানীয় পর্যায়ে স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারিত হয়

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১
খ. খাদ্যে ভেজাল রোধ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. 'ক' শাসনব্যবস্থা দ্বারা কোন ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'গণতন্ত্র বিকাশে 'খ' শাসনব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ'— যুক্তি দেখাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির আইন ও নীতিবিরুদ্ধ কাজকে দুর্নীতি বলে।

খ জনস্বাস্থ্য রক্ষা তথা সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য খাদ্যে ভেজাল রোধ প্রয়োজন।
বর্তমান যুগে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানোর প্রভাবে নানাভাবে শারীরিক ঝুঁকি বাড়ে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে কিডনি, লিভার ও পাকস্থলীর ক্ষতি হয়। তাই সুস্থ থাকার জন্য খাদ্যে ভেজাল রোধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের 'ক' শাসনব্যবস্থা দ্বারা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

শাসনকার্য সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে দু ধরনের শাসন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে স্থানীয় শাসনের অর্থ হচ্ছে অঞ্চলভিত্তিক শাসন। স্থানীয় শাসনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় শাসন মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় পর্যায়ের সকল সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এজন্য সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে নীতি ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় শাসনের উপর অর্পিত হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণের কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে জনগণেরও অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। কারণ স্থানীয় শাসন সরকারি কর্মকর্তাদের শাসন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন— জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, থানা প্রশাসন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক' শাসনব্যবস্থা দ্বারা উল্লিখিত তথ্যসমূহ উপরের আলোচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' শাসন ব্যবস্থা দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। গণতন্ত্রের বিকাশে 'খ' শাসন ব্যবস্থা তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা গৌণ, জনগণের প্রতিনিধিদের ভূমিকাই মুখ্য। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং স্থানীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদাহরণ। আমরা জানি, গণতন্ত্র বলতে মূলত জনগণের শাসনকে বোঝায়, যা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দ্বারা প্রতিফলিত হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে জনগণ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে জনগণের সম্পৃক্ত হওয়ায় সুযোগ থাকায় স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে যা গণতন্ত্রকে সুসংগঠিত করে।

যেহেতু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয় সেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার ফলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল লক্ষ্য স্ব-শাসন, যার ফলে জনগণ পরবর্তীতে বৃহত্তর শাসন ব্যবস্থায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এছাড়াও স্থানীয় জনগণের মনে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি আস্থা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'খ' তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব রাজু একটি গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রধান। তিনি জনগণের বিবাদ মিটিয়ে থাকেন। নানা কাজে তাকে প্রায়ই উপজেলা ও জেলা সদরে যেতে হয়। এভাবে সারাদিন তিনি জনকল্যাণে কাজ করে যান। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. পৌরসভার প্রধানের পদ কী? ১

খ. উপজেলা পরিষদের কাজ লিখ। ২

গ. রাজু কোন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান? তার প্রতিষ্ঠানের গঠন-কাঠামো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাজুর মত হওয়া উচিত— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরসভার প্রধানের পদ হলো মেয়র।

খ উপজেলা পরিষদ বাংলাদেশের অন্যতম একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথা- স্থানীয় প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা প্রদান, স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এছাড়াও উপজেলা পরিষদ পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতসহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের সকল নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাজুর মতো হওয়া উচিত। কেননা চেয়ারম্যানের একক প্রচেষ্টায় পরিষদের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। পরিষদের অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যরা চেয়ারম্যানকে সমানভাবে সহযোগিতা করলেই সার্বিক জনকল্যাণ সাধিত হবে।

উদ্দীপকের রাজু গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান। তিনি জনগণের বিভিন্ন ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে থাকেন। নানান কাজে প্রায়ই উপজেলা ও জেলা সদরে যান। এসব কাজের বাইরেও তাকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যেমন- i. ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করা; ii. কৃষির উন্নয়নে উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা; iii. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা; iv. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা তৈরি করা; v. মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া; vi. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা; vii. জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্ট্রি ও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রভৃতি।

ইউনিয়ন পরিষদের উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদেরও চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করা উচিত। এতে করে ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিকগণ যদি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করে তবেই ইউনিয়ন পরিষদ তার আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের জনগণের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের জন্য একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন চেয়ারম্যান, নয়জন সদস্য ও তিনজন মহিলা সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬; অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. স্থানীয় শাসন কী? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাই হলো স্থানীয় শাসন। যেমন— বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। সেই ব্রিটিশ-পূর্ব আমল হতে এর অগ্রযাত্রা শুরু। এর কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা। উদ্দীপকে এ প্রতিষ্ঠানটিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে বলা হয়েছে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পল্লি অঞ্চলের জনগণের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন করাই এর কাজ। এতে একজন চেয়ারম্যান নয়জন সদস্য ও তিনজন মহিলা সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এটি সর্বমোট ১৩জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে ৯ জন পুরুষ সদস্য; প্রতি তিন ওয়ার্ড থেকে একজন করে মহিলা সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সেই সাথে সমগ্র ইউনিয়নের জনগণের সরাসরি ভোটে ১ জন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জনবহুল গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্যেই ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করে থাকে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনকল্যাণ সাধনই ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান লক্ষ্য। তাই গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ কাজে করে। রাস্তাঘাট খেলাধুলার মাঠ, পার্ক, গোরস্থান, পুকুর ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ইউনিয়নকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে সব ধরনের পদক্ষেপ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রহণ করে থাকে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করে। বৃক্ষরোপণ, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, কৃষি শিল্পের উন্নয়ন সাধনে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন বিনোদনমূলক কাজও প্রতিষ্ঠানটি করে থাকে। যেমন— মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি।

ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো— শিক্ষার উন্নয়নকল্পে সাহায্য দান, পাঠাগার ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, যুবপ্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ, জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। আর এসব কাজের ফলে অবহেলিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী উন্নত জীবন যাপনের ছোঁয়া পায় এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তাই বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৮ স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে, ঐ এলাকায় সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে 'খ' নামক আরেকটি সংস্থা। এ সংস্থার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। *[চা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. কতজন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়? ১

খ. পৌরসভার গঠন সম্পর্কে কী জান? ২

গ. 'ক' নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে কী ধরনের শাসন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' সংস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৩ জন (১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য এবং ৩ জন মহিলা সদস্য) সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

খ শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একক হচ্ছে পৌরসভা।

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

গ 'ক' নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে এমন এক ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিম্নস্তরে অবস্থিত শহর বা গ্রাম এলাকার বহুবিধ স্থানীয় সমস্যা থাকে। সেগুলো স্থানীয়ভাবে সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক এরূপ শাসনব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নামে পরিচিত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বৈশিষ্ট্য হলো— স্থানীয় এলাকার প্রতিনিধি দ্বারা এ শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন থেকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, স্থানীয় পর্যায়ে নীতি গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে।

উদ্দীপকের বর্ণনা মতে, স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। উক্ত ইঙ্গিত দ্বারা স্পষ্টতই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে।

ঘ আলোচ্য উদ্দীপকে 'ক' নামক সংস্থাটি হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার এবং 'খ' নামক সংস্থাটি হলো স্থানীয় সরকার। নিচে এদের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

স্থানীয় সরকার	স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার
১. স্থানীয় সরকার হলো প্রশাসনের সুবিধার্থে কেন্দ্র কর্তৃক গঠিত প্রশাসনিক একক।	১. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হলো সেই সরকার যার নিজস্ব কার্যাবলি পরিচালনার আইনসংগত অধিকার ও প্রয়োজনীয় সংগঠন রয়েছে।
২. স্থানীয় সরকারে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেন।	২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ পরোক্ষ ও তত্ত্বাবধানমূলক।
৩. স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং সরকারের নিকট দায়ী।	৩. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের নিকট দায়ী।
৪. স্থানীয় সরকারের উদাহরণ হলো— উপজেলা প্রশাসন।	৪. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উদাহরণ হলো- উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ।

উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের আরো অনেক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। যেমন— নিয়োগগত, মেয়াদগত, স্থায়িত্বগত ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶৯ ছোট একটি শহরের জনপ্রতিনিধি জনাব কামরুল ইসলাম তার শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। অন্যান্য সদস্যের সহায়তায় তিনি এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তিনি ও তার ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সালিশি আদালত এলাকার ছোটখাটো বিবাদ ও কলহের মীমাংসা করতে পারেন। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

https://teachingbd24.com

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব কামরুল ইসলাম যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের প্রধান তার গঠন উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উক্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সকল কার্যক্রম উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয় নাই— মন্তব্য করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে।

খ যখন ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ, গুণ বা উপযুক্ততা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখন তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।
সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। বাংলাদেশে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি মেনে চলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

গ জনাব কামরুল ইসলাম পৌরসভা নামক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের প্রধান। কেননা উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব কামরুল একটি শহরের জনপ্রতিনিধি হিসেবে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেন। যে কাজগুলো মূলত পৌরসভার কাজ। এছাড়া তিনি ও তার ৪ জন সদস্য সালিশি আদালত গঠন করেন। এ বিষয়টিও পৌরসভাকেই নির্দেশ করে। নিচে পৌরসভার গঠন উল্লেখ করা হলো-
বাংলাদেশের শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভা গঠিত হয়। প্রতিটি পৌরসভাকে কতকগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এভাবে মেয়র, কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। পৌরসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক পৌরসভায় একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণনায় পৌরসভা তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সকল কার্যক্রম প্রতিফলিত হয় নি বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকের বর্ণনা মতে, পৌরসভার জনপ্রতিনিধি জনাব কামরুল ইসলাম শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। অন্যান্য সদস্যের সহায়তায় তিনি এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করেন। তিনি ও তার ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সালিশি আদালত এলাকার ছোটখাটো বিবাদ ও কলহের মীমাংসা করতে পারেন। এছাড়াও পৌরসভার আরো নানাবিধ কার্যাবলি রয়েছে। যেমন- পৌর এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এগুলোকে অর্থ সাহায্য প্রদান, ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, যাদুঘর স্থাপন, পার্ক, উদ্যান, মিলনায়তন স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে রেডিও-টেলিভিশন সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ, অনাথ ও দুস্থদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তি, জুয়াখেলা ও মদ্যপান বন্ধের ব্যবস্থা করা, মৃতদেহের সৎকার, পৌর এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য নৈশ প্রহরী নিয়োগ, অপরাধ ও বিপজ্জনক খেলা ও পেশা নিয়ন্ত্রণ, গোরস্থান, শ্মশান নির্মাণ, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।
সুতরাং এটা নি:সন্দেহে বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণনায় পৌরসভা নামক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সকল কার্যক্রম প্রতিফলিত হয় নি।

প্রশ্ন ▶ ১০ মরিয়ম বেগম হারবাং গ্রামে বাস করে। সে গ্রামের কয়েকজন দুঃস্থ মহিলাকে নিয়ে একটি কুটির শিল্প গড়ে তোলে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা অর্থ সংকটে পড়ে। তাদের কিছু মালামালও চুরি হয়ে যায়। তখন তারা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। ঐ সময় তাদের এলাকার একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তাদের বেশ সহযোগিতা করে। ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানটি এখন অনেক বড় হয়েছে। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা কয়টি? ১
খ. পৌরসভার গঠন বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে তার কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখ। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত সংস্থা গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা ১১টি।

খ শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একক হচ্ছে পৌরসভা।
পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

গ উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি হলো উপজেলা পরিষদ।
নিম্নে উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:
১. পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি।
২. পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কার্যসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।
৩. ই-গভর্ন্যান্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
৪. উপজেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
৫. সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৬. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
৭. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান করা।
৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৯. সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উপজেলা পরিষদ গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কাজ, জনশৃঙ্খলা রক্ষামূলক কাজ, জনকল্যাণ ও সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দফতরের কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে। ইউনিয়ন ও পৌরসভার কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্যজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে। স্যানিটেশন, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানীয় ব্যবস্থা করে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা

Teachingbd24.com

প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা প্রদান করে। কৃষি উন্নয়নে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়ও করে থাকে উপজেলা পরিষদ।

সুতরাং বলা যায়, গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা পরিষদ ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বর্ষার জলাবদ্ধতা নগর জীবনের এক অভিশাপ। নগরবাসীকে এই সংকট হতে মুক্তি দেয়ার জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। নালা নর্দমা পরিষ্কার, জলাশয় ভরাট রোধ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সরকারের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এসব কাজ করে থাকে। যেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এসব কাজে নিয়োজিত তাই জনগণের প্রত্যাশা তাদের প্রতি অত্যাধিক। বাংলাদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক।

[বি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নগর উন্নয়নে কী কী কাজ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে— তোমার সুপারিশসমূহ লিখ। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংখ্যা তিন (০৩) জন।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পৌরসভার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সংস্থা নগর উন্নয়নে কী কী কাজ করতে পারে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন: জনসাধারণের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা করাও পৌরসভার দায়িত্ব।

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণ সাধন করার লক্ষ্যে পৌরসভা পৌর এলাকার আর্বজনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রোগ জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধ পত্র সরবরাহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে থাকে।

শিক্ষামূলক কাজ: পৌর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পৌরসভা বিদ্যালয় স্থাপন, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং অন্যান্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্য দান করে।

উন্নয়নমূলক কাজ: জনসাধারণের চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, বৃক্ষরোপণ ও এগুলো সংরক্ষণ প্রভৃতি পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজের অংশবিশেষ।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন: সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য পৌরসভা নগর এলাকায় তথ্যকেন্দ্র, জাদুঘর, আর্ট গ্যালারি ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনা করে।

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা: শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পৌরসভা নগর উন্নয়নের জন্য উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ পৌরসভাকে শক্তিশালী করার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

স্বচ্ছতা: পৌরসভার দৈনন্দিন কার্যাবলির মধ্যে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা খুবই জরুরি। কারণ কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকলে তা জনকল্যাণমুখী হয়।

জবাবদিহিতা: পৌরসভার নগর এলাকায় নানাবিধ কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করলে তা সংস্থার সুনামের পথ সুগম করে। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান একটি শক্তিশালী স্বায়ত্তশায়িত প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে।

আইনের শাসন: পৌরসভাকে শক্তিশালী করার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত অপরিহার্য। আইন অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত। কারণ তাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন প্রতিষ্ঠানের সুনাম বয়ে আনে।

অংশগ্রহণ: উক্ত সংস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে জনগণের প্রতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বেড়ে যায় এবং এরা কাজের প্রতি বেশ মনোযোগী হয়ে থাকেন।

পদচ্যুতি: কোনো প্রতিনিধি ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাকে পদচ্যুতি করার বিধানকে শক্তিশালী করা দরকার। এছাড়া দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতা, অসদাচরণ, তহবিল আত্মসাৎ প্রভৃতি কারণে তাদেরকে অপসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১২

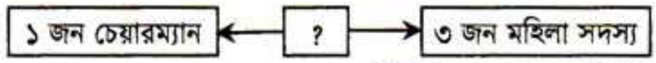

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. কয়টি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার গঠিত? ১

খ. উপজেলা পরিষদের গঠনের পটভূমি বর্ণনা করো। ২

গ. ছকের '?' স্থানে কোন সংস্থাটির নাম বসবে? কেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকের সংস্থাটির কার্যাবলী বর্ণনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার গঠিত।

খ উপজেলা পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

১. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান।

২. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা)।

৩. উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র এবং তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়।

গ ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের নাম বসবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন- গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এর মধ্যে গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যন, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য ও সচিব। এখানে মূলত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, যার মধ্যে ৯ জন সাধারণ আসনের সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য। চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকে। তবে উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যরাও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। নয়টি সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিষদের একজন সদস্য বলে গণ্য হন। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। তাছাড়া ইউনিয়ন

Teachingbd24.com

পরিষদে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করার জন্য সরকার নিযুক্ত একজন বেতনভুক্ত সচিব থাকে। তাই বলা যায়, চিত্রের '?' চিহ্নিত স্থানে ইউনিয়ন পরিষদের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি মূল্যায়ন করা হলো—

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাদের তত্ত্বাবধান, খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তা ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, গোরস্থান, শ্মশান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কূপ, নলকূপ স্থাপন করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

শান্তিরক্ষা-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

বিচার -সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে।

রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

বিনোদনমূলক কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার, নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

উক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ আবীর গ্রামে বাস করে। সে এবার প্রথম একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। বিধি অনুযায়ী সে এই সংস্থার নির্বাচনে মোট তিন জনকে ভোট দেবার সুযোগ পায়। সংস্থাটিতে মোট ১৩ জন নির্বাচিত হন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। আবীর মনে করে, উক্ত সংস্থাটি স্থানীয় জনমতের প্রাধান্য দিয়ে এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে এবং স্থানীয় জনগণকে সকল কাজে সম্পৃক্ত করবে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. মুসলিম লীগ কবে গঠিত হয়? ১

খ. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. স্থানীয় জনগণের উন্নতিতে এই সংস্থাটি কী কী ভূমিকা রাখছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ যত বেশি হবে গণতন্ত্রের ভীতও শক্তিশালী হবে।"— তুমি কি একমত যুক্তি দেখাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

খ ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবার্ট ক্লাইভ দুই জনের যে অভিনব শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাকে দ্বৈতশাসন বলে।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি (রাজস্ব) আদায়ের ক্ষমতা লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন। দ্বৈত শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

গ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি মূল্যায়ন করা হলো-

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাদের তত্ত্বাবধান, খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তা ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, গোরস্থান, শ্মশান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কূপ, নলকূপ স্থাপন করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

শান্তিরক্ষা-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

বিচার -সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে।

রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

বিনোদনমূলক কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার, নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

উক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ, ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে- এ কথার সাথে আমি একমত।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা হয় এবং গণতন্ত্রের ভিত আরো শক্তিশালী হয়। কেননা, গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। আর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদেরকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯ অনুসারে, প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ডসভা গঠিত হয়। এর বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম উপস্থাপন করে। ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। এর ফলে ওয়ার্ড পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ঘটে। ওয়ার্ড পর্যায়েই প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কিম এবং উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিরূপণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। তাছাড়া বয়স্কভাতা, ভর্তুকিসহ বিভিন্ন ভাতা তাদেরকে কীভাবে দেওয়া হবে তা ওয়ার্ডসভাতে বসে ঠিক করা হয়। এছাড়াও যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ওয়ার্ডসভা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে গতি আসবে, গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ চুন্নু মিয়া গ্রামভিত্তিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনিসহ আরো কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সমন্বয় ঐ প্রতিষ্ঠান গঠিত। দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য একজন সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারিও নিযুক্ত। রফিক সাহেব অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তার নির্বাচনি এলাকার সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কিছু সীমাবদ্ধতা ও অনুভব করেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১

খ. খাদ্যে ভেজাল রোধ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. জনাব চুন্নু মিয়া কোন পদে আসীন? তার প্রতিষ্ঠানের গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চুন্নু মিয়ার প্রতিষ্ঠান কী কাজ করে? প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা কী? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করাই দুর্নীতি।

খ আমাদের দেশের নাগরিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হলো খাদ্যে ভেজাল।

খাদ্যে ভেজালের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভয়ঙ্কর প্রভাব রয়েছে। এর ফলে গর্ভবতী মা ও শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি। খাদ্যে ভেজালের কারণে আমরা নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। যেমন— লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্লাড ক্যান্সার, কিডনির জটিলতা, হৃদরোগ, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি। এছাড়াও ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ইত্যাদি এখন নৈমিত্তিক ঘটনা। এসব থেকে বাঁচার জন্য খাদ্যে ভেজাল রোধ করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের চুন্নু মিয়া গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে।

ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন করে মোট তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের চুন্নু মিয়া একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। চুন্নু মিয়ার এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের চুন্নু মিয়ার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ, ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তবে এসব কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। জনবহুল গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ প্রধানত দুই ধরনের কাজ করে। যেমন: মৌলিক কাজ, উন্নয়নমূলক কাজ।

ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাকরির কার্যকাল ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে। এ সংস্থাটি ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে। সরকারের নীতি বা কর্মসূচি জনগণকে জানানোও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। ইউনিয়নে কোনো অপরাধ ঘটলে এ প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে জানায়। অপরাধ নিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করে। ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও করে। যেমন: রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, পার্ক, পুকুর, কবরস্থান, ইত্যাদি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়া জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্যোগের সময় সেবামূলক কাজ এবং নিরাপত্তামূলক কাজ করাও ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। আবার বৃক্ষরোপণ, কৃষি-শিল্পের উন্নয়ন সাধন, বিনোদন ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের কাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

জনগণের কল্যাণে কাজ করা হলেও কখনো কখনো ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি কিছু সীমাবদ্ধতার শিকার হয়। যেমন— সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনগণ যদি অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের হয় তাহলে চেয়ারম্যান যতোই আন্তরিক হোক না কেন, তার পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। ইউনিয়ন পরিষদের আরেকটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হলো— নিজস্ব পর্যাপ্ত জনবল না থাকা। এছাড়া পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সচিব ও চৌকিদারদের বেতন বা সম্মানী নামমাত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক কাজ করার আগ্রহ খুবই কম। তাছাড়া করের পরিমাণ কম হওয়ায় পরিষদের নিজস্ব আয়ও তেমন নেই। উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ করলেও তার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বর্ষার জলাবদ্ধতা নগর জীবনের এক অভিশাপ। নগরবাসীকে এই সংকট হতে মুক্তি দেয়ার জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়। নালা-নর্দমা পরিষ্কার, জলাশয় ভরাট রোধ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়। সরকারের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এসব কাজ করে থাকে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের বিভাগ কয়টি, নাম লিখ। ১

খ. স্থানীয় সরকার/শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা নগর উন্নয়নে কী কী কাজ করতে পারে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে— তোমার সুপারিশসমূহ লিখ। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বিভাগ ৮টি। যথা— ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান

↓

৯ জন নির্বাচিত সদস্য + ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য। *[ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. HIV এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. কীভাবে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোন স্তরের প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে-তুমি কি একমত? তোমার উত্তরে স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

Teachingbd24.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো— Human Immunodeficiency Virus।

খ কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্টের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করা যায়।

মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটিয়ে সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতে তার এখতিয়ারে স্থানীয় সীমার মধ্যে কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিফলন ঘটেছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন- গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এর মধ্যে গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। এই ইউনিয়ন পরিষদ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। উদ্দীপকেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে মূলত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, যার মধ্যে ৯ জন সাধারণ আসনের সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য। চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকে। তবে উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। নয়টি সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীগণও অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের একজন সদস্য বলে গণ্য হন। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন বেতনভুক্ত সচিব থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে গণতন্ত্রের ভিত ততো শক্তিশালী হবে- এ কথার সাথে আমি একমত।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো, সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা হয় এবং গণতন্ত্রের ভিত আরো শক্তিশালী হয়। কেননা গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। আর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণকে সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার আইন-২০০৯ অনুসারে, প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে ওয়ার্ডসভা গঠিত হয়। এর বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম উপস্থাপন করে। ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। এর ফলে ওয়ার্ড পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ঘটে। ওয়ার্ড পর্যায়েই প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কিম এবং উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিরূপণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। তাছাড়া বয়স্কভাতা, ভর্তুকিসহ বিভিন্ন ভাতা তাদেরকে কীভাবে দেওয়া হবে তা ওয়ার্ডসভাতে বসে ঠিক করা হয়। এছাড়াও যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ওয়ার্ডসভা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে গতি আসবে, গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭

[বি. এন. কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? ১

খ. সুপ্রীম কোর্টের গঠন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ? চিহ্নিত স্থানে কোন ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ? চিহ্নিত প্রশাসনকে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট।

খ সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন, কার্যাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতির আসন এবং প্রত্যেক বিভাগের আসন গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগ এবং অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করবেন। বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। স্থানীয় শাসন বলতে স্থানীয় পর্যায়ের বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা শাসনব্যবস্থাকে বুঝায়। স্থানীয় শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিগণ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকে বাংলাদেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ১ম ও ২য় স্তর বিভাগীয় প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের নাম উল্লেখ রয়েছে।

https://teachingbd24.com

কিন্তু আমরা জানি বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন নিয়ে বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন কাঠামো গঠিত। সুতরাং উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নটির মাধ্যমে এই জেলা প্রশাসনকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নটি দ্বারা বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ করছে। এই জেলা প্রশাসনকে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। জেলা প্রশাসনকে কেন্দ্র করে জেলার সমগ্র শাসন আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক হলো জেলার মধ্যমণি। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য ও প্রশাসনের প্রবীণ কর্মকর্তা।

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ সচিবালয়ে জেলা সংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত হয়। জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসন, রাজস্ব, সমন্বয়, স্থানীয় শাসন, মানবতামূলক কাজ, বিচার সংক্রান্ত কাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিরোধ মিমাংসাসহ যাবতীয় কার্যাবলি দ্বারা রাষ্ট্রের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের অপর দুটি বিভাগ যথা বিভাগীয় প্রশাসন এবং উপজেলার মধ্যে সমন্বয় শাধন করে থাকেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে জেলা ও কেন্দ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জেলা প্রশাসন জেলার প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা, তত্ত্বাবধায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রুমি গ্রামে বাস করে। সে কয়েক বছর আগে একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। এই পরিষদটি হয়েছে একজন নির্বাচিত প্রধান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাংলাদেশে কয়টি সিটি কর্পোরেশন আছে? ১

খ. স্থানীয় সরকার/শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় জনগণের উন্নয়নে যে ধরনের কাজ করে তা উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১১টি সিটি কর্পোরেশন আছে।

খ স্থানীয় সরকার বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

স্থানীয় সরকার হলো সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ। সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও নীতিনির্ধারণি ক্ষমতা থাকে না। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি বলতে ইউনিয়ন পরিষদকে বোঝানো হয়েছে যার মূল লক্ষ্য গ্রামীণ জনগণের সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করা।

গ্রাম কেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্ব নিম্নে অবস্থিত। এই পরিষদটি গঠিত হয় একজন নির্বাচিত প্রধান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এটি গ্রামের স্থানীয় জনগণের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণের উন্নয়নে যে সকল কাজ পরিচালনা করে তাদের মধ্যে রয়েছে:-

১. গ্রাম বা পল্লির সৌন্দর্য বৃদ্ধি
২. গ্রামীণ বা পল্লি এলাকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
৩. স্ব-শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা
৪. স্থানীয় জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো
৫. উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা
৬. জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা
৭. গণ সচেতনার বিকাশ ঘটানো
৮. শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ বা পল্লি জনগণের সার্বিক উন্নয়নে বহুমুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্নে অবস্থান করে। এটি গণতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামীণ জনগনের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ সৃষ্টি হয়েছে। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে ৫ বছরের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ বা পল্লি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, গণ সচেতনতার বিকাশ ঘটানোসহ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্র জনগণের শাসন। জনপ্রতিনিধিরাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। গ্রামীণ ও পল্লির এলাকাতে দেশের সিংহভাগ মানুষ বসবাস করে। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর কারণে দেশে গণতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পদ সুপ্রশস্ত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সোহেল সরকার একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনি সহ মোট ১৩ (তের) জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পৌরসভার প্রধানকে কী বলা হয়? ১

খ. স্থানীয় শাসন কী? ২

গ. উদ্দীপকের সোহেল সরকার কোন ধরনের সংস্থার প্রধান ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একককে পৌরসভা বলা হয়।

Teachingbd24.com

খ স্থানীয় শাসন বলতে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এর প্রতিনিধিগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। এরা নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২০ মোসাদ্দেক হোসেন একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান। যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। তিনি পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বে থাকবেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন খাতে যেমন আয় করেন তেমনি বিভিন্ন খাতে ব্যয়ও করেন। পরিষদটি দেশের স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. পার্বত্য জেলা তিনটির নাম লেখ। ১

খ. পৌরসভার গঠন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ২

গ. মোসাদ্দেক সাহেব কোন স্থানীয় সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠান কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা তিনটি হলো রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি।

খ শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একক হচ্ছে পৌরসভা।

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মোসাদ্দেক সাহেব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান এবং ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তারা প্রত্যেকেই জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের সেবা প্রদান ও স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে তিনি জনগণের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করেন। ইউনিয়ন পরিষদের অবকাঠামো, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি, নারী উন্নয়ন, শিশু ও যুব উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে তিনি জনগণকে সম্পৃক্ত করেন।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, মোসাদ্দেক হোসেনও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান। তার প্রতিষ্ঠানেও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্বের বিকাশসহ নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ সমাজে গণতন্ত্রের চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রাম ও ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। তাই গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ কাজ করে থাকে। রাস্তাঘাট, খেলাধুলার মাঠ, পার্ক, গোরস্থান, পুকুর ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, বিদ্যালয়, পাঠাগার ও পাঠশালা, সমবায় সমিতি, এনজিও, কলেজ, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রযুক্তিগত শিক্ষা, নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা হাল নাগাদ প্রভৃতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করাও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। এছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, জরিপ, রাজস্ব আদায়, সরকারী কর্মসূচী প্রচার, ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার, চোরাচালান প্রতিরোধ, জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ ইত্যাদি করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ ইউনিয়ন পরিষদ গনতন্ত্র চর্চা, স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶২১ জাহিদ সাহেব প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। তিনি পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন খাতে যেমন আয় করেন তেমনি বিভিন্ন খাতে ব্যয়ও করেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি কী? ১

খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জাহিদ সাহেব কোন স্থানীয় সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে জাহিদ সাহেবের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি হলো পৌর মেয়র।

খ স্থানীয় সরকার বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

স্থানীয় সরকার হলো সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ। সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও নীতিনির্ধারণি ক্ষমতা থাকে না। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের জাহিদ সাহেব গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য,

https://teachingbd24.com

তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি।

উদ্দীপকের জাহিদ সাহেব একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকারও কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। বিধান সরকারের এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জাহিদ সাহেব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহিদ সাহেব তথা ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ জাহিদ সাহেব প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান যার মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। তিনি পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন খাতে যেমন আয় করেন, তেমনি বিভিন্ন খাতে ব্যয়ও করেন। এলাকার উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. কীভাবে পৌরসভা গঠিত হয়? ২

গ. জাহিদ সাহেব কোন স্থানীয় সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে জাহিদ সাহেবের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে।

খ শহরকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মৌলিক একক হচ্ছে পৌরসভা।

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহিদ সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান হিসেবে স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ইনসান সাহেব বাংলাদেশের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের আরও ৯ জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ৫ বছর। *[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. স্থানীয় শাসন কাকে বলে? ১

খ. স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় শাসন বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়।

খ স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা। আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাচিত কর্মকর্তাদের লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে।

ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত

https://teachingbd24.com

করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ, ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের ইনসান সাহেব একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। সুতরাং বলা যায়, ইনসান সাহেবের এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হলো—

জনকল্যাণমূলক কাজ: জনকল্যাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাদের তত্ত্বাবধান, খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তা ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, গোরস্থান, শ্মশান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কূপ, নলকূপ স্থাপন করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

শান্তিরক্ষা-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

বিচার -সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে।

রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

বিনোদনমূলক কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার, নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

উক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সিদ্দিক বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অধীনে একটি পরিষদের প্রধান। তার সাথে আরও নয়জন পুরুষ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সাথে আরও নির্বাচিত হয়েছেন তিনজন নারী সদস্য। তাদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন সরকারি কর্মচারি। তাদের পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর। *[দিউ গভ: জিগ্রী কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং-৮]*

ক. সিটি কর্পোরেশনের কার্যকাল বা মেয়াদ কত বছর? ১

খ. নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় NGO-এর ভূমিকা কীরূপ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব সিদ্দিক স্থানীয় সরকারের কোন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের উন্নয়ন কাজে উক্ত পরিষদ অনেক কার্য সম্পাদন করে থাকে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিটি কর্পোরেশনের কার্যকাল ৫ বছর।

খ বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে NGO-এর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নারীর উন্নয়নে তারা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে নারীদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করছে। এছাড়া শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে কাজ করা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব নিরসনে সামাজিক প্রচারণা, নারী নির্যাতন বন্ধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি বন্ধ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। শিশুদের শিক্ষার জন্যও NGO নানা উদ্যোগ নিয়ে থাকে। যেমন- প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ'-এর প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ'-এর প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব শিপন তাঁর নিজ এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান জনপ্রতিনিধি। তিনি আরও ১২ জন নির্বাচিত অধীনস্থ প্রতিনিধি নিয়ে স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং অভাব অভিযোগ ও চাহিদা পূরণ করে থাকেন। *[আলফেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. স্থানীয় সরকার কী? ১

খ. কোরাম বলতে কী বুঝ? ২

গ. জনাব শিপন যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় এলাকার অভাব ও চাহিদা পূরণ করে। উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় সরকার বলতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

খ যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

কোরাম শব্দের অর্থ ন্যূনতম উপস্থিতি সংখ্যা। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা হয়। সংসদের অধিবেশন চলাকালে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা যদি ৬০ জনের চেয়ে কম হয় এবং সে মর্মে যদি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার অধিবেশন স্থগিত রাখবেন বা সংসদ মুলতবি ঘোষণা করবেন।

গ জনাব শিপন যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তা হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এর সদস্য সংখ্যা চেয়ারম্যানসহ মোট ১৩ জন। প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি।

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন করে। এ সংস্থাটি ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে। ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও করে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও দুর্যোগের সময় সেবামূলক কাজ করে। আবার বৃক্ষরোপণ, কৃষি-শিল্পের উন্নয়ন সাধন, বিনোদন ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের কাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলাকার অভাব ও চাহিদা পূরণ করে- উক্তিটি যথার্থ।

স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদ।

Teachingbd24.com

ইউনিয়ন পরিষদ জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার করে। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ, কুটির শিল্প, গ্রামীণ শিল্প এবং দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে ছোটখাটো বিবাদের মীমাংসা করে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করার জন্য কৃষি, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষের সমতা বিধানে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণের অভাব ও চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব সাজিদউল্লাহ একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। তার প্রতিষ্ঠানটি ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত। *[লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বাংলাদেশে মোট কয়টি সিটি কর্পোরেশন আছে? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন কেন? ২

গ. জনাব সাজিদউল্লাহর প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসন নিশ্চিত করে। বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট ১১টি সিটি কর্পোরেশন আছে।

খ আধুনিককালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে রাষ্ট্রের বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার কারণে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন এলাকায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন স্থানীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটায়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় তাদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় ও বিকাশ ঘটে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে তারা বৃহত্তর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে জনাব সাজিদউল্লাহর স্থানীয় প্রশাসনের মোট সদস্য হলো ১৩ জন। চেয়ারম্যান ১ জন, ৯ জন সদস্য আর ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য। এসব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে বলা যায়, জনাব সাজিদউল্লাহর প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও আদিম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ দেশের যেকোনো গ্রামবাসী ইউনিয়ন পরিষদের সাথে পরিচিত। পল্লি এলাকার নিরীহ মানুষের খুব কাছের প্রতিষ্ঠান হলো এ ইউনিয়ন পরিষদ। এটি গ্রামীণ জনগণের সুখ-দুঃখের সাথী এবং দুর্দিনের কাণ্ডারি। সাধারণত গড়ে ১০ থেকে ১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে থাকে ৯টি ওয়ার্ড, যেখান থেকে ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য ও ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে মোট ৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। এরা সবাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব সাজিদউল্লাহ ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য।

ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রামীণ জীবনের পথ প্রদর্শক। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এটি পল্লি এলাকার জনগণের খুব কাছের প্রতিষ্ঠান। এটি ইউনিয়নের আওতাধীন এলাকার স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানের দায়িত্বে নিয়োজিত। ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসন নিশ্চিত করে। উদ্দীপকের এ উক্তিটি যথার্থ। কারণ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে জনগণের মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলির বিকাশ ঘটে। ফলে জনগণের মধ্য সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, আত্মসংযম, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। ভোটদানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। ইউনিয়ন পরিষদে সঠিক ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য এবং ভণ্ড ও দালাল প্রকৃতির অপতৎপরতা বন্ধে স্থানীয় জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সার্বিকভাবে ভূমিকা পালন করতে হয়। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চতকরণ, সমস্যার প্রকৃতি নির্বাচন ও সমাধানের পথনির্দেশ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিতকরণ, দেশপ্রেম সৃষ্টি ও অসাম্প্রদায়িকতা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। যা ইউনিয়ন পরিষদের সুশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মোবারক সাহেব গ্রামে বাস করে। তিনি কয়েক বছর আগে একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন। যে পরিষদটি ১৩ জন নির্বাচিত জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। উক্ত পরিষদটির মূল লক্ষ্য হলো স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রাম বা পল্লির জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রধানের পদবি কী? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মোবারক সাহেব যে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন তার গঠন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।' উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রধানের পদবি হলো চেয়ারম্যান।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের মোবারক সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।

১৯৭৬ সালের বাংলাদেশ স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত প্রতি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।ইউনিয়নের প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট ৯ জন সদস্য এবং তিনটি ওয়ার্ডে একজন করে নয়টি ওয়ার্ড থেকে ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্যসহ মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করে। ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ সংস্থাটি ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে। সরকারের নীতি বা কর্মসূচি জনগণকে জানানোও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। ইউনিয়নে কোনো অপরাধ ঘটলে এ প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারকাজও ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

ঘ গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ— উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। জনপ্রতিনিধিরাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। জনপ্রতিনিধিদের তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। কেননা গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্যই হলো জনগণের

https://teachingbd24.com

জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। অপর দিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হলো কোন নির্দিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের জন্য জনগণের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এদিক থেকে গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

লর্ড ব্রাইস বলেছেন, 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হলো গণতন্ত্রের সুতিকাগার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের যথাযথ অনুশীলন হলো গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম রক্ষাকবচ।' স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চার ফলেই নাগরিকগণ বৃহৎ পরিসরে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ পায়। বাংলাদেশে নাগরিকগণ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা করে থাকে।

সুতরাং বলা যায় গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ইফা ও তিশা ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ইফা গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা করে। অপরদিকে মিশার বাবা চাকরিজীবী হওয়ার কারণে বর্তমানে সে শহরে একটি মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। ইফা একটি চিঠিতে তার শহুরে বান্ধবী তিশাকে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলির কথা জানায়। সে তিশাকে লিখে-'গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তিশা ইফার চিঠি থেকে উপলব্ধি করে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফল। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত? ১

খ. প্রশাসনিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইফা তার লিখিত চিঠিতে ইউনিয়ন পরিষদের যে কার্যাবলির কথা উল্লেখ করেছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ইফার চিঠি থেকে তিশার উপলব্ধি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪,৫৫৪টি।

খ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত।

গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। ৯ জন নির্বাচিত সদস্য, ১ জন চেয়ারম্যান ও ৩ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য একজন সরকারি বেতনভুক্ত সচিব নিযুক্ত থাকেন।

গ উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি মূল্যায়ন করা হলো-

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নে যেসব কাজ করে তা নিম্নরূপ:

১. **জনকল্যাণমূলক কাজ:** জনকল্যাণের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাদের তত্ত্বাবধান, খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তা ঘাটে আলোর ব্যবস্থা, গোরস্থান, শ্মশান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কূপ, নলকূপ স্থাপন করে থাকে ইউনিয়ন পরিষদ।

২. **শান্তিরক্ষা-সংক্রান্ত কাজ:** ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

৩. **বিচার-সংক্রান্ত কাজ:** ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে।

৪. **রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ:** ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

৫. **বিনোদনমূলক কাজ:** ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

গ্রামীণ পর্যায়ের নাগরিকগণ ইউনিয়ন পরিষদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে এবং নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করে।

উক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী ইফার চিঠি থেকে তিশার উপলব্ধি "ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফল" ছিল যথাযথ।

আধুনিককালে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বিশাল এবং বিপুল বিধায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে কোনো এলাকার সমস্যা স্থানীয় সরকারই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং সে অনুযায়ী সমাধানের ব্যবস্থাও দ্রুততার সাথে গ্রহণ করত পারে। তাই সরকারের জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফল হিসেবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ধারণার উদ্ভব। এই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ অনুযায়ী বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ জন করে মোট ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে মোট ৩ জন মহিলা সদস্য থাকেন। সমগ্র ইউনিয়ন থেকে ১ জন চেয়রম্যান নিয়ে মোট ১৩ সদস্যের ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এ ইউনিয়ন পরিষদ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় জনগণের কল্যাণে নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর।

উপরোক্ত আলোচনার থেকে এ কথা বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফল। সুতরাং উদ্দীপকে তিশার উপলব্ধি ছিল যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৯ স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে ঐ এলাকায় সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে 'খ' নামক আরেকটি সংস্থা। এ সংস্থার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবী কী? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার দুটি মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে কী ধরনের শাসনকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' সংস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি হলো পৌর মেয়র।

খ বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতি রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি মূলনীতির ব্যাখ্যা হলো—

১. বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

https://teachingbd24.com

২. ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। এখানে জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করা হবে। এ দেশের প্রত্যেক নাগরিক তার নিজস্ব ধর্ম পালন, চর্চা ও প্রচার করতে পারবে।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩০ ফয়সাল মল্লিক একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তাঁর সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হয়? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ফয়সাল মল্লিক কোন ধরনের সংস্থার প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

খ মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যতীত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ হয় সেগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মৌলিক অধিকার ব্যতীত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো মৌলিক অধিকার।

গ উদ্দীপকের ফয়সাল মল্লিক গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের ফয়সাল মল্লিক একটি সংস্থার নির্বাচিত প্রধান। তার সংস্থায় তিনিসহ মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সেক্রেটারি কর্মরত আছেন। ফয়সাল মল্লিকের এ সংস্থাটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনের মিল রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ফয়সাল মল্লিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— বক্তব্যটি সঠিক।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার, নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে। নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে। জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। সর্বোচ্চ পাঁচ (০৫) হাজার টাকা মূল্যের দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৩১ জনাব মেহেরুন নেছা টেকনাফ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা। তার এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনার কারণে তিনি বেশ জনপ্রিয়। তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেন ঐ এলাকার উপজেলা পরিষদ। তারা জনগণের দাবীগুলোকে সরকারের নিকট উপস্থাপন করে থাকে। উভয়ের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হতে পারে। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করে স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. পৌরসভার গঠন বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার কাজ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত শাসন কিভাবে জনগণের উপকার করতে পারে— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর।

খ বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো পৌরসভা।

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সমগ্র পৌর এলাকা থেকে একজন মেয়র, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে একজন কাউন্সিলর এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার কাজ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একজন নির্বাহী কর্মকর্তা থাকেন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি হলো উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি নিম্নরূপ—

১. পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি।
২. পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কার্যসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।
৩. ই-গভর্ন্যান্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
৪. উপজেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
৫. সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৬. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
৭. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান করা।
৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৯. সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।

ঘ উদ্দীপকে স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা পরিষদের কথা বলা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে উপজেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতিমালা, কর্মসূচি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে। বাস্তবিকপক্ষে, উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা স্থানীয় জনগণের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। গ্রামীণ জনগণের অভাব-অভিযোগ ও নানাবিধ সমস্যার সমাধানে উপজেলা প্রশাসন সরাসরিভাবে ভূমিকা রাখে। উপজেলার জরুরি কর্তব্য পালনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একজন সেবক হিসেবে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ও অন্যান্য বিপর্যয়ের মুহূর্তে তিনি ত্রাণ সাহায্য সংক্রান্ত কর্তব্যকর্মে যোগদান করেন এবং খাদ্যসহ মজুদ ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ এবং সেগুলো বণ্টনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

অপরদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের প্রধান বা মৌলিক কাজগুলো হলো— ১. প্রশাসন ও সংস্থাপন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনা, ২. জনশৃঙ্খলা রক্ষা, ৩. জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কিত সেবা প্রদান এবং ৪. স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এ সমস্ত মৌলিক বিষয়াবলির ওপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদও উপজেলা প্রশাসনের ন্যায় সর্বদা জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা পরিষদ উভয়ই জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ▶৩২ জনাব রহমত আলী ও জনাব নুরুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তারা দুজনই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত বছর তারা দলীয় প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দুটি ভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ছোট একটি শহরের জনপ্রতিনিধি হিসেবে রহমত আলী স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। অপরদিকে জনাব নুরুজ্জামানের প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হলো পল্লীর জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করে জনসেবা করা এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করা।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. কোরাম কী? ১

খ. স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব রহমত আলীর প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনাব নুরুজ্জামানের প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যক্রম শুরু করা যায় তাকে কোরাম বলে।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের জনাব রহমত আলীর প্রতিষ্ঠানটি হলো— পৌরসভা। নিম্নে পৌরসভার গঠন প্রণালী আলোচনা করা হলো—

পৌরসভা হচ্ছে শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। প্রতিটি পৌরসভাকে কতগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হয় শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। একজন মেয়র, কয়েকজন কাউন্সিলর ও সরকার কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। প্রতি তিনটি ওয়ার্ড হতে সংরক্ষিত আসনে একজন মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সে হিসেবে পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যা হলো: একজন মেয়র, আঠারো জন কাউন্সিলর, ছয়জন মহিলা কাউন্সিলরসহ মোট ২৫ জন। পৌরসভার মনোনীত মহিলা কাউন্সিলর কোনোক্রমেই নির্বাচিত কাউন্সিলদের মোট সংখ্যার দশভাগের এক অংশের বেশি হবে না। পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরদের কার্যকালের মেয়াদকাল পাঁচ বছর।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত প্রতিষ্ঠান বলতে পল্লি পর্যায়ের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা 'উপজেলা পরিষদ'কে বোঝানো হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ আমাদের দেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন—

১. স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।
২. আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৩. স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
৪. ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা।
৫. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
৬. স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
৭. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করা।
৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।
৯. বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
১০. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।

অতএব, উল্লিখিত বিষয়গুলো থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার সমাধানকল্পে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন ▶৩৩ রফিক গ্রামে বাস করে। সে এ বছর একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। এ পরিষদটি গঠিত হয়েছে একজন নির্বাচিত প্রধান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এ পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৭]

https://teachingbd24.com

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO-এর পূর্ণরূপ হলো— Non Government Organization।

খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর প্রতিনিধিগণ এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা নিজ নিজ এলাকার জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে গড়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় মোট ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে। এ পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত একজন সেক্রেটারি। উদ্দীপকের রফিক যে স্থানীয় পরিষদে ভোট দিয়েছে, তা উপরোল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্য বহন করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে। নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে। জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। সর্বোচ্চ পাঁচ (০৫) হাজার টাকা মূল্যের দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে। সার্বিকভাবে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ নাসিম গ্রামে বাস করে। সে এ বছর একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। এ পরিষদটি গঠিত হয়েছে একজন নির্বাচিত প্রধান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এ পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

[বালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ৩
ঘ. স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO-এর পূর্ণরূপ হলো Non-Government Organization।

খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর প্রতিনিধিগণ এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা নিজ নিজ এলাকার জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে গ্রামকেন্দ্রিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নে অবস্থিত। গ্রামীণ জনগণের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন নির্বাচত মহিলা সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাসিম গ্রামে বাস করে। সে এ বছর একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য নিয়ে। এ থেকে বোঝা যায় উদ্দীপকের পরিষদটি ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশ করে। কারণ ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এর মোট সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। তাই বলা যায় উদ্দীপকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধি তৈরি করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাপক কাজ পরিচালনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ও

https://teachingbd24.com

রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে। তাছাড়া সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নিবন্ধীকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিত করণেও ভূমিকা রাখে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ আশরাফের মামা গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে তিনি ও আরো দু'জন ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রামীণ উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। এজন্য প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ওয়ার্ড সভা কী? ১

খ. ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনগণ কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের আশরাফের মামা যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান তার গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. গ্রামীণ উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের অধীনস্ত ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন মেম্বার এর সভাপতিত্বে গঠিত সভাকে ওয়ার্ড সভা বলা হয়।

খ ইউনিয়ন পরিষদ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণ অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন গড়ে নিজেদের সুসংগঠিত করে তুলতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা সমাধানকল্পে ইউনিয়ন পরিষদে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

সাধারণ জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন- রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ, কুটির শিল্প, গ্রামীণ শিল্প এবং দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করতে পারে। এছাড়া সাধারণ জনগণ স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় নেতৃত্ব দ্বারা স্বশাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকের আশরাফের মামা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। নিচে উপজেলা পরিষদের গঠন তুলে ধরা হলো—

১. উপজেলার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান, একজন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।

২. উপজেলার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সদস্য হবেন।

৩. উপজেলার অন্তর্গত পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র বা দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র সদস্য হবেন।

৪. উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলর কর্তৃক নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ এর সদস্য হবেন।

এছাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে কাজ করবেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। উপজেলা পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

ঘ গ্রামীন উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম। নিচে গ্রামীণ উন্নয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা তুলে ধরা হলো-

১. স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

২. আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণা-বেক্ষন করা।

৩. স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৪. ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা।

৫. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬. স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

৭. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার প্রচার নিশ্চিত করা।

৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।

৯. বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

১০. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারী উপজেলা পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ করিম বাংলাদেশের একটি গ্রামে বাস করে। একটি স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে সে ভোট প্রদান করেছে। এ পরিষদটি একজন চেয়ারম্যান, নয়জন সদস্য এবং তিনজন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এরা সকলেই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। *[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন স্থানীয় পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তুমি কী মনে কর উক্ত সংস্থা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে? যুক্তি দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলা হয়।

খ যখন ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ, গুণ বা উপযুক্ততা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখন তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। বাংলাদেশে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি মেনে চলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরের প্রশাসন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়নের ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, প্রতি ওয়ার্ড হতে একজন করে মোট ৯ জন সদস্য এবং তিনটি ওয়ার্ডে একজন করে নয়টি ওয়ার্ড থেকে ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্যসহ মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, করিম গ্রামে বাস করে এবং একটি স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। এ পরিষদ ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন পুরুষ এবং ৩ জন নারী সদস্য নিয়ে গঠিত এবং তারা সবাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এ পরিষদ গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। এ থেকে বুঝা যায় উদ্দীপকের স্থানীয় পরিষদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।
ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে। নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে। কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে এবং মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে পুকুর এবং দীঘিতে জনসাধারণের ময়লা আবর্জনা ফেলা, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। পানি সরবরাহের জন্য কূপ, নলকূপ, পুকুর ও দীঘি খনন এবং সংরক্ষণ করে। শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষতা দূরীকরনের জন্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন করে।
উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষ করে পল্লি এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৩৭ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জনাব জামিল সাহেব নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পূর্বে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি করেছিলেন জনগণের নিকট। কিন্তু বিজয়ী হওয়ার পর তিনি তার অঙ্গীকার পূরণের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছেন। জনগণের যে মূল্যবান ভোটের কারণে তিনি ক্ষমতা পেলেন তাদের কথা ভুলে গিয়ে তিনি কেবল নিজের স্বার্থ আদায়ে গুরুত্ব প্রদান করলেন। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ইউনিয়ন পরিষদ কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১
খ. স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২
গ. জনাব জামিল সাহেবের বিজয়লাভে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব জামিল সাহেবের দায়িত্বহীনতা স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনিয়ন পরিষদ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। স্থানীয় শাসন ও স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা। আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাচিত কর্মকর্তাদের লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

গ ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিকগণ ভোট প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে অংশগ্রহণ করে। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়রাম্যান জামিল সাহেবকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে জয়ী করে অংশগ্রহণ করেছে। জনাব জামিল সাহেব চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন জনসম্মুখে। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তিনি অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়ে নিজ স্বার্থ আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠেন।
উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যান জামিল সাহেব নাগরিকদেরকে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের মন জয় করেছিলেন এবং তাদের ভোট আদায় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি জনস্বার্থকে উপেক্ষা করেন। জামিল সাহেব পাঁচ বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। পাঁচ বছর পরে তাকে যে পুনরায় ভোটের জন্য নাগরিকদের কাছে যেতে হবে এ বিষয়টি তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। যে নাগরিকরা তাকে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান বানিয়েছেন পরবর্তী নির্বাচনে তারাই তাকে ভোট না দিয়ে পরাজিত করবেন।
সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জামিল সাহেবকে ভোট দেয়ার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণ তার জয় লাভে অংশগ্রহণ করলেও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি।

ঘ জামিল সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তার দ্বারা স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকে একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং স্থানীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। এ ধরনের ব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকাই মুখ্য। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলো যদি তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করে তবে স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান করা সম্ভব হয়। ফলে স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এতে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ হ্রাস পায়। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকশিত হয় এবং স্থানীয় লোকজনের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনা বৃদ্ধি পায়। গ্রাম বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ব-শাসন বা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গণসচেতনতার বিকাশ ঘটে। সর্বোপরি গণতন্ত্র চর্চার পথ সুগম হয়।
কিন্তু উদ্দীপকের জামিল সাহেবের দায়িত্বহীনতা গণতন্ত্র চর্চার পরিবর্তে বরং স্বৈরতন্ত্রকে উস্কে দিবে। ফলে স্থানীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে। উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, জনাব জামিল সাহেবের দায়িত্বশীলতা স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে না।

Teachingbd24.com

ষষ্ঠ অধ্যায়: স্থানীয় শাসন

★★ বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন কাঠামো

১. স্থানীয় শাসন কাঠামোর সর্বশেষ স্তর কী? [জ্ঞান]
ক বিভাগীয় প্রশাসন খ জেলা প্রশাসন
গ থানা প্রশাসন ঘ উপজেলা প্রশাসন **ঘ**

২. 'স্থানীয় সরকার বলতে আমরা বুঝি যে, সরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় অবস্থান করে এবং কিছু অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে' উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক জন ক্লার্ক
খ হেনরি মেডিক
গ জি. ডি. এইচ কোল
ঘ ডব্লিউ. সি. রবসন **গ**

৩. কোন সরকারের নির্দেশে স্থানীয় সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে? *[দি. বো. '১৫]*
ক কেন্দ্রীয় সরকার খ জেলা প্রশাসন
গ উপজেলা প্রশাসন ঘ জাতীয় সংসদ **ক**

৪. গ্রাম ও শহর অঞ্চলের স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের শাসনকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক স্বায়ত্তশাসন ক স্থানীয় শাসন
গ স্ব-শাসন ঘ সামরিক শাসন **খ**

৫. 'যদি কোনো স্থানীয় সংস্থা অন্যান্য সংস্থা হতে ভিন্নভাবে শাসন পরিচালনা করার ক্ষমতা ভোগ করে তাহলে সেই শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলে।'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ই এম হোয়াইট খ ই এল হ্যালজাক
গ এ ভি ডাইসি ঘ লর্ড ব্রাইস **খ**

৬. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় কীসের মাধ্যমে? [অনুধাবন]
ক ধর্ম খ প্রথা
গ আইন ঘ সম্পদ **গ**

৭. ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা কত ছিল? [জ্ঞান]
ক ২২টি খ ২৪টি
গ ২৬টি ঘ ২৮টি **ক**

৮. স্থানীয় সরকার কীসের অংশ? [জ্ঞান]
ক জনগণের অংশ খ বিদেশি সংস্থার অংশ
গ জাতীয় সরকারের অংশ
ঘ বিদেশি রাষ্ট্রের অংশ **গ**

★ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব

৯. 'আইনসংগত উপায়ে গঠিত নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে কোথায়? [জ্ঞান]
ক বাংলাদেশ সংবিধানে
খ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশন রিপোর্টে
গ লোকাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারলিতে
ঘ সামাজিক বিজ্ঞান কোষে **ক**

১০. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কী? [জ্ঞান]
ক জনপ্রতিনিধিদের শাসন
খ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন
গ স্থানীয় সরকারের শাসন
ঘ সরকারি কর্মকর্তাদের শাসন **ক**

১১. বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি? *[ঢ. বো. '১৬, '১৫; চ. বো. '১৬]*
ক গ্রাম পরিষদ খ ইউনিয়ন পরিষদ
গ উপজেলা পরিষদ ঘ জেলা পরিষদ **খ**

১২. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারী হলেন— *[য. বো. '১৫]*
ক বেসরকারি খ সরকারি
গ স্বায়ত্তশাসিত ঘ আধা-সরকারি **গ**

১৩. স্থানীয় শাসন কাঠামোর সর্বশেষ স্তর কী? *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক জেলা প্রশাসন খ ইউনিয়ন
গ উপজেলা ঘ পৌরসভা **গ**

১৪. স্থানীয় সমস্যাগুলো কাদের দ্বারা সমাধান হওয়া উচিত? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা
খ র‍্যাবের মাধ্যমে
গ স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে
ঘ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে **গ**

১৫. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় কাদের ভূমিকা গৌণ? [জ্ঞান]
ক নির্বাচনি প্রতিনিধিদের
খ স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের
গ সরকারি কর্মকর্তাদের
ঘ প্রাদেশিক সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের **গ**

১৬. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে জনগণ কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়? [জ্ঞান]
ক বেসরকারি কার্যক্রম
খ সরকারি কার্যক্রম
গ ব্যক্তিগত কার্যক্রম
ঘ প্রভাবশালীদের কার্যক্রম **খ**

১৭. কোন সরকারকে গণতন্ত্রের মাতৃসদন বলা হয়? [জ্ঞান]
ক স্বৈরশাসন সরকার
খ এককেন্দ্রীক সরকার
গ স্থানীয় সায়ত্তশাসিত সরকার
ঘ রাজতান্ত্রিক সরকার **গ**

১৮. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, কেননা- *[ব. বো. '১৫]*
i. জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়
ii. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়
iii. রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

১৯. ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ বা কার্যকাল কত বছর? [জ্ঞান]
ক ৩ বছর খ ৪ বছর
গ ৫ বছর ঘ ৬ বছর **গ**

২০. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ১০ জন খ ১২ জন
গ ১৩ জন ঘ ১৬ জন **গ**

Teachingbd.com

২১. ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংখ্যা কতজন? [জ্ঞান]
ক ২ জন　খ ৩ জন
গ ৫ জন　ঘ ৭ জন　**খ**

২২. ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনটি? *[দি. বো. '১৫, '১৬; রা. বো. '১৫]*
ক গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করা
খ শহরের শ্রীবৃদ্ধি করা
গ গ্রামের শিক্ষার হার বাড়ানো
ঘ শহরের শিক্ষার হার বাড়ানো　**ক**

২৩. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল কত বছর? [জ্ঞান]
ক ৪　খ ৫
গ ৬　ঘ ৭　**খ**

২৪. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কীভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
ক জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
খ গণভোটে
গ সদস্যদের দ্বারা　ঘ জেলা প্রশাসকের দ্বারা　**ক**

২৫. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ জারি করা হয় কত সালে? [প্রয়োগ]
ক ১৯৮১ সালে　খ ১৯৮২ সালে
গ ১৯৮৩ সালে　ঘ ১৯৮৪ সালে　**গ**

২৬. দিগন্ত মল্লিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করার জন্যে প্রচারণা চালাচ্ছে। তার এই পদে বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন হয়েছিল কত সালে? [প্রয়োগ]
ক ১৯৭৫ সালে　খ ১৯৭৬ সালে
গ ১৯৭৭ সালে　ঘ ১৯৮০ সালে　**গ**

২৭. কত সালের পর থেকে ৩ জন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
ক ১৯৭৬　খ ১৯৮৩
গ ১৯৯১　ঘ ১৯৯৭　**ঘ**

২৮. ব্যয় নির্বাহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কর আরোপ করতে পারে — *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
i. ঘর বাড়ির মূল্য ও জমির আয়ের ওপর
ii. যানবাহনের ওপর
iii. হাটবাজার ও জনমহলের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　খ i ও iii
গ ii ও iii　ঘ i, ii ও iii　**খ**

নিচের উদ্দীপক হতে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রহিমা পারিবারিক কলহের কারণে বাবার বাড়ি চলে যায়। রহিমার স্বামী বিষয়টি মীমাংসা করতে না পেরে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবের দ্বারস্থ হয়। চেয়ারম্যান সাহেব উভয় পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টি মীমাংসা করেন। *[কু. বো. '১৬; রা. বো. '১৫; দি. বো. '১৫]*

২৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির মীমাংসা করা চেয়ারম্যান সাহেবের কোন ধরনের কাজ?
ক উন্নয়নমূলক　খ সেবামূলক
গ বিচার সালিশমূলক
ঘ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষামূলক　**গ**

৩০. চেয়ারম্যান সাহেবের এরূপ উদ্যোগ-
ক সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করবে
খ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে
গ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে
ঘ নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে　**ক**

★ পৌরসভার গঠন ও কার্যাবলি

৩১. পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি কী? [জ্ঞান]
ক চেয়ারম্যান　খ কমিশনার
গ পৌর মেয়র　ঘ কাউন্সিলর　**গ**

৩২. পৌরসভার সূচনা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৮৪০ সালে　খ ১৮৪২ সালে
গ ১৮৫৭ সালে　ঘ ১৮৭১ সালে　**গ**

৩৩. বাংলাদেশে বর্তমানে পৌরসভার সংখ্যা প্রায় কত? [জ্ঞান]
ক ৩০০টি　খ ৩০৯টি
গ ৩১২টি　ঘ ৩১৯টি　**ঘ**

৩৪. পৌরসভার জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নিচের কোনটি? *[চ. বো. '১৫; ব. বো. '১৫]*
ক জাদুঘর স্থাপন　খ মশক নিধন
গ বৃক্ষ রোপণ　ঘ ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ　**খ**

৩৫. পৌরসভা কোন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত? *[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
ক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
খ স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
গ পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ঘ পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়　**খ**

৩৬. পৌরসভার প্রধান কাজ কোনটি? [অনুধাবন]
ক জনকল্যাণমূলক　খ আইন প্রণয়ন
গ ন্যায়বিচার　ঘ প্রশাসনিক　**ক**

৩৭. পৌরসভার বিচার কমিটি কত সদস্য নিয়ে গঠিত? [জ্ঞান]
ক তিন জন　খ চার জন
গ পাঁচ জন　ঘ ছয় জন　**গ**

৩৮. বাংলাদেশে শহর এলাকায় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কী ধরনের কার্যাবলি পৌরসভার উদ্যোগে গৃহীত হয়? [অনুধাবন]
ক বন্যা প্রতিরোধ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, ভেজাল খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি
খ মহামারী হতে জীবন রক্ষা, শ্মশান নির্মাণ, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি
গ অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা, সংক্রামক রোগের টিকা দান ইত্যাদি
ঘ ডাস্টবিন ও ড্রেন নির্মাণ, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি　**ঘ**

৩৯. কত সালের আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের মেয়র প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন? [অনুধাবন]
ক ১৯৮০ সালের　খ ১৯৯৩ সালের
গ ১৯৯৮ সালের　ঘ ২০০০ সালের　**খ**

৪০. পৌরসভার মনোনীত মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত কাউন্সিলরদের কত অংশ হবে? [জ্ঞান]
ক দশ ভাগের এক অংশ
খ দশ ভাগের দুই অংশ
গ দশ ভাগের তিন অংশ
ঘ দশ ভাগের চার অংশ　**ক**

Teachingbd.com

৪১. আইনসংগত কারণ ব্যতীত পর পর পৌরসভার কয়টি কার্য-বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে মেয়র বা কাউন্সিলরকে পদচ্যুত করা যাবে? [জ্ঞান]

ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **খ**

৪২. পৌরসভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়— [অনুধাবন]

i. আয়তনের ভিত্তিতে
ii. অবস্থানের ভিত্তিতে
iii. লোকসংখ্যার ভিত্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

করিম সাহেব রূপকানিয়া ইউনিয়নের জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তিনি সকল শ্রেণি পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে এলাকার আয়ের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, বিচার সালিশ সম্পাদনসহ নানান উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তার প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনায় জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে। *[চ. বো. '১৫]*

৪৩. উদ্দীপকে করিম সাহেব যে পদের অধিকারী—

ক মেয়র খ কাউন্সিলর
গ হেডম্যান ঘ সদস্য **ঘ**

৪৪. করিম সাহেবের এরকম ভূমিকার ফলে এলাকায় দায়িত্বশীল নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক হবে—

i. বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে
ii. রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতে হবে
iii. স্থানীয় শাসনকার্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ উপজেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

৪৫. নিচের কোন সংস্থায় মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ রয়েছে? *[ব. বো. '১৫]*

ক উপজেলা পরিষদ খ ইউনিয়ন পরিষদ
গ পৌরসভা ঘ সিটি কর্পোরেশন **ক**

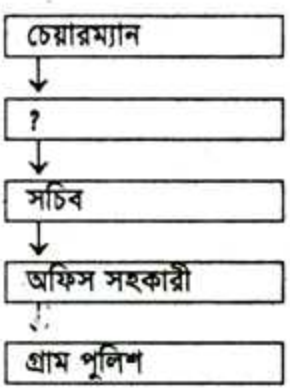

৪৬. প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানের প্রতিনিধির সদস্য সংখ্যা কতজন? *[য. বো. '১৫]*

ক ৯ খ ১২
গ ১৫ ঘ ১৮ **খ**

৪৭. উপজেলা পরিষদে জনগণের ভোটে কত জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন? [জ্ঞান]

ক ১ জন খ ২ জন
গ ৩ জন ঘ ৪ জন **খ**

৪৮. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কীভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]

ক জনগণের ভোটে
খ জনগণের পরোক্ষ ভোটে
গ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
ঘ সরকারের মনোনয়নের মাধ্যমে **গ**

৪৯. কত সালে থানাকে উপজেলা নামকরণ করা হয়? [জ্ঞান]

ক ১৯৮২ খ ১৯৮৩
গ ১৯৮৫ ঘ ১৯৮৬ **খ**

৫০. প্রশাসনিক দিক থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মর্যাদা কার সমতুল্য? [অনুধাবন]

ক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
খ জেলা প্রশাসক
গ সহকারী কাউন্সিলর
ঘ বিভাগীয় কাউন্সিলর **ক**

৫১. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা নারী সদস্যগণকে ন্যূনতম কতটি সভায় উপস্থিত থাকতে হবে? [জ্ঞান]

ক ৮টি খ ৯টি
গ ১০টি ঘ ১১টি **খ**

★ সিটি কর্পোরেশনের গঠন ও কার্যাবলি

৫২. বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের শহরকেন্দ্রিক সংগঠন কোনটি?

ক সিটি কর্পোরেশন খ জেলা পরিষদ
গ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঘ উপজেলা পরিষদ **ক**

৫৩. 'ক' একটি সংস্থার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। আইন দ্বারা অযোগ্য নন এমন ব্যক্তিরা এ সংস্থার মেয়র ও কাউন্সিলর হতে পারবেন। এ সংস্থার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? *[দি. বো. '১৫; রা. বো. '১৫]*

ক ইউনিয়ন পরিষদ খ পৌরসভা
গ থানা পরিষদ ঘ সিটি কর্পোরেশন **ঘ**

৫৪. বাংলাদেশে কতটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক ১০টি খ ১১টি
গ ১২টি ঘ ১৪টি **খ**

৫৫. সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রধানের পদবি কী? [জ্ঞান]

ক চেয়ারম্যান খ কমিশনার
গ সিটি মেয়র ঘ কাউন্সিলর **গ**

Teachingbd.com

৫৬. সিলেট একটি সিটি কর্পোরেশন। এ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেয়র। সিটি কর্পোরেশন হিসেবে সিলেট কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? [প্রয়োগ]
ক আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান
খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
গ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ঘ জাতীয় প্রতিষ্ঠান **খ**

৫৭. বিদ্যুৎ বোর্ড, ওয়াসা ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সহায়তা লাভ করে থাকে নিচের কোনটি? [অনুধাবন]
ক সিটি কর্পোরেশন খ পৌরসভা
গ ইউনিয়ন পরিষদ ঘ জেলা পরিষদ **ক**

৫৮. মেয়র ও কাউন্সিলরগণ কয় বছরের জন্যে নির্বাচিত হন? [জ্ঞান]
ক ৩ বছর খ ৪ বছর
গ ৫ বছর ঘ ৬ বছর **গ**

৫৯. সিটি কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]
i. জনস্বাস্থ্য রক্ষায়
ii. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়
iii. স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

৬০. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? *[চ. বো. '১৫]*
ক ১৯৯৬ খ ১৯৯৭
গ ১৯৯৮ ঘ ১৯৯৯ **খ**

৬১. পার্বত্য এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কত সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৯৫ সালের ২ ডিসেম্বর
খ ১৯৯৬ সালের ২ ডিসেম্বর
গ ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর
ঘ ১৯৯৮ সালের ২ ডিসেম্বর **গ**

৬২. ১৯৫১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ ছিল অ-উপজাতীয়? [জ্ঞান]
ক ৮ ভাগ খ ৯ ভাগ
গ ১০ ভাগ ঘ ১১ ভাগ **খ**

৬৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর দপ্তর কোথায় ছিল? [জ্ঞান]
ক রাঙামাটি খ বান্দরবান
গ চন্দ্রঘোনা ঘ খাগড়াছড়ি **গ**

৬৪. কত সালের আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে 'Excluded Area' হিসেবে ঘোষণা করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৩৫ সালের খ ১৯৪৭ সালের
গ ১৯১৯ সালের ঘ ১৯২৩ সালের **ক**

৬৫. ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে কয়টি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ সংক্রান্ত আইন পাস হয়? [জ্ঞান]
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি **গ**

★ বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা

৬৬. এনজিও'র উপার্জিত আয় কোন কাজে ব্যয় হয়? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তিগত কাজে
খ আত্মীয়-স্বজনের কাজে
গ জনকল্যাণমূলক কাজে
ঘ সরকারি কোষাগারে **গ**

৬৭. কোনটি বাংলাদেশি এনজিও? [জ্ঞান]
ক কেয়ার খ অক্সফাম
গ আশা ঘ হিউমেন রাইটস ওয়াচ **গ**

৬৮. সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন কতটি এনজিও রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৫২ হাজার খ ৫৪ হাজার
গ ৫৬ হাজার ঘ ৫৮ হাজার **গ**

৬৯. দেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে কোনটি প্রথম স্থানে রয়েছে? [জ্ঞান]
ক গ্রামীণ ব্যাংক খ ব্র্যাক
গ কেয়ার ঘ আশা **ক**

৭০. মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছে কতটি এনজিও? [জ্ঞান]
ক ৬৪টি খ ৬৫টি
গ ৬৬টি ঘ ৬৭টি **খ**

৭১. দুর্যোগের সময় ব্র্যাক কোনটির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলে? [জ্ঞান]
ক আইআরএস খ সিআইআর
গ আইএসএস ঘ আইসি আরই এসএস **ঘ**

৭২. বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হলো— [অনুধাবন]
i. ডানিডা
ii. কেয়ার iii. সুইস এইড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপক হতে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সেলিনা একটি সংস্থায় চাকরি করে। যা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংস্থাটি সরকারি নয়। *[চ. বো. '১৫]*

৭৩. উদ্দীপকের সেলিনা কোন ধরনের সংস্থায় চাকরি করে?
ক ইউনিয়ন পরিষদ খ পৌরসভা
গ উপজেলা পরিষদ ঘ এনজিও **ঘ**

৭৪. উক্ত সংস্থাটি ভূমিকা রাখে—
i. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়
ii. নারীর ক্ষমতায়নে
iii. আইন-শৃংখলা রক্ষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৭: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

প্রশ্ন ▶১ বিধান সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, মেধাবী ও দক্ষ লোক বাছাইয়ের কাজ করে।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভরশীল— বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন হলো ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়া।

খ সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটদানের অধিকারকে বোঝায়।

ভোটদানের অধিকার নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্রের সংবিধান এবং সরকারি বিধিবিধানের মাধ্যমে স্বীকৃত পন্থায় নাগরিকদের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষমতাকে ভোটাধিকার বলা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সাদৃশ্য আছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কাজের জন্য মেধাবী ও যোগ্য নাগরিকদের বাছাইয়ের কাজ করে। এজন্য সংস্থাটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কর্মকমিশন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সার্ভিস বা পদে নিয়োগকৃতদের পদোন্নতি এবং বদলি সংক্রান্ত বিষয়েও নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিধান সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, মেধাবী ও দক্ষ লোক বাছাইয়ের কাজ করে। বাংলাদেশে এরূপ কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের ভূমিকার উপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার কাঠামোয় মেধাবী ও দক্ষ কর্মকতা-কর্মচারীর গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রে মেধার ভিত্তিতে কর্মকর্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। মেধা যাচাইয়ের ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক বাছাইয়ের জন্য একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের এমন একটি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মকমশিন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানে কর্মকমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে বিধানাবলি সন্নিবেশিত আছে। এ বিধানাবলি অনুসারে কমিশন প্রজাতন্ত্রের কাজে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, ডাক্তারি পরীক্ষা, পুলিশি তদন্ত প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে। সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে তারা প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাছাই করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। কর্মকমিশন যেহেতু নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়, তাই প্রকৃত মেধাবীরাই নিয়োগ পেয়ে থাকেন। আর সৎ, যোগ্য ও মেধাবীদের নিয়ে গড়ে ওঠা প্রশাসন সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং এর সার্বিক উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের ভূমিকা অনেক।

প্রশ্ন ▶২ মি: 'Y' একজন সিনিয়র আইনজীবী। তিনি যে কোনো আদালতে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। সরকারের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত দেন। তার কর্মকান্ডের ওপর সরকারের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। তবে অসদাচরণের কারণে তাকে অপসারণ করা যায়।

[চা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক কে? ১
খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ?' ২
গ. মি: 'Y' কোন ধরনের সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন? তার ক্ষমতা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মি: 'Y'-এর ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক হলো— জাতীয় সংসদ।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, অ্যাটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ মিঃ 'Y' অ্যাটর্নি জেনারেল নামক সাংবিধানিক পদটিতে অধিষ্ঠিত আছেন।

বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী একজন অ্যাটর্নি জেনারেল আছেন। তিনি সরকারের প্রধান আইন সংক্রান্ত উপদেষ্টা। তিনি পদাধিকার বলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের সকল বারের নেতা। মিঃ 'Y'-এর মধ্য দিয়ে মূলত এই পদটিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

মিঃ 'Y' একজন সিনিয়র আইনজীবী। তিনি যে কোনো আদালতে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। সরকারের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে তিনিই মতামত প্রদান করেন। তার কর্মকান্ডের ওপর সরকারের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদটির ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। কোনো ব্যক্তির অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার জন্য কমপক্ষে ১০ বছর পর্যন্ত এডভোকেট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। অ্যাটর্নি জেনারেল দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারেন। সরকার যেসব আইন

https://teachingbd24.com

সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ চাইবেন, তিনি সেসব বিষয়ে সরকারের পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে সরকারের পক্ষে ওকালতি করবেন। যেসব মামলায় সরকার জড়িত সেগুলোতে তিনি সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করবেন। মামলা পরিচালনাকালে তিনি জনস্বার্থ এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যুক্তি উপস্থাপন করবেন। কারণ তার কথা ও কাজের ওপরই সরকারের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশ দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে হাইকোর্ট অ্যাটর্নি জেনারেলকে নোটিশ প্রদান করবেন। হাইকোর্ট তার মতামতের ওপর ভিত্তি করে আদেশ প্রদান করবেন।

ঘ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মি. 'Y' অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনারেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

আমরা জানি, অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক পদ। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান সরকারি আইন কর্মকর্তা। বাংলাদেশের সকল আদালতে মামলা পরিচালনার ক্ষমতা তার রয়েছে। এ কারণে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

বস্তুত অ্যাটর্নি জেনারেলের পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য খুব বেশি। কেননা তিনি আদালতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে সরকারের পক্ষে ওকালতি করেন। তাছাড়া সরকারের আইন উপদেষ্টা হিসেবে দেশের সকল আদালতে তাকে মামলা পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংবিধান অনুসারে অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের প্রধান আইন পরামর্শক। তিনি তার এ ক্ষমতা বলে বিচার কাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাছাড়া তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে জটিল আইন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে আইনের জটিলতাগুলো নিরপেক্ষ ও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করে বিচার কাজে সহায়তা করতে পারেন। তিনি যে সকল মামলায় সরকার জড়িত সে সকল মামলায় সরকারের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করেন। মামলা পরিচালনাকালে তিনি জনস্বার্থ এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যুক্তি উপস্থাপন করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল তার এ সকল কর্মকাণ্ড সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালনা করলে তা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তিনি দেশের সকল আদালতে আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত। তিনি যদি তার এই ক্ষমতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়ে যায়। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অ্যাটর্নি জেনারেলের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৩ বিপ্লব বড়ুয়া গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তাঁর পদে বহাল থাকবেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের মর্যাদা ভোগ করেন। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বিপ্লব বড়ুয়ার পদের সাথে বাংলাদেশের কোনো সাংবিধানিক পদের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদের সঠিক দায়িত্ব পালন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন এমন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম, কর্ণধার এবং অগ্রপথিক হচ্ছে বিচার বিভাগ। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীন বিচার বিভাগ অপরিহার্য। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বাধীন বিচার বিভাগ ছাড়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

গ হ্যাঁ, বিপ্লব বড়ুয়ার পদের সাথে বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক পদ অ্যাটর্নি জেনারেলের পদের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন বিষয়ক কর্মকর্তা হলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। সংবিধানের ৬৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। রাষ্ট্র ও সরকারের স্বার্থরক্ষার্থে অ্যাটর্নি জেনারেল দেশের যেকোনো আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারেন। তাছাড়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকেন এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করেন।

উদ্দীপকের বিপ্লব বড়ুয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, বিপ্লব বড়ুয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত তার পদে বহাল থাকেন এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের ন্যায় মর্যাদা ভোগ করেন। তার এসব কর্মকাণ্ড মূলত অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা, কার্যাবলি ও পদমর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের বিপ্লব বড়ুয়ার পদের সাথে সাংবিধানিক পদ অ্যাটর্নি জেনারেলের মিল রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪ মি. আমিন বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ পদে কর্মরত। প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে যোগ্য নাগরিকদের নিয়োগের সার্বিক কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। তাঁর বন্ধু মি. আতিক তার পুত্রের জন্য একটি চাকরির সুপারিশ করেন। মি. আমিন তাঁর বন্ধুকে জানিয়ে দেন তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সততার সাথে উপযুক্ত ও দক্ষ লোকের নিয়োগ প্রদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের কাজ। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; য.বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কী? ২

গ. মি. আমিন কোন প্রতিষ্ঠানে ও কোন পদে কর্মরত? উক্ত প্রতিষ্ঠানের গঠন ও উক্ত পদের পদমর্যাদা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০।

খ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।

বাংলাদেশের সংবিধানে ১১৭ নং অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে। এটি একটি স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা, যা সুপ্রিম কোর্টের অধীনে নয়। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ও প্রকৃতি, ট্রাইব্যুনালের সদস্যসংখ্যা, সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতি ও কর্মের শর্তাবলি সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

https://teachingbd24.com

গ মি. আমিন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতির পদে কর্মরত।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় সুদক্ষ সরকারি কর্মকর্তা সংগ্রহ ও নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে। উদ্দীপকে এ প্রতিষ্ঠানটিরই ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

মি. আমিন প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে যোগ্য নাগরিকদের নিয়োগের সার্বিক কাজ করে থাকেন। তার প্রতিষ্ঠানটি নিরপেক্ষভাবে সততার সাথে উপযুক্ত ও দক্ষ লোক নিয়োগ করে। আমরা জানি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনই এ কাজ করে থাকে। একজন সভাপতি এবং কয়েকজন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন গঠিত। রাষ্ট্রপতির ৫৭ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য সংখ্যা সভাপতিসহ অন্যূন ৬ জন এবং অনুর্ধ্ব ১৫ জন নির্ধারিত হয়। বর্তমানে কর্মকমিশনে একজন সভাপতি ও ১২ জন সদস্য রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নিজস্ব কাজ করে। এর ওপর দেশের জনগণের আস্থা বিদ্যমান। কমিশনের সদস্যগণ চাকরি প্রার্থীর যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে বিচার করে সে অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করেন। এর সভাপতি ও সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। তারা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমান মর্যাদার অধিকারী। এ আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় মি. আমিন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি হিসেবে কর্মরত।

ঘ উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান তথা বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সকল কার্যক্রম উদ্দীপকে বর্ণিত হয় নি।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে যোগ্য নাগরিকদের নিয়োগের সার্বিক কাজ করে থাকে। এই কাজটির কথাই উদ্দীপকে বলা হয়েছে। অথচ এ কাজটি ছাড়াও বাংলাদেশ কর্মকমিশন বহুবিধ কাজ করে।

বিভন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান, আইনের দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন দায়িত্বপালন, সরকারি কর্ম কমিশনের ওপর ন্যস্ত। এ কমিশন প্রতিবছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্ববর্তী ৩১-এ ডিসেম্বরে সমাপ্ত ১ বছরের স্বীয় কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে, রিপোর্টের সাথে কমিশন একটি স্মারকলিপি পেশ করে। কোনো ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো পরামর্শ গৃহীত না হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে তার কারণ স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ থাকে। কর্মকমিশন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সার্ভিস বা পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা ও পদ্ধতি, পদোন্নতি এবং বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান করে। ক্যাডার সার্ভিস বা কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোও কর্মকমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন প্রভূত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। এই ক্ষমতাবলে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মে নিয়োগসংক্রান্ত সকল কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব মিলন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'-এর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি পেশাগত জীবনে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেন। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে সরকারি কর্মকমিশন যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মিলনের বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠানটি মামলা দায়ের করেছে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে কতটুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করতে পারে সেসব প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

খ সরকারি কর্মকমিশন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে।

কর্মকমিশন সরকারি কাজে জনবল নিয়োগের জন্য উপযুক্ত লোকদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করে। কর্মকমিশন যোগ্য প্রার্থীর কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করে প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে যোগ্য চাকরিপ্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মিলনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি দমনে বহুবিধ কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, জনাব মিলন অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা দুর্নীতি দমনে উপর্যুক্ত কার্যাবলিসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশনই পরিচালনা করে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪' এর তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করে। অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে এই আইনের অধীনে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য ব্যক্তির দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করে। দুর্নীতি বিষয়ে আইনদ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করে। এ কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ সুপারিশ পেশ করে। এ কমিশনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি হলো— দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা; কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে অনেকাংশে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, জনাব মিলনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। এখানে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো দুর্নীতি দমন কমিশন। এ প্রতিষ্ঠানের তৎপরতার কারণেই দুর্নীতির বিচার হয়েছে। এ কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

Teachingbd24.com

দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতির বেড়াজাল থেকে দেশকে রক্ষা করা। এ কমিশনের গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দুর্নীতি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনানুযায়ী সাক্ষী তলব করা, অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তকে জেরা করা, বেসরকারি দলিলপত্র উপস্থাপন করা এবং গ্রেফাতারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪-এ বলা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা প্রধান দুর্নীতি দমন কমিশনার যেকোনো স্থানে তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন। এর ফলে যে কোনো ব্যক্তিই দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় পায় এবং দুর্নীতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ২০০৪-এর আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তার অধস্তন যেকোনো অফিসার দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা এ আইনের বলে কমিশন দুর্নীতিগ্রস্তদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে অন্যরাও দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে শাস্তির ভয় পাবে এবং নিজেকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দুর্নীতি দমন কমিশন তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ কারণেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পদক্ষেপসমূহ দেশের দুর্নীতি হ্রাসে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৬ মিরার বাবা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার এ প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মে নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, বদলি ও প্রেষণে নিয়োগ সংক্রান্ত কাজও করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ইভটিজিং কাকে বলে? ১

খ. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কীভাবে দুর্নীতি রোধ করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল আছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকাশ্যে পুরুষ দ্বারা নারীকে উত্ত্যক্ত এবং নির্যাতন করাকে ইভটিজিং বলে।

খ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করে।

দুর্নীতি দমনে গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। গণমাধ্যম দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণা, সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র ইত্যাদি প্রচার করে জনগণের মধ্যে দুর্নীতির বিরূপ প্রভাব উপস্থাপন করে দুর্নীতির প্রতিকার করে। আর এসব সম্ভব হয় তখনই যখন গণমাধ্যম স্বাধীনতা ভোগ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মিল রয়েছে।

আমরা জানি, সাংবিধানিক বিধিবিধানের আওতায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানসমূহই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে, ন্যায়ানুগ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যা উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিরার বাবা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার এ প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মের নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করে। এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী। ঠিক একইভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ কমিশনের চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির ন্যায় সমান মর্যাদার অধিকারী। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা বাছাই, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্ব এ প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন এক ও অভিন্ন।

ঘ দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম— উক্তিটি যথার্থ।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার কাঠামোয় দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এজন্য বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রে মেধার ভিত্তিতে কর্মকর্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনও অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো মেধাসম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা বাছাইয়ে অসামান্য ভূমিকা রাখে।

তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন। দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করা এ কমিশনের মূল কাজ। এ কমিশনের নিকট কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাই মুখ্য এবং অন্য সবকিছু গৌণ। কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাছাইয়ের কাজ সহজ নয়। একজন ব্যক্তির লব্ধজ্ঞান যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন। একজন দক্ষ ব্যক্তিই পারেন অন্যজনের জ্ঞান যাচাই করতে। এ কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করেন। দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। কারণ, কমিশনের দক্ষতার হানি ঘটলে কর্মকর্তা নিয়োগের কাজটি দুর্বলভাবে সম্পাদিত হবে। আর এজন্য রাষ্ট্র অদক্ষতার শিকারে পরিণত হবে। এমনকি যদি সততার অভাব ঘটে তাহলে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এ কমিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে উঠে বাংলাদেশ সরকারব্যবস্থাকে কর্মক্ষম ও সচল করতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৭ ফারজানা আক্তার গুরুত্বপূর্ণ একটি সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ৬৫ বছর পর্যন্ত তিনি তার পদে বহাল থাকবেন। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী কারা? ১

খ. দুর্নীতি দমন কমিশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফারজানা আক্তার কোন ধরনের সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদের সঠিক দায়িত্ব পালনের ফলে সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের যে জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হয় এবং নিজেদের ও সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারে না, তারাই হলো বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী।

Teachingbd24.com

খ প্রশাসন ও সমাজের দুর্নীতি দমন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে সেটিই হলো দুর্নীতি দমন কমিশন।

দুর্নীতি দমন কমিশন স্বশাসিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ একটি প্রতিষ্ঠান। এটি তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে একজন হলেন চেয়ারম্যান। প্রত্যেকেই মনোনয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে দুর্নীতি দমন কমিশন সব ধরনের আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

গ ফারজানা আক্তার মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নামক সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পদ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের আয়-ব্যয়ের ওপর আইনসভার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৭নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফারজানা আক্তারের পদটি এই পদটিকেই নির্দেশ করে। তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একটি সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক। ৬৫ বছর পর্যন্ত তিনি তার পদে বহাল থাকতে পারবেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক পদটির ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এটি বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পদ। এটি বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তাই এই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক হয়েই কাজ করতে হয়। সংবিধানের ১২৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করবেন। দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর অথবা তার বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। সুতরাং বলা যায়, ফারজানা আক্তার মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে বহাল আছেন।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ তথা মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হতে পারে।

বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রধান শর্ত হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। এ শর্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথার্থ হওয়া প্রয়োজন। আর এ কাজটি যথার্থভাবে সম্পন্ন করা মহাহিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব। মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রতিবছরের সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। সরকারি খরচে কোনো গলদ আছে কিনা তা তার রিপোর্টেই উঠে আসে। সরকারের যেকোনো অপব্যয় বা অদক্ষতার ব্যাপারেও তিনি রিপোর্ট করতে পারেন। তিনিই বিভিন্ন অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ অথবা অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন। তিনি পার্লামেন্টের সরকারি অর্থ নিরীক্ষা কমিটির পথ-প্রদর্শকরূপে কার্যসম্পাদন করেন। অনেক সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের ধারণাগুলো কতটুকু প্রয়োগ করা হচ্ছে তাও নিরীক্ষণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, মহাহিসাব নিরীক্ষক উপর্যুক্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে অর্থ-ব্যবস্থায় দুর্নীতি ঠেকানো সম্ভব। আর অর্থ-ব্যবস্থায় দুর্নীতি বন্ধ হলে নিঃসন্দেহে সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৮ মি. রাজীব বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। মি. রাজীব মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

[দি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. উপজেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. মি. রাজীব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মি. রাজীবের মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক BPSC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Public Service Commission।

খ উপজেলা পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

১. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান।

২. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা)।

৩. উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র এবং তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের মি. রাজীব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেটি হলো রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন।

সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিরূপে কার্য করবেন। ১১৮(৩) অনুচ্ছেদ মতে, এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বৎসরকাল হবে। ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ মতে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন থাকবে।

১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে । তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে মি. রাজীব মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। আমি এ মন্তব্যের সাথে একমত। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা। বস্তুত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান। আইন কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন নির্বাচন যেমন— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। দল সম্পর্কিত ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও এ কমিশনের কাজ।

গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন ▶ ৯ সরকারের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গত ৩০ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ২৩৪টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। জনগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সরকারের প্রতিষ্ঠানটি প্রার্থীদের আচরণবিধি প্রণয়ন, প্রচার এবং কার্যকর করে। *[কু. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৬; মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল | প্রশ্ন নং ৯]*

https://teachingbd24.com

ক. দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংক্ষেপে কী বলা হয়? ১
খ. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবি কী? তার ক্ষমতা বর্ণনা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত? তার গঠন বর্ণনা করো। ৩
ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংক্ষেপে 'দুদক' বলা হয়।

খ বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবি অ্যাটর্নি জেনারেল।
বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা নিম্নরূপ:
১. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন; ২. বাংলাদেশের সকল আদালতে বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতা; ৩. প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ; ৪. সরকারের আইন উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন; ৫. সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং এক্ষেত্রে তিনি তার মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

গ উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সম্পৃক্ত। সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানটির গঠন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ—
সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিরূপে কার্য করবেন। ১১৮(৩) অনুচ্ছেদ মতে, এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বৎসরকাল হবে। ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ মতে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন থাকবে। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে । তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

ঘ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা। বস্তুত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন যেমন— সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ যথা— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত ও নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব মিলটন বাংলাদেশ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তার পেশাগত জীবনে সব সময় স্বজনপ্রীতি, উৎকোচ গ্রহণসহ নানাবিধ অপকর্মের সাথে জড়িত। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের ফলে তিনি আজ বিত্তশালীদের প্রথম স্তরে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করছে।
[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]
ক. আইনের জটিল প্রশ্নে কে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন? ১
খ. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করো। ২
গ. জনাব মিলটনের বিরুদ্ধে কোন সাংবিধানিক সংস্থা মামলা করে? তার গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব মিলটনের মতো সামাজিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর? ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনের জটিল প্রশ্নে অ্যাটর্নি জেনারেল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

খ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জাতীয় অর্থের অভিভাবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।
তার দুটি ক্ষমতা নিম্নরূপ:
১. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করবেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন।
২. এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রজাতন্ত্রের কার্যে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তির নথি, বই, রশিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জমিন বা সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষা করবেন এবং এরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দেন।

গ জনাব মিলটনের বিরুদ্ধে যে সাংবিধানিক সংস্থা মামলা করে তার নাম দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক। কেননা আমরা জানি, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠান উদ্দীপকের মিলটন সাহেবের মতো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
২০০৪ সালে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়। দুদক একজন চেয়ারম্যান ও দু'জন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত। চেয়ারম্যান কমিশনারের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অন্য দুই কমিশনারদের দায়িত্ব বণ্টন করেন এবং সেসব কাজের জন্য তারা চেয়ারম্যানের নিকট জবাবদিহি করবেন। তারা দুদক আইন ২০০৪ এর ৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আইনে কমিশনরাদের মেয়াদকালের নিশ্চয়তা বিধান করে বলা হয়েছে, 'সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে না।' এছাড়া মেয়াদ শেষে তা পুণর্নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না।

ঘ জনাব মিলটনের মতো সামাজিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য দেশে একটি স্থায়ী ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধক পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব সবার। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দল, সরকার, গণতান্ত্রিক মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ তথা দেশের সর্বস্তরের জনগণের যৌথ ও সমন্বিত প্রয়াস চালাতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে দুর্নীতির মাত্রা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে পাঁচটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিশোধন অত্যন্ত জরুরি। এগুলো হলো—

https://teachingbd24.com

১. রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন।
২. আইনের শাসন।
৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও জবাবদিহিতা।
৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।
৫. বহুমুখী স্থায়ী উদ্যোগ।

পরিশেষে বলা যায়, এসব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের হয়রানি কমবে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ অধ্যাপক শামসুর রহমান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা শিক্ষক। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাকে একটি সাংবিধানিক সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি সেখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর চাকরির ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রতিবছর এরূপ নিয়োগের মাধ্যমে তিনি দেশকে মেধাবী ও সৎ প্রশাসন উপহার দিয়ে থাকেন।

[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর দু'টি সমস্যা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক সংস্থাটি 'দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সৎ প্রশাসন উপহার দিতে পারে'— মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো- South Asian Association for Regional Co-operation.

খ সমাজে যারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না এবং চাহিদা পূরণে অক্ষম তারাই মূলত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী। এরা বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এগুলোর মধ্যে দুটি সমস্যা হলো— শারীরিক ভারসাম্যহীনতা ও শোনার সমস্যা।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক সংস্থাটি তথা বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন 'দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সৎ প্রশাসন উপহার দিতে পারে'— উক্তিটি সঠিক।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪০ ও ১৪১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ বর্ণনা মতে, কর্ম কমিশনের কাজই হলো প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা। এ লক্ষ্যে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কমিশন সৎ, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করে ধাপে ধাপে যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়োগের জন্য সরকারকে সুপারিশ করে। আর সে সুপারিশ অনুযায়ী সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে ব্যক্তিদের নিয়োগ করে থাকে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যদি যথাযথ বিধি অনুসরণ করে কোনো প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় না নিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয় তবে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সহজেই দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সৎ প্রশাসন উপহার দিতে পারে। এ প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটলে প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ে। ফলে জনগণ প্রশাসন থেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সৎ প্রশাসন উপহার দেওয়ার স্বার্থে নিয়োগে রাজনৈতিক ও অন্যান্য হস্তক্ষেপ না করাই যুক্তিযুক্ত। তাহলেই সরকারি কর্মকমিশন দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সৎ প্রশাসন উপহার দিতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব চৌধুরী প্রথিতযশা আইনজীবী। সংবিধান ছাড়াও দেওয়ানি, ফৌজদারি আইন সম্পর্কে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট। আইনজীবী হিসেবে তার সুখ্যাতির কথা বিবেচনায় এনে সরকার তাকে একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ প্রদান করে। তিনি আইনি পরামর্শ ও সরকারের পক্ষে মামলায় মতামত দিয়ে থাকেন। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সরকারি কর্ম কমিশন কী? ১
খ. দুর্নীতি দমন কমিশনের গঠন সম্পর্কে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনজীবীর উক্ত সাংবিধানিক পদে নিয়োগের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি কর্মকমিশন হলো এমন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে।

খ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত। তিনজন কমিশনারের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেন। কমিশনারগণের কার্যকাল পাঁচ বছর। এছাড়া সাচিবিক দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশন একজন সচিব নিযুক্ত করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আইনজীবীর উক্ত সাংবিধানিক পদে অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগের যৌক্তিকতা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে অ্যাটর্নি জেনারেল নামক সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দান করে থাকেন। উক্ত সাংবিধানিক পদে নিয়োগদানের কারণে তিনি সরকারের কৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়া আইন বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ আইন উপদেষ্টা হিসেবে সরকারের পক্ষে সকল আদালতে বিভিন্ন ধরনের মামলা পরিচালনা করেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রদান করে থাকেন। মূলত সরকারের মান মর্যাদা অনেকাংশে অ্যাটর্নি জেনারেলের দক্ষতা, যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকের চৌধুরী সাহেব প্রথিতযশা আইনজীবী। আইনের নানা দিক সম্পর্কে তার প্রজ্ঞার কথা সর্বজনবিদিত। তার এ সুখ্যাতির কথা বিবেচনা করে সরকার তাকে এমন একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ প্রদান করে, যে পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সরকারকে আইন সম্পর্কিত পরামর্শ দান ও সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। অর্থাৎ জনাব চৌধুরী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। পূর্বোক্ত আলোচনায় অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য যে যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে জনাব চৌধুরীর মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ অ্যাটর্নি জেনালে হিসেবে তার নিয়োগ যথার্থ।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ কুমিল্লা ডিগ্রি কলেজের পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের শিক্ষক জনাব মাজেদ পাঠদানকালে বললেন যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে। নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণসহ সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা এ কমিশন গ্রহণ করে থাকে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. EVM-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. নির্বাচন কমিশন বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির প্রধান কাজ কী? উক্ত কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থাটি কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? মতামত ব্যক্ত করো। ৪

https://teachingbd24.com

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক EVM-এর পূর্ণরূপ হলো— Electronic Voting Machine।

খ যে কমিশন দেশের বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে সেই কমিশনকে নির্বাচন কমিশন বলে। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সব দায়িত্ব পালন করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা। এ কাজ পরিচালনা করার জন্য কমিশনকে নানামুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ কর্মকান্ডের বৈশিষ্ট্য হলো—

১. দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনের জন্যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করা।
২. জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা করা।
৩. নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা।
৪. সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করা।
৫. নির্বাচন কমিশন আধা-বিচারসংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন, যেমন—
   ক. সংসদ সদস্যদের ও অন্যান্য স্তরের নির্বাচনের জন্যে গৃহীত মনোনয়নপত্র বাছাই করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত।
   খ. কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তার সদস্য পদের যোগ্যতা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা বিতর্ক দেখা দিলে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হয়। কমিশন উক্ত বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
   গ. নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ করাতে স্পিকার ব্যর্থ হলে নির্বাচন কমিশনার সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

এই সমস্ত দায়িত্ব ছাড়াও কমিশন সংবিধান অনুযায়ী এবং আইনের দ্বারা অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে।

ঘ উক্ত সংস্থাটি অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। যেমন- নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে এবং সীমানা সমস্যার সমাধানে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। এ কমিশন প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই করে। এক্ষেত্রে, কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যের অযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিরোধ দেখা দিলে এ কমিশনই তার নিষ্পত্তি করে। এসব কাজে কারো হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার নেই।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনা জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে যা নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণসহ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে পারে। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব শাহরিয়ার হোসেন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি পেশাগত জীবনে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেন।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মকমিশন গঠন করা হয়েছে? ১
খ. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব শাহরিয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠানটি মামলা দায়ের করেছে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে কতটুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মকমিশন গঠন করা হয়েছে।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের আয় ব্যয়ের ওপর আইনসভার পূর্ণনিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। এ নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করার জন্য এমন এক কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন যা স্বাধীনভাবে মজুতকৃত অর্থব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করে এর রিপোর্ট আইনসভায় পেশ করবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে নিয়োগ দান করেন। এটি একটি সাংবিধানিক পদ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব শাহরিয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি দমনে বহুবিধ কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করা যায়, জনাব শাহরিয়ার হোসেন অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক ধনসম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা দুর্নীতি দমনে উপর্যুক্ত কার্যাবলিসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশনই পরিচালনা করে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪' এর তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করে। অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে এই আইনের অধীনে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য ব্যক্তির দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করে। দুর্নীতি বিষয়ে আইনদ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করে। এ কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি এবং গবেষণালব্ধ সুপারিশ পেশ করে। এ কমিশনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি হলো— দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা; কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উপরের আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনাব শাহরিয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করেছে এবং এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি দমনে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে অনেকাংশে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করা যায়, জনাব শাহরিয়ার হোসেনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। এখানে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো দুর্নীতি দমন কমিশন। এ প্রতিষ্ঠানের তৎপরতার কারণেই দুর্নীতির বিচার হয়েছে। এ কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতির বেড়াজাল থেকে দেশকে রক্ষা করা। এ কমিশনের গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দুর্নীতি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনানুযায়ী সাক্ষী তলব করা, অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তকে জেরা করা, বেসরকারি দলিলপত্র উপস্থাপন করা এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এ বলা হয়েছে, দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা কমিশনের প্রধান তথা চেয়ারম্যান যেকোনো স্থানে তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন। এর ফলে যে কোনো ব্যক্তিই দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় পায় এবং দুর্নীতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ২০০৪-এর আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তার অধস্তন যেকোনো অফিসার দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা এ আইনের বলে কমিশন দুর্নীতিগ্রস্তদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে অন্যরাও দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে ভয় পাবে এবং নিজেকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশন তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ কারণেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পদক্ষেপসমূহ দেশের দুর্নীতি হ্রাসে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৫ জনাব এ এস এম কবির একজন সরকারি আমলা ছিলেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি তাকে রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগদান করেন। তার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে জনমতের ভিত্তিতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক দলকে বাছাই করা যারা দেশের সার্বিক কল্যাণে কাজ করবে। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? ১

খ. অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রধান কাজগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন সাংবিধানিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে? উক্ত সংস্থার উদ্দেশ্য ও গঠন লিখ। ৩

ঘ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটি কী ধরনের ভূমিকা পালন করে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা।

অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের আইন উপদেষ্টা হিসেবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে তিনি তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

গ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।।

ঘ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সরকারের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গত ৩০ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ২৩৪টি পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন করেন। জনগণ ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সরকারের প্রতিষ্ঠানটি প্রার্থীদের আচরণ-বিধি প্রণয়ন, প্রচার এবং কার্যকর করে। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. আইনের জটিল প্রশ্নে কে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন? ১

খ. দুর্নীতি কী? ২

গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের কোন সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত? তার গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাটর্নি জেনারেল আইনের জটিলতা প্রশ্নে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

খ নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

দুর্নীতি একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতির কারণে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে দূরত্ব ও বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। এক শ্রেণি লোকের সম্পদের পাহাড় গড়ার হীন মনোবাসনার কাছে ক্রমেই অসহায় হয়ে পড়ে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা। দুর্নীতির ফলে জাতীয় আয় এবং মানুষের মাথাপিছু আয় উভয়ই কমে যায়। মানবাধিকার ও জাতীয় উন্নয়ন উভয়টির জন্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দুর্নীতি।

গ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।।

ঘ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. লিয়ন বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। মি. লিয়ন মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। *[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দুদকের পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. লিয়ন যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মি. লিয়নের মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদকের পূর্ণরূপ হলো দুর্নীতি দমন কমিশন।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে, যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ সুশান্ত বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাইভার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য সে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রিয় শিক্ষকের কাছে যায়। এ বিষয়ে তার শিক্ষক বলেন, এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও প্রতিষ্ঠান করে থাকে। *[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং-৯]*

ক. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অ্যাটর্নি জেনারেলের কথা বলা হয়েছে? ১

খ. সাংবিধানিক সংস্থা কীভাবে পরিচালিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুশান্তর পরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের গঠন বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও দক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে পারে'— মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৪ নং অনুচ্ছেদে অ্যাটর্নি জেনারেলের কথা বলা হয়েছে।

খ সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধি অনুযায়ী সাংবিধানিক সংস্থা পরিচালিত হয়।

এ সংস্থাগুলো রাষ্ট্রের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে, ন্যায়ানুগ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অ্যাটর্নি জেনারেল হলো বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এসব সংস্থার গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে সংবিধানে উল্লেখ আছে।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশের সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, বড় হয়ে তোমরা যারা সরকারি চাকরি করবে। তারা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দেখেই চাকরির জন্য আবেদন করবে। প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা। *[লায়ন স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বাংলাদেশে সরকারি কর্মে কর্মচারী নিয়োগ বা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে যে প্রতিষ্ঠান তার নাম কী? ১

খ. সরকারি কর্ম-কমিশনের গঠন লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি কী কী কাজ করে থাকে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা'—উদ্দীপকে উল্লিখিত এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারি কর্মে কর্মচারি নিয়োগ বা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে থাকে যে প্রতিষ্ঠান তার নাম 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন'।

খ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন সভাপতি ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে সেরূপ অন্যান্য সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির ৫৭নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য সংখ্যা সভাপতিসহ অনুরূপ ৬ জন এবং অনূর্ধ্ব ১৫ জন নির্ধারিত করা হয়। সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা ৫ বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন। এ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি সংবিধানের '১৪০নং অনুচ্ছেদ' অনুযায়ী প্রধানত চার ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকে—

১. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা। সরকারি কাজে জনবল নিয়োগের জন্য উপযুক্ত লোকদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করা এ কমিশনের প্রধান কাজ।

২. নিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শমূলক কাজ। রাষ্ট্রপতি নিয়োগসংক্রান্ত কোনোরূপ পরামর্শ চাইলে তা প্রদান করে কমিশন। যেমন- কোনো নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, অবসরভাতার অধিকার, এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে প্রতিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে প্রশাসনকে সহায়তা করা এ কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

৩. বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান। কমিশন প্রতিবছর ১লা মার্চ বা তার আগেই আগের বছরের, অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত এক বছরের কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি বরাবর পেশ করে।

৪. আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ। কমিশন আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে।

উপরের এ দায়িত্বগুলো পালনই বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কাজ।

ঘ 'এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা।' উদ্দীপকে উল্লিখিত এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করা হলো—

সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা। এ কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও সভাপতি নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মের মেয়াদ ও অন্যান্য শর্ত পর্যালোচনা করলে এ কমিশনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অনুমিত হয়। কর্ম কমিশনের স্বাধীন মর্যাদা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান কমিশনের সভাপতিকে কর্মাবসানের পর প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্ম লাভ থেকে বিরত রেখেছেন। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন, কিন্তু প্রমাণিত ক্ষেত্র ব্যতীত ইচ্ছামতো তিনি তাদের অপসারণ করতে পারেন না। কর্ম কমিশনের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমমর্যাদার অধিকারী।

আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে তারা নিজস্ব দায়িত্ব পালন করবেন। নিয়োগের পর কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের বেতনভাতা ও সুবিধাদির ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যয় বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট তহবিল থেকে ব্যয়িত হবে এবং তা সংসদে ভোটযোগ্য হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, কর্ম কমিশন একটি নিরপেক্ষ বিধিবদ্ধ সংস্থা। ন্যায়নিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও সততার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি জনগণের প্রগাঢ় আস্থা বিরাজমান।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব সোহরাব হোসেন 'ক' নামক সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব আলাল সাহেব নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে জনাব সোহরাব হোসেন সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠান আলাল সাহেবের মনোনয়ন বাতিল করে দেন। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে কে নিয়োগ দেন? ১

খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সোহরাব হোসেন সাহেব কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের করেন? উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

https://teachingbd24.com

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

খ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে এমন সংবিধানকে বোঝায় যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধতি জটিল হয়। সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে এ সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ— বাংলাদেশের সংবিধানের কথা বলা যায়। এ সংবিধানের কোনো ধারার পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি প্রয়োজন। এটি কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিও থাকতে হবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সোহরাব হোসেন সাহেব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে নির্বাচন ব্যবস্থার সংগঠন, নির্বাচনি বিধিবিধান এবং নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। গণতন্ত্রের একটি মৌলিক বিষয় হলো নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে নির্বাচন কমিশন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১১৯নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণিত আছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি আচরণবিধি ঘোষণা করে এবং কেউ এ আচারণবিধি লঙ্ঘন করলে নির্বাচনে কমিশনে তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অভিযোগ দায়ের করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মেয়র পদপ্রার্থী সোহরাব হোসেন সাহেবের প্রতিদন্দ্বী নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের করেন। যেহেতু নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার বিধান রয়েছে, তাই বলা যায় জনাব সোহরাব হোসেন সাহেব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশন অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হলো অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচন। কেবলমাত্র অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের রায় প্রকাশ পায়।

নির্বাচন যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে জনগণের মতের কোনো গুরুত্ব থাকে না। অনেক সময় ভোট কারচুপি করে জাতীয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়। আর এই কারচুপির মতো দুর্নীতি একমাত্র নির্বাচন কমিশনের পক্ষেই ঠেকানো সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালের পূর্বে কয়েকটি নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা যায়। যেখানে ভোট কারচুপির মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল বলে সেই সরকারকে আমরা স্বৈরাচারী সরকার বলে থাকি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের মতের মূল্যায়ন করার সুযোগ তৈরি হয়। আর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার ওপর।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা হয়, নির্বাচন কমিশন যত গণতান্ত্রিক হবে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ততটাই সহজতর হবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ জামাল সাহেব একজন প্রথিতযশা আইনজীবী ছিলেন। রাষ্ট্রের সংবিধান থেকে শুরু করে ফৌজদারী আইনে তার ধারে কাছে আছেন এমন ব্যক্তি এ দেশে নেই। সুপ্রিম কোর্টে তিনি কেস লড়েছেন আর হেরেছেন এটি খুব বিরল। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও দেশপ্রেমিক হিসেবে পরিচিত এবং তার মক্কেলদের কাছে খুব মানবিক। আইনজীবী হিসেবে তার সুখ্যাতির কথা বিবেচনায় তাকে সরকার একটি আইনভিত্তিক সংবিধানিক পদে নিয়োগ দান করে। জামাল সাহেব সরকারি প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শ ও সরকারের পক্ষে মামলার মতামত দিয়ে থাকেন। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সরকারি কর্ম কমিশন প্রধানত কয় ধরনের কাজ করে থাকে? ১

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জামাল সাহেবের নিয়োজিত পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জামাল সাহেবকে উক্ত পদে নিয়োগদানের যৌক্তিক কারণ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি কর্ম কমিশন প্রধানত চার ধরনের কাজ করে থাকে।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে, যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব মিলন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি পেশাগত জীবনে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অনেক সম্পদের মালিক হন। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে সরকারি কর্মকমিশন যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিলনের বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠান মামলা দায়ের করেছে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে কতটুকু সহায়ক হবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব প্রতিষ্ঠান সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করতে পারে সেসব প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

খ সরকারি কর্মকমিশন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে।

কর্মকমিশন সরকারি কাজে জনবল নিয়োগের জন্য উপযুক্ত লোকদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করে। কর্মকমিশন যোগ্য প্রার্থীর কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করে প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে যোগ্য চাকরিপ্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ করে।

গ সৃজনশীল ১০নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পদক্ষেপ দুর্নীতি দমনে অনেকাংশে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে লক্ষ্য করা যায় যে, জনাব মিলনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও তদন্তের ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করে। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত তাকে ঐ অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করে। এখানে

https://teachingbd24.com

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো দুর্নীতি দমন কমিশন। এ প্রতিষ্ঠানের তৎপরতার কারণেই দুর্নীতির বিচার হয়েছে। এ কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতির বেড়াজাল থেকে দেশকে রক্ষা করা। এ কমিশনের গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের দুর্নীতি অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনানুযায়ী সাক্ষী তলব করা, অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তকে জেরা করা, বেসরকারি দলিলপত্র উপস্থাপন করা এবং গ্রেফাতারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪-এ বলা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা প্রধান দুর্নীতি দমন কমিশনার যেকোনো স্থানে তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন। এর ফলে যে কোনো ব্যক্তিই দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় পায় এবং দুর্নীতি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ২০০৪-এর আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তার অধস্তন যেকোনো অফিসার দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা এ আইনের বলে কমিশন দুর্নীতিগ্রস্তদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে অন্যরাও দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে শাস্তির ভয় পাবে এবং নিজেকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দুর্নীতি দমন কমিশন তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ কারণেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পদক্ষেপসমূহ দেশের দুর্নীতি হ্রাসে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব আলী আহসান চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে আইন পেশায় জড়িত থাকার ফলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। রাষ্ট্রপতি তাকে একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগদান করেছেন। জনাব চৌধুরী রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয়পদে বহাল থাকবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৭]

ক. প্রজাতন্ত্রের কর্মে লোক নিয়োগের জন্য গঠিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? ১

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব আলী আহসান চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি কোন সাংবিধানিক পদে নিয়োগদান করেছেন? এই পদে নিয়োগ পেতে হলে কী কী যোগ্যতা থাকতে হয়? ৩

ঘ. জনাব আলী আহসান চৌধুরী যে পদে নিয়োগ লাভ করেছেন সে পদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে কী কী কাজ করতে হবে? ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রজাতন্ত্রের কর্মে লোক নিয়োগের জন্য গঠিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ জনাব আলী আহসান চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগদান করেছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আলী আহসান চৌধুরী আইন পেশায় জড়িত থাকায় এবং সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি তাকে একটি সাংবিধানিক পদে নিয়োগ করেন। অর্থাৎ তাকে এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ করেছেন।

এই পদে নিয়োগ পেতে হলে যে সব যোগ্যতা থাকতে হয়, নিচে তা তুলে ধরা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রে একজন এটর্নি জেনারেল থাকবেন। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এটর্নি জেনারেল অন্যতম। তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৪(১) অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য এমন কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ করবেন। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত এটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

ঘ জনাব আলী আহসান চৌধুরী এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ লাভ করেছেন। এটর্নি জেনারেলকে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। নিচে তার দায়িত্ব পালনের জন্য যে কাজ করতে হবে তা তুলে ধরা হলো—

এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এবং তিনি দেশের যে কোনো আদালতে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে পারবেন। এছাড়া তিনি পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত। এটর্নি জেনারেল যেহেতু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবিধানের অন্যতম প্রধান একটি পদে থাকেন, তাই তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৩(২) অনুযায়ী এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ (৬৪) অনুযায়ী এটর্নি জেনারেল তার দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের যে কোনো আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। এ ছাড়াও এটর্নি জেনারেল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন এবং বাংলাদেশ সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আলী আহসান চৌধুরী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এটর্নি জেনারেল নির্বাচিত হওয়ায় তাকে রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৪ ড. শাহাদাৎ হোসাইন বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য অন্যান্য সদস্যরাও আছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে মেধাবী, দক্ষ ও যোগ্য লোক বাছাই এর জন্য তারা অত্যন্ত গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করছেন।

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১১]

ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. গ্রিন হাউজ এফেক্ট কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা কেন অপরিহার্য? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BPSC-এর পূর্ণরূপ হলো— Bangladesh Public Service Commission।

খ বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস সূর্যের তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ করে তোলে। এসব গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাবকে গ্রিন হাউজ এফেক্ট বলে।

Teachingbd24.com

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ায় বিকীর্ণ তাপ ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূ-পৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে প্রাণীজগতের বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত দহন এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে, যার নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মেধাবী, দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা বাছাই করা।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন প্রজাতন্ত্রের কাজে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে। রাষ্ট্রপতি কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইলে বা কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করে। কর্মকমিশন প্রতিবছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বর সমস্ত এক বছরের স্বীয় কার্যাবলি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করবে এবং তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে। কর্মকমিশন আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন। সরকারি কর্মকমিশন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের বাছাই, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির দায়িত্ব পালন ও এসব বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আর বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন উপরোল্লিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করে। যা উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করে বলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ সরকারি কর্মকমিশনের গোপনীয়তা এবং নিরপেক্ষতা অপরিহার্য।

কর্মকমিশনকে যোগ্য ও মেধাবীদেরকে কর্মকর্তা হিসেবে বাছাই ও নিয়োগ দেওয়ার জন্যই তাদের কাজ কর্মে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে যোগ্য লোক বাছাইয়ের জন্য কর্মকমিশনের এ গোপনীয়তা অপরিহার্য। রাষ্ট্রে সাফল্য নির্ভর করে একটি দক্ষ ও সৎ প্রশাসনের ওপর। তাই কর্মকমিশনকে দক্ষ ও সৎ লোক বাছাই ও নিয়োগ দানে সচেষ্ট থাকা উচিত। এক্ষেত্রে কর্মকমিশন রাজনৈতিক চাপ, তদবির, হুমকি, প্রলোভন ইত্যাদিকে এড়াতে পারলেই একটি ভালো প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব। শুধু সততা নয়, দক্ষতাও এক্ষেত্রে কর্মকমিশনের আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে বিবেচ্য হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ কর্মকমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। তারা নিরপেক্ষতার সাথে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাছাই ও নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নারী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ না করে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী বাছাই করে। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা সে দেশের প্রশাসনের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ভালো হলে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং আইনের শাসন কার্যকর হয়। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। আর দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে কর্মকমিশনের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কর্মকমিশনের গোপনীয়তা এবং নিরপেক্ষতা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ফজলে এলাহী বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বিভাগে লোক নিয়োগে সুপারিশ, সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতির পরীক্ষাসহ বিভিন্ন বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে সাজ্জাদুজ্জামান চৌধুরী অপর একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. অধ্যাদেশ কে জারি করেন? ১

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাজ্জাদুজ্জামান চৌধুরী যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সে প্রতিষ্ঠানের গঠনকাঠামো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. দেশ ও জাতিকে মেধাবী ও সৎ প্রশাসন উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে ফজলে এলাহীর প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি জারি করেন।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার কাজের গতিশীলতার জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। যার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। এগুলোই হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের সাজ্জাদুজ্জামান চৌধুরী যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সে প্রতিষ্ঠানটি হলো 'নির্বাচন কমিশন'। নিচে নির্বাচন কমিশনের গঠন কাঠামো আলোচনা করা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যে রূপ নির্দেশ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন।

- একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিত্ব করবেন।
- সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর হবে।
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।
- অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন, তবে অন্য কোনোভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।
- নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন।
- সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণে নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন।
- কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারেন।

https://teachingbd24.com

ঘ দেশ ও জাতিকে মেধাবী এবং সৎ প্রশাসন উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে ফজলে এলাহীর প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন-এর ভূমিকা অপরিসীম।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার কাঠামোয় দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এজন্য বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রে মেধার ভিত্তিতে কর্মকর্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনও অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো মেধাসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা বাছাইয়ে অসামান্য ভূমিকা রাখে।

তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন। দক্ষতার সাথে নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা এ কমিশনের মূল কাজ। এ কমিশনের নিকট কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাই মুখ্য এবং অন্য সবকিছু গৌণ। কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাছাইয়ের কাজ সহজ নয়। একজন ব্যক্তির লব্ধজ্ঞান যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন। একজন দক্ষ ব্যক্তিই পারেন অন্যজনের জ্ঞান যাচাই করতে। এ কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করেন। দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। কারণ, কমিশনের দক্ষতার হানি ঘটলে কর্মকর্তা নিয়োগের কাজটি দুর্বলভাবে সম্পাদিত হবে। আর এজন্য রাষ্ট্র অদক্ষতার শিকারে পরিণত হবে। এমনকি যদি সততার অভাব ঘটে তাহলে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এ কমিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে উঠে বাংলাদেশ সরকারব্যবস্থাকে কর্মক্ষম ও সচল করতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষ ও সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের 'পৌরনীতি ও সুশাসন' বিষয়ের শিক্ষক জনাব মো. আক্তারুজ্জামান পাঠদানকালে বললেন যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি কমিশন রয়েছে। নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণসহ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা এ কমিশন করে থাকে। *[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. এটর্নি জেনারেলকে কে নিয়োগ করেন? ১

খ. 'বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন' এর গঠন বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? মতামত ব্যক্ত করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি।

খ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন সভাপতি ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে সেরূপ অন্যান্য সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হবে।

রাষ্ট্রপতির ৫৭নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য সংখ্যা সভাপতিসহ অন্যূন ৬ জন অনূর্ধ্ব ১৫ জনে নির্ধারিত করা হয়। সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের অর্ধেক সদস্য এমন ব্যক্তি হবেন যারা বিশ বছর বা ততোধিককাল সরকারি কর্মে নিয়োজিত। সংবিধানের ১৩৮ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইন সাপেক্ষে সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে। সংবিধানের ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যদের কার্যকাল হবে ৫ বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্ব-স্ব পদে বহাল থাকবেন।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো—

১. সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধায়ন, নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণ।
২. রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।
৩. সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা।
৪. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও সীমানা অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ।
৫. সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।
৬. রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই করা এবং বাছাইকৃত মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন।
৭. নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ও গেজেট প্রকাশ করা।
৮. উল্লিখিত কার্যাদি ব্যতিরেকে সংবিধান অনুযায়ী এবং অন্যান্য আইনের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান উল্লিখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলির দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

ঘ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে একটি স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম তা আলোচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের গঠনে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগদান করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাধারণত দলীয় ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা একটু কঠিন বৈকি। তবে এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যথা সম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশন অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হলো অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। অনেক সময় ভোট কারচুপির মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা কর হয়। আর এই কারচুপি ঠেকানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা ও নির্বাহী প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে থাকে। সংবিধানের ১২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতায় সামান্য হলেও হস্তক্ষেপ করে। যেমন— সংবিধানের ১২৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনি এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন।

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কার্যাবলি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর। তবে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ তাহের এর চাচা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজ হল দেশের বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা করাসহ ভোটার তালিকা করা এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। *[বাংলাদেশের নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৭]*

Teachingbd24.com

ক. রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদের নাম কী? ১
খ. সরকারী কর্মকমিশনের দুটি কাজ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তাহের এর চাচা যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উক্ত প্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্য 'সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় উক্ত প্রতিষ্ঠান মুখ্য ভূমিকা পালন করে।' তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদের নাম অ্যাটর্নি জেনারেল।

খ সরকারী কর্মকমিশনের দুটি কাজ উল্লেখ করা হলো—
১. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দানের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মকমিশন কর্মকর্তা যাচাই ও পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।
২. সুষ্ঠুভাবে সরকারি কর্ম পরিচালনার জন্যে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগতভাবে কর্মচারি মনোনয়ন ও নিয়োগ করার দায়িত্ব সরকারি কর্মকমিশনের ওপর ন্যস্ত।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনাব মশিউর বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। জনাব মশিউর মনে করেন, গণতান্ত্রিক সরকার পতিষ্ঠায় তর প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।
[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. 'দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি'— বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. জনাব মশিউর যে প্রতিষ্ঠানের কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনাব মশিউরের মন্তব্যটির স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BPSC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Public Service Commission।

খ 'দুর্নীতি' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি যার কারণে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।
বাংলাদেশের সমাজ জীবনে দুর্নীতির মারাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দুর্নীতি মানবাধিকার ও জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দুর্নীতির কারণে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এছাড়া দুর্নীতির ফলে সামাজিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি নৈতিক চেতনা হারিয়ে মানুষ অমানুষে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডের সাথে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সম্পৃক্ত। সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানটির গঠন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ—
সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিরূপে কার্য করবেন। ১১৮(৩) অনুচ্ছেদ মতে, এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বৎসরকাল হবে। ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ মতে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন থাকবে। ১১৮(২) অনুচ্ছেদ মতে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে । তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

ঘ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা। বস্তুত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন যেমন— সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ যথা— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত ও নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি: হাবীব বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র দেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। মি: হাবীব আরও মনে করেন, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিহার্য।
[আলফেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা | প্রশ্ন নং ৭]

ক. BPSC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কাকে বলে? ২
গ. মি: হাবীব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩
ঘ. অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে মি: হাবীবের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? তা আলোচনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BPSC-এর পূর্ণরূপ হলো— Bangladesh Public Service Commission।

খ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১১৭ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।'

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মি: হাবিব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন সেটি হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপ্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন। নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন।

Teachingbd24.com

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান করা। এছাড়াও আইন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানীয় সরকার পরিষদ যথা— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করাও এ কমিশনের কাজ। এ কমিশন সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ এবং মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ও গেজেট প্রকাশ করে।

ঘ অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে মি: হাবিবের অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনারে ভূমিকা অত্যন্ত স্বচ্ছ হওয়া উচিত।

নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আন্তরিকতা ও গৃহীত কার্যব্যবস্থার ওপর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে এ কমিশনকে কতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়। সকল প্রকার চাপ ও প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে সাহসিকতার সাথে নির্বাচনি কর্তব্য পালন করা, নির্বাচনি নিয়মনীতি সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা। নির্বাচনি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে অগ্রাধিকার না দেওয়া। নির্বাচনি আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হওয়া। নির্বাচন কমিশনকে জনসাধারণের আস্থাশীল সংস্থা হিসেবে নির্বাচনি সকল কার্যক্রমে নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি।

আলোচনা শেষে বলা যায়, অবাধ, সুষ্ঠু এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মি: হাবিবের ভূমিকা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶ ৩০

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবী কী? ১

খ. নির্বাচন কমিশনের একটি কাজ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ণ করবে? ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তার পদবী অ্যাটর্নি জেনারেল।

খ নির্বাচন কমিশনের একটি কাজ হলো রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির পূর্ববর্তী ষাট থেকে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদে। আবার, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হলে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।

গ সৃজনশীল ১নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ ফারজানা বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। তিনি মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই- উক্তিটি কার। ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বুঝ? ২

গ. ফারজানা যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি আলোচনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, এদেশের মানুষের অধিকার চাই'- উক্তিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

খ পাকিস্তানি স্বৈরচারী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী বাঙালিদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে তাই অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

এ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলোতে অবস্থানরত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনে হত্যা করা। পাশাপাশি সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্রাগার, রেডিও, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলসহ এদেশের সামগ্রিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করা।

গ উদ্দীপকের ফারজানা যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেটি হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন থাকবে। সংবিধানের ১১৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিবন্ধন এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। এ কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য দেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফারজানা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকে। আর এ কাজটি করে থাকে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ঘ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশ পায়। জনগণের রায়ের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলের অবসান ঘটাতে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত।

Teachingbd24.com

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো—সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধায়ন, নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণ। সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা, সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও সীমানা অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই করা এবং বাছাইকৃত মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ইত্যাদি। উল্লিখিত কার্যাদি ব্যতিরেকে সংবিধান অনুযায়ী এবং অন্যান্য আইনের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট।

প্রশ্ন ▶৩২ প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের দেওয়া এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বলেন যে, নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধি বাছাইয়ের সুযোগ পায়। একজন নাগরিক একটি নির্দিষ্ট বয়স এবং আরও আইনি কিছু শর্ত পূরণের পর ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়। দেশের সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনই কেবল দক্ষ, উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

[সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর | প্রশ্ন নং ৭]

ক. নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ কত? ১

খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির শর্তসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ ৫ বছর।

খ নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। বাংলাদেশে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি মেনে চলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির সর্বপ্রথম শর্ত হলো বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া।

কোনো ব্যক্তিকে ভোটাধিকার প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। নাগরিকের ভোটের অধিকার প্রাপ্তির জন্য ১৮ বছর বয়স হতে হবে। ১৮ বছরের কম কোনো ব্যক্তি যতই সুঠাম দেহের অধিকারীই হোক না কেন বাংলাদেশের আইন বলে সে ভোটাধিকার লাভ করবে না। অর্থাৎ উদ্দীপকের নাগরিকদের ভোট প্রদানের অধিকার প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার সাথে সাথে প্রাপ্তবয়স্কও হতে হবে।

এছাড়াও ভোটাধিকার প্রাপ্তির জন্য উদ্দীপকের নাগরিককে ঐ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী হতে হবে। নির্বাচনি এলাকা বহির্ভূত কোনো ব্যক্তি ঐ এলাকায় ভোটার হতে পারবে না। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকের ন্যায় কোনো নাগরিককে ভোটার হতে হলে তাকে সাংবিধানিক নিয়ম-নীতির আওতাভুক্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে কেউ যদি আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হয়, তবে সে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা হারাবে। সেই সাথে দ্বি-নাগরিকত্ব ও আদালত কর্তৃক দেউলিয়া না হওয়াই হলো উদ্দীপকের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির মূল শর্ত।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত কমিশন তথা নির্বাচন কমিশনের সাথে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক ভালো ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

নির্বাচন কমিশনের কাজই হলো দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যদি স্বজনপ্রীতিপরায়ণ কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে অবস্থান করা সম্ভব হবে না। তখন একদলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন অন্য রাজনৈতিক দলের প্রতি অসাংবিধানিক আচরণ করবে। ফলস্বরূপ নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিধান লংঘিত করে নেতিবাচক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। তখন সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। নির্বাচন কমিশনের আচরণ সংক্রান্ত দিক বিবেচনায় উদ্দীপকের নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনি নিয়ম-নীতি সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সকল প্রকার চাপ ও প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে উদ্দীপকের নির্বাচন কমিশনকে সাহসিকতার সাথে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। তবেই দেশে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্বচ্ছতা বিষয়ক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সুসম্পর্ক থাকা জরুরী।

প্রশ্ন ▶৩৩ ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮। এদিন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ দীর্ঘ দু বছর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে। এ নির্বাচনের সময় প্রচার কাজে নিয়োজিত মাইকের হর্ণ মানুষকে কষ্ট দেয়নি বা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায়নি। প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার মিছিল, গাড়ি বহর ও মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা নিয়ে শোডাউন এবারে ছিল না।

[রাঙ্গাপবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ১

খ. কোরাম কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনটিকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ ও শক্তিশালি নির্বাচন কমিশন'- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

খ যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

কোরাম শব্দের অর্থ ন্যূনতম উপস্থিতি সংখ্যা। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা হয়। সংসদের অধিবেশন চলাকালে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা যদি ৬০ জনের চেয়ে কম হয় এবং সে মর্মে যদি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার অধিবেশন স্থগিত রাখবেন বা সংসদ মুলতুবি ঘোষণা করবেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনটিকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা খুবই অপরিহার্য। কেননা নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়। আর সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। তাই নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তেমনিভাবে অনিয়ম রোধে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের আন্তরিকতা ও গৃহীত কার্যব্যবস্থার ওপর নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে কতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়। সকল প্রকার চাপ ও প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে সাহসিকতার সাথে নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করা। নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের সময় সরকারের নিকট পর্যাপ্ত নির্বাহী ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও র‍্যাবসহ অন্যান্য বাহিনীর সহযোগিতা চাইতে পারে এবং কর্মকর্তাদের কঠোর থাকতে নির্দেশ দেয়।

ঘ বাংলাদেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন' উক্তিটি যথার্থ।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা। বস্তুত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সেই সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলের অবসান ঘটাতে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচনি নিয়মনীতি প্রয়োগ করা এবং নির্বাচনি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। তা হলে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিশন ক্ষমতাসীনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ জন্য কমিশনকে কঠোর হওয়ার জন্য আরো বেশি নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, বড় হয়ে তোমরা যারা সরকারি চাকরি করবে, তারা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দেখেই চাকরির জন্য আবেদন করবে। প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৬]

ক. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং ধারায় নির্বাচন কমিশনের উল্লেখ আছে? ১

খ. এটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি কী কী কাজ করে থাকে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা'- উদ্দীপকে উল্লেখিত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কথা উল্লেখ আছে।

খ অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা।

অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের আইন উপদেষ্টা হিসেবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন। সংবিধানের ১০৬ নং অনুচ্ছেদানুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে তিনি তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন প্রজাতন্ত্রের কাজে দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে। সরকারি কর্মকমিশনের ক্ষমতা হলো এটি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের বাছাই, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির দায়িত্ব পালন ও এসব বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। যা উদ্দীপকে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করছিলেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, বড় হয়ে তোমরা যারা সরকারি চাকরি করবে, তারা একটি সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে চাকরির আবেদন করবে। আর বাংলাদেশ কর্মকমিশন সরকারি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং সকল প্রকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ কর্মকমিশন।

ঘ 'এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা' উদ্দীপকে উল্লিখিত এ উক্তিটি যথাযথ।

সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা। এ কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও সভাপতি নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মের মেয়াদ ও অন্যান্য শর্ত পর্যালোচনা করলে এ কমিশনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অনুমিত হয়। কর্ম কমিশনের স্বাধীন মর্যাদা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান কমিশনের সভাপতিকে কর্মাবসানের পর প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্ম লাভ থেকে বিরত রেখেছেন। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন, কিন্তু প্রমাণিত ক্ষেত্র ব্যতীত ইচ্ছামতো তিনি তাদের অপসারণ করতে পারেন না। কর্ম কমিশনের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমমর্যাদার অধিকারী।

আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে তারা নিজস্ব দায়িত্ব পালন করেন। নিয়োগের পর কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের বেতনভাতা ও সুবিধাদির ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন করা যায় না। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যয় বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট তহবিল থেকে ব্যয়িত হয় এবং তা সংসদে ভোটযোগ্য হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কর্ম কমিশন একটি নিরপেক্ষ বিধিবদ্ধ সংস্থা। ন্যায়নিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও সততার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি জনগণের প্রগাঢ় আস্থা বিরাজমান।

Teachingbd24.com

সপ্তম অধ্যায়: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

★★ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বাংলাদেশে কর্মকমিশনের গঠন ও কার্যাবলি

১. **কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি কী দ্বারা নির্ধারিত হয়?** [অনুধাবন]
ক প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে
খ উচ্চ আদালতের মাধ্যমে
গ সংসদ আইনের দ্বারা
ঘ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের দ্বারা **গ**

২. **সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশ কর্মকমিশন গঠিত হয়েছে?** [জ্ঞান]
ক ১৩৭ খ ১২৭
গ ১৩১ ঘ ১২১ **ক**

৩. **কর্মকমিশন কার নিকট বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান করেন?** [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি **খ**

৪. **বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কে?** /কু. বো. ১০/
ক চেয়ারম্যান খ মহাপরিচালক
গ সদস্য ঘ সচিব **ক**

৫. **বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সকল ক্ষমতার মালিক কে?** /দি. বো. ১০/
ক সরকার খ জনগণ
গ রাষ্ট্র ঘ রাজনৈতিক দল **খ**

৬. **সরকারি কর্ম কমিশনকে কেন একটি নিরপেক্ষ সংস্থা বলা হয়েছে?** /ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউ এসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর/
ক দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ পদ্ধতি
খ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন
গ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত
ঘ দলীয় লোকজন নিয়োগ **ক**

৭. **কর্মকমিশনের সদস্যদের কার্যকাল কত বছর বয়স পর্যন্ত?** [জ্ঞান]
ক ৫৯ বছর খ ৬০ বছর
গ ৬২ বছর ঘ ৬৫ বছর **ঘ**

৮. **কর্মকমিশন কর্তৃক পেশকৃত বাৎসরিক রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি কোথায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন?** [অনুধাবন]
ক সুপ্রিম কোর্ট খ মন্ত্রিসভায়
গ জাতীয় সংসদে ঘ সেনা সদর দপ্তরে **গ**

৯. **'Spoils System' কী?** [জ্ঞান]
ক মেধা খ আনুগত্য
গ দলীয় সুযোগ ঘ বংশ পরিচয় **গ**

১০. **বিশ্বের প্রায় সর্বত্র কোন বিভাগের প্রাধান্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে?** [জ্ঞান]
ক আইন বিভাগ খ শাসন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ ঘ জাতীয় সংসদ **গ**

১১. **রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার?** [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রীর
খ রাষ্ট্রের স্থায়ী কর্মকর্তাদের
গ জনগণের ঘ সাংবাদিকদের **খ**

১২. **বাংলাদেশের কর্মবিভাগকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?** [জ্ঞান]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **ক**

১৩. **১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কর্মকমিশন নির্দেশ জারি করেন কে?** [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
গ রাষ্ট্রপতি ঘ মন্ত্রিপরিষদ **গ**

১৪. **বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন রাষ্ট্রপতির কত নং অধ্যাদেশ ছিল?** [জ্ঞান]
ক ৫০নং খ ৫৫নং
গ ৫৭নং ঘ ৫৮নং **গ**

১৫. **কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ দায়িত্বভার গ্রহণের পর কত বছর পর্যন্ত স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন?** [জ্ঞান]
ক ৪ বছর খ ৫ বছর
গ ৬ বছর ঘ ৭ বছর **খ**

১৬. **কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে বা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোনো বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সে সম্বন্ধে তারা কাকে উপদেশ দান করেন?** [অনুধাবন]
ক প্রধানমন্ত্রীকে খ রাষ্ট্রপতিকে
গ স্পিকারকে ঘ প্রধান বিচারপতিকে **খ**

১৭. **মোজাম্মেল দলীয় বিবেচনায় চাকরি পেয়েছে। সে সরকারি কাজে কী সমস্যা তৈরি করবে?** [প্রয়োগ]
ক দল প্রীতি খ অহংকার প্রদর্শন
গ দুর্নীতি ঘ দীর্ঘসূত্রিতা **ক**

১৮. **কর্মকমিশনের সাথে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কীভাবে জড়িত?** [অনুধাবন]
ক নিয়োগ ব্যবস্থাপনা তৈরিতে
খ প্রশ্নপত্র প্রণয়নে
গ সভাপতি নিয়োগে
ঘ ক্যাডার নির্ধারণে **গ**

১৯. **কর্মকমিশনের সাথে রাষ্ট্রপতির উপদেশ বিনিময়ের কারণ কী?** [অনুধাবন]
ক সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা
খ তার অদক্ষতা
গ সামরিক নির্দেশ ঘ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা **ঘ**

২০. **'সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন'— এই কথাটি বলা হয়েছে সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে?** [জ্ঞান]
ক ১৩০ নম্বর খ ১৩৫ নম্বর
গ ১৩৮ নম্বর ঘ ১৪০ নম্বর **ঘ**

২১. **বাংলাদেশে কর্মকমিশনের নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হয় কীভাবে?** [অনুধাবন]
ক দক্ষতার কারণে
খ অভিজ্ঞতার কারণে
গ দলীয় নির্বাচনের কারণে
ঘ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে **গ**

http://teachingbd.com

২২. সংসদ প্রণীত যেকোনো আইন সাপেক্ষে কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের কর্মের শর্তাবলি কার আদেশে নির্ধারিত হয়? [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি **খ**

২৩. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলো— [অনুধাবন]
i. বাংলাদেশ ব্যাংক
ii. সরকারি কর্ম কমিশন
iii. মহাহিসাব নিরীক্ষক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৪. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়— *[কু. বো. '১৬; চ.বো. '১৬; দি. বো. '১৬, '১৫; রা. বো. '১৫]*
i. নির্বাচন কমিশন ii. সরকারি কর্মকমিশন
iii. দুর্নীতি দমন কমিশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i ও iii **গ**

২৫. বাংলাদেশ কর্মকমিশনের উদ্দেশ্যগত দিক থেকে মিল পাওয়া যায়— [অনুধাবন]
i. ফ্রান্সের কর্মকমিশনের
ii. জার্মানির কর্মকমিশনের
iii. ব্রিটেনের কর্মকমিশনের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৬. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আইনের দ্বারা এক বা একাধিক কর্মকমিশন গঠন করার কথা বলা হয়— [অনুধাবন]
i. নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যে
ii. পদোন্নতি নির্ধারণের জন্যে
iii. বদলি সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণের জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৭. মাসুদ সাহেব একজন সচিব। কিছুদিন পর তিনি অবসরে যাবেন। তিনি বাংলাদেশের উপকার করেছেন তার— [প্রয়োগ]
i. মেধা দিয়ে ii. কর্মদক্ষতা দিয়ে
iii. যোগ্যতা দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৮. কর্মকমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হয়— [অনুধাবন]
i. রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায়
ii. ২০ বছরের অভিজ্ঞতায়
iii. ২০ বছরের অধিক অভিজ্ঞতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৯. সাংবিধানিক পদের অধিকারী— [অনুধাবন]
i. কর্মকমিশনের সভাপতি
ii. সরকারি কর্মচারী
iii. কর্মকমিশনের সদস্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৩০. 'নির্বাচন কমিশন' কীভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রপতির নির্দেশে খ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে
গ আন্তর্জাতিক প্রথা অনুসারে
ঘ সংবিধান অনুযায়ী **ঘ**

৩১. প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কে নিয়োগ দেন? *[চ.বো., রা. বো. '১৫; নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক আইনমন্ত্রী খ প্রধানমন্ত্রী
গ রাষ্ট্রপতি ঘ স্পিকার **গ**

৩২. কোনটি নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়? *[চ. বো. '১৫]*
ক উপজেলা চেয়ারম্যানদের শপথ বাক্য পাঠ করানো
খ ভোটার তালিকা প্রণয়ন
গ সীমানা নির্ধারণ ঘ নির্বাচন পরিচালনা **ক**

৩৩. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন ব্যবস্থায় সংগঠন, নির্বাচনি বিধিবিধান এবং নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্যে নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১১২ নং খ ১১৪ নং
গ ১১৬ নং ঘ ১১৮ নং **ঘ**

৩৪. নির্বাচন কমিশনের সভাপতি কে? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রপতি
খ প্রধান বিচারপতি
গ প্রধান নির্বাচন কমিশনার
ঘ প্রধানমন্ত্রী **গ**

৩৫. সংসদ প্রণীত আইনের বিধান সাপেক্ষে কে নির্বাচন কমিশনারদের কাজের শর্তাবলি নির্ধারণ করবেন? [জ্ঞান]
ক প্রধান বিচারপতি খ রাষ্ট্রপতি
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ নির্বাচন কমিশনার **খ**

৩৬. এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কত জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্মরত থেকেছেন? [জ্ঞান]
ক ৪ জন খ ৫ জন
গ ৬ জন ঘ ৭ জন **ঘ**

৩৭. রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পরবর্তী কত দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে? [জ্ঞান]
ক ৩০ দিন খ ৬০ দিন
গ ৯০ দিন ঘ ১২০ দিন **গ**

Teachingbd.com

৩৮. নির্বাচন কমিশনের কাজ কী? [অনুধাবন]
ক নির্বাচনি ব্যয় তদারকি করা
খ নির্বাচন পরিচালনা করা
গ নির্বাচনি প্রচার সংক্রান্ত অপরাধ তদারকি করা
ঘ দলীয় প্রভাবের অধীনে থেকে নির্বাচন করা
খ

৩৯. বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন *[গাইবান্ধা সরকারি কলেজ]*
i. ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে
ii. রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে
iii. সংসদ নির্বাচনে এলাকা নির্ধারণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

৪০. নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো— *[ব. বো. '১৫]*
i. নির্বাচন অনুষ্ঠান করা
ii. নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ
iii. ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii ও iii খ i ও iii
গ i, ii ও iii ঘ i ও ii
গ

৪১. নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে— *[রা. বো. '১৫; দি. বো. '১৫]*
i. ভোটার তালিকা বিধিমালা সংশোধন
ii. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
iii. ব্যালট বাক্স ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৪২. নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খুবই প্রয়োজন। কারণ এতে— [অনুধাবন]
i. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
ii. যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়
iii. যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

৪৩. নির্বাচন তফসিল ঘোষিত হওয়ার পর আদালত কোনো বিষয়ে—
[অনুধাবন]
i. কমিশনকে নোটিশ দিতে পারবে
ii. প্রশ্ন করতে পারবে
iii. অভিযোগের শুনানির সুযোগ দিতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
গ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৪ ও ৪৫ প্রশ্নের উত্তর দাও:
নাবিলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে চায়। তাই সে একটি সংস্থার অফিসে যায়। উক্ত অফিস তাকে একটি পরিচয়পত্র প্রদান করে। সে পরিচয়পত্র দ্বারা ভোট প্রদান ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবে। *[চা. বো. '১৫]*

৪৪. নাবিলা কোন সাংবিধানিক সংস্থার অফিসে যায়? [প্রয়োগ]
ক নির্বাচন কমিশন খ মানবাধিকার কমিশন
গ সরকারি কর্মকমিশন ঘ দুর্নীতি দমন কমিশন
ক

৪৫. উক্ত পরিচয়পত্র দ্বারা নাবিলা আর যে কাজ করতে পারবে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. পাসপোর্ট তৈরি
ii. বিমানের টিকেট বুকিং
iii. ব্যাংক হিসাব খোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৬ ও ৪৭ প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাশেদ অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্র। সামনের নির্বাচনে সে ভোট দিতে চায়। তাই সে একটি সংস্থার অফিসে যায়। অফিস তাকে একটি পরিচয়পত্র প্রদান করে। উক্ত সংস্থা দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। *[য. বো. '১৫]*

৪৬. রাশেদ যে সংস্থার অফিসে গিয়েছিল— [প্রয়োগ]
ক সরকারি কর্মকমিশন
খ নির্বাচন কমিশন
গ সিটি কর্পোরেশন
ঘ দুর্নীতি দমন কমিশন
খ

৪৭. উক্ত সংস্থার যেভাবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে— [উচ্চতর দক্ষতা]
ক যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগে
খ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে
গ দুর্নীতির তদন্ত করা
ঘ সরকারের আইনি জটিলতা নিরসনে
খ

★ অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৪৮. সরকারের আইনবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কে? [জ্ঞান]
ক অ্যাটর্নি জেনারেল খ প্রধান বিচারপতি
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ রাষ্ট্রপতি
ক

৪৯. সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কে? *[চা. বো. '১৬; দি.বো., রা. বো. '১৫; য. বো. '১৫]*
ক আইনমন্ত্রী খ প্রধান বিচারপতি
গ অ্যাটার্নি জেনারেল ঘ আইন প্রতিমন্ত্রী
গ

৫০. প্রজাতন্ত্রের পক্ষে কে জটিল আইনের ব্যাখ্যা দান করেন? *[কু. বো. '১৫]*
ক প্রধান বিচারপতি খ হাইকোর্টের বিচারপতি
গ অ্যাটর্নি জেনারেল ঘ আইনমন্ত্রী
গ

৫১. অ্যাটর্নি জেনারেল 'রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে? [জ্ঞান]
ক ৬১ (২) খ ৬২ (২)
গ ৬৩ (২) ঘ ৬৪ (২)
গ

Teachingbd.com

৫২. বাংলাদেশে কয়জন অ্যাটর্নি জেনারেল থাকবেন? [জ্ঞান]
ক একজন খ দুইজন
গ তিনজন ঘ চারজন **ক**

৫৩. সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব কোনটি? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক দলীয় দায়িত্ব পালন
খ অ্যাটর্নি জেনারেলকে সহায়তা
গ রাষ্ট্রপতির সেবা
ঘ প্রধানমন্ত্রীর আদেশ পালন **খ**

৫৪. অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলগণের নিয়োগ নীতি কোন কারণে বিঘ্নিত হয়? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক দলীয় কারণে খ যোগ্যতার অভাবে
গ রাষ্ট্রপতির প্রভাবে
ঘ আইনজীবীদের ক্ষমতাবলে **ক**

৫৫. সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— *[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*
i. পদটি সংবিধানে উল্লেখ নেই
ii. তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলকে সহযোগিতা করেন
iii. তিনি বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য আইন উপদেষ্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৬. জাতীয় সমস্যা সংবলিত যেকোনো বিচারে সব সময় বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে। এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেন— [প্রয়োগ]
i. অ্যাটর্নি জেনারেল
ii. সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
iii. স্বয়ং রাষ্ট্রপতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৭. অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো— [অনুধাবন]
i. সরকারের আইনী পরামর্শ দেন
ii. বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন
iii. সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৫৮. অ্যাটর্নি জেনারেল এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে কে নিয়োগ দান করেন? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘ আইনমন্ত্রী **ক**

৫৯. মহাহিসাব নিরীক্ষকের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো— *[ঢা. বো. '১৩]*
ক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করা
খ সরকারি হিসাবের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা
গ সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা
ঘ সরকারি সম্পত্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা **ক**

৬০. বাংলাদেশের হিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সাংবিধানিক পদ কোনটি? *[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*
ক অ্যাটর্নি জেনারেল
খ অডিটর জেনারেল
গ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল
ঘ মেজর জেনারেল **খ**

৬১. সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের হিসাব নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে একজন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক থাকবেন? [জ্ঞান]
ক ১২৫ নং অনুচ্ছেদ খ ১২৬নং অনুচ্ছেদ
গ ১২৭ নং অনুচ্ছেদ ঘ ১২৮ নং অনুচ্ছেদ **ক**

৬২. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হন সেরূপ পদ্ধতিতে আর কে অপসারিত হবেন? [জ্ঞান]
ক স্পিকার খ প্রধানমন্ত্রী
গ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
ঘ রাষ্ট্রপতি **গ**

৬৩. প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে কীভাবে? [অনুধাবন]
ক রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে
খ জনগণের দাবি অনুসারে
গ প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে
ঘ রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছানুসারে **ক**

৬৪. কোন রাষ্ট্রে সরকারের আয়-ব্যয়ের ওপর আইনসভার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে? [জ্ঞান]
ক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে
গ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ঘ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে **ক**

৬৫. জাতীয় অর্থের অভিভাবক কে? [জ্ঞান]
ক এটর্নি জেনারেল খ নির্বাচন কমিশন
গ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
ঘ দুদক **গ**

৬৬. কর্মাবসানের পর কে প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোনো পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না? [জ্ঞান]
ক আইজিপি
খ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
গ প্রাইভেটাইজেশনের চেয়ারম্যান
ঘ তথ্য কমিশনার **খ**

৬৭. প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলে তিনি তা কোথায় পেশ করেন? [জ্ঞান]
ক প্রধানমন্ত্রীর নিকট খ সচিবালয়ে
গ সংসদে ঘ মন্ত্রীদের নিকট **গ**

৬৮. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের— *[সরকারি এম এম কলেজ, যশোর]*
i. নথি ও হিসাব পরীক্ষা করবেন
ii. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দান করবেন
iii. দলিল ও নগদ অর্থ পরীক্ষা করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সোহেলের বাবা বাংলাদেশের হিসাব নিরীক্ষার প্রধান পদে নিযুক্ত ব্যক্তি। তিনি ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার পদে বহাল থাকবেন। তিনি রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন।

৬৯. সোহেলের বাবা যে পদটিতে নিযুক্ত আছেন তার নাম কী? [প্রয়োগ]

ক মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
খ কর্মকমিশন সভাপতি
গ অ্যাটর্নি জেনারেল
ঘ কর্মকমিশন সদস্য

ক

৭০. সোহেলের বাবা যেসব দায়িত্ব পালন করে থাকেন— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করেন
ii. সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষা করেন
iii. আইনের জটিল প্রশ্নে মত প্রকাশ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য সার্চ কমিটির দৃষ্টিতে সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন মি. 'ক'। কিন্তু মি. 'ক' ইতোপূর্বে জাতীয় অর্থের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিধায় তাকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

৭১. মি. 'ক' পূর্বে কোন পদে অধিষ্ট ছিলেন? [প্রয়োগ]

ক কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান
খ প্রধান নির্বাচন কমিশন
গ অ্যামিকাস কিউরি
ঘ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

ঘ

৭২. মি. 'ক' এর ক্ষেত্রে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. তিনি সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন
ii. বর্তমানে তার বয়স ৬৫ এর বেশি
iii. তিনি তার রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিতেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

★★ দুর্নীতি দমন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৭৩. কত সালে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়? [জ্ঞান]

ক ২০০৪ সালে খ ২০০৮ সালে
গ ২০১০ সালে ঘ ২০১২ সালে

ক

৭৪. দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয় কত সালে? *[চা. বো. '১৬; কু. বো. '১৬; য. বো. '১৬]*

ক ২০০২ খ ২০০৩
গ ২০০৪ ঘ ২০০৫

গ

৭৫. দুর্নীতি দমনের পূর্বশর্ত হলো— *[য. বো. '১৫]*

ক রাজনৈতিক অঙ্গীকার
খ নৈতিকতার অভাব
গ আইনের শাসন
ঘ গণ গ্রেফতার

গ

৭৬. দুর্নীতি দমন কমিশন কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে? *[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]*

ক ২০০২ খ ২০০৩
গ ২০০৪ ঘ ২০০৫

গ

৭৭. জনগণের মধ্যে কোন গুণটি সৃষ্টি করলে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হবে? [জ্ঞান]

ক সততা খ অসততা
গ হঠকারিতা ঘ পরাধীনতা

ক

৭৮. দুদকের চেয়ারম্যান কত বছর পর্যন্ত নিজ পদে বহাল থাকবে? [জ্ঞান]

ক ৫ বছর খ ৪ বছর
গ ৩ বছর ঘ ১০ বছর

খ

৭৯. প্রশাসন ও সমাজের দুর্নীতি দমন করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? [জ্ঞান]

ক তথ্য কমিশন
খ দুর্নীতি দমন কমিশন
গ বাংলাদেশ কর্ম কমিশন
ঘ নির্বাচন কমিশন

খ

৮০. কত তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতির ফলে দুদক বিল আইনে পরিণত হয়? [জ্ঞান]

ক ২০ ফেব্রুয়ারি খ ২১ ফেব্রুয়ারি
গ ২২ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৩ ফেব্রুয়ারি

ঘ

৮১. কত সালে সরকার দুর্নীতি দমন বিধিমালা প্রণয়ন করেন? [জ্ঞান]

ক ২০০৩ সালে খ ২০০৫ সালে
গ ২০০৭ সালে ঘ ২০০৯ সালে

গ

৮২. কত সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হয়? [জ্ঞান]

ক অন্যূন ২ সদস্যের
খ অন্যূন ৪ সদস্যের
গ অন্যূন ৫ সদস্যের
ঘ অন্যূন ৭ সদস্যের

খ

৮৩. দুদক যে সকল অপরাধের তদন্ত ও অনুসন্ধান করে— [অনুধাবন]

i. মানি লন্ডারিং
ii. সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে
iii. ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ আকাশচুম্বী হলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

Teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৮: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

প্রশ্ন ▶১ নির্বাচন প্রতিনিধি বাছাইয়ের উত্তম পন্থা। বাংলাদেশে নিয়মিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি ভিন্ন। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনসমূহে বাংলাদেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়।

[ঢা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]

ক. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য যারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদেরকে নির্বাচকমণ্ডলী বলে।

নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটাররাই হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য যোগ্য বিচারক। বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স্ক যারা ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদেশের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার বেশকিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় নাম থাকা আবশ্যক। এদেশে সকল নাগরিকের জন্য 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি প্রচলিত। প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা থাকে। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ এবং জাতীয় সংসদের ৩৫০ আসনের মধ্যে ৩০০টি সাধারণ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আর বাকি ৫০ টি সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যগণ পরোক্ষভাবে ৩০০ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল নির্বাচন গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতিতে ভোটারগণ প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের পাশে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত সীলমোহর ব্যবহার করেন। এতে ভোট গণনার কাজে সুবিধা হয়। এদেশের নির্বাচনে সমগ্রদেশকে জনসংখ্যার সমতার ভিত্তিতে ৩০০টি একক প্রতিনিধি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এছাড়া সকল জন প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় একক নির্বাচনি এলাকা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে। এই কমিশনই নির্বাচনি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এদেশের সংবিধানে নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় EVM ব্যবহার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর সাহায্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ ও গণনার কাজ করা হয়।

ঘ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সরকার নয়, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এ দেশের জনগণ নির্বাচনে সঠিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করে বলেই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখছে। বাংলাদেশের নাগরিকগণ জেনে, বুঝে সকল প্রভাবমুক্ত হয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। আর এভাবে ভোট প্রয়োগের ফলে সৎ যোগ্য ও দক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। আর এমন জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে পারলে দেশে আইনের শাসন কায়েম হবে, দুর্নীতি দূর হবে। কেবল নিজের ভোটদানের মাধ্যমেই একজন নাগরিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। অন্যকে ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে ভোটদানে উৎসাহিত করাও নাগরিকের কর্তব্য। নির্বাচনি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কেবল সরকার বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সকল প্রকার সন্ত্রাসী অপতৎপরতা বন্ধে নাগরিক সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সরকারি সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তা সত্ত্বেও নির্বাচনকে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলির মধ্যে একটি নির্বাচন হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। সে নির্বাচনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল 'দিন বদলের ডাক'। অন্য একটি বড় রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদান প্রভৃতি নতুন উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয় এদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে, এবং দীর্ঘ দুই বছরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরে আসে।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. সর্বজনীন ভোটাধিকার কাকে বলে? ১

খ. নির্বাচনে কেন নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন কীভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহর, পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

খ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পরিচালিত। নাগরিকগণ তাদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিবার্চন করে আইন প্রণয়ন এবং সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। আর প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণ তথা নাগরিকদের পক্ষেই শাসন পরিচালনা করে থাকে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্তই হচ্ছে নির্বাচন। এজন্যই বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অর্থাৎ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল, 'দিন বদলের ডাক'। অন্য একটি বড় দলের স্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এ নির্বাচনেই প্রথম ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এখানে মূলত বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

Teachingbd24.com

কেননা আমরা জানি, ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর শুরু হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব জোট ও দলের নির্বাচনি প্রচারণা। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনি ইশতেহারে চাল-ডাল-তেল-সারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। নির্বাচনি ইশতেহারে শেখ হাসিনা 'দিন বদলের ডাক' দেন। বিএনপি ও চার দলীয় জোটের নির্বাচনি স্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এ বারই প্রথম দেশের কোনো নির্বাচনে মিছিল, শ্লোগান, শোডাউন ছাড়া নির্বাচনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। এছাড়া এ নির্বাচনেই প্রথমবারের মতো স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদান করা হয়। এ নির্বাচন নিয়ে যাবতীয় আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা দূর করে ২৯ ডিসেম্বর পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর উদ্দীপকেও এ নির্বাচনের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বৈধ সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে আসে।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেয়াদ শেষে ক্ষমতা ত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করে, তখন থেকেই দেশে রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়। তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী বিধান ছিল যে, কোনো দল ক্ষমতা হস্তান্তরের ৯০ দিন পর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং মধ্যবর্তী ৯০ দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া তদারকি করবে। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের পদত্যাগের পর ফখরুদ্দীন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৯০ দিন পর, সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দুই বছর পর। আর এভাবে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ অসহনীয় অবস্থার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০৮ সালের নির্বাচন ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ নির্বাচন সংক্রান্ত সব আশঙ্কা ও গুজবকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ দীর্ঘ দুই বছর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসনে ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘ দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান ঘটিয়ে একটি সুষ্ঠ-সুশৃঙ্খল নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরে আসে।

প্রশ্ন ▶৩ মিতু তার বাবার কাছে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনের গল্প শোনে। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের মুখে ঐ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন। *[চা. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. দুর্নীতি দমন কমিশন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইল ফলক'- তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৪ সালে।

খ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। উক্ত বিষয়ে প্রণীত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপ্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করবেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পূর্বে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারি এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। দুই দলের আন্দোলনের একপর্যায়ে এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় ব্যক্তি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন করেন এবং এ কমিশনের অধীনে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মিতু তার বাবার কাছ একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের গল্প শোনে। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের একপর্যায়ে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং নির্দলীয় ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে উপ-রাষ্ট্রপতির সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় এক মাইলফলক - বক্তব্যটি সঠিক।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। দেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়। কার্যত এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ফলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে যায়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে কেননা এটিই ছিল সামরিক শাসন পরবর্তী সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে প্রথম নির্বাচন। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পুনরাগমন ঘটে। এ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক দল ও প্রার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ভোটাররাও বিপুল উৎসাহে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এই নির্বাচন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ছিল তা সর্বজনস্বীকৃত। আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত এ নির্বাচন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে।

উক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় এক মাইলফলক হয়ে আছে।

প্রশ্ন ▶৪ 'ক' রাষ্ট্রে কেবল সর্বনিম্ন ২১ বছর বয়স্ক পুরুষ নাগরিকদের ভোটাধিকার রয়েছে। নাগরিকগণ প্রকাশ্য ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু এ রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নির্বাচন সম্পর্কে উদাসীন। বেশিরভাগ নাগরিক নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে না এবং প্রার্থী সম্পর্কেও তারা ভালোভাবে অবগত হতে আগ্রহী নন। *[চ. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৭; স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বাংলাদেশে প্রথম কত সালে সংসদ নির্বাচন হয়? ১

Teachingbd24.com

খ. ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর অসামঞ্জস্যতা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সংসদ নির্বাচন হয়।

খ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না হওয়ার সম্ভাবনায় ভোটার উপস্থিতি কম ছিল।

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার না থাকায় আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলামী ও জাসদ নির্বাচন বর্জন করে। উপরন্তু রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন জমা দেয়া ও মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং নির্বাচনের দিন সর্বাত্মক হরতাল পালন করে। ফলে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং হরতাল, সহিংস আন্দোলন ইত্যাদির কারণে উক্ত নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১২২ (২) নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সী নারী ও পুরুষের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে ২১ বছর বয়স্ক কেবল পুরুষ নাগরিকরা ভোট দিতে পারেন। অর্থাৎ 'ক' রাষ্ট্রের নাগরিকগণ প্রকাশ্যে ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিকগণ গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সুতরাং, উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন— ভোট দেওয়ার বয়স, ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং ভোটদান পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভূমিকা যথার্থ নয়।

উদ্দীপকের রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নির্বাচন সম্পর্কে উদাসীন। তারা বেশিরভাগ নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করে না। প্রার্থী সম্পর্কে তারা ভালোভাবে অবগত হতে আগ্রহী নয়, যা আদর্শ নাগরিকের বৈশিষ্ট্য নয়। তাদের এই ভূমিকায় নাগরিক অধিকার হরণ হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়। বস্তুত, নাগরিকগণ যখন তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন না হয় তখন অগণতান্ত্রিক তথা স্বৈরাচারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকায় প্রতিফলিত হয়।

জনগণ যদি প্রার্থী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত না হয় তাহলে অদক্ষ, অশিক্ষিত, অরাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ না নিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণ অবগত হতে পারে না। ভবিষ্যৎ শাসকগোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না এবং নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো অগণতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রচারণা থাকলে জনগণ তার প্রতিবাদ করতে পারে না। যার ফলে জনগণের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়ে মূর্খের সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকা যথার্থ নয়। তাদেরকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, ভালো যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে, নির্বাচন সম্পর্কিত বিধি জেনে প্রতিনিধি নির্বাচন করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ একটি উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিকের কোনো বিকল্প নাই।

প্রশ্ন ▶৫ সালমান সম্প্রতি ১৮ বছরে পদার্পণ করেছে। আগামী একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সে ভোট দিতে পারবে বলে খুবই উৎফুল্ল। সে ঠিক করেছে ভোটের আগে সমস্ত দিক লক্ষ্য রেখে তবেই যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান করবে। কেননা যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাবার সাথে এসব বিষয় নিয়ে সে প্রায়শই আলোচনা করে। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সর্বজনীন ভোটাধিকার কাকে বলে? ১

খ. গণভোট বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে বাংলাদেশে উক্ত বিষয়টির কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত বিষয়টির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে"— মূল্যায়ন কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, গুণ বা উপযুক্ততা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখন তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।

খ গণভোট বলতে কোনো বিষয়ে জনমত যাচাইকে বোঝানো হয়। যদি কোনো বিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের আইনই যথেষ্ট বলে মনে না হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের পূর্বে রাষ্ট্রপতি জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেন। এটাই গণভোট নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী বা ভোটার হবার যোগ্যতা এবং সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স্ক নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভোটদান সম্পাদিত হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। অর্থাৎ মেয়াদান্তে নির্ধারিত সময়ে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে কোনো কারণে যদি আসন শূন্য হয়, নির্ধারিত সময়ে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সালমান নির্বাচনে ভোটপ্রদান করবে। সে উক্ত নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করবে। কেননা সঠিক প্রার্থী নির্ধাচিত করতে না পারলে উন্নয়ন সম্ভব হবে না। ভোটারদের সচেতনতার মাধ্যমে সৎ, দক্ষ ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়। মোটকথা, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও সচেতন ভোটাররাই পারে উপযুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে।

ঘ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। কারণ নাগরিকগণ সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। এরূপ একটি নির্বাচন আয়োজন করার দায়িত্ব প্রধানত নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু নির্বাচকমন্ডলী অর্থাৎ ভোটারদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও এক্ষেত্রে কোনো অংশে কম নয়। ভোটারদের সতর্ক দৃষ্টি একটি সুন্দর নির্বাচনের পূর্বশর্ত।

সৎ, দক্ষ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটারদের পছন্দই প্রধান। কিন্তু যদি এ ভোটাররা অসচেতন থাকেন কিংবা কোনোরূপ প্রভাবিত হয়ে ভোট দিয়ে থাকেন, তবে নির্বাচন কমিশনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা সম্ভব নয়। ভোটারদেরকে যদি অর্থ দিয়ে প্রভাবিত করা যায় তবে নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট হতে বাধ্য। তাই

Teachingbd24.com

ভোটারেরা না চাইলে অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে না। গণতন্ত্রকে সংহত করতে চাইলে তাই সবার আগে ভোটারদের সচেতনতা প্রয়োজন। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নির্বাচনে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৬ শমির বয়স গত বছর ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে। এবার ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে ভীষণ খুশি। কেননা আগামীতে যেকোনো নির্বাচনে সে ভোট প্রদান করতে পারবে এবং তার পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করতে পারবে। এজন্য সে এখন থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে। *[হলি ক্রস কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শমির ভোটাধিকার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলন ঘটেছে? ৩

ঘ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ করার জন্য তুমি কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে? লিখ। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

খ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বোঝায়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এর প্রতিনিধিগণ এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরা নিজ নিজ এলাকার জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে শমির ভোটাধিকারপ্রাপ্তি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

নির্বাচন প্রক্রিয়া বলতে নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো বোঝায়। ভোটার তালিকা প্রণয়ন; নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ; নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা; রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ; মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ ও বাছাই; প্রতীক বন্টন ও ব্যালট পেপার মুদ্রণ; ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা; প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ; ব্যালট বাক্স বিতরণ; ভোট গ্রহণ; ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার অংশ। অর্থাৎ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া বলে। এ প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটার নির্ধারণ করা।

উদ্দীপকের শমির বয়স ১৮ বছর হওয়ায় সে সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের ভোটার হয়েছে, যা বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটার নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, শমির বয়স বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নির্বাচকমণ্ডলী নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

ঘ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ করার জন্য আমি যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করবো সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের কতকগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। একটি যুগোপযোগী আইনি কাঠামো; নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা ও যথাযথভাবে নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ; স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও যুগোপযোগী নির্বাচন কমিশন এবং নিরপেক্ষ সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রভৃতি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পাদন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনি মাঠে কালো টাকা ও পেশিশক্তির অনুপস্থিতি, সর্বোপরি নাগরিকের অংশগ্রহণ। কেননা, নাগরিকের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো নির্বাচন অর্থবহ হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। নাগরিকগণ জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নাগরিকগণ প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। এছাড়া ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরী, নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ও সংস্কার, নির্বাচন কমিশন ও সরকারের নিরপেক্ষতা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, আইনের শাসন প্রভৃতি অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

প্রশ্ন ▶৭ রিমা তার বাবার কাছে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনের গল্প শোনে। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের মুখে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. নির্বাচন কী? ১

খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার মাইলফলক"— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাই বা নির্বাচন করার একটি প্রক্রিয়া।

খ যখন ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, গুণ বা উপযুক্ততা নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়, তখন তাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। বাংলাদেশে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি মেনে চলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পূর্বে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে এবং তৎকালীন এরশাদ সরকারকে স্বৈরাচারি হিসেবে আখ্যায়িত করে। দুই দলের আন্দোলনের একপর্যায়ে এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় ব্যক্তি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন করেন এবং এ কমিশনের অধীনে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেন। উদ্দীপকেও দেখা যায়, রিমা তার বাবার কাছ থেকে বাংলাদেশের যে তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা জানতে পেরেছে, সে নির্বাচনের পূর্বেও প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে এবং তৎকালীন সরকারকে স্বৈরাচারী আখ্যা দেয়। আন্দোলনের একপর্যায়ে সরকার পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় ব্যক্তিকে

https://teachingbd24.com

উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে এবং উপ-রাষ্ট্রপতির অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইলফলক— বক্তব্যটি সঠিক।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়। কার্যত এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ফলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে যায়। ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রপতি এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ঐদিনই রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক দল ও প্রার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ভোটাররাও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত এ নির্বাচন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে। এই নির্বাচন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ছিল তা সর্বজনস্বীকৃত। রাজনৈতিক ভাষ্যকার, সাংবাদিক, বিশ্লেষক সকলেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এরূপ অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পূর্বে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

উক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইলফলক হয়ে আছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ 'ক' রাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ের এক নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ শেষে বিদেশী পর্যবেক্ষকদল এক বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্ট তুলে ধরেন। তাদের পর্যালোচনায় যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে সেগুলো হলো- সর্বজনীন ভোটাধিকার, গোপন ভোটদান পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন, ছবিসহ ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র, নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রভৃতি। পরিশেষে তারা মন্তব্য করেন— 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচন ব্যবস্থা উত্তম। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বেসরকারি বিল কাকে বলে? ১

খ. জাতীয় সংসদের গঠন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কোন কোন ক্ষেত্রে 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংসদে প্রাথমিকভাবে সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিলকে বেসরকারি বিল বলা হয়।

খ ১৯৭২ সালের সংবিধান মোতাবেক ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। তন্মধ্যে ৩০০ জন প্রত্যক্ষ ভোটে একক নির্বাচনি এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে ৫০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে নারীদের জন্য। তবে নারীরা সাধারণ আসনেও নির্বাচিত হতে পারেন।

গ সর্বজনীন ভোটাধিকার, গোপন ভোটদান পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন, ছবিসহ ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র এবং নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স্ক নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভোটদান সম্পাদিত হয়। আবার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যগণ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পাশাপাশি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিও চালু রয়েছে। যেমন— বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যগণ পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশের নির্বাচনে কারচুপি ও জাল ভোট রোধের জন্য ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি ও জাতীয় পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। এ জন্যই বলা যায় যে, 'ক' দেশের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ বিদেশী পর্যবেক্ষক 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচন ব্যবস্থা উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন।

উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়—

১. সর্বজনীন ভোটাধিকার উত্তম নির্বাচনের জন্যে অপরিহার্য শর্ত। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি যথার্থভাবে ফুটে ওঠে।

২. প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ।

৩. সহজ ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা কায়েম করা যায়। এ পদ্ধতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

৪. উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে গোপনে ভোটদান ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

৫. একক প্রতিনিধি নির্বাচনি এলাকাকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এতে নির্বাচন ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা প্রকাশ পাবে।

৬. উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এ নিয়ন্ত্রণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দুর্নীতিমুক্ততা। কারচুপি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব নির্বাচিত সরকারের স্বচ্ছতাকে ব্যহত করে। এ জন্যে দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থাই উত্তম নির্বাচন ব্যবস্থা।

৮. নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ভিন্ন রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করলে সমালোচনার ভয়ে কোনো দল কারচুপির আশ্রয় নিতে পারে না। ফলে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সহজ হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পর্যবেক্ষক ও এ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই বলা যায় তাদের মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৯ বিদ্যালয়ের আসন্ন শিক্ষক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ দুদলে ভাগ হয়ে গেলেন। তাদের দাবি একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের। অবশেষে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আশ্বাসে পদত্যাগ করতে বাধ্য শিক্ষকগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। *[পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. জেনারেল এরশাদ কত সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন? ১

খ. জনপ্রতিনিধি কে? ২

গ. উদ্দীপকে আনোয়ারুল হকের ভূমিকার সাথে ১৯৯১ সালের নির্বাচনের বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ভূমিকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষকগণের সন্তুষ্টি যেন ১৯৯১ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর সন্তুষ্টিই প্রতিচ্ছবি— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

Teachingbd24.com

খ যিনি জনগণের হয়ে তাদের দাবি-দাওয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেন তাকে জনপ্রতিনিধি বলা হয়।

নাগরিকগণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ এবং দাবি-দাওয়ার কথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরেন। যেমন— বাংলাদেশের সংসদ সদস্যগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যার কথা সরকারের নিকট তুলে ধরেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেন।

গ উদ্দীপকের আনোয়ারুল হকের ভূমিকার সাথে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ভূমিকার সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পূর্বে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে এবং তৎকালীন এরশাদ সরকারকে স্বৈরাচারী হিসেবে আখ্যায়িত করে। দুই দলের আন্দোলনের একপর্যায়ে এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় ব্যক্তি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন করেন এবং এ কমিশনের অধীনে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, বিদ্যালয়ের আসন্ন শিক্ষক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ দুদলে ভাগ হয়ে একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের দাবি করেন। অবশেষে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হক সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলে ক্ষমতাসীনরা পদত্যাগ করেন। আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হলে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ সন্তুষ্ট হন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের শিক্ষকগণের সন্তুষ্টি যেন ১৯৯১ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর সন্তুষ্টিরই প্রতিচ্ছবি- কথাটি যথার্থ।

১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রপতি এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ঐদিনই রাষ্ট্রপতি এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক দল ও প্রার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ভোটাররাও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এই নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ছিল। উক্ত নির্বাচনের ফলাফল অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়। কার্যত এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ফলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে যায়। রাজনৈতিক ভাষ্যকার, সাংবাদিক, বিশ্লেষক সকলেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এরূপ অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পূর্বে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

উক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষকগণের সন্তুষ্টি ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সন্তুষ্টিরই প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶ ১০

সংসদের মেয়াদ — ১১ দিন
গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস
১৫তম সংশোধনীতে সেই বিল বাতিল

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাংলাদেশে প্রথম কত সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো কোন জাতীয় নির্বাচনের ইঙ্গিত দিচ্ছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. ছকের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণপূর্বক এবং পাঠ্যবইয়ের আলোকে তৎকালীন সরকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান।

নাগরিকগণ তাদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিবার্চন করে আইন প্রণয়ন এবং সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। আর প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণ তথা নাগরিকদের পক্ষেই শাসন পরিচালনা করে থাকে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্তই হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন। এজন্যই বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

গ ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকে দেখানো হচ্ছে যে, ১১ দিন মেয়াদি উক্ত সংসদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হয় এবং তা পরবর্তীতে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়। উক্ত ঘটনার প্রত্যেকটিই ছিল ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচনের পরবর্তী সরকারের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) অধীনে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদসহ অন্যান্য সকল দল বর্জন করে। ফলে বিএনপি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭৮টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু বর্জনকারী বিরোধী দলগুলোর অনবরত আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হয়। স্বল্পমেয়াদী উক্ত সংসদে গুরুত্বপূর্ণ "তত্ত্বাবধায়ক সরকার" বিল পাস করে সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়। পরবর্তীতে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচনের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

ঘ পাঠ্যবইয়ের আলোকে এবং ছকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তৎকালীন সময়কার অর্থাৎ ৬ষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন ও তৎপরবর্তী গঠিত সরকারের সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল অস্থিতিশীল।

১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসীন বিএনপি-এর অধীনে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, জেপি-সহ প্রায় সব দল বর্জন করে। ফলে প্রহসনের নির্বাচনে বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭৮ আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে।

প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাবে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী জোট মিলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। বিরোধীদের যৌক্তিক আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হন। পদত্যাগের পূর্বে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী এনে বিরোধী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী "তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল" পাস করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং উক্ত সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

https://teachingbd24.com

তৎকালীন সময়ে দেশে বিরাজমান উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ছিল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা আশা পোষণ করেন, এই নির্বাচনি ফলাফল দেশে সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ভিত্তি রচনা করবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ যুগের অগ্রগতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের কোনো ছোঁয়া লাগেনি রশিদ মিয়ার মনে। তাই সে নারীর অধিকারে, ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে না। সে কখনোই চায় না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি সে তার মেয়েদেরও ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয় না। সে ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেনি। *[দিউ গভ: ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং-৭]*

ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কবে? ১

খ. কীভাবে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রশিদ মিয়া বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় কোন বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রশিদ মিয়ার ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ।

খ নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হয়।

এ ব্যবস্থায় জনগণের অভাব, অভিযোগ জানার এবং সেগুলো দূরীকরণে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। বস্তুত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়। তাই বলা যায়, নির্বাচন সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকের রশিদ মিয়া বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছেন।

নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকারে কথা বলা হয়েছে। ভোটদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান এবং এটা সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। একজন পুরুষের ভোট যেমন মূল্যবান, তেমনি একজন নারীর ভোটও মূল্যবান। এক্ষেত্রে নারীকে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়া কিংবা প্রভাবিত করা যাবে না। আর এটাই হলো সর্বজনীন ভোটাধিকারের মূল বৈশিষ্ট্য।

উদ্দীপকে দেখা যায় রশিদ মিয়া নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন না। সে চায় না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি সে তার স্ত্রী ও মেয়েদেরও ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয় না। সে ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেনি। এর মাধ্যমে রশিদ মিয়া বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকারকে অস্বীকার করেছেন। ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিক তার প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নেয়। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। ভোটাধিকার বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীকে দূরে রাখা যাবে না।

ঘ উদ্দীপকের রশিদ মিয়ার ভূমিকায় শাসনব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আমি মনে করি।

গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত রেখে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সর্বজনীন ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর ফলে নারী ও পুরুষ সবাই ভোটার এবং প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একজন পুরুষ যতটুকু অবদান রাখতে পারে, সুযোগ পেলে একজন নারীও সেরূপ অবদান রাখতে পারে। আর আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। তাই তাদেরকে বাদ দিয়ে দেশে দক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীকে প্রথম মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। আর নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হলে তারা দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু উদ্দীপকের রশিদ মিয়ার মনোভাব নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখবে। তারা দেশের জনশক্তির অর্ধেক অংশ হওয়া সত্ত্বেও কোনো অবদান রাখতে পারবে না।

আলোচনা শেষে বলা যায়, নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন ভোটাধিকার অবমাননায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ১২ নির্বাচন প্রতিনিধি বাছাই এর উত্তম পন্থা। বাংলাদেশে নিয়মিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি ভিন্ন। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনসমূহে বাংলাদেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়। *[লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৯]*

ক. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. নির্বাচকমণ্ডলী বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য যারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদেরকে নির্বাচকমণ্ডলী বলে।

নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটাররাই হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য যোগ্য বিচারক। বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স্ক যারা ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদেশের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার বেশকিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় নাম থাকা আবশ্যক। এদেশে সকল নাগরিকের জন্য 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি প্রচলিত। প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা থাকে।

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল নির্বাচন গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতিতে ভোটারগণ প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের পাশে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত সীলমোহর ব্যবহার করেন। এতে ভোট গণনার কাজে সুবিধা হয়। এদেশের নির্বাচনে সমগ্রদেশকে জনসংখ্যার সমতার ভিত্তিতে ৩০০টি একক প্রতিনিধি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এছাড়া সকল জন প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় একক নির্বাচনি এলাকা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে। এই কমিশনই নির্বাচনি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এদেশের সংবিধানে নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের

Teachingbd24.com

বিধান রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় EVM ব্যবহার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর সাহায্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ ও গণনার কাজ করা হয়।

ঘ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকদের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সরকার নয়, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এ দেশের জনগণ নির্বাচনে সঠিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করে বলেই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখছে।

বাংলাদেশের নাগরিকগণ জেনে, বুঝে সকল প্রভাবমুক্ত হয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। আর এভাবে ভোট প্রয়োগের ফলে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। আর এমন জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে পারলে দেশে আইনের শাসন কায়েম হবে, দুর্নীতি দূর হবে। কেবল নিজের ভোটদানের মাধ্যমেই একজন নাগরিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। অন্যকে ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে ভোটদানে উৎসাহিত করাও নাগরিকের কর্তব্য। নির্বাচনি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কেবল সরকার বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সকল প্রকার সন্ত্রাসী অপতৎপরতা বন্ধে নাগরিক সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা। এক্ষেত্রে নাগরিকগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সরকারি সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তা সত্ত্বেও নির্বাচনকে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ যুগের অগ্রগতিতে অনেক পরিবর্তন হলেও শহরে বসবাসরত মাহমুদ সাহেবের মনে তার কোনো ছোঁয়া লাগেনি। তাই তিনি নারীদের ঘরের বাইরের কাজ, কোনো ধরনের ক্ষমতা প্রদানে বিশ্বাস করেন না। তিনি কখনই চান না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি তিনি তার মেয়েদেরকেও ভোটকেন্দ্রে যেতে দেন না। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত বিচক্ষণতা সব নারী এখনও অর্জন করতে পারেনি।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাংলাদেশের কোন সংস্থা নির্বাচন পরিচালনা করে? ১

খ. প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে কী বলে? ব্যাখা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহমুদ সাহেব নির্বাচন ব্যবস্থার কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করেছেন? ব্যাখা করো। ৩

ঘ. উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবমাননায় শাসন ব্যবস্থায় কীরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে।

খ প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে বলা হয় নির্বাচন।

নির্বাচন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দেশের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি নিয়মিত ও দীর্ঘ মেয়াদি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই হলো নির্বাচন। এটি মূলত প্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি প্রক্রিয়া। এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক এবং অপরিহার্য বিষয়। নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই যোগ্য প্রতিনিধি বাছাই করে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

গ উদ্দীপকের মাহমুদ সাহেব বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ প্রতিনিধি বাছাইয়ের কাজটি করে থাকে। সেখানে নির্বাচন ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদানের অধিকারী।

অথচ উদ্দীপকের মাহমুদ সাহেব স্ত্রী ও মেয়েদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেন না। আবার তিনি নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাসও করেন না। বরং এটা ভাবেন যে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেনি। এজন্যই বলা যায়, উদ্দীপকের মাহমুদ সাহেব বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকারকে অস্বীকার করেছেন।

ঘ উক্ত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্য অবমাননায় শাসনব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আমি মনে করি।

গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত রেখে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সর্বজনীন ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আবার সকল নাগরিকেরই ভোটদানের সমান অধিকার রয়েছে। সকলের ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়। তা না হলে এর গুরুত্ব থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি করে ভোট রয়েছে। প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য পৃথক ভোটার তালিকা থাকবে। নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রভেদে কোনো ভোটার তালিকা থাকবে না। সকলেই সমান।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন ব্যতীত বাকি সময় সরকার পরিবর্তনের একমাত্র ধারক হিসেবে কাজ করছে নির্বাচন। মূলত জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমেই তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করছে।
অতএব আলোচনা শেষে বলা যায়, সর্বজনীন ভোটাধিকার ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রনির বয়স ১৮ বছর হওয়ায় ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে খুশি কেননা আগামীতে সে ভোট দিবে এবং পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন করতে পারবে। সে এখন বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২

গ. উদ্দীপকে রনির ভোটাধিকার প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ৩

ঘ. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ করার জন্য তুমি কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা সচল রাখা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে প্রত্যেক নাগরিক ভোটদানের অধিকারী।

২. বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রয়োগ করে থাকে। ভোট প্রদানের গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রনির বয়স ১৮ হওয়ায় সে ভোটার হয়েছে। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে আগামীতে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। এগুলো বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্য বহন করে তা নিচে দেওয়া হলো-

https://teachingbd24.com

সর্বজনীন ভোটাধিকার: ১৮ বছর বয়সের সকল নাগরিক ভোটদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারী।

অভিন্ন ভোটার তালিকা: সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনে এলাকার জন্য একটি অভিন্ন ভোটার তালিকা থাকবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করে কোনো বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না।

স্বাধীন নির্বাচন কমিশন: নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং সংবিধান ও আইনের অধীন হবে।

গোপন ভোট পদ্ধতি: গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনি কাজ সমাপ্ত হয়।

ঘ বাংলাদেশের নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের কতকগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। একটি যুগোপযোগী আইনি কাঠামো, নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা ও যথাযথভাবে নির্ধারিত নির্বাচনি এলাকা এসব পূর্বশর্তের অন্তর্ভুক্ত। এতে আরো অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও যুগোপযোগী নির্বাচন কমিশন এবং নিরপেক্ষ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সর্বোপরি নাগরিকের অংশগ্রহণ। কেননা নাগরিকের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো নির্বাচনই অর্থবহ হতে পারে না।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকগণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জনমত তৈরী করে এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দানের জন্য প্রচারণা চালায়। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করে। ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকগণ সার্বভৌম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। নাগরিকগণ তথা নির্বাচকমণ্ডলী জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার ও বিরোধী দল জনমতের ভিত্তিতে নিজেদের কার্যক্রম নির্ধারণ করে। যার প্রভাব পড়ে নির্বাচনি ফলাফলের উপর। ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এছাড়া নাগরিকগণ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগরিকের অংশগ্রহণ সর্বজনীন নির্বাচনকে অর্থবহ ফলপ্রসূ ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'ক' রাষ্ট্রটিতে রাজতন্ত্র এবং 'খ' রাষ্ট্রটিতে গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। 'ক' রাষ্ট্রটিতে নির্বাচনব্যবস্থা নেই। কিন্তু 'খ' রাষ্ট্রটিতে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও কাঠামো সচল করার লক্ষ্যে নির্বাচনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন কাজ সম্পন্ন হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণই সরকার পরিচালনা করেন। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত 'খ' রাষ্ট্রটির নির্বাচনব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ও নির্বাচন ব্যবস্থার সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ'— উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো-

১. বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা সচল রাখা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক, অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে প্রত্যেক নাগরিক ভোটদানের অধিকারী।

২. বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রয়োগ করে থাকে।

গ 'খ' রাষ্ট্রটির নির্বাচনব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ও নির্বাচনব্যবস্থায় সাদৃশ্য রয়েছে। নিচে তা দেখানো হলো—

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রে লক্ষ্য করা যায়, এ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও কাঠামো সচল করার লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটার কর্তৃক জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন এবং সরকার পরিচালনা করেন। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু রয়েছে। সংসদীয় সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক। সরকার গঠিত হয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। বাংলাদেশের নির্বাচনব্যবস্থায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স থেকে বাংলাদেশের সব নাগরিক ভোটদানের অধিকারী হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে জনসংখ্যার সমতার ভিত্তিতে এবং ভৌগোলিক অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিবেচনায় রেখে প্রতিনিধি নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এক একটি নির্বাচনি এলাকা হতে একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিরাই সরকার গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

সুতরাং 'খ' রাষ্ট্রের নির্বাচনব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি ও নির্বাচনব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে, যা উপরোক্ত আলোচনাই প্রমাণ করে।

ঘ 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ' উক্তিটির যথার্থতা নিচে নির্ণয় করা হলো—

আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এ শাসনব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এ নির্বাচিত প্রতিনিধির ওপরই শাসনব্যবস্থা বা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ জনগণ তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জাতীয় সংসদে প্রেরণ করে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। নির্বাচন নাগরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে চায়। তাই নির্বাচন প্রাক্কালে নাগরিকবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ্য ও দক্ষ প্রার্থীর পক্ষে সংঘবদ্ধ হয় এবং তাদের পছন্দের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন হলো জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশের বাহন। জনগণের সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জনগণ ও নাগরিকের যে অংশ ভোটার, তারা নাগরিক এবং জনগণের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। জনগণই যে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটদানের মাধ্যমে। নাগরিকবৃন্দ সর্বদা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষের শক্তি। সুশাসন, দায়িত্বশীলতা, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকারের প্রতি নাগিরকগণ সর্বদা শ্রদ্ধাশীল। নাগরিকগণ নির্বাচনের মাধ্যমে এসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ও বাস্তবায়ন দেখতে চায়। সেই লক্ষ্যে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নাগরিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং সরকারের একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা দূর করেন। সুতরাং 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ' এ কথাটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোর মধ্যে একটি নির্বাচন হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। সে নির্বাচনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল 'দিন বদলের ডাক'। অন্য একটি বড় রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদান প্রভৃতি নতুন উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয় এদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে এবং দীর্ঘ দুই বছরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরে আসে। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

https://teachingbd24.com

ক. বাংলাদেশে প্রথম কত সালে সংসদ নির্বাচন হয়? ১
খ. নারীর ভোটাধিকার কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন কীভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে।

খ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম। আর জনগণের অর্ধেক নারী, তাই নারীর ভোটাধিকার প্রয়োজন।

আধুনিক বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই নারী। এ অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করে গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব নয়। ভোটাধিকার নারী-পুরুষ সবারই জন্মগত অধিকার। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে নারীরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। আর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সফল হওয়ার জন্য নারীর ভোটাধিকারই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অর্থাৎ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনে একটি বড় রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল, 'দিন বদলের ডাক'। অন্য একটি বড় দলের স্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এ নির্বাচনেই প্রথম ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এখানে মূলত বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

কেননা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর শুরু হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব জোট ও দলের নির্বাচনি প্রচারণা। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনি ইশতেহারে চাল-ডাল-তেল-সারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। নির্বাচনি ইশতেহারে শেখ হাসিনা 'দিন বদলের ডাক' দেন। বিএনপি ও চার দলীয় জোটের নির্বাচনি স্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও'। এ বারই প্রথম দেশের কোনো নির্বাচনে মিছিল, স্লোগান, শোডাউন ছাড়াই নির্বাচনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। এছাড়া এ নির্বাচনেই প্রথমবারের মতো স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদান করা হয়। এ নির্বাচন নিয়ে যাবতীয় আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা দূর করে ২৯ ডিসেম্বর পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর উদ্দীপকেও এ নির্বাচনের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বৈধ সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে আসে।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেয়াদ শেষে ক্ষমতা ত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করে, তখন থেকেই দেশে রাজনৈতিক সংকট শুরু হয়। তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী বিধান ছিল যে, কোনো দল ক্ষমতা হস্তান্তরের ৯০ দিন পর জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং মধ্যবর্তী ৯০ দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া তদারকি করবে। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের পদত্যাগের পর ফখরুদ্দীন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৯০ দিন পর, সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দুই বছর পর। আর এভাবে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ অসহনীয় অবস্থার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০৮ সালের নির্বাচন ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ নির্বাচন সংক্রান্ত সব আশঙ্কা ও গুজবকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের জনগণ দীর্ঘ দুই বছর পর আবার গণতান্ত্রিক শাসনে ফিরে যাবার সুযোগ লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘ দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান ঘটিয়ে একটি সুষ্ঠ-সুশৃঙ্খল নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরে আসে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ যুগের অগ্রগতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের কোনো ছোঁয়া লাগেনি রহিম মিয়ার মনে। তাই সে নারীর অধিকারে ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে না। সে কখনই চায় না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি সে তার মেয়েদেরও ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয় না। সে ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনও অর্জন করতে পারেনি।

[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ, মাগুরা ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. নির্বাচন কি? ১
খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কি বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে রহিম মিয়া নির্বাচনের কোন বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বৈশিষ্ট্যটি অবমাননার ফলে শাসন ব্যবস্থায় কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি প্রক্রিয়া।

খ নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। আইন প্রণয়ন, সরকার পরিচালনা এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এর মাধ্যমে সফল গণতন্ত্র নিশ্চিত হয়।

গ উদ্দীপকের রহিম মিয়া বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্যকে অবমাননা করেছেন।

নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে। ভোটদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান এবং এটা সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। একজন পুরুষের ভোট যেমন মূল্যবান, তেমনি একজন নারীর ভোটও মূল্যবান। এ ক্ষেত্রে নারীকে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়া কিংবা প্রভাবিত করা যাবে না। আর এটাই হলো সর্বজনীন ভোটাধিকারের মূল বৈশিষ্ট্য।

উদ্দীপকে দেখা যায় রহিম মিয়া নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন না। সে চায় না তার স্ত্রী ভোট প্রদান করুক। এমনকি সে তার স্ত্রী ও মেয়েদেরও ভোট কেন্দ্রে যেতে দেন না। সে ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা নারীরা এখনো অর্জন করতে পারেনি। এর মাধ্যমে রহিম মিয়া বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বজনীন ভোটাধিকারকে অস্বীকার করেছেন। ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিক তার প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নেয়। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। ভোটাধিকার বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীকে দূরে রাখা যাবে না।

ঘ উক্ত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈশিষ্ট্য অবমাননায় শাসনব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আমি মনে করি।

গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত রেখে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সর্বজনীন

https://teachingbd24.com

ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর ফলে নারী ও পুরুষ সবাই ভোটার এবং প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একজন পুরুষ যতটুকু অবদান রাখতে পারে, সুযোগ পেলে একজন নারীও সেরূপ অবদান রাখতে পারে। আর আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। তাই তাদেরকে বাদ দিয়ে দেশে দক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীকে প্রথমত মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। আর নারীর ক্ষমতায় নিশ্চিত হলে তারা দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। কিন্তু উদ্দীপকের রহিম মিয়ার মনোভাব নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখবে। তারা দেশের জনশক্তির অর্ধেক অংশ হওয়া সত্ত্বেও কোনো অবদান রাখতে পারবে না।

আলোচনা শেষে বলা যায়, নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন ভোটাধিকার অবমাননায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ আবরার-এর দেশের নাম "ওয়াদিয়া"। এখানে ২০ বছর ধরে সামরিক শাসন চলছে। এদেশের নির্দিষ্ট কিছু সামরিক কর্মকর্তা এবং সরকারি চাকুরিজীবী ছাড়া কেউ ভোট দিতে পারে না। এ সকল ভোটারদের ভোটে সবসময় ঐ সামরিক শাসককে জয়ী হতে দেখা যায়। কিন্তু সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যতীত প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র অর্জন অসম্ভব। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? ১

খ. "ভাগ কর, শাসন কর"-নীতি বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সাথে তোমার দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য তুলনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত লাইনটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

খ ভাগ কর ও শাসন কর নীতি হলো ব্রিটিশদের কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার একটি রাজনৈতিক কৌশল।

ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় তারা এ উপমহাদেশে নানা শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। তারা এক পক্ষকে খুশি করে নিজেদের পক্ষে রেখে শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। তাই তারা সুকৌশলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং উগ্র ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দু ও মুসলিমরা একে অন্যের জন্য শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ সুযোগে ব্রিটিশরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতিটি কার্যকর করতে তৎপর হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের সাথে আমার দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। সংবিধানের ১২২ (২) নং অনুচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সী নারী ও পুরুষের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভোটদানের অধিকারী। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবরার-এর দেশে ২০ বছর ধরে সামরিক শাসন চলছে। এ দেশে নির্দিষ্ট কিছু সামরিক কর্মকর্তা এবং সরকারি চাকরিজীবী ছাড়া কেউ ভোট দিতে পারে না। আর এ সকল ভোটার সবসময় সামরিক শাসককে নির্বাচনে জয়ী করে। অর্থাৎ এ দেশে গণতন্ত্র এবং নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার অনুপস্থিত। যেখানে আমাদের দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত সেখানে আবরার-এর দেশের কতিপয় নাগরিকের ভোটদানের অধিকার রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় আমাদের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে উদ্দীপকের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের শেষোক্ত লাইনটি হলো- সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যতীত প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়।

গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের শাসন। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। সংবিধানে বলা হয়েছে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, স্থানীয় পর্যায়েও নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতি এবং সংবিধানে বর্ণিত সকল নির্বাচন গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন হলো জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশের বাহন। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করে প্রত্যাশিত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতে চায়। সেই সাথে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া নাগরিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং সরকারের একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা দূর করেন।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যতীত প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ গ্রামের প্রান্তিক চাষি জসিম। অভাব-অনটন তার নিত্য সঙ্গী। আর এ সুযোগ গ্রহণ করে সুবিধাভোগী মোড়ল। নগদ টাকার লোভ দেখিয়ে জসিমের ভোট কিনে নেয় সে। জসিমও নগদ টাকা পেয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরে যায়। *[হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সর্বজনীন ভোটার অধিকার কী? ১

খ. নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ করে কে? ২

গ. জসিমের চরিত্রে 'নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা' এর কোন বিষয়টি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে জসিম কী ভূমিকা রাখতে পারবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, পেশা-শ্রেণি নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তিকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

খ নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ করে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র দেশকে নির্বাচনি সুবিধানীতির ভিত্তিতে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করাকে নির্বাচনি এলাকা বলে। সংবিধানের ১২৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি এলাকার সীমা নির্ধারণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জসিমের চরিত্রে সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা বিষয়টি অনুপস্থিত।

ভোটাধিকার নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। আর এ অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিক সৎ ও যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নাগরিক যদি সকল প্রকার লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে জেনে-শুনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাহলে

Teachingbd24.com

যোগ্য ও দক্ষ জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে। আর সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করাও সুনাগরিকের একটি গুণ। কিন্তু অনেক অসচেতন নাগরিক টাকার লোভে অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকে। উদ্দীপকের জসিমের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গ্রামের সুবিধাভোগী মোড়ল টাকার প্রলোভন দেখিয়ে গরীব কৃষক জসিমের ভোট কিনে নেয়। জসিম সামান্য কিছু টাকার জন্য নিজের ভোটকে বিক্রি করে দিয়ে অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছে। অযোগ্য ও অসৎ প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কখনোই ভালো কিছু আশা করা যায় না। তারা সবসময়ই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর থাকে। তাই প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হলো দেশ ও জাতির স্বার্থে লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা।

ঘ সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে জসিমের মতো অসচেতন ও দায়িত্বহীন নাগরিক কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। আর সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সৎ, যোগ্য ও দক্ষ জনপ্রতিনিধির কোনো বিকল্প নেই। সৎ, দক্ষ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভোটারদের পছন্দই প্রধান। কিন্তু যদি এ ভোটাররা অসচেতন থাকেন কিংবা কোনোরূপ প্রভাবিত হয়ে ভোট দিয়ে থাকেন তবে নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট হয় এবং উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে না।

গণতন্ত্রকে সংহত করতে চাইলে সবার আগে ভোটারদের সচেতনতা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে প্রত্যেক নির্বাচনেই অনেক ভোটার টাকার বিনিময়ে অযোগ্য লোককে ভোট দিয়ে থাকে। এর ফলে সমাজ ও দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিসহ নানা রকম অনিয়ম ঘটে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২০ মিতু তার বাবার কাছে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনের গল্প শুনে। উক্ত নির্বাচনের পূর্বে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের মুখে ঐ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী | প্রশ্ন নং ১১]

ক. দুর্নীতি দমন কমিশন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. নির্বাচন কমিশন কিভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় মাইলফলক" তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্নীতি দমন কমিশন ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় যা সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনার (ইসি)-এর সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগদান করবেন। সংসদের বিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারিত হবে।

গ সৃজনশীল ৩নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ লোকমানপুর গ্রামের ফারুক সাহেব একজন সৎ ও নির্ভিক ব্যক্তি। তিনি তার এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। আর্থিকভাবে তিনি স্বচ্ছল না হয়েও প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাড়িয়েছেন। এলাকাবাসী চাঁদা তুলে তাকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তিনি নির্বাচনে জয়লাভও করেন। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না কোন নির্বাচনে? ১

খ. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কী ধরনের কাজ সম্পাদন করে? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে নির্বাচনে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৪র্থ সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না।

খ বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি ব্যবস্থায় আইন বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করে।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা হালনাগাদ, রিটানিং অফিসার ও সহকারী রিটানিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাছাই, চূড়ান্ত মনোনয়নপত্র প্রকাশ, নির্বাচনি আচরণবিধি ঘোষণা, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণ ও বাতিল, নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা, নির্বাচন গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ এবং নির্বাচিত দলকে সরকার গঠনের জন্য গেজেট প্রকাশসহ বিভিন্ন আইনি কার্যক্রম করে।

গ উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে বোঝা যায়, নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সক্রিয়।

জাতীয় রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা নির্বাচনে অংশ নিয়ে ভোটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করে নেয়। এ কারণেই নির্বাচনে জনগণের সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা বাহুল্য। যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন হলো শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভিত্তি। আর নির্বাচনের প্রাণ হলো জনগণ। তারা নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধিকে বাছাই করে নেয়। এর মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা দক্ষ ও উন্নত করতে জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। প্রার্থী বাছাই এবং প্রার্থীকে পরাজিত করতে জনগণের ভোটই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়। উদ্দীপকের ঘটনাও এর প্রমাণ বহন করে। এখানে দেখা যায়, লোকমানপুর গ্রামের ফারুক সাহেব প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আর্থিকভাবে সবল না হওয়ায় এলাকাবাসীই নিজ উদ্যোগে চাঁদা তুলে তাকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছে। আবার জনগণের বিপুল ভোটে তিনি নির্বাচিতও হন। সুতরাং দেখা যায়, নির্বাচন নির্ভর করে জনগণের ওপর এবং প্রার্থীর বাছাই নির্ভর করে তাদের ভোটের ওপর।

উপরিউক্ত আলোচনায় নির্বাচনের জনগণের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়।

ঘ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হলো নির্বাচন। আর এ নির্বাচনের প্রাণ হলো জনগণ। জনগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের পক্ষে দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ নেয়। তাই জনগণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয় এবং সুযোগ্য প্রতিনিধি বাছাই করে নেয়। জনগণের সমর্থন যে বেশি লাভ করতে সক্ষম হয় সেই দেশের শাসনব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। উদ্দীপকের ফারুক সাহেবও এভাবে জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এ কারণেই আর্থিকভাবে সবল না হওয়া সত্ত্বেও জনগণ তাকে চাঁদা তুলে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। বিপুল জনসমর্থন থাকার কারণেই তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হন। মূলত জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত উদ্দীপকের ফারুক সাহেব শাসনকার্যে অংশ নিতে পারতেন না। তাই বলা যায়, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

Teachingbd24.com

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

★★ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১. বাংলাদেশে কত বছর বয়স্ক নাগরিক ভোটদানের অধিকারী হয়? [জ্ঞান]
ক ১৭ বছর খ ১৮ বছর
গ ১৯ বছর ঘ ২০ বছর — **খ**

২. 'নির্বাচন' কী? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রের উপাদান
খ ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া
গ প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়া
ঘ প্রতিনিধি মনোনয়নের প্রক্রিয়া — **গ**

৩. 'ক' রাষ্ট্রে ভূমিহীন মানুষরা ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। 'ক' রাষ্ট্রে কোন বিষয়টি অনুপস্থিত? [প্রয়োগ]
ক সর্বজনীন ভোটাধিকার
খ রাজনৈতিক দল
গ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
ঘ নির্বাচন — **ক**

৪. সাজ্জাদ এর দেশে একই ভোটারতালিকা দিয়ে মানুষ স্থানীয় এবং জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকে। সাজ্জাদ এর দেশে কোন বিষয়টি কার্যকর রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক সমভোটাধিকার
খ সহজ ভোটার তালিকা
গ পৃথক ভোটার ব্যবস্থা
ঘ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব — **ক**

৫. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় কোন ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্য লক্ষ করা যায়? [জ্ঞান]
ক বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে
খ ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে
গ নারী ও পুরুষ ভেদে ভিন্নতা
ঘ শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে প্রার্থীর বয়সের ভিন্নতা — **ক**

৬. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই প্রার্থী সর্বোচ্চ কতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন? [জ্ঞান]
ক ২টি আসনে খ ৩টি আসনে
গ ৪টি আসনে ঘ ৫টি আসনে — **খ**

৭. বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ শাসন ক্ষমতায় কীভাবে অংশগ্রহণ করে? [অনুধাবন]
ক প্রত্যক্ষভাবে
খ পরোক্ষভাবে
গ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে
ঘ প্রশাসনের সহায়তায় — **খ**

৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বক্তব্যটি সঠিক? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন
খ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন
গ ধারাবাহিকতা নেই
ঘ সামরিক বাহিনীর অধীনে নির্বাচন — **গ**

৯. নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে— *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
i. ভোটার তালিকা বিধিমালা সংশোধন
ii. ব্যালট বাক্স ব্যবহার
iii. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

১০. নির্বাচন একটি— *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
i. প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া
ii. প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া
iii. জনমত যাচাই প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **খ**

১১. বাংলাদেশের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো — *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*
i. সর্বজনীন ভোটাধিকার
ii. গোপন ভোটপদ্ধতি
iii. একক নির্বাচনি এলাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

১২. নির্বাচিত প্রার্থী জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত— [অনুধাবন]
i. দলীয় পর্যায়ে
ii. জাতীয় সংসদে
iii. শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

১৩. নির্বাচনে একজন কর্মী বা রাজনৈতিক নেতা— [অনুধাবন]
i. দলীয় প্রার্থীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন
ii. কারচুপির মাধ্যমে নিজ দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার চেষ্টা করেন
iii. নির্বাচনে নিরপেক্ষতা ও সততা বজায় রাখার চেষ্টা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **গ**

১৪. এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তিত হয়েছে— [অনুধাবন]
i. হত্যার মাধ্যমে
ii. অভ্যুত্থানের মাধ্যমে
iii. সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ক**

Teachingbd.com

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

'ক' রাষ্ট্রের ৫ম নির্বাচনটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে।

সেখানে → প্রাপ্ত বয়স্ক → নাগরিকরা গোপনে তাদের ভোট প্রদান সম্পন্ন করেছে। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

১৫. অনুচ্ছেদে কী ধরনের ভোটাধিকার ফুটে উঠেছে?
ক বিশেষ ভোটাধিকার
খ যৌথ ভোটাধিকার
গ সরল ভোটাধিকার
ঘ সর্বজনীন ভোটাধিকার — ঘ

১৬. উদ্দীপকের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে—
i. গোপন ভোটদান
ii. সর্বজনীন ভোটাধিকার
iii. স্তরভিত্তিক ভোটদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii
গ i ও iii ঘ ii ও iii — খ

★★ ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালের জাতীয় নির্বাচন

১৭. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে (১৯৭৩) কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? [জ্ঞান]
ক আওয়ামী লীগ
খ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)
গ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
ঘ বাংলাদেশ জাতীয় লীগ — ক

১৮. বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৩ খ ১৯৭৯
গ ১৯৮৬ ঘ ১৯৮৮ — ক

১৯. কত তারিখে জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৮ সালের ৫ জানুয়ারি
খ ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি
গ ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি
ঘ ১৯৮১ সালের ৫ মার্চ — গ

২০. ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কত জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে? [জ্ঞান]
ক ১,৫১৪ জন খ ২,০০০ জন
গ ২,৩১৫ জন ঘ ২,৩৫২ জন — ঘ

২১. ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) কত জনকে মনোনীত করে? [জ্ঞান]
ক ৮৯ জন খ ৯০ জন
গ ১১২ জন ঘ ২১৪ জন — ক

২২. ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো- *[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ন্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
i. আওয়ামী লীগ ৯৬.৬৬% আসন পায়
ii. শতকরা ৮৫ ভাগ ভোটদান করে
iii. আওয়ামী লীগ ৭৩.৬৬% ভোট পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

★★ ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

২৩. ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কত জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন? [জ্ঞান]
ক ১৫২৭ জন খ ১৫৪০ জন
গ ১৫৮০ জন ঘ ১৫৯৪ জন — ক

২৪. জাতীয় সংসদ বাতিল করলে কয়দিনের মধ্যে সংসদের নির্বাচন অবশ্যই অনুষ্ঠিত হতে হবে? [জ্ঞান]
ক ৫০ দিন খ ৬০ দিন
গ ৮০ দিন ঘ ৯০ দিন — ঘ

২৫. ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথ রচিত হয়
ii. সামরিক শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়
iii. রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

★★ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১

২৬. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন প্রণীত হয় কত তম জাতীয় সংসদে? [জ্ঞান]
ক চতুর্থ খ পঞ্চম
গ ষষ্ঠ ঘ সপ্তম — গ

২৭. ১৯৯১ সালের নির্বাচন কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১২ জানুয়ারি খ ২৭ ফেব্রুয়ারি
গ ১৮ মার্চ ঘ ২০ এপ্রিল — খ

২৮. ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কতটি আসন লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ১২০টি খ ১৩০টি
গ ১৪২টি ঘ ১৫০টি — গ

২৯. কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল? [জ্ঞান]
ক দ্বিতীয় খ তৃতীয়
গ চতুর্থ ঘ পঞ্চম — ঘ

৩০. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার গঠনের জন্য সাধারণ আসনে কমপক্ষে কতটি আসন পাওয়ার প্রয়োজন হয়? [জ্ঞান]
ক ১৪২টি খ ১৪৫টি
গ ১৫১টি ঘ ১৫৫টি — গ

৩১. রহিম বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ কর্তৃক পরিচালিত একটি নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা করেন। উক্ত নির্বাচন— [প্রয়োগ]
i. ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়
ii. গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ
iii. দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

http://teachingbd.com

★ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ (জুন)

৩২. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কত জন সদস্য মোতায়েন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ২ লক্ষ খ ৩ লক্ষ
গ ৪ লক্ষ ঘ ৫ লক্ষ **গ**

৩৩. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণফোরাম কতটি আসনে মনোনয়ন দেয়? [জ্ঞান]
ক ৯৫টি খ ১০২টি
গ ১০৪টি ঘ ১২০টি **গ**

৩৪. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কতটি আসন লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ১১০টি খ ১১৬টি
গ ১২৫টি ঘ ১৩০টি **খ**

৩৫. সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ কত বছর পর ক্ষমতাসীন হয়? [জ্ঞান]
ক ১২ বছর খ ১৫ বছর
গ ১৮ বছর ঘ ২১ বছর **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

বিচারপতি হাবিবুর রহমান স্মরণে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তারা বলেন, তিনি ছিলেন ভাষা সৈনিক, কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী। অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৩৬. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল? [প্রয়োগ]
ক পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
খ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
গ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ঘ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন **গ**

৩৭. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন
ii. অধিক দলের অংশ গ্রহণ কিন্তু মুষ্টিময়ের আসন লাভ
iii. এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১

৩৮. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০১) কোন রাজনৈতিক দল/ জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? [জ্ঞান]
ক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
খ ৪ দলীয় ঐক্যজোট
গ জামায়াতে ইসলামী
ঘ জাতীয় পার্টি **খ**

৩৯. ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে কতটি দল অংশগ্রহণ করে? [জ্ঞান]
ক ৫০টি খ ৫২টি
গ ৬০টি ঘ ৬৫টি **খ**

৪০. বাংলাদেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৯ খ ১৯৮৬
গ ১৯৯৬ ঘ ২০০১ **ঘ**

৪১. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ শতকরা কত ছিল? [জ্ঞান]
ক ৬৮.১৭% খ ৭০.৫৫%
গ ৭৫.৫৯% ঘ ৮০.৪৩% **গ**

৪২. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ছিলেন কত জন? [জ্ঞান]
ক ১২৩৫ জন খ ১৪০০ জন
গ ১৪৩৯ জন ঘ ১৫১৭ জন **গ**

৪৩. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট সর্বমোট কতটি আসন লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ২১০টি খ ২১২টি
গ ২১৪টি ঘ ২১৬টি **ঘ**

৪৪. এদেশে বিগত যেসব সংসদ পূর্ণ মেয়াদ পূরণ করে— [অনুধাবন]
i. ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ
ii. ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ
iii. ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ ও ২০১৪

৪৫. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট মোট কতটি আসন লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ২৮ খ ২৯
গ ৩৩ ঘ ৩১ **গ**

৪৬. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০৮) কোন রাজনৈতিক জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? [জ্ঞান]
ক আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট
খ বি.এন.পি-জামায়াতের ৪ দলীয় জোট
গ স্বতন্ত্র
ঘ এল.ডি.পি **ক**

৪৭. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়— *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*
ক ৪ জানুয়ারি ২০১৪ খ ৫ জানুয়ারি ২০১৪
গ ৬ জানুয়ারি ২০১৪ ঘ ৭ জানুয়ারি ২০১৪ **খ**

৪৮. বাংলাদেশে মোট কতবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে? *[সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ, পাবনা; লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক ৫ খ ৭
গ ১০ ঘ ১১ **গ**

৪৯. বাংলাদেশে সর্বশেষ কততম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক অষ্টম খ নবম
গ দশম ঘ একাদশ **গ**

Teachingbd.com

৫০. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি কতটি আসনে জয়লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ২১টি খ ২৫টি
গ ২৩টি ঘ ২৪টি — খ

৫১. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কত জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন? [জ্ঞান]
ক ৪৫ জন খ ৫৫ জন
গ ৬০ জন ঘ ৬৫ জন — গ

৫২. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে কে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
ক মাহমুদুল হাসান
খ শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি
গ মওদুদ আহমদ
ঘ ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা — ক

৫৩. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ২৩২টি খ ১২৮টি
গ ১২৯টি ঘ ১৩০টি — ক

★★নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা; নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

৫৪. গণতন্ত্র কী ধরনের শাসনব্যবস্থা? [অনুধাবন]
ক প্রাচীন খ স্বৈরাচারী
গ প্রহসনমূলক ঘ প্রতিনিধিত্বমূলক — ঘ

৫৫. ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের কি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? *[দি. বো. '১৫; রা. বো. '১৫]*
ক ভোটার খ নির্বাচক
গ নির্বাচকমণ্ডলী ঘ সুনাগরিক — গ

৫৬. নাগরিকদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক প্রার্থী বাছাই খ শাসনকার্য পরিচালনা
গ প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালন
ঘ শুধু সমালোচনা করা — ক

৫৭. নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন? *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]*
ক রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য
খ সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য
গ অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য
ঘ ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার জন্য — ক

৫৮. রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কোনটি অপরিহার্য? *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]*
ক স্বৈরসরকার
খ নির্বাচিত সরকার
গ অনির্বাচিত সরকার
ঘ যোগ্য ও দক্ষ সরকার — খ

৫৯. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোনটির গুরুত্ব অপরিসীম? [অনুধাবন]
ক রাজনৈতিক দলের খ আমলাদের
গ নাগরিকের ঘ সরকারের — গ

৬০. নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ফলে জনগণের কোন জ্ঞান বৃদ্ধি পায়? [জ্ঞান]
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ঘ বাণিজ্যিক — গ

৬১. কোনটির মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচিত করে? [জ্ঞান]
ক নির্বাচন খ দলীয় কর্মসূচি
গ সেনাবাহিনী ঘ চাপসৃষ্টিকারী — ক

৬২. ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কীরূপ অধিকার? [জ্ঞান]
ক অর্থনৈতিক অধিকার
খ সামাজিক অধিকার
গ রাজনৈতিক অধিকার
ঘ সাংস্কৃতিক অধিকার — গ

৬৩. সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির ফলে কোনটি ঘটে? [জ্ঞান]
ক মন্ত্রীদের উন্নতি খ নাগরিকদের উন্নতি
গ সচিবদের উন্নতি ঘ আমলাদের উন্নতি — খ

৬৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যা প্রয়োজন— [অনুধাবন]
i. রাষ্ট্রের জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন
ii. রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন সাধন
iii. নির্বাচনে নাগরিকের সর্বাধিক অংশগ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৬৫. জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো- *[নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]*
i. সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা
ii. জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ
iii. ভোট দান না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফিরোজ এ বছর প্রথম ভোটার হিসেবে ভোট প্রদান করে। সে প্রার্থীর দলীয় পরিচয় বিবেচনায় না এনে বরং তার সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতার বিষয়টি খেয়াল করে ভোট প্রদান করে। *[ব. বো. '১৬]*

৬৬. অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফিরোজ কোন ধরনের অধিকার ভোগ করেছে?
ক অর্থনৈতিক খ সাংস্কৃতিক
গ সামাজিক ঘ রাজনৈতিক — ঘ

৬৭. অনুচ্ছেদের ফিরোজের মত সকল ভোটার একই দিক বিবেচনা করলে—
i. সুনাগরিকতার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে
ii. উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হবে
iii. জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

Teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৯: বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

প্রশ্ন ▶১ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে 'Z' নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করে—

i. আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নীতি।
ii. স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ নীতি।
iii. পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্রের নাম কী? ১
খ. বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে- তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্রের নাম আফগানিস্তান।

খ যে নীতির সাহায্যে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাই বৈদেশিক নীতি।
বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই সব রাষ্ট্রই কোনো না কোনো বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাধারণত জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'Z' রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হলো— সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'। এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব পোষণ করে। দেশটি পৃথিবীর কোনো দেশ বা জাতির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আক্রমণ পরিচালনা করার দূরভিসন্ধি পোষণ করে না। বাংলাদেশ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।
উদ্দীপকে 'Z' রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলকথা হলো 'আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা নীতি, স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ নীতি, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত'। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল কথাও তাই। এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। সুতরাং বলা যায়, 'Z' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি তথা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।
বাংলাদেশ একটি শান্তিকামী রাষ্ট্র। বিশ্বের সব দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কারও সাথে শত্রুতা নেই। বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করে। সেই আলোকে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করছে। দেশটি স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশ নিজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতায় বদ্ধপরিকর। বিশ্বশান্তির মহানব্রত নিয়ে জাতিসংঘ সনদ, কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, সার্ক প্রভৃতি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের নীতি ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখে।
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সরকার সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের পাঠাচ্ছে। এ মিশনে বাংলাদেশর ভূমিকা আজ বিশ্বে সমাদৃত। তাছাড়া বিশ্বের কোনো দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বা যুদ্ধ সংঘটিত হলে বাংলাদেশ উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি অর্থাৎ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶২ 'ক' রাষ্ট্রের জন্মের পর রাষ্ট্রটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। সংস্থাটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করে।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. ওআইসি কী? ১
খ. কমনওয়েলথ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্থা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কাজ করছে- তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওআইসি(OIC- Organisation of Islamic Co-operation) হলো বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

খ কমনওয়েলথ হলো সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বর্তমানে স্বাধীন এমন রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।
একসময় প্রায় সারা বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ গঠন করা হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানি হলেন এ সংগঠনটির প্রধান।

গ 'ক' সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের মিল রয়েছে।
বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত ৫০টি দেশের জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র ১৯৩টি। বিশ্বশান্তি রক্ষা, অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বে ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের জন্মের পর রাষ্ট্রটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। সংস্থাটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের

Teachingbd24.com

সদস্যপদ লাভ করে। এরপর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির সাথে আমার পঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির জন্য কাজ করছে, বিষয়টির সাথে আমি একমত।

বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করে। শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে জাতিসংঘ। কোনো রাষ্ট্রের সাথে অন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে এ সংস্থাটি আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। জাতিসংঘ আগ্রাসী ও শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। তাছাড়া সংগঠনটির নিরাপত্তা পরিষদ গোলযোগ ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

জাতিসংঘ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়। এছাড়া এটি আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে। সংগঠনটি এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কাজ করছে।

প্রশ্ন ▶৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র ইউরোপ অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে অভিন্ন বাজার ব্যবস্থা ও মুদ্রা প্রতিষ্ঠাসহ আরো কিছু উদ্দেশ্যে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট। এ জোট বাংলাদেশি পণ্যের বড় বাজার। এ ছাড়াও এ জোটের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে বহুবিধ সম্পর্ক। *[চি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সার্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১

খ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোটের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

খ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে বোঝায় বিশ্বের সামরিক জোট বা বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের জোটের মতাদর্শের বাইরে থেকে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির কথাই ধরা যাক। এদেশের বৈদেশিক নীতি স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, শেখ হাসিনাসহ দেশের বড় বড় নেতা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির কথা বলেছেন। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ধারায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলার অধিকারে বিশ্বাসী, আর এ বিষয়টিই হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলকথা।

গ উদ্দীপকে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোটের কথা বলা হয়েছে সেটি হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি আঞ্চলিক সংস্থা। ১৯৫৭ সালে পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি দেশের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংস্থাটির জন্ম হয়। বর্তমানের এর সদস্য সংখ্যা ২৭। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে এ সংগঠনটির সদর দপ্তর অবস্থিত। উদ্দীপকে এ সংস্থাটিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের সংস্থাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। এটি অভিন্ন বাজারব্যবস্থা ও মুদ্রা প্রতিষ্ঠাসহ আরও কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়। এ জোটটি বাংলাদেশি পণ্যের বড় বাজারও বটে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় অর্থনীতি মহাসংকটে নিপতিত হয়। এ সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপকে সামনে রেখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়। সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অভিন্ন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বাণিজ্য ও অর্থনীতির উন্নয়নই ইইউ-এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বর্তমানে ইইউ-এর দেশগুলোর মধ্যে একক মুদ্রা চালু হয়েছে। এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে।

যেমন: ১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যৌথ সম্পদ শক্তি অর্জন করা; ২. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্পদের সর্বোচ্চ সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা; ৩. সদস্য দেশগুলোর উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করা। ৪. সদস্য দেশগুলোর উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য স্বল্প উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্রকে সহায়তা করা। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটি অর্থাৎ ইইউ এর মূল লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জোট অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ২০০০ সালের ২২ মে ইইউ-এর সদর দপ্তর ব্রাসেলসে বাংলাদেশ ও ইইউ-এর মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ ও ইইউ-এর মধ্যে বাণিজ্য, উন্নয়ন সহায়তা এবং আর্থিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইইউ এদেশকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী সমাজের উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতি ইইউ সবসময়ই যত্নশীল। বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি বিষয়ে ইইউ বাংলাদেশে ব্যাপক সহায়তা করে থাকে। ইইউ বাংলাদেশের বাজার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ট্যারিফ ও ননট্যারিফ বাধা অপসারণ, তথ্য যোগাযোগ ও সংস্কৃতি খাতেও ব্যাপক অবদান রাখছে। এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষার বিষয়গুলোতেও ইইউ অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তৈরি পোষাক শিল্পে বাংলাদেশ ইইউ-এর কাছ থেকে পাচ্ছে সর্বাধিক জিএসপি সুবিধা। উল্লেখ থাকে যে অস্ত্র ছাড়া বাংলাদেশের সব পণ্যই ইইউ-এর কাছ থেকে জিএসপি সুবিধা পেয়ে থাকে। এছাড়া ইইউ-এর অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহে বহু বাংলাদেশিরা শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ পাচ্ছে। এতে মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এই বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইইউ-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই আন্তরিক।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ ফজলুল হক সম্প্রতি আফ্রিকা সফরে যান। তিনি দেখতে পান সেখানকার কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে তোমার পঠিত কোনো আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই উক্ত সংস্থার লক্ষ্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কমনওয়েলথ হলো কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন সংস্থা।

খ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হলো সরকার কর্তৃক প্রণীত অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ও আচরণের নীতিমালা।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' এ নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সব সময়ই বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে আমার পঠিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)-এর সাদৃশ্য আছে।

সার্ক ১৯৮৫ সালে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট। শুরুতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে এ আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আফগানিস্তান এর সদস্যভুক্ত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত। উদ্দীপকে আফ্রিকায় কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি এবং পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাওয়া সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল রয়েছে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতার কিছু প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেন। এর প্রতি এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। এটা স্বীকৃত যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সকল দেশের পক্ষেই কাম্য এবং সুবিধাজনক। এরই ফলশ্রুতিতে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৮৫ সালে সার্কের যাত্রা শুরু হয়।

উদ্দীপকের ফজলুল হক আফ্রিকা সফরে গিয়ে দেখতে পান সেখানকার কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থাটির গঠন এবং কার্যক্রমের সাথে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার মিল আছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক গঠন করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের সংস্থার সাথে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর সাদৃশ্য আছে।

ঘ নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই উক্ত সংস্থা অর্থাৎ সার্ক-এর লক্ষ্য। বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করা হলো—

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট গঠন করা। তাই পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে গড়ে ওঠে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক। সার্ক সনদের ৮টি উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে— i. দক্ষিণ এশীয় জনগণের কল্যাণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ii. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সামাজিক অগ্রগতি সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি দেশের স্ব স্ব মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা, iii. দেশগুলোর মধ্যে সমষ্টিগতভাবে আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা, iv. পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, সমঝোতা এবং অন্যের সমস্যা উপলব্ধি করা, v. প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার প্রসার ঘটানো, vi. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো, vii. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা, viii. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। সার্ক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যদিও নানাবিদ কারণে সার্ক তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় ইস্যুর বাধার কারণে সার্কের মাধ্যমে বহুপক্ষীয় যে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা ছিল তা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিদ্যমান নানা সমস্যা থাকলেও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মনোভাবের সমাপ্তির মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করার ওপর নির্ভর করছে সার্কের অগ্রগতি তথা লক্ষ্যের সঠিক বাস্তবায়ন।

প্রশ্ন ▶৫ দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেও বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে বঙ্গোপসাগরের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধ মিটাতে পারেনি। অবশেষে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যায়। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে। তাতে বাংলাদেশের অধিকার অর্জিত হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে, বিশ্বের যেকোনো দেশের সঙ্গেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. কমনওয়েলথ গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. সার্কের উদ্দেশ্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মিয়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসৃত বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আশাবাদ পূরণ করা কীভাবে সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৩১ সালে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

খ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে সামনে রেখে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করাই সার্কের উদ্দেশ্য।

সার্ক সনদে ৮টি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়। সেগুলো হলো- দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মানুষের কল্যাণ সাধন ও জীবনমান উন্নয়ন; দেশগুলোর মধ্যে যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা; সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ, সমস্যার নিষ্পত্তি ও পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন করা; সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন অগ্রগতির জন্য যৌথভাবে কার্যক্রম স্থির ও রূপায়ন করা; সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা জোরদার করা; সার্কভুক্ত ৮টি দেশ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলবে এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকবে।

https://teachingbd24.com

গ মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সব বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে উৎসাহিত করে। এ নীতির একটি অন্যতম দিক হলো আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান। উদ্দীপকে বর্ণিত মিয়ানমারের সাথে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আমরা এ নীতির প্রতিফলন দেখতে পাই।

বঙ্গোপসাগরে নিজেদের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দীর্ঘ ৩৮ বছর বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করে আসছিল। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ জানার পরেও দেশটি মিয়ানমারের প্রতি কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেনি। বরং ন্যায্য অধিকার পেতে ২০০৯ সালে জার্মানির হামবুর্গ ভিত্তিক সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে (International tribunal for the Law of the Sea- ITLOS) মামলা করে। সংগঠনটি ২০১২ সালে বাংলাদেশের পক্ষে রায় দেয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ নিজ দেশের সমৃদ্ধি অর্জন ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা রক্ষার পাশপাশি আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ওপর সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাই আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও দেশটি শক্তিপ্রয়োগ পরিহার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানে প্রয়াসী হয়। উদ্দীপকের ঘটনাটি যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘ যেকোনো দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক আলোচনা শান্তিপূর্ণ সমাধান দিতে পারে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন যার বাস্তব উদাহরণ। আর এ প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর আশাবাদ পূরণে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নেই।

শুধু নিজ দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নানা ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এসব দেশ যদি শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিহার করে বাংলাদেশের মতো শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীতি গ্রহণ করে তবে কোনো সংঘাত ছাড়াই কার্যকর সমাধান পেতে পারে।

সমস্যা সমাধানে আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। আলোচনা যেকোনো বিষয়কেই সহজ এবং যৌক্তিকভাবে উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়। এক্ষেত্রে শত্রুতা নয় বরং মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলে কার্যকর ফল আশা করা যায়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের অধিকার অর্জন করেছেন এবং তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, যেকোনো দেশই এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধান করতে পারে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূলকথা হলো— পৃথিবীর সব দেশর সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। অন্যদিকে নিজেদের অধিকার, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ পুরোপুরি সচেতন। এক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ নীতি পরিহার করে আলোচনার নীতি অনুসরণের ওপরই প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তার এ আশাবাদ পূরণে পারস্পরিক বিরোধে জড়িত দেশগুলো বাংলাদেশের এ নীতি অনুসরণ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶৬ সত্তরের দশকে একটি দেশ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একত্রিত হয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. বৈদেশিক নীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. কেন 'সার্ক' গঠিত হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সংগঠন এর সাদৃশ্য আছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটিতে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতির সাহায্যে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাই বৈদেশিক নীতি।

খ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং সহযোগিতা তৈরির লক্ষ্যে সার্ক গঠিত হয়েছিল।

বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সার্ক এমনি একটি সংস্থা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধন করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করাই সার্কের প্রধান লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের OIC সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য আর সৌহার্দ্যের যে মহান শিক্ষা রাসুল (স) আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাকে ভিত্তি করে ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের অঙ্গীকার নিয়ে ওআইসি (OIC) গঠিত হয়। ওআইসি (OIC)-এর পূর্ণরূপ হলো Organisation of Islamic Co-operation. উদ্দীপকেও এ সংগঠনটির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, সত্তরের দশকে একটি দেশ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের পর ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় গোটা মুসলিম বিশ্বে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ আগস্ট ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা কায়রোতে আলোচনায় বসেন। এর পর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ২৪টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের ২২ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত মুসলিম মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে জেদ্দায় OIC-এর সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ সংস্থা OIC (ওআইসি) সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। উদ্দীপকেও এ সংগঠনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে OIC-এর সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে এর বিভিন্ন সাংগঠনিক ও কমিটিতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য বাংলাদেশকে এর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, অঙ্গসংগঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালের ৬-১০ ডিসেম্বর ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওআইসি-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অব্যাহত সমর্থন জানিয়ে আসছে, ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসনকে নিন্দা জানিয়েছে, বসনিয়া যুদ্ধ বন্ধের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী আরব দেশগুলোর উপকূলে মার্কিন

https://teachingbd24.com

সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মার্কিন হামলার নিন্দা করে। বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ওআইসি-এর সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ১১ দফা প্রস্তাব পেশ করে। বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এ সংগঠন থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাও অর্জন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ওআইসিতে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট।

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রতিবন্ধি কারা? ১

খ. ওআইসি (OIC) কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটির মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবন্ধি হলো তারা যারা দৈহিক, মানসিক ও বোধ শক্তিজনিত অসুবিধার কারণে যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে অক্ষম এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত।

খ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ওআইসি (OIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

মুসলিম দেশগুলোর সর্ববৃহৎ সংগঠনের নাম হল ওআইসি(OIC), যার পূর্ণরূপ— Organisation of Islamic Cooperation। এটি বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মুসলমানদের স্বার্থে ভূমিকা রাখা ওআইসি (OIC) গঠনের অন্যতম কারণ।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের কথা বলা হয়েছে।

সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করে আঞ্চলিক অখণ্ডতা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সার্ক (SAARC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দীপকের আঞ্চলিক সংস্থারও অনুরূপ উদ্দেশ্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। এ তথ্যগুলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক (SAARC- South Asian Association for Regional Cooperation)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী আটটি রাষ্ট্র নিয়ে সংস্থাটি গঠিত। সার্ক গঠনে বাংলাদেশই উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংস্থাটি গঠিত হয়। সার্কের মূলনীতিগুলো হলো— এ সংস্থার যেকোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে; দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় আলোচনার জন্য তোলা হবে না; সদস্য রাষ্ট্রগুলো একে অপরের ওপর কোনো প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করে আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নীতি মেনে চলা; এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। সর্বোপরি এর অন্যতম মূলনীতি হলো সবসময় এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সংগঠনটির ভূমিকা পালন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা অর্থাৎ সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ট।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সার্ক গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সংস্থাটি গঠিত হয়। তবে বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু সার্ক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর যেকোনো সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা সর্বজনবিহিত। সংগঠনটির জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। অন্যতম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশসহ বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও অবাধ করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে ইসলামাবাদে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (SAFTA- South Asian Free Trade Area; এর আগে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল SAPTA- SAARC Preferential Trading Arrangement) সম্পাদিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সার্কের সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। এছাড়া মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সদস্য দেশগুলোকে সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৮ সালে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAC- SAARC Agriculture Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত সক্রিয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা এবং এর পরবর্তী সব কার্যক্রমে এদেশের অংশগ্রহণ একথাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাংলাদেশ ২০১২ সালে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার শান্তি রক্ষা মিশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ পরবর্তী শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ দেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সংস্থাটি পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে।

[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে? ১

খ. বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটির গঠন লেখ। ৩

ঘ. "বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ উক্ত সংস্থার সবচেয়ে সক্রিয় অংশীদার।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

খ যে নীতির সাহায্যে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাই বৈদেশিক নীতি।

বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সব রাষ্ট্রই কোনো না কোনো বিষয়ে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাধারণত জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যার লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৪৫ সালে ৫১টি রাষ্ট্রের জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র ১৯৩টি। এর প্রধান অঙ্গসংস্থাগুলো হলো- সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত এবং জাতিসংঘ সচিবালয়।

সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আইনসভার মতো। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এটাই একমাত্র পরিষদ যেখানে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সব রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হিসেবে অবস্থান করে।

জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব এ পরিষদের। এটি মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী এবং বাকি ১০টি অস্থায়ী (যাদের মেয়াদকাল ২ বছর) সদস্য রাষ্ট্র। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নে এ সংস্থার ভূমিকা অনন্য।

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা/পরিচয় আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। বর্তমানে এ পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হয়েছে। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অবস্থিত।

জাতিসংঘ সচিবালয় হলো এর প্রশাসনিক বিভাগ। বিশ্বশান্তি, সহযোগিতা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

ঘ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের শান্তিরক্ষা মিশনের সবচেয়ে সক্রিয় অংশীদার। উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG)-র অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন শুরু করে। এরপর থেকে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশনের প্রধান অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৩৮টি রাষ্ট্রে ৫৪টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে প্রায় ১১,০০০ সেনাসদস্য পাঠিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১২টি দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে এদেশের সেনাসদস্যরা কর্মরত আছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবে ও উর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের 'The cream of UN peacekeepers' বলে আখ্যায়িত করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের এ অবদান আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

এভাবে জাতিসংঘ বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আমাদের দেশকে সাহায্য করে যাচ্ছে। বাংলাদেশও জাতিসংঘ সনদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল থেকে এর বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶৯ ফজলুল হক সম্প্রতি আফ্রিকা সফরে যান। তিনি দেখতে পান সেখানকার কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. নির্বাচন কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে তোমার পঠিত কোনো আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই উক্ত সংস্থার লক্ষ্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়াই হলো নির্বাচন।

খ সৃজনশীল ৪নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶১০ দেশের উত্তরাঞ্চলের জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনগ্রসর ছিল। উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহ অনগ্রসরতা কাটিয়ে উন্নতির লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হওয়ার পর যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হলে দু'অঞ্চলের মধ্যে সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের জনগণ উপকৃত হতে থাকে। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. কী উদ্দেশ্যে সার্ক গঠিত হয় লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সহযোগিতার সফলতাকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হলে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রসমূহ লাভবান হবে বলে তুমি মনে কর কি? মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো- South Asian Association for Regional Cooperation.

খ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঐক্য স্থাপন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হয়।

সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ) নিয়ে এটি গঠিত হয়; ২০০৭ সালে আফগানিস্তান এর সদস্যপদ লাভ করায় সংস্থাটির বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র ৮টি। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের

https://teachingbd24.com

কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ, পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য সার্ক গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। একটি অগ্রসর অঞ্চল পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জনগণের সমৃদ্ধি অর্জনে সফলতা আসে।

উদ্দীপকের সহযোগিতার সফলতাকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। এক্ষেত্রে প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো যেসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে উন্নত দেশগুলো সহযোগিতার মাধ্যমে তা দূর করতে পারে। উদ্দীপকের ঘটনায় যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হওয়ায় যেমন যোগাযোগব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়েছে, তেমনি সহযোগিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনিভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রের প্রতি শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করতে হবে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিশ্বের সব দেশের সাথে বন্ধুতাপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলো লাভবান হবে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

ঘ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হলে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলো লাভবান হবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অথবা অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা লাভ করে লাভবান হতে পারে। জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ সংস্থার অনেকগুলো সহযোগী সংগঠন রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কৃষি, নারী অধিকার, মানবাধিকারসহ নানা ক্ষেত্রে গঠনমূলক অগ্রগতির আনয়নে এ সংস্থাটি কাজ করে চলেছে। তাছাড়া ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে।

বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলো যদি বিভিন্ন উন্নয়ন ও দাতা সংস্থার বত্যিকার সহযোগিতা পায় তাহলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশপাশি সব ক্ষেত্রেই তারা উন্নতি করবে। উন্নত রাষ্ট্রগুলো এক্ষেত্রে প্রধান সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আমি মনে করি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হওয়া দরকার।

প্রশ্ন ▶ ১১ সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয়। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। আন্ত-রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বহুবিধ সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্য এই সংস্থাটি নির্ধারণ করে। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সংস্থাটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির নাম কী? এই সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থা গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর সংগঠন হলো কমনওয়েলথ; সংগঠনটি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র ৫৩টি।

খ জাতিসংঘের সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো নিরাপত্তা পরিষদ।

নিরাপত্তা পরিষদ ৫টি স্থায়ী (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন) ও ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচিত হয়। এরা দুই বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো সার্ক।

উদ্দীপকের সংস্থাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় এবং এটি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এ তথ্যগুলো সার্ক (SAARC- South Asian Associaton for Regional Cooperation)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা এবং এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সার্ক সনদ (১৯৮৫ সালে ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত) অনুযায়ী সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা; সদস্য দেশগুলোর মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সব ধরনের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা।
৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা দান।
৪. আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করা।
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৬. বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৭. সর্বজনিন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা।
৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ঘ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ সার্ক গঠনে বাংলাদেশের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে।

সার্ক প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অভিন্ন। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ। এজন্য একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। এ প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে এদেশের মাটিতেই সার্কের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম ও তৎপরতার পর ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে এ অঞ্চলের দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়।

Teachingbd24.com

এ সম্মেলনে ৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধান যোগ দেন। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষর এবং ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা জন্মলাভ করে। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, এজন্য কার্যকর উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তিতে সার্কের প্রতিষ্ঠা এ সব কিছুর সাথেই বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। তাই বলা যায়, সার্ক গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকাই প্রধান।

প্রশ্ন ▶ ১২

'ক' সংস্থা	'খ' সংস্থা
১. প্রাথমিক সদস্য : ৫০	প্রাথমিক সদস্য : ২৪
২. উদ্দেশ্য: বিশ্বশান্তি রক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন	উদ্দেশ্য: মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণ ও নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
৩. সদর দপ্তর : নিউইয়র্ক	সদর দপ্তর : জেদ্দা

[চ. বো. ২০১৬ ◢ প্রশ্ন নং ৮; স্কলারসহোম, সিলেট ◢ প্রশ্ন নং ১; মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ◢ প্রশ্ন নং ১০]

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ২

গ. 'ক' সংস্থার সাথে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 'খ' সংস্থার কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— South Asian Association for Regional Cooperation.

খ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল- বন্ধুত্বের নীতি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলকথা হল, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' (Friendship to all and malice to none)। বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই এ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলেছে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাই আমাদের বৈদেশিক নীতির মূলকথা। আমরা বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চাই।'

গ 'ক' সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের মিল রয়েছে।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত ৫০টি দেশের জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। জাতিসংঘের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ৫০। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৯৩। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি রক্ষা, বিশ্বের অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন, জাতিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বে সৌভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত।

'ক' সংস্থার প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ৫০। সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। এ ছাড়া সংস্থাটির সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত, যা আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের অনুরূপ। তাই বলা যায় 'ক' সংস্থার সাথে জাতিসংঘের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' সংস্থাটির সাথে OIC (Organisation of Islamic Cooperation) এর সাদৃশ্য আছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি-এর সদস্যপদ লাভ করে। ওআইসি-এর সদস্যপদ বাংলাদেশকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বীকৃতি অর্জন এবং জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভে সাহায্য করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর অবদান ছিল অপরিসীম। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ওআইসি-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। ওআইসি-এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট আল-কুদস কমিটির অন্যতম সদস্য। এ ছাড়াও সব স্থায়ী কমিটির সদস্য। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত OIC-এর ৫ দিনব্যাপী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে। ওআইসি-এর প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Islamic University of Technology (IUT) বাংলাদেশের গাজীপুরে অবস্থিত।

বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এর সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা লাভেও সমর্থ হয়েছে। IDB বাংলাদেশকে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতা লাভ করছে। সম্প্রতি কিছু আইনি জটিলতা তৈরি হলেও ওআইসিভুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য লাভ করার পর থেকে এর নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সাংগঠনিকভাবে সংগঠনটির সাথে এদেশের যেমন সক্রিয় অবস্থান রয়েছে তেমনি এর সদস্য দেশগুলোর সাথেও বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৩

M সংস্থা	N সংস্থা
* সদস্য সংখ্যা-০৮	* ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত
* ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত	* সদর দপ্তর নিউইয়র্ক
* সদর দপ্তর - কাঠমান্ডু	* সদস্য বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ

[সি. বো. ২০১৬ ◢ প্রশ্ন নং ৮]

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'- উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'M' কলামে প্রদত্ত সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'N' কলামে প্রদত্ত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Organisation of Islamic Cooperation.

খ সৃজনশীল ৪নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের M কলামে প্রদত্ত সংস্থাটি পাঠ্য বইয়ের SAARC (সার্ক) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)-এর উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন করা।

২. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে যৌথ স্বনির্ভরতাকে উন্নত ও জোরদার করা।

https://teachingbd24.com

৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বিরাজমান সমস্যা, দ্বন্দ্ব, বিরোধ নিরসন করে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করা।
৪. সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য যৌথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
৫. পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।
৬. বিশ্বের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।
৭. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৮. সার্কভুক্ত দেশগুলো একে অপরের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনভাবে চলার নীতি মেনে চলবে এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত N কলামের সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম দেশ হিসেবে সদস্যদপদ লাভ করে। শুরু থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে কাজ করে যাচ্ছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষ্টি, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সাহায্য ও সহযোগিতা করছে। তাই বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।
এ ছাড়া জাতিসংঘের অনেক অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা বীরত্বের সাথে কাজ করে চলেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন অনুসারে, শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান শীর্ষে। এ পর্যন্ত ৩১টি মিশনে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি শেষ হয়েছে এবং ১২টি চলছে। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে সিয়েরালিওন বাংলা ভাষাকে সে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মুধর, গভীর এবং সুনিবিড়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যার সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে। বর্তমানে ১৯৩টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এ সংগঠনের সদস্য। বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, টেকসই উন্নয়ন, গণতন্ত্রের উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা ছাড়াও স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সংস্থাটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মূলত আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যর্থতাও রয়েছে। *[বি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. EU-র পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত সংগঠনকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক EU-এর পূর্ণরূপ হলো European Union।

খ সার্কের দুটি উদ্দেশ্য নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. **আঞ্চলিক সহযোগিতা:** সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন করে সহযোগিতার বন্ধনকে দৃঢ় ও প্রসারিত করা সার্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা সার্কের অন্যতম লক্ষ্য।

২. **সার্বভৌমত্ব ও সংহতিবিধান:** সার্কভুক্ত ৮টি দেশ পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলবে এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠন হলো জাতিসংঘ। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা হলো নিরাপত্তা পরিষদ। ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। এ পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। অন্য ১০টি অস্থায়ী সদস্য দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের 'ভেটো' ক্ষমতা রয়েছে। তাদের যে কেউ ভেটো প্রদান করে যেকোনো প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কাজ হলো বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ পরিষদ শান্তি নষ্টকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। এ পরিষদে প্রতি মাসের জন্য একজন করে সভাপতি নির্বাচিত হন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠন হলো জাতিসংঘ। একে অধিকতর কার্যকর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
১. নিরাপত্তা পরিষদকে সম্প্রসারণ করা। একে অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলা।
২. নিরাপত্তা পরিষদকে আরো জবাবদিহিমূলক করে অধিকতর গণতান্ত্রিক করা।
৩. সংগঠনটির মহাসচিবকে আরো বেশি ক্ষমতা প্রদান করা।
৪. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ও ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রহিত করা।
৫. সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা।
৬. যৌথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা বৃদ্ধি করা।
৭. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘের নিজস্ব স্থায়ী শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করা একান্ত দরকার।
৮. জাতিসংঘের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে চলতি অর্থ বছরে অর্থ দিতে বাধ্য করা।
৯. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কর্মধারা প্রসারিত করা।
১০. জাতিসংঘ সচিবালয়ে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কী পরিমাণ সদস্য নিয়োগ করা দরকার তার সুস্পষ্ট বিধান থাকা।

প্রশ্ন ▶ ১৫

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

https://teachingbd24.com

ক. SAARC এর পূর্ণ রূপ কী? ১
খ. IUT সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত স্থানের আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণ রূপ হলো South Asian Association for Regional Co-operation.

খ IUT এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— Islamic University of Technology.
১৯৮৩ সালে OIC'র অর্থায়নে বাংলাদেশের গাজীপুরে শিক্ষা ও গবেষণামূলক এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং কেমিক্যাল প্রকৌশলের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি ও প্রশিক্ষক সৃষ্টি। এখানে ওআইসি'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্য গৃহীত কার্যক্রম দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সুনাম অর্জন করেছে।

গ উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানের আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে জাতিসংঘকে বোঝানো হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হলো—
লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতা এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শান্তিকামী দেশগুলোকে চরমভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। এরই প্রেক্ষাপটে চৌদ্দটি মিত্রশক্তি শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে লন্ডনে এক সম্মেলনের আহ্বান জানায়। এর কিছু দিনের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষর করেন। উক্ত সনদে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে চারটি প্রধান শক্তির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াশিংটনের ডামবারটন ওক্স শহরে ১৯৪৪ সালে চারটি মিত্রশক্তির বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সানফ্রান্সিসকোতে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ দীর্ঘ দুই মাস আলোচনার পর খসড়া দলিল অনুমোদন করেন। এ দলিলটি ইউএনও চার্টার নামে খ্যাত। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ জন্মলাভ করে। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য।

ঘ উদ্দীপকে প্রশ্নচিহ্নিত সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা অপরিসীম।
জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখতে বিশেষ আগ্রহী। স্বাধীনতার পর নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে জাতিসংঘ যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছে। নিচে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হলো:
জাতিসংঘ সনদের প্রতি আস্থা: বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় জাতিসংঘের প্রতি সমর্থনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে।
শক্তি প্রয়োগ নীতির বিরোধী: বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে জাতিসংঘের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে চায়।
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি: জাতিসংঘ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। বাংলাদেশও বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে স্বাগত জানায়।
পারমাণবিক শক্তিবিরোধী: পারমাণবিক শক্তি বিবর্জিত বিশ্ব গড়তে জাতিসংঘের সংকল্পের সঙ্গে বাংলাদেশ সবসময় অঙ্গীকারাবদ্ধ।
সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব: ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতির আসন অলংকৃত করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেন।
কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে পানিসেচ, বন সৃষ্টি, খাবার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ভূমিক্ষয় রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রশ্নে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে বৈষয়িক ও কারিগরি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়।
স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও WHO-এর সদস্য পদ লাভ: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এদেশের স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি ইত্যাদি উন্নয়নে প্রচুর সাহায্য ও অনুদান প্রদান করেছে এবং এখনও করছে।
তাই বলা যায়, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর এ ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা আট। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কবে প্রণীত হয়? ১
খ. জোট নিরপেক্ষ নীতি বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থাটির কথা বলা হয়েছে তার মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়।

খ জোট নিরপেক্ষ নীতি বলতে বোঝায় বিশ্বের সামরিক জোট বা বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের জোটের মতাদর্শের বাইরে থেকে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ধারায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলার অধিকারে বিশ্বাসী, আর এ বিষয়টিই হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলকথা।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের কথা বলা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। একইভাবে সার্ক (SAARC) দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী আটটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এই আঞ্চলিক সংস্থার পূর্ণরূপ South Asian Association for Regional Co-operation অর্থাৎ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। সার্ক গঠনে বাংলাদেশই প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্ক (SAARC) গঠিত হয়। সার্কের মূলনীতিগুলো হলো— এ সংস্থার যেকোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত

Teachingbd24.com

হবে; দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না; আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সার্ক ভূমিকা গ্রহণ করবে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখকৃত সংস্থাটি যে সার্ক, তা তার মূলনীতির মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা অর্থাৎ সার্কের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সার্ক গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু সার্ক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সার্কের যেকোনো সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। সার্কের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নয়নে সার্কের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যব্যবস্থা (SAPTA) চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সার্কের সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য বহুগুণ বাড়ে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৯ সালে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্কের সদা সাফল্য বাংলাদেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, সার্ক ও বাংলাদেশ অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সত্তরের দশকে একটি দেশ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা কী? ১

খ. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সংগঠন এর সাদৃশ্য আছে, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটিতে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

খ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষতা বলতে কোনো সামরিক জোটের সদস্য না হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি মেনে চলাকে বোঝায়।

ডান নয়, বামও নয়, মিত্র বা অক্ষ, কোনো শক্তির সঙ্গে জোট বাঁধা নয়। প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া হলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতি। এই মূলনীতির ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিউবার রাজধানী হাভানায় ন্যাম এর সদর দপ্তর অবস্থিত এবং বর্তমানে বিশ্বের ১২০টি দেশ এর সদস্য।

গ সৃজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মিঃ রাজু জাতিসংঘের একটি সংস্থা পরিচালিত শান্তি মিশনে কঙ্গোতে কাজ করেন। এই সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা ১৫। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এ সংস্থার প্রধান কাজ। অন্যদিকে মিসেস রাজিয়া কাজ করেন জাতিসংঘের অন্য একটি শাখায়। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রই এই শাখার সদস্য। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সার্ক গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. কমনওয়েলথ বলতে কী বোঝ? ২

গ. মিঃ রাজু জাতিসংঘের কোন শাখায় কাজ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুটি শাখার মধ্যে কোনটি অধিক শক্তিশালী বলে তুমি মনে করে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্ক গঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর।

খ কমনওয়েলথ হলো কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন সংস্থা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও অগ্রগতি এবং পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে। ব্রিটেন ও ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল এমন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহই কমনওয়েলথের সদস্য। বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫৩।

গ উদ্দীপকের মি. রাজু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাজ করেন।

জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্য এবং বাকী ১০টি অস্থায়ী সদস্য। প্রতি দুই বছর অন্তর সাধারণ পরিষদ সদস্যদের ভোটে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। স্থায়ী সদস্যরা প্রত্যেকে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কাজ হলো বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি বিপন্নকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিমাসের জন্য একজন করে সভাপতি নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ৫টি স্থায়ী সদস্যসহ মোট ৯টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি: রাজু জাতিসংঘের একটি সংস্থা পরিচালিত শান্তি মিশনে কঙ্গোতে কাজ করেন। এই সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা ১৫। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এ সংস্থার প্রধান কাজ। যা জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন নিরাপত্তা পরিষদকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের দুটি শাখার মধ্যে অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ অধিক শক্তিশালী বলে আমি মনে করি।

জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন হলো নিরাপত্তা পরিষদ। ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ

Teachingbd24.com

গঠিত। অন্যদিকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। যেকোনো শান্তিকামী রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা আছে। তাদের মধ্য হতে যে কোনো একটি রাষ্ট্র ভেটো প্রদান করে জাতিসংঘের যেকোনো প্রস্তাব বাতিল করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে নতুন সদস্য গ্রহণ, সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ, জাতিসংঘের বাজেট পাস, সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, অন্যান্য সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাধারণ পরিষদ করে থাকে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি বিপন্নকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের দুটি শাখার মধ্যে অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ অধিক ক্ষমতাশীল।

প্রশ্ন ▶ ১৯

[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. সার্ক এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কমনওয়েলথ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে যে অঙ্গ সংগঠনটি হবে, তার গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উক্ত সংগঠণের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্ক (SAARC)-এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Co-operation.

খ কমনওয়েলথ হলো কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন সংস্থা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও অগ্রগতি এবং পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে। ব্রিটেন ও ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল এমন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহই কমনওয়েলথের সদস্য। বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫২।

গ উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে নিরাপত্তা পরিষদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের কাজ-কর্ম পরিচালিত হয় ছয়টি প্রধান অঙ্গ সংস্থা দ্বারা। এগুলো হলো: (১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৪) আছি পরিষদ, (৫) আন্তর্জাতিক আদালত এবং (৬) সচিবালয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন হলো নিরাপত্তা পরিষদ।

নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় ১৫ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্য। বাকি ১০টি অস্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্য প্রতি দুই বছর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। স্থায়ী সদস্যরা ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্তকে তারা একাই বাতিল বা স্থগিত করে দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের কাজ হলো বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণ করা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মোট কথা, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রধান দায়িত্ব পালন করে।

ঘ উদ্দীপকের নির্দেশকৃত জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংগঠন নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় প্রধান দায়িত্ব পালন করে।

জাতিসংঘের কাজ-কর্ম পরিচালিত হয় ছয়টি প্রধান অঙ্গ সংস্থা দ্বারা। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ৫ জন স্থায়ী এবং ১০ জন অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। এ পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ও ফ্রান্স ও চীন। ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের ভোটে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। তাদের কেউ ভেটো প্রদান করে যেকোনো প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক কাজ হলো বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকলে নিরাপত্তা পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি বিপন্নকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা, জাতিগত দ্বন্দ্ব দূর, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফল বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার নিষ্পত্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ শফিউল হক সম্প্রতি একটি দেশের সফরে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান সেখানকার কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা তৈরি করে পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে তোমার পঠিত কোন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই উক্ত সংস্থার লক্ষ্য— বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কমনওয়েলথ হলো কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন সংস্থা।

খ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হলো সরকার কর্তৃক প্রণীত অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ও আচরণের নীতিমালা।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' এ নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

গ সৃজনশীল ৪নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট।

[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কমনওয়েলথ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হলো Organisation of Islamic Co-operation।

খ কমনওয়েলথ হলো সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বর্তমানে স্বাধীন এমন রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

একসময় প্রায় সারা বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ গঠন করা হয়।

গ সৃজনশীল ৭নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ নিচের তথ্যসমূহ দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী? ১

খ. সার্ক কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উল্লেখিত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়।

খ ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক সনদ অনুমোদন ও স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সার্কের জন্ম হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি উন্নয়নশীল দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের মে মাসে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৮ ডিসেম্বর সার্ক সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) জন্ম লাভ করে।

গ উদ্দীপকে প্রশ্ন চিহ্ন '?' দ্বারা আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে জাতিসংঘকে বোঝানো হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হলো–

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শান্তিকামী দেশগুলোকে চরমভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। এরই প্রেক্ষাপটে চৌদ্দটি মিত্রশক্তি শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে লন্ডনে এক সম্মেলনের আহ্বান জানায়। এর কিছু দিনের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষর করেন। উক্ত সনদে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। এর পর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে চারটি প্রধান শক্তির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়াশিংটনের ডামবারটন ওক্স শহরে ১৯৪৪ সালে চারটি মিত্রশক্তির বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সানফ্রান্সিসকোতে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ দীর্ঘ দুই মাস আলোচনার পর খসড়া দলিল অনুমোদন করেন। এ দলিলটি ইউএনও চার্টার নামে খ্যাত। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ জন্মলাভ করে। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত। বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য।

ঘ উদ্দীপকে প্রশ্ন '?' চিহ্নিত সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখতে বিশেষ আগ্রহী। স্বাধীনতার পর নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে জাতিসংঘ যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছে। নিম্নে জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করা হলো:

জাতিসংঘ সনদের প্রতি আস্থা: বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় জাতিসংঘের প্রতি সমর্থনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে।

শক্তি প্রয়োগ নীতির বিরোধী: বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে জাতিসংঘের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে চায়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি: জাতিসংঘ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। বাংলাদেশও বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে স্বাগত জানায়।

পারমাণবিক শক্তিবিরোধী: পারমাণবিক শক্তি বিবর্জিত বিশ্ব গড়তে জাতিসংঘের সংকল্পের সঙ্গে বাংলাদেশ সবসময় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব: ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সভাপতির আসন অলংকৃত করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেন।

কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে পানিসেচ, বন সৃষ্টি, খাবার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ভূমিক্ষয় রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রশ্নে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে বৈষয়িক ও কারিগরি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও WHO-এর সদস্য পদ লাভ: ২০০৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সভাপতির পদ লাভ করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এদেশের স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি ইত্যাদি উন্নয়নে প্রচুর সাহায্য ও অনুদান প্রদান করেছে এবং এখনও করছে।

তাই বলা যায়, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর এ ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৩

'ক' সংস্থা	'খ' সংস্থা
১. প্রাথমিক সদস্য: ৫০	১. প্রাথমিক সদস্য-২৪
২. উদ্দেশ্য: বিশ্বশান্তি রক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন।	২. উদ্দেশ্য: মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণ, নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৩. সদরদপ্তর: নিউইয়র্ক।	৩. সদরদপ্তর: জেদ্দা।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১০]

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. ইউরোপীয় ইউনিয়নের গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ২

গ. 'ক' সংস্থার সাথে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মিল রয়েছে? তার গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 'খ' সংস্থার কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো কমনওয়েলথ।

খ ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্গঠনের জন্য।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ দেশের একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। এ সংস্থার মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা সুফল পায়। বর্তমানে ইউরোপ সত্যিকার অর্থেই বিশ্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

গ সৃজনশীল ১২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয়। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বহুবিধ সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্য এই সংস্থাটি নির্ধারণ করে। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সংস্থাটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। *[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কমনওয়েলথ কী? ১

খ. নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির নাম কী? এ সংস্থাটির লক্ষ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থা গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর সংগঠন হলো কমনওয়েলথ; সংগঠনটি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র ৫৩টি।

খ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নাগরিকগণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জনমত তৈরি করে থাকেন, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোটদানের জন্য প্রচারণা চালান এবং যোগ্য মনে করলে নিজে প্রার্থী হন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নাগরিকগণ প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। নাগরিকের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো নির্বাচনই অর্থবহ হতে পারে না। তাই নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো সার্ক।

উদ্দীপকের সংস্থাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় এবং এটি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এ তথ্যগুলো সার্ক (SAARC- South Asian Associaton for Regional Cooperation)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা এবং এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সার্ক সনদ (১৯৮৫ সালে ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত) অনুযায়ী সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা; সদস্য দেশগুলোর মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সব ধরনের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা।

৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা দান।

৪. আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করা।

৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৬. বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৭. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা।

৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ঘ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ সার্ক গঠনে বাংলাদেশের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে।

সার্ক প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অভিন্ন। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ। এজন্য একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। এ প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে এদেশের মাটিতেই সার্কের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম ও তৎপরতার পর ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে এ অঞ্চলের দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এ সম্মেলনে ৭টি দেশের সরকারপ্রধান যোগ দেন। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষর এবং ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, এজন্য কার্যকর উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তিতে সার্কের প্রতিষ্ঠা এ সব কিছুর সাথেই বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। তাই বলা যায়, সার্ক গঠনে বাংলাদেশের ভূমিকাই প্রধান।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৫ সুদান ও দারফুরের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ ও সংঘর্ষ চলে আসছিল। তাদের বিবাদ মীসাংসায় একটি বিশ্বসংস্থা এগিয়ে আসে এবং গণভোটের আয়োজন করে। বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বসংস্থা বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-১০]

ক. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি? ১

খ. বাংলাদেশ কীভাবে ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে? বর্ণনা দাও। ২

গ. সুদান ও দারফুরের মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় বিশ্বসংস্থাটির কোন শাখা কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়।

খ বিশ্বের ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত OIC-র অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ পাঁচ বছর পর্যন্ত ওআইসির সাথে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল বলে প্রথম পাঁচ বছর বাংলাদেশে কোনো মুসলিম দেশের দূতাবাসও স্থাপিত হয়নি। ১৯৭৪ সালে ওআইসির দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়। তখনো পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ওআইসির নেতারা বাংলাদেশকে শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের আহ্বান করলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের শর্তারোপ করে। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং ওআইসি বাংলাদেশকে সদস্য করে নেয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদান ও দারফুরের মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় বিশ্বসংস্থাটির নিরাপত্তা পরিষদ কাজ করে থাকে।

বিশ্ব শান্তি ও সংহতি রক্ষায় ১৯৪৫ সালে গঠিত হওয়া জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো নিরাপত্তা পরিষদ। ৫টি স্থায়ী সদস্যসহ মোট ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব হলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগও করতে পারে। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এ পরিষদের ওপর ন্যস্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুদান ও দারফুরের মধ্যে চলে আসা দীর্ঘদিনের বিবাদ মীমাংসায় একটি বিশ্বসংস্থা এগিয়ে আসে এবং গণভোটের আয়োজন করে। বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে গঠিত এ বিশ্বসংস্থা বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করে থাকে। পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলা যায়, উক্ত সংস্থার গঠন ও কার্যাবলি জাতিসংঘের সাথে মিলে যায়। এ আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিবাদ মীমাংসায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এগিয়ে এসেছে।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ'-এর প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব 'ক' একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সম্প্রতি তিনি এক সেমিনারে বলেন যে, বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ। এ যুগে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে চলা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের স্বার্থ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র কতকগুলো নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়"-এ নীতির ভিত্তিতে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশও বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলেছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ১০]

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত নীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়"—উক্তিটির বাস্তবতা উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Co-operation।

খ বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৮৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৮টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১৩টি শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ, সেনাবাহিনী অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর আলোচনায় যেসব বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা— পাঠ্যবইয়ে উল্লেখ আছে একটি রাষ্ট্রের শান্তি, সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ, জাতীয় স্বার্থরক্ষা এবং সামরিক নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অপর রাষ্ট্রের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশেরও নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে।

একটি দেশের বৈদেশিক নীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ। বাংলাদেশের সংবিধানে ২৫নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে 'জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা এ সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।' বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। বাংলাদেশ নিজেকে কোনো জোটের সাথে জড়াতে চায় না। এই দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্ন। এসব কিছু বিবেচনায় রেখেই অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা লাভের জন্য বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সর্বদা সচেষ্ট।

ঘ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'— উক্তিটি উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হলো—

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ নীতি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রের সমঅধিকার, নিরাপত্তা, শান্তি ও নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী।

সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয় এ নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে জাতিসংঘ সনদসহ মানবাধিকারের সকল দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার কথাও বলা হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। এই সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল বহির্বিশ্বের স্বীকৃতি এবং দেশ পুনর্গঠনের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য আদায়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন Friendship to all malice to none অর্থাৎ সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে বৈরিতা নয়।

https://teachingbd24.com

এই উক্তির মধ্যেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল তাৎপর্য নিহিত। একদিকে দেশ পুনর্গঠন অন্যদিকে বহিঃবিশ্বের স্বীকৃতি আদায় এই দুইটি প্রধান দিককে লক্ষ রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই পরাশক্তির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। আয়তনে ক্ষুদ্র, সমস্যাপীড়িত এবং উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এ নীতির অনুসরণ অত্যন্ত যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত।

প্রশ্ন ▶ ২৭ ৭টি প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় বসে নিজেদের মধ্যকার বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার পাশাপাশি একে অপরের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ না করা এবং অপরের সম্পদের প্রতি লোভ ও তা অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকার সংকল্প ঘোষণা করেন। *[নায়েক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. কোন দিবসটি সারা বিশ্বে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১

খ. কমনওয়েলথ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে একটি আঞ্চলিক সংস্থার মিল বা সাদৃশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ব্যাখ্যা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২৪ অক্টোবর সারা বিশ্বে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

খ কমনওয়েলথ অব নেশনস বা কমনওয়েলথ হলো অতীতে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এমন স্বাধীন জাতিসমূহ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। বর্তমানে এ সংস্থার সদস্যসংখ্যা ৫৩। ব্রিটিশ রাজা বা রাণী এ সংস্থার প্রতীকী প্রধান। এ সংস্থার সচিবালয় লন্ডনে অবস্থিত। গ্রেট ব্রিটেনই এর নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমনওয়েলথ অব নেশনস গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে আমার পঠিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর সাদৃশ্য আছে।

সার্ক ১৯৮৫ সালে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট। শুরুতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে এ আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আফগানিস্তান এর সদস্যভুক্ত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাবলির সাথে সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতার কিছু প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেন। এর প্রতি এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। এটা স্বীকৃত যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সকল দেশের পক্ষেই কাম্য এবং সুবিধাজনক। এরই ফলশ্রুতিতে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৮৫ সালে সার্কের যাত্রা শুরু হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সংস্থার সাথে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর সাদৃশ্য আছে।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. প্রতিবন্ধি কারা? ১

খ. ওআইসি (OIC) কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটির মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবন্ধি হলো তারাই যারা দৈহিক, মানসিক ও বোধ শক্তিজনিত অসুবিধার কারণে সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত।

খ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওআইসি (OIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

মুসলিম দেশসমূহের সর্ববৃহৎ সংগঠনের নাম হল ওআইসি, যার পূর্ণরূপ হলো— Organisation of Islamic Co-operation (OIC)। এটি বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বের মুসলমানদের স্বার্থে ভূমিকা রাখা ওআইসি (OIC) গঠনের অন্যতম কারণ।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের কথা বলা হয়েছে।

সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সার্ক (SAARC) গঠনের মূল উদ্দেশ্য। উদ্দীপকের আঞ্চলিক সংস্থারও অনুরূপ উদ্দেশ্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। একইভাবে সার্ক (SAARC) দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী আটটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এই আঞ্চলিক সংস্থার পূর্ণরূপ হলো SAARC- South Asian Association for Regional Co-operation অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা। সার্ক গঠনে বাংলাদেশই প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্ক (SAARC) গঠিত হয়। সার্কের মূলনীতিগুলো হলো— এ সংস্থার যেকোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে; দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না; আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সার্ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থা অর্থাৎ সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ট।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু সার্ক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সার্কের যেকোনো সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

Teachingbd24.com

সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। সার্কের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নয়নে জন্য সার্কের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও অবাধ করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্যব্যবস্থা (SAPTA) চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সার্কের সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য বহুগুণ বাড়ে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৯ সালে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্কের সদা সাফল্য বাংলাদেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সার্ক ও বাংলাদেশ অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ২৯

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. EU কী? ১

খ. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানটির নাম কী? এর রচিত সনদগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী? ৩

ঘ. 'তুমি কি মনে কর বর্ণিত স্থানটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই গভীর'— ব্যাখ্যা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক EU এর পূর্ণরূপ হলো— European Union।

খ বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৮৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ৩৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১৩টি শান্তি মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ, সেনাবাহিনী অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করছে।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের নাম সার্ক। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন করা।

২. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে যৌথ স্বনির্ভরতাকে উন্নত ও জোরদার করা।

৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার বিরাজমান সমস্যা, দ্বন্দ্ব, বিরোধ নিরসন করে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করা।

৪. সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য যৌথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৫. পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।

৬. বিশ্বের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

৭. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৮. সার্কভুক্ত দেশগুলো একে অপরের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনভাবে চলার নীতি মেনে চলবে এবং একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বিশ্বে ইউরোপীয় পণ্যের বাজার প্রতিষ্ঠার জন্যই ঐ অঞ্চলের কিছু দেশ একটি জোট গঠন করে। পরবর্তীকালে এরা বাণিজ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জোট গঠন করে। বর্তমানে ব্রিটেন ঐ জোট হতে বেরিয়ে যাবার প্রস্তাব রেখেছে। যদিও এই আন্তর্জাতিক সংস্থা ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে। *[জাফরাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সার্কের সদর দফতর কোথায়? ১

খ. নিরাপত্তা পরিষদের কাজ কী? ২

গ. উদ্দীপকের যে আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সঙ্গে উক্ত সংস্থার সম্পর্ক বর্ণনা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সদর দফতর নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত।

খ নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংস্থা। নিরাপত্তা পরিষদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। বিশ্ব শান্তি রক্ষা করাই হলো নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান দায়িত্ব।

গ সৃজনশীল ৩নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ 'S' নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই তার বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে। কোনো সামরিক জোটে যোগদান না করা, কোনো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত ও প্রগতিশীল করার মহান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রটির বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া রাষ্ট্রটি আঞ্চলিক সহযোগিতার নীতিকে জোরদার করার মাধ্যমে জনজীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশি ৭টি দেশকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তুলেছে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি? ১

খ. ওআইসি কেন গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'S' রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থাটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

Teachingbd24.com

খ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওআইসি (OIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

মুসলিম দেশসমূহের সর্ববৃহৎ সংগঠনের নাম হল ওআইসি, যার পূর্ণরূপ হলো— Organisation of Islamic Co-operation (OIC)। এটি বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বের মুসলমানদের স্বার্থে ভূমিকা রাখা ওআইসি (OIC) গঠনের অন্যতম কারণ।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থা হচ্ছে সার্ক। সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ট।

সার্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সার্কের স্বপ্ন দ্রষ্টা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু সার্ক গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সার্কের যেকোনো সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

সার্ক গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোগী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। সার্কের জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের উন্নয়নে জন্য সার্কের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সার্কের সদস্য হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্যব্যবস্থা (SAPTA) চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে সার্কের সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য বহুগুণ বাড়ে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৮৯ সালে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে এ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্কের সদা সাফল্য বাংলাদেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সার্ক ও বাংলাদেশ অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ৩২ সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান এক সেমিনারে বলেন, বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ। এ যুগে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে চলা সম্ভব নয়। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'— এ নীতির ভিত্তিতে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশও বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলেছে। *[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'— উক্তিটির বাস্তবতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হলো— Organisation of Islamic Cooperation।

খ 'সার্ক সনদ' এবং 'ঢাকা ঘোষণা' অনুযায়ী সার্কের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ঠিক করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম দুটি উদ্দেশ্যে হলো—

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান।

গ উদ্দীপকের নীতিটি অর্থাৎ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়' হলো বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি। এই নীতি ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে।

সমস্যা সমাধানে আলাপ-আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। আলাপ-আলোচনা যেকোনো বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান দিতে পারে। তাই শত্রুতা নয় বরং মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলে কার্যকর ফলাফল আশা করা যায়।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূলকথা হলো— পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। অন্যদিকে নিজেদের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায়ও বাংলাদেশ পুরোপুরি সচেতন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বার্থগত কারণে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িত। এসব দেশ যদি শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিহার করে বাংলাদেশের মতো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করে তবে দেশের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই একটি উপযুক্ত ও কার্যকর সমাধান পেতে পারে।

ঘ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'— এ নীতির ভিত্তিতে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলকথা হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়। আয়তনে ক্ষুদ্র, সমস্যা পীড়িত এবং উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এই নীতি অনুসরণ অত্যন্ত যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত।

বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য—উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা করা বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সর্বদা সমর্থন করে।

বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌমত্ব ও সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাসী। কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করুক এটা যেমন প্রত্যাশা করে না, তেমনি অন্য কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে কেউ আঘাত আনুক এটাও কামনা করে না। বাংলাদেশ তার বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস করে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্কের রূপকার বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সকল মুসলিম দেশের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত আগ্রহী।

আলোচনা শেষে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে শত্রুতা নয়' নীতিতে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা তৈরিতে কাজ করছে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সদস্য সংখ্যা আট। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

Teachingbd24.com

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যে আঞ্চলিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেটির মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হলো— Organisation of Islamic Co-operation।

খ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হলো সরকার কর্তৃক প্রণীত অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ও আচরণের নীতিমালা। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' এ নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

গ সৃজনশীল ৭নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে ১৯৫০ সালে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশও উক্ত সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা-ই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বিশ্ব শান্তি রক্ষার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনটির মূলনীতি রক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা কতটুকু সক্রিয় বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ লিখ। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC-এর পূর্ণরূপ হলো Organisation of Islamic Co-operation.

খ বিশ্ব শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো জাতিসংঘ।

১৯২০ সালে গঠিত লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা এবং ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতায় বিশ্ববাসি সংকিত হয়ে পড়ে। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করে। কোনো রাষ্ট্রের সাথে অন্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে এ সংস্থাটি আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কমনওয়েলথ আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং টেকসই পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এক সময় প্রায় সারা বিশ্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। যেসব দেশ বা রাষ্ট্র ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনভুক্ত ছিল তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য গঠিত হয় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশন (British Commonwealth of Nations)। সংগঠনটি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথের প্রধান। এর সদরদপ্তর লন্ডনে অবস্থিত। প্রতি দুই বছর পরপর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কমনওয়েলথের প্রধান লক্ষ্য হলো ব্রিটেন ও এর স্বাধীন উপনিবেশগুলোর মধ্যে নূন্যতম সম্পর্ক রক্ষা করা। এই সম্পর্ক ধরে রাখার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানে সহায়তার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশকৃত সংগঠনটির মূলনীতি রক্ষায় বাংলাদেশ সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটেন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র। কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশ খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, আশ্রয় দান করেছিল।

বাংলাদেশের প্রতি উদার মনোভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য পথ লাভ করে। একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এর প্রতিটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এর নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে। কলম্বো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ সহযোগিতা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ কমনওয়েলথের মূলনীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫

[শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. জাতিসংঘের মহাসচিবের নাম কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক আদালতের কাজ লিখ। ২
গ. চিত্রে উল্লিখিত সংস্থাটি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নে সংস্থাটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

খ যে আদালত আইনি প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে তাকে আন্তর্জাতিক আদালত বলা হয়।

জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র যেকোনো আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। ১৫ জন বিচারক নিয়ে এ আদালত গঠিত।

Teachingbd24.com

গ চিত্রে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো সার্ক।

চিত্রে যে দেশগুলো প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলো সার্কের সদস্য রাষ্ট্র। সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা এবং এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদস্য রাষ্ট্র ৮টি। সেগুলো হলো— বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান।

সার্ক সনদ (১৯৮৫ সালে ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত) অনুযায়ী সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা; সদস্য দেশগুলোর মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সব ধরনের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা।
৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা দান।
৪. আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করা।
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৬. বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৭. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা।
৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ঘ আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নে সংস্থাটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংস্থার জন্ম হয়। সার্ক সনদে আটটি প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জনজীবনের মানোন্নয়ন, আস্থা ও সমঝোতা বৃদ্ধি, যৌথ কার্যক্রমের সূচনা, অপরের সঙ্গে সহযোগিতা, অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা এবং সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিধান।

এছাড়া সার্ক সদস্যভুক্ত দেশসমূহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লেনদেন এবং আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহের সাথে কাজ করে থাকে। শুধু তাই নয় সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধের নিষ্পত্তি, প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সংকট নিরসনে সকল সদস্য রাষ্ট্র একযোগে কাজ করছে যা সামগ্রিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সংস্থাটি অর্থাৎ সার্ক আঞ্চলিক শান্তি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ শ্রেণিকক্ষে তাহিয়া বলেছিলেন, একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে OIC গঠন ত্বরান্বিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশ OIC'র সদস্যপদ লাভের চেষ্টা করে অবশেষে এর সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যের সাথে OIC'র লক্ষ্যের মিল থাকার কারণেই বাংলাদেশ এ সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং সংস্থার বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে বাংলাদেশও নানাভাবে লাভবান হচ্ছে। *[সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশ OIC'র সদস্যপদ লাভ করে কবে? ১
খ. কোন বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে OIC'র গঠন ত্বরান্বিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষকের মতে যে কারণে বাংলাদেশ OIC'র সদস্যপদ গ্রহণ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিক্ষকের সর্বশেষ মন্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে।

খ ইসরাইল কর্তৃক মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রেক্ষাপটে ওআইসি(OIC) গঠন করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় ইহুদিরা অগ্নিসংযোগ করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা জানায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। বিষয়টি সম্পর্কে সকল মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে সে বছর ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭০ সালের ২২ থেকে ২৭ মার্চ প্রথমবারের মতো মুসলিম মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ওআইসি-এর একটি খসড়া সনদ অনুমোদিত হয়। শুরু হয় ওআইসি-এর অগ্রযাত্রা।

গ উদ্দীপকের শিক্ষকের মতে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্যের সাথে OIC-এর লক্ষ্যের মিল থাকায় এ সংস্থাটির সদস্যপদ বাংলাদেশ গ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হলো সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়'। এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব পোষণ করে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' এ নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সব সময়ই বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুদৃঢ় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

ওআইসি গঠনের উদ্দেশ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামি সংহতি বৃদ্ধি করা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা সংহত করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা। সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্যের অবসান এবং সবরকমের ঔপনিবেশবাদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা। মুসলমানদের মান-মর্যাদা, স্বাধীন ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ শিক্ষকের শেষ মন্তব্যটির মূলকথা হলো বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ গ্রহণ করার ফলে নানাভাবে লাভবান হচ্ছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি-এর সদস্যপদ লাভ করে। ওআইসি-এর সদস্যপদ বাংলাদেশকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বীকৃতি অর্জন এবং জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভে সাহায্য করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর অবদান ছিল অপরিসীম। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ওআইসি-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে।

Teachingbd24.com

ওআইসি-এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট আল-কুদস কমিটির অন্যতম সদস্য। এ ছাড়াও সব স্থায়ী কমিটির সদস্য। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত OIC-এর ৫ দিনব্যাপী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।

বাংলাদেশ ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এর সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা লাভেও সমর্থ হয়েছে। IDB বাংলাদেশকে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতা লাভ করছে। ওআইসি-এর প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Islamic University of Technology (IUT) বাংলাদেশের গাজীপুরে অবস্থিত। ওআইসিভুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। সাংগঠনিকভাবে সংগঠনটির সাথে এদেশের যেমন সক্রিয় অবস্থান রয়েছে তেমনি এর সদস্য দেশগুলোর সাথেও বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান।

আলোচনা শেষে বলা যায়, শিক্ষক তার বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ ওআইসি'র কাছ থেকে যে সকল সুযোগ-সুবিধার লাভ করছে সে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব রায়হান আব্বাস গার্মেন্টস কারখানার মালিক। এ কারখানার উৎপাদিত কাপড় তিনি ইউরোপের কয়েকটি দেশে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। রায়হান আব্বাসের ব্যবসার ক্ষেত্রে ২০০১ সালে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তি কার্যকরী অবদান রেখে চলেছে। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা কত? ১

খ. কমনওয়েলথ এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রায়হান আব্বাসের ব্যবসার সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থাটি জড়িত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক'-এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৩।

খ কমনওয়েলথ এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেন ছিল বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং গঠন করেছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। কমনওয়েলথ ও তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকের রায়হান আব্বাসের ব্যবসার সাথে পাঠ্যবইয়ের ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্থাটি জড়িত।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার হলো ইউরোপ। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে বিনা শুল্কে সব ধরনের পণ্য রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০০১ সালে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তি বিশেষ অবদান রাখছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রায়হান আব্বাস একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। তিনি ইউরোপের কয়েকটি দেশে তার কারখানার কাপড় বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। তার ব্যবসার ক্ষেত্রে ২০০১ সালে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তি কার্যকরী অবদান রেখে চলছে। তাই বলা যায়, রায়হান সাহেবের ব্যবসা পাঠ্যবইয়ের ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্থাটির সাথে জড়িত।

ঘ উদ্দীপকে রায়হান আব্বাসের ব্যবসার সাথে পাঠ্যবইয়ের ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্থাটি জড়িত। এ সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশি পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একক অঞ্চল হিসেবে ইইউ শীর্ষে অবস্থান করছে। বর্তমানে ইইউভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশ বিনা শুল্কে সবধরনের পণ্য রপ্তানি করছে।

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, সুশাসন এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০১ সালে ইইউ বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত করে। ইইউ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষককের ভূমিকা পালন করে। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইইউ ১০০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ছিল। এছাড়া বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির বড় বাজার ইউরোপ। এজন্য বাংলাদেশের শ্রমিক অধিকার ও গার্মেন্টস শিল্পে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে ২০১৩ সালে ইইউ ও বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, ইইউ-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মূলত বাণিজ্যিক।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইইউ-এর সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও বাণিজ্যিক সম্পর্কই প্রধান।

Teachingbd24.com

নবম অধ্যায়: বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

★★ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ও বৈশিষ্ট্য

১. 'পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাই আমাদের বৈদেশিক নীতির মূলকথা'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ তাজউদ্দিন আহমদ
গ জেনারেল জিয়াউর রহমান
ঘ জেনারেল এইচ.এম.এরশাদ — ক

২. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে শরিক হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৩ সালে
গ ১৯৭৪ সালে ঘ ১৯৭৫ সালে — খ

৩. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক উন্নয়নমুখী
খ পরাধীন ও নিরপেক্ষতা
গ আঞ্চলিক ও অসহযোগিতা
ঘ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী — ঘ

৪. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল— *[ব. বো. '১৫]*
ক বিশেষ কারও সাথে বন্ধুত্ব কারও প্রতি শত্রুতা নয়
খ সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে শত্রুতা নয়
গ সকলের সাথে শত্রুতা
ঘ গোষ্ঠী বিশেষের সাথে মিত্রতা — খ

৫. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান শর্ত কী? *[আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ভিকারুন নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক বন্ধুত্বের নীতি খ শত্রুতার নীতি
গ আঞ্চলিক নীতি ঘ নিরপেক্ষ নীতি — ক

৬. 'আমি কোনো ব্লকে নেই। প্রাচ্য ব্লকেও নয়, পাশ্চাত্য ব্লকেও নয়— আমি স্বাধীন, নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ খন্দকার মোশতাক আহমদ
গ বেগম খালেদা জিয়া
ঘ শেখ হাসিনা — ক

৭. পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোন নীতি গ্রহণ করেছে? [জ্ঞান]
ক জোটপূর্ণ নীতি খ জোট নিরপেক্ষ নীতি
গ বৃহৎ শক্তির জোট ঘ সাম্রাজ্যবাদী জোট — খ

৮. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি স্বাধীন ও নিরপেক্ষতার পাশাপাশি কীরূপ? [অনুধাবন]
ক আদর্শভিত্তিক
খ অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা শাসিত
গ অন্য রাষ্ট্রের প্রতি অপপ্রচার চালানো
ঘ আপোষহীন — ক

৯. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির কথা উল্লেখ রয়েছে সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে? [জ্ঞান]
ক ২১ (১) খ ২৩ (১)
গ ২৪ (১) ঘ ২৫ — ঘ

১০. 'বৈদেশিক' শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক নিজ দেশ সম্বন্ধীয়
খ অন্য দেশ সম্বন্ধীয়
গ পার্শ্ববর্তী দেশ সম্বন্ধীয়
ঘ বিদেশের গৃহীত নীতি সম্বন্ধীয় — খ

১১. "National policy" শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক অভ্যন্তরীণ নীতি
খ বাহ্যিক নীতি
গ বৈদেশিক নীতি
ঘ জাতীয় নীতি — ঘ

১২. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য হলো— *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
i. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা
ii. প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বৈরী সম্পর্ক গড়ে তোলা
iii. প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি বজায় রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

★ সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্য

১৩. সার্ক গঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৮১ সালে খ ১৯৮২ সালে
গ ১৯৮৪ সালে ঘ ১৯৮৫ সালে — ঘ

১৪. সার্কের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী? [জ্ঞান]
ক শীলকান্ত শর্মা খ আহমেদ সালাম
গ নিহলে রডারিগো ঘ চেনকিয়াব দরজি — খ

১৫. সার্ক হলো— *[য. বো. '১৫]*
ক আঞ্চলিক সংস্থা খ সামরিক জোট
গ জোট নিরপেক্ষ সংস্থা
ঘ ধর্মীয় সংস্থা — ক

১৬. সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র হলো- *[চা. বো. '১৫]*
ক চীন খ দক্ষিণ কোরিয়া
গ আফগানিস্তান ঘ মায়ানমার — গ

১৭. প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র ছিল কয়টি? [জ্ঞান]
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৯টি ঘ ১০টি — গ

১৮. সার্কের প্রথম পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ঢাকায় খ নয়াদিল্লিতে
গ কলম্বোতে ঘ কাঠমান্ডুতে — গ

১৯. কত সালে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে সার্কের তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৮৭ সালে খ ১৯৮৮ সালে
গ ১৯৮৯ সালে ঘ ১৯৯০ সালে — ক

২০. সার্কভুক্ত কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে? [অনুধাবন]
ক পাকিস্তান খ শ্রীলংকা
গ ভারত ঘ নেপাল — গ

২১. কে সার্কের প্রথম মহাসচিব ছিলেন? [জ্ঞান]
ক আবুল আহসান
খ জিয়াউর রহমান
গ ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ
ঘ জিগমে ওয়াই ফিনলে — ক

নিচের ছক থেকে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

[কু. বো. '১৫; সি. বো. '১৫]

২২. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত সংস্থাটির নাম কী?
ক জাতিসংঘ খ ওআইসি
গ আসিয়ান ঘ সার্ক — ঘ

Teachingbd.com

২৩. ছকে '?' চিহ্নিত সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ওপর—

i. অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে
ii. পরস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে
iii. অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ ওআইসি-র গঠন ও উদ্দেশ্য

২৪. কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]

ক ১৯৪৭ খ ১৯৪৮
গ ১৯৪৯ ঘ ১৯৫০ **গ**

২৫. ওআইসির অন্যতম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ICTVTR বাংলাদেশের কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]

ক সাভারে খ মিরপুরে
গ গাজীপুরে ঘ আব্দুল্লাহপুরে **গ**

২৬. OIC এর পূর্ণরূপ কী? [জ্ঞান]

ক Organization of Islamic Capital
খ Organization of Islamic Cooperation
গ Organisation of Islamic Country
ঘ Organisation of Islamic Courrency **খ**

২৭. ও.আই.সির অর্থ কী? [জ্ঞান]

ক ইসলামি সম্মেলন সংস্থা
খ ইসলামি কনফারেন্স
গ ইসলামি বিশ্ব সম্মেলন
ঘ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা **ক**

২৮. ওআইসি গঠনের উদ্দেশ্য হলো— *[য. বো. '১৫]*

ক এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক স্থাপন
খ বিশ্ব বাণিজ্য সম্প্রসারণ
গ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংহতি বৃদ্ধি করা
ঘ কমনওয়েলথ গঠন করা **গ**

২৯. মুসলিম দেশসমূহের সর্ববৃহৎ সংগঠনের নাম কী? *[চ. বো. '১৫; আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক সার্ক খ ওআইসি
গ কমনওয়েলথ ঘ আসিয়ান **খ**

৩০. জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের কত তম মুসলিম রাষ্ট্র? [জ্ঞান]

ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ **খ**

৩১. কত সালে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়? [জ্ঞান]

ক ১৯৭৪ সালে খ ১৯৭৫ সালে
গ ১৯৭৬ সালে ঘ ১৯৭৭ সালে **ক**

৩২. ১৯৭৪ সালে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]

ক করাচিতে খ লাহোরে
গ ইসলামাবাদে ঘ তাসখন্দে **খ**

৩৩. ওআইসি এর বর্তমান পূর্ণ নাম কী? [জ্ঞান]

ক ইসলামি সম্মেলন সংস্থা
খ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা
গ ইসলামি উন্নয়ন সংস্থা
ঘ ইসলামি সহযোগিতা সমিতি **খ**

৩৪. ওআইসির সদস্যভুক্ত কোন দেশগুলোতে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করছে? [জ্ঞান]

ক উন্নয়নশীল
খ সোনার খনি রয়েছে এমন দেশসমূহে
গ তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহে
ঘ গ্যাসসমৃদ্ধ দেশসমূহে **গ**

৩৫. কোন সালে ঢাকায় ওআইসিভুক্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]

ক ১৯৮০ সালে খ ১৯৮১ সালে
গ ১৯৮২ সালে ঘ ১৯৮৩ সালে **ঘ**

৩৬. ওআইসির প্রধান কাজ কী? [অনুধাবন]

ক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়
খ মন্ত্রীদের আনুগত্য
গ পার্শ্ব সংগঠন
ঘ চার-পাঁচ সদস্যের সিদ্ধান্ত **ক**

৩৭. সেক্রেটারিয়েট গঠিত হয়— [অনুধাবন]

i. একজন সেক্রেটারি জেনারেল
ii. তিজন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল
iii. প্রয়োজনীয় স্টাফ নিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৮. বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ লাভের ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বীকৃতি পায়
ii. জাতিসংঘসহ অন্যান্য সংস্থার সদস্যপদ সহজে পেয়ে যায়
iii. যুদ্ধ পরবর্তী দেশের পুনর্গঠনে তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতা পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ইউরোপীয় ইউনিয়নের গঠন ও উদ্দেশ্য

৩৯. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য কতটি? [জ্ঞান]

ক ২৫টি খ ২৭টি
গ ২৮টি ঘ ২৯টি **গ**

৪০. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? *[কু. বো. '১৫]*

ক প্যারিসে খ রোমে
গ ব্রাসেলসে ঘ লন্ডনে **গ**

৪১. বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা কত? [জ্ঞান]

ক ২২ খ ২৫
গ ২৮ ঘ ২৯ **গ**

৪২. ইইউ দেশগুলোর মধ্যে যে একক মুদ্রা চালু হয়েছে তার নাম কী? [জ্ঞান]

ক টাকা খ ডলার
গ দিনার ঘ ইউরো **ঘ**

৪৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাহী বিভাগের নাম কী? [জ্ঞান]

ক ইইউ খ ইসি
গ ওএইউ ঘ ইউসি **খ**

৪৪. ইইউ-এর বর্তমান সদস্য কত? [জ্ঞান]

ক ২৫ খ ২৬
গ ২৭ ঘ ২৮ **ঘ**

৪৫. ইইউ-এর অফিসিয়াল ভাষা কয়টি? [জ্ঞান]

ক ১৮টি খ ১৯টি
গ ২৩টি ঘ ২৫টি **গ**

৪৬. ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের একক মুদ্রার নাম কী? [জ্ঞান]

ক ডলার খ ইয়েন
গ ইউরো ঘ লিরা **গ**

৪৭. কোন ক্ষেত্রে ইউরোপ এখন বিশ্বশক্তি? [জ্ঞান]

ক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে
গ সামাজিক ক্ষেত্রে ঘ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে **খ**

Teachingbd.com

৪৮. ইইউ কোন দেশের শক্ত প্রতিপক্ষ হতে পারে? [জ্ঞান]
ক ভারত খ রাশিয়া
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ চীন
গ

৪৯. ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য— */শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা; নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/*
i. বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন
ii. আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
iii. সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

★★ কমনওয়েলথ এর গঠন ও উদ্দেশ্য

৫০. মূলত কোন দেশগুলো নিয়ে কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ইউরোপ মহাদেশভুক্ত
খ এশিয়া মহাদেশভুক্ত
গ আফ্রিকা মহাদেশভুক্ত
ঘ প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত
ঘ

৫১. বাংলাদেশ সর্বপ্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেন? */চা. বো. '১৫/*
ক কমনওয়েলথ খ জাতিসংঘ
গ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন
ঘ ও আই সি
ক

৫২. ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে? */কু. বো. '১৫/*
ক ওআইসি খ কমনওয়েলথ
গ সার্ক ঘ জাতিসংঘ
খ

৫৩. বাংলাদেশ কতসালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে? */আল-আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর/*
ক ১৯৭২ সালের ১০ মে খ ১৯৭২ সালের ২২ জুন
গ ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর
ঘ ১৯৭২ সালের ১০ ডিসেম্বর
খ

৫৪. 'কমনওয়েলথ' এর প্রধান কে? [জ্ঞান]
ক ব্রিটেন-এর রাজা-রানি
খ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী
গ ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
ঘ ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ক

৫৫. অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। অস্ট্রেলিয়া কোন রাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল? [অনুধাবন]
ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ ব্রিটেন
গ ফ্রান্স ঘ জার্মানি
খ

৫৬. কমনওয়েলথের প্রধান কে? [অনুধাবন]
ক শুধু ব্রিটেনের রাজা
খ শুধু ব্রিটেনের রানি
গ এমেকা
ঘ ব্রিটেনের রাজা বা রানি
ঘ

৫৭. জিয়াউর রহমান কত সালে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করেন? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৫ সালে খ ১৯৭৬ সালে
গ ১৯৭৭ সালে ঘ ১৯৭৮ সালে
গ

৫৮. কত সালে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৪৯ সালে খ ১৯৫০ সালে
গ ১৯৫১ সালে ঘ ১৯৫২ সালে
ক

৫৯. কমনওয়েলথের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [জ্ঞান]
ক দি হেগে খ প্যারিস
গ লন্ডন ঘ ব্রাসেলস
গ

৬০. কমনওয়েলথ যে ধরনের সংস্থা— [অনুধাবন]
i. সহযোগিতামূলক সংস্থা
ii. স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীন সংস্থা
iii. স্বাধীনতা লাভে সাহায্যকারী সংস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সম্প্রতি ফারহানা ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বৃত্তি নিয়ে ব্রিটেনে অধ্যায়ন করছে। তার সংস্থাটির প্রধান ব্রিটেনের রাজা বা রানি। সংস্থাটি বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও মানবতা প্রভৃতির অগ্রগতির জন্য কাজ করছে। */শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা/*

৬১. ফারহানার বৃত্তিদাতা সংস্থাটির নাম কী? [প্রয়োগ]
ক ওআইসি খ সার্ক
গ কমনওয়েলথ ঘ জাতিসংঘ
গ

৬২. ফারহানার বৃত্তিদাতা সংস্থাটির সদস্য দেশগুলোর বাংলাদেশে অবদান রয়েছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. খাদ্য ও কৃষি উন্নয়নে
ii. স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে
iii. কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

★★ জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য

৬৩. সারা বিশ্ব জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয় কোন দিবসটি? [জ্ঞান]
ক ২৬ জুন, ১৯৪৫ খ ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৫
গ ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫
ঘ ১০ জানুয়ারি, ১৯৪৬
গ

৬৪. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [জ্ঞান]
ক লন্ডন শহরে খ ওয়াশিংটন শহরে
গ নিউইয়র্ক শহরে ঘ সানফ্রান্সিসকো শহরে
গ

৬৫. বাংলাদেশ কত সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৫ সালে খ ১৯৭৬ সালে
গ ১৯৭৭ সালে ঘ ১৯৭৮ সালে
ঘ

৬৬. আন্তর্জাতিক আদালত কোন শহরে অবস্থিত? [জ্ঞান]
ক নিউইয়র্ক খ ওয়াশিংটন
গ হেগ ঘ প্যারিস
গ

৬৭. জাতিসংঘ কোন সালে 'প্রতিবন্ধীদের অধিকার সনদ' প্রণয়ন করে? */চ. বো. '১৫/*
ক ১৯৭৯ খ ১৯৯০
গ ২০০০ ঘ ২০০৬
ঘ

৬৮. নিচের কোন দেশটি পরাশক্তি? */ঢা. বো. '১৫; হলিক্রস কলেজ, ঢাকা/*
ক যুক্তরাষ্ট্র খ জাপান
গ ভারত ঘ পাকিস্তান
ক

৬৯. 'লীগ অব নেশনস্' সৃষ্টি হয়েছিল কেন? */আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/*
ক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য
খ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য
গ বাণিজ্যিক সহযোগিতায়
ঘ সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে
ক

৭০. জাতিসংঘ কর্তৃক শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয় কেন? */ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউ এসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর/*
ক শান্তি রক্ষার জন্য
খ শান্তি দূর করার জন্য
গ শান্তিপ্রিয় লোক সৃষ্টির জন্য
ঘ শান্তি সংঘ গঠনের জন্য
ক

Teachingbd.com

৭১. কত সালে লিগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯০২ সালে খ ১৯৫২ সালে
গ ১৯৪৮ সালে ঘ ১৯২০ সালে **ঘ**

৭২. জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট
খ আব্রাহাম লিংকন
গ উড্রো উইলসন ঘ কেনেডি **ক**

৭৩. জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদবির নাম কী? [জ্ঞান]
ক মহাপরিচালক খ সচিব
গ মহাসচিব ঘ পরিচালক **গ**

৭৪. আন্তর্জাতিক আদালতকে কী বলা হয়? [অনুধাবন]
ক আন্তর্জাতিক বিচারালয়
খ জাতিসংঘের বিচারালয়
গ জাতিসংঘের আঞ্চলিক বিচারালয়
ঘ ইউরোপিয়ান বিচারালয় **খ**

৭৫. জাতিসংঘের মহাসচিবের মেয়াদকাল কত বছর? [জ্ঞান]
ক ৫ বছর খ ৬ বছর
গ ৮ বছর ঘ ১০ বছর **ক**

৭৬. বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ফাও) এর সদস্য সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ১৮৭টি খ ১৮৮টি
গ ১৯৫টি ঘ ১৭৮টি **ক**

৭৭. জাতিসংঘের অন্যতম সাফল্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক পৃথিবীকে সংঘাতমুক্ত করতে পেরেছে
খ পৃথিবীকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পেরেছে
গ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়েছে
ঘ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে **গ**

৭৮. জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো— *[য. বো. '১৫; নরাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা]*
i. শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা
ii. সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা
iii. মানবাধিকার নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭৯. জাতিসংঘ অবদান রাখছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়তে
ii. নিরক্ষরতা দূর করতে
iii. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮০. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য। সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ— [প্রয়োগ]
i. সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়
ii. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য
iii. আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

৮১. আফ্রিকা মহাদেশের কোন দেশের অন্যতম জাতীয় ভাষা বাংলা? [জ্ঞান]
ক কঙ্গো খ জায়ার
গ সুদান ঘ সিয়েরালিওন **ঘ**

৮২. বাংলাদেশে কোন সংস্থার উদ্যোগে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি' প্রকল্প চালু রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ন্যাম খ সার্ক
গ জাতিসংঘ ঘ আসিয়ান **গ**

৮৩. ১৯৭২ সালের ১০ মে বাংলাদেশ কোন সংস্থাটির সদস্যপদ লাভ করে? [জ্ঞান]
ক বিশ্বব্যাংক
খ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল
গ জাতিসংঘ
ঘ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা **খ**

৮৪. বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭২ সালের কত তারিখে? [জ্ঞান]
ক ১৯ এপ্রিল খ ১৯ মে
গ ১৯ সেপ্টেম্বর ঘ ১৯ অক্টোবর **ঘ**

৮৫. ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের কোন মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেন? [জ্ঞান]
ক দ্যাগ হ্যামারশোল্ড খ প্যারেজ দ্যা কুইয়ার
গ কফি আনান ঘ বান কি মুন **খ**

৮৬. ১৯৯১ সালে মিয়নমার থেকে বাংলাদেশে যে শরণার্থী আসে তারা কী নামে পরিচিত? [জ্ঞান]
ক রোহিঙ্গা খ মারমা
গ চাকমা ঘ সাঁওতাল **ক**

৮৭. কোন যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন পাঠানো হয়? [জ্ঞান]
ক আফগানিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে
খ ইরান-ইরাক যুদ্ধে
গ ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধে
ঘ ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত যুদ্ধে **খ**

৮৮. ইউনেস্কোর মূল কাজ হলো— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা, বিজ্ঞান
ii. সংস্কৃতি
iii. যোগাযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্যুক্ত হয়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সার্থক বৈদেশিক নীতির জন্যে
ii. সার্থক শ্রমনীতির জন্যে
iii. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল ভূমিকা পালনের জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯০–৯২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১০ মে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের, ২০ মে আংকটাড এবং ২২ জুন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

৯০. উদ্দীপকের সংস্থাগুলো কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন সংস্থা? [প্রয়োগ]
ক ওআইসি খ আসিয়ান
গ জাতিসংঘ ঘ কমনওয়েলথ **গ**

৯১. বাংলাদেশ কত সালে উক্ত সংস্থাটির সদস্যপদ লাভ করে? [প্রয়োগ]
ক ১৯৭৪ সালের ৮ মে
খ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর
গ ১৯৭৪ সালের ২০ নভেম্বর
ঘ ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর **খ**

৯২. স্বাধীনতার পর উক্ত সংস্থাটি বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান করেছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. শিক্ষা ক্ষেত্রে
ii. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে
iii. যোগাযোগ ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-১০: নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

প্রশ্ন ▶১ নজরুল ইসলাম বাজার থেকে কিছু পাকা আম ক্রয় করে বাড়ি আসেন। আম কাটার পর তিনি দেখতে পান ভেতরে আমের আঁটিগুলো শক্ত হয়নি। আম খাওয়ার পর তার পেটে কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. দুর্নীতি কী? ১

খ. শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো নাগরিক সমস্যার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব- বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন ও নীতি বিরুদ্ধ কাজই হলো দুর্নীতি।

খ অসুখ, দুর্ঘটনা, চিকিৎসাজনিত ত্রুটি অথবা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলে।
যাদের মাঝে নিচে উল্লেখিত লক্ষণগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যাবে তারা শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত হবে। যথা- একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত এমন ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম বা সাধারণ চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়; স্নায়ুবিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত নাগরিক সমস্যা খাদ্যে ভেজাল-এর সাদৃশ্য রয়েছে।
সাধারণভাবে খাদ্যে ভেজাল বলতে খাঁটি বা আসল পণ্যের সাথে নিম্নমানের পণ্য বা রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিক্রয় করাকে বোঝায়। এতে দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধতা হারায়। বর্তমানে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় অপরিপক্ক ফল পাকানো এবং এর রং আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে। এসব ফল খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, নজরুল ইসলাম বাজার থেকে কিছু পাকা আম কিনে বাড়ি আসেন। আম কাটার পর তিনি দেখতে পান ভেতরে আমের আঁটিগুলো শক্ত হয়নি। আম খাওয়ার পর তার পেটে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এখানে মূলত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্যে ভেজাল সমস্যা।

ঘ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা অর্থাৎ খাদ্যে ভেজাল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।
আমরা প্রতিনিয়ত যেসব খাবার গ্রহণ করি তার মধ্যে রয়েছে ভেজাল। ফসল তোলা থেকে শুরু করে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে মেশানো হচ্ছে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং নাগরিক সচেতনতার প্রয়োজন। ভেজাল খাদ্য কীভাবে সমাজের ক্ষতি করছে এবং এর মারাত্মক পরিণতির বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা দরকার। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী প্রচারণা এবং কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে।
শুধু জনগণ সচেতন হলেই খাদ্যে ভেজাল মেশানো বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য ভেজালমুক্ত কিনা সেজন্য নিয়মিত সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। ভেজাল খাদ্য উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। জরিমানা ও কারাদণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং কড়াকড়িভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে। ভোক্তা পর্যায়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সবার দায়িত্ব হবে নিজে খাদ্যে ভেজালের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং অপরকে সচেতন করে তোলা।
উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▶২ জনি রনির বড় ভাই। রনি ২০১৬ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। অন্যদিকে জনি কথা বলতে পারে না। তাই স্থানীয় স্কুলে তাকে ভর্তি করানো যায়নি। তার সমবয়সীরা তাকে খেলায় নিতে চায় না। এ কারণে জনি ও তার বাবা-মায়ের মন খারাপ থাকে। জনির সাথে রনির খুব বন্ধুত্ব। জনি সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। তার বাবা তার জন্য রং ও ছবি আঁকার বই কিনে দিয়েছে। জনি এখন ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত।

[চা. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. C.F.C. (সি.এফ.সি) কী? ১

খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনির প্রতিবন্ধিতা জনিত সমস্যাটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনির সমস্যা সমাধানে এবং তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা আলোচনা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক C.F.C হলো— উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক এক ধরনের গ্রিন হাউস গ্যাস।

খ খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।
খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়। যথা— অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

গ জনি একজন বাক-প্রতিবন্ধী।
শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে যারা অসুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম তারাই হলো প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজেরই সদস্য। মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে বাক প্রতিবন্ধিতা অন্যতম। জনির ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিবন্ধিতাই লক্ষণীয়।
উদ্দীপকের জনি কথা বলতে পারে না। তবে সে সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। কথা বলতে না পারার কারণে সে স্কুলে ভর্তি হতে না পারলেও ছবি আঁকা নিয়ে সে ব্যস্ত থাকছে। বাক-প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এমনটি লক্ষ করা যায়। জন্মের পর থেকেই যারা কোনো শব্দ বলতে পারেনি কিংবা

https://teachingbd24.com

রোগ বা দুর্ঘটনায় কথা বলার শক্তি হারিয়েছে তারা হলো বাক-প্রতিবন্ধী। অনেক সময় দেখা যায় কথা না শোনার কারণেই তারা কথা বলতে শেখে না। এরা কথা বলতে না পারলেও কোনো না কোনো দিক থেকে নিজের দক্ষতার বিকাশ করতে পারে। যেমন: ছবি আঁকা, নাচ, অভিনয়, হস্তশিল্প ইত্যাদি। অবশ্য অন্যান্য প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়ে থাকে।

ঘ জনির সমস্যা সমাধানে এবং তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধীদের বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। জীবন যতদূর বিস্তৃত প্রতিবন্ধীদের সমস্যাও ততদূর বিস্তৃত। তাই এদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের সাথে সাথে ব্যক্তি, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সহায়তা আবশ্যক। সম্মিলিতভাবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করা সম্ভব।

প্রতিবন্ধী সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। প্রতিবন্ধীরাও যে মানুষ-এ ধারণা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জাগ্রত হলে তাদের মধ্যকার প্রতিবন্ধী বিষয়ক কুসংস্কার দূর হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তাদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিবারভিত্তিক সেবা ও কমিউনিটি ভিত্তিক পুনর্বাসনের বিস্তার ঘটাতে হবে। প্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবারগুলোকে আর্থিক ও মানসিক সহায়তা দিতে হবে। এতে তারা আত্মপ্রত্যয়ী হবে। যেসব প্রতিবন্ধীর কাজ করার ক্ষমতা আছে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে কাজে যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তারা যাতে ন্যায্যমূল্য পায় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো প্রতিবন্ধীবান্ধব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ। এ আইনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের একটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আনতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে প্রতিবন্ধী সমস্যা অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব। আর তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারলেই তারা স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

প্রশ্ন ▶৩ 'X' পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশু। তার চেহারা ও অবয়ব অন্য শিশুদের মতো। তার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সে অন্যদের তুলনায় একটু বেশি বা কম সংবেদনশীল।

[রা. বো., ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯; ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. দুর্নীতি কী? ১

খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'X' কী ধরনের শিশু? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে 'X' এর মতো শিশুরা একদিন সম্পদে পরিণত হবে— তুমি কি একমত? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

খ বর্তমান সময়ে প্রতিবন্ধীদের বোঝানোর জন্য বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ হচ্ছে ' Person with Special Needs'. এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী'।

সাধারণভাবে বলা হয়, যার মাঝে প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান তিনিই প্রতিবন্ধী; সে প্রতিবন্ধকতা যত সামান্যই হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের 'X' এর প্রতিবন্ধিতার একটি অন্যতম ধরন অটিজমে আক্রান্ত শিশু।

অটিজম বা আত্মসংবৃতি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা; যা শিশুর বয়স তিন বছর হবার পূর্বেই প্রকাশ পায়। এ ধরনের শিশুরা সামাজিক আচরণে দুর্বল একই কাজ বারবার করার প্রবণতা থেকে তাদের শনাক্ত করা যায়। উদ্দীপকের শিশু 'X' এর ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ বিষয়টি দেখতে পাই।

সাধারণত অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা থাকে না এবং তাদের চেহারা, অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এ ধরনের শিশু পারদর্শী হয়। সাধারণত অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— i. মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা, ii. সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি, iii. শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যাথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা, iv. চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা, v. অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি।

উদ্দীপকের পাঁচ বছর বয়সী শিশু 'X' এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার চেহারা ও অবয়ব অন্য শিশুদের মতো তার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ বা আচরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং অন্যদের তুলনায় সে একটু কম বা বেশি সংবেদনশীল। তার শারীরিক ও মানসিক এ বৈশিষ্ট্যের সাথে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মিল রয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের 'X' অটিজমে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী শিশু।

ঘ হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে প্রতিবন্ধী শিশুরা একদিন সম্পদে পরিণত হবে।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদেরকে সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। তাহলেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। আর এজন্য সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের সমাজের প্রতিবন্ধীরা বিভিন্ন রকমের সমস্যায় ভুগছে। এসব সমস্যা সমাধান করে তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে। তাদের প্রতি সমাজের মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে তারা প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের সর্বস্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রতিবন্ধীদের আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা দিতে হবে। এতে তারা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবে। প্রতিবন্ধীদেরকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে সার্বিক নিরাপত্তা পেয়ে নিজের জন্য ও সমাজের জন্য কাজ করতে পারবে। তারা আলোকিত মানুষ হয়ে সমাজকে উজ্জ্বল করতে পারবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রতিবন্ধীদের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারলে তারা আর সমাজের বোঝা থাকবে না। তারাও নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে আলোকিত সমাজ গড়ার কর্ণধার হতে পারবে।

প্রশ্ন ▶৪ রাফিন কানে শোনে না। তাই তাকে তিন বছর বয়সেই একটি বিশেষ স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলের শিক্ষকরা লক্ষ করলেন যে রাফিন ছবি আঁকায় খুবই আগ্রহী। দুই বছরের মধ্যেই সে দক্ষ অংকন শিল্পী হয়ে ওঠে। সুন্দর ছবি আঁকার জন্য সে প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কারও লাভ করে। রাফিনের শিক্ষকরা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে একটি আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. HIV-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দুর্নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের রাফিন কোন ধরনের শিশু? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাফিনের প্রতি তার বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকদের গৃহীত উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

https://teachingbd24.com

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV-এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus.

খ দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করাকে বোঝায়।

রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠা বা চাওয়া পূর্ণ করা হলে তাকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মোটকথা, নীতি বিচ্যুত হয়ে যেকোন কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

গ উদ্দীপকের রাফিন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বা প্রতিবন্ধী শিশু। বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক বা একাধিক অক্ষমতা বিশিষ্ট মানুষকেই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বলা হয়। রাফিনের ক্ষেত্রে এই অক্ষমতাই দৃষ্টিগোচর হয়। রাফিন কানে শোনে না, তবে ছবি আঁকায় খুবই পারদর্শী। সুন্দর ছবি আঁকার জন্য সে প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কারও লাভ করেছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়।

শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কারণে প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্থ হয়ে। বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশজন যে কাজগুলো করতে পারে প্রতিবন্ধীরা তা পারে না। এই প্রতিবন্ধিতা শারীরিক বুদ্ধি, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক এসব ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে এই ধরনের মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে অধিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। অর্থাৎ কোনো না কোনো দিক দিয়ে তারা নিজেদের যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। যেমন: গান করা, ছবি আঁকা, নৃত্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবন্ধীরা নিপুণতার সাথে কাজ করতে পারে। সুতরাং রাফিন কানে শোনে না ও ছবি আঁকায় দক্ষ হওয়ায় তাকে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদার শিশু হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

ঘ রাফিনের প্রতি তার বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকদের গৃহীত উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়— উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। তাদেরকে সবাই সমাজের কলঙ্ক ও বোঝা মনে করে। এ কারণে তাদের পাশে দাঁড়ানো সমাজের প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের দৃষ্টান্ত রাফিনের বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

রাফিন প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও ছবি আঁকায় দক্ষ। এ দক্ষতা দেখে প্রতিভা বিকাশের স্বার্থে তার বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকরা তাকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করায়। এ কাজটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। কারণ বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজের এই অংশটিকে যোগ্য করে নিজ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের কর্তব্য। নিজেদের অন্তর্নিহিত দক্ষতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে যেকোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে সমাজের আলোকিত মানুষ। তবে এ আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন যথার্থ সহায়তা। যে শিশুটি যে দিকে দক্ষ তাকে সেইমুখী শিক্ষা দিতে হবে। অনেক সময় প্রতিবন্ধীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই নিজেদের গুটিয়ে রেখে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ কারণে তাদেরকে মানসিক আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। এছাড়া তাদের প্রতিভা বিকাশ, প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তার জন্য সরকারি নীতিমালার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাহলেই রাফিনের মতো শিশুরা হয়ে উঠবে আত্মপ্রত্যয়ী আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে তারা সমাজের যোগ্য মানুষ অর্থাৎ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার করানোর জন্য প্রয়োজন সার্বিক সহযোগিতা। রাফিনের বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকদের গৃহীত উদ্যোগে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ অহনার প্রিয় সবজি টমেটো। সে বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে দুই কেজি টমেটো ক্রয় করে। বাসায় এসে কেটে দেখে টমেটো পাকার মত হয়নি। এই টমেটো খেয়ে তার ছোট বোন মারিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লো। অহনা বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ দোকানদারকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করে। বিজ্ঞ আদালত দোকানদারকে ঐ আইনের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন।

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. ইভটিজিং কাকে বলে? ১

খ. রাজনৈতিক অস্থিরতা কীভাবে দুর্নীতির বিকাশ ঘটায়? ২

গ. উদ্দীপকে অহনার সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অহনা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা প্রতিরোধে তুমি কী কী সুপারিশ করবে? ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুরুষ কর্তৃক নারীকে উত্ত্যক্ত করা, শারীরিক বা মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করা বা যৌন নিপীড়ন করাকে ইভটিজিং বলে।

খ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে যা দুর্নীতির বিকাশ ঘটায়।

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হলে, সে সুযোগে দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্ষমতায় আসার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পর সেই অর্থ উশুল করার প্রবণতার কারণেও দুর্নীতির বিকাশ ঘটে থাকে।

গ উদ্দীপকে অহনার সমস্যাটি বাংলাদেশের খাদ্যে ভেজাল সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

সাধারণভাবে খাদ্যে ভেজাল বলতে খাঁটি বা আসল পণ্যের সাথে নিম্নমানের ও নকল পণ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিক্রয় করাকে বোঝায়। এতে দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধতা হারায়। বর্তমান যুগে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মিশ্রণ করে কিছু অসাধু, নীতি বিবর্জিত ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে থাকে, উদ্দীপকেও এ সমস্যার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, অহনা বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে দুই কেজি টমেটো ক্রয় করে। বাসায় এসে কেটে দেখে টমেটো পাকার মতো হয়নি। এই টমেটো খেয়ে তার ছোট বোন মারিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখানে মূলত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভেজাল খাদ্য। মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে শুরু করে তৈরি খাবার, ফলমূল এমনকি শিশু খাদ্যে পর্যন্ত ভেজালের ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মুনাফা অর্জনের লোভে, নাগরিকদের অসচেতনতা এবং আইন প্রয়োগে প্রশাসনের শিথিলতার কারণে দিন দিন এ সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে পুষ্টির অভাব থেকে ভোক্তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উদ্দীপকেও এ সমস্যাটির কথা বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের অহনা খাদ্যে ভেজাল সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছে। আর এ সমস্যাটি প্রতিরোধ করতে হলে সরকার,ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সকল পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্যে ভেজাল প্রতিকার বা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবেঃ

Teachingbd24.com

১. খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী BSTI- এর দ্বারা মানোত্তীর্ণ হবার সার্টিফিকেট অর্জন এবং তা প্রদর্শন করতে হবে।
২. BSTI এর দ্বারা পরিক্ষীত নয়, এমন উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করা হলে কঠিন শাস্তির বিধান এবং তা কার্যকর করতে হবে।
৩. হোটেল, রেস্তোরাঁয় পচা-বাসি খাবার যেন পরিবেশন করা না হয় সেজন্য নজরদারি জোরদার করতে হবে।
৪. অসৎ ব্যবসায়ী, উৎপাদক, পরিবেশকদের বিরুদ্ধে কী শাস্তি প্রদান করা হলো, ভ্রাম্যমান আদালত কী করছে তা নিউজ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে।
৫. চাল-ডাল-আটা-ময়দা, ফলমূল প্রভৃতির আড়তগুলোতে নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে।
৬. বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িতদের ওপর সতর্ক নজরদারি রাখতে হবে, যেন এসব পদার্থ খাদ্যে ভেজালের জন্য নয় বরং উপযুক্ত কাজেই শুধু ব্যবহার হয়।
৭. খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং খাদ্য সংরক্ষণের জন্য জনগণবান্ধব ও স্বাস্থ্যসহায়ক উপায় বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।
৮. জনগণ নিজেই যেন ফরমালিনমুক্ত বা ভেজাল পণ্য চিনতে পারে সে পদ্ধতি প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

সর্বোপরি, জনগণের সচেতনতা, সাবধানতা, ব্যবসায়ীদের সততা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যাটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৬ কর্মস্থলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত হয় শফিক। তার অপারেশনের জন্য রক্তের প্রয়োজন। এই রক্ত দেয় তারই প্রবাসী বন্ধু সিয়াম। শফিক সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন পর শফিকের ওজন কমে যাওয়া শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা ও শুকনা কাশি হচ্ছে। সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো এবং জানতে পারল সে এক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. জলবায়ু পরিবর্তন কাকে বলে? ১
খ. গ্রিনহাউস ইফেক্ট কীভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন করে? ২
গ. উদ্দীপকের শফিক কোন ধরনের মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিক যে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত এর থেকে মুক্তির জন্য তুমি কী কী সুপারিশ করবে। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো স্থানের বা অঞ্চলের ৩০-৪০ বছরের জলবায়ুর উপাদান যেমন— তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুর আদ্রতা ও শুষ্কতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

খ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূ-পৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে প্রাণীজগতের বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত দহন এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে, যার নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক।

গ উদ্দীপকের শফিক মরণব্যাধি এইডস- এ আক্রান্ত হয়েছে।
এইডস এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা গঠিত রোগ। এই ভাইরাসকে Human Immunodeficiency Virus বা এইচ আই ভি (HIV) বলা হয়। এইচ আই ভি ভাইরাসটি রক্তের সাদা কোষ (CD-4 বা টি সেল) নষ্ট করে দেয়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের শফিকের মধ্যেও এই রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠেছে। উদ্দীপকের শফিক দুর্ঘটনায় আহত হলে তার প্রবাসী বন্ধুর রক্ত দিয়ে তার অপারেশন করা হয়। সে সুস্থ হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর তার ওজন কমতে শুরু করে এবং দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা ও শুকনো কাশি হতে থাকে। ডাক্তারের নিকট গেলে শফিক জানতে পারে সে মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত। কেননা তার মধ্যে এইডস এর লক্ষণ বা উপসর্গগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের ওজন হ্রাস পেতে থাকে। সেই সাথে দুই মাসের বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে, দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি লেগে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। HIV আক্রান্ত হলে ব্যাকটেরিয়া- ভাইরাস এবং অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজম দ্বারা সংঘটিত রোগ সহজেই শরীরকে আক্রান্ত করে ফেলে। এইডস এর কার্যকর প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এজন্যই এইডসকে ঘাতকব্যাধি বা মরণব্যাধি বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শফিকও এইডস রোগে আক্রান্ত।

ঘ শফিক মরণব্যাধি এইডস- এ আক্রান্ত। এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
বর্তমানে এইডস একটি মারাত্মক রোগ যা বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এ রোগের প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয়নি। এ রোগ প্রতিরোধকল্পে উন্নত দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বর্তমানে এ রোগের ছোবল থেকে রক্ষা পেতে হলে নাগরিকদের সচেতন হয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
উদ্দীপকের শফিক এইডস- এ আক্রান্ত। এরোগ থেকে মুক্তি পেতে ধর্মীয় অনুশাসন সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে মানুষ পারিবারিক জীবনে বিশ্বস্ত থাকে। সেই সাথে অনিরাপদ ও বিবাহ-বর্হিভূত শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে। এছাড়া সুই কিংবা সিরিঞ্জ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করলে এইডস এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। তাই কারো সাথে সুই কিংবা সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করা যাবেনা। এইডস- এ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো যাবেনা এবং তার ব্যবহৃত সুঁচ, সিরিঞ্জ ও অন্যান্য অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে। এ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হলে পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে, সমকামিতার কুফল সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়াও এইডসের কারণ ও এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। এইডস প্রতিরোধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। এইডস সংক্রমণের আশঙ্কা আছে এমন কারণ থেকে নিজে দূরে থাকতে হবে এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।
উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকলে এবং তা যথাযথভাবে মেনে চললে মরণব্যাধি এইডস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব রহিম দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করে সম্প্রতি দেশে ফিরে আসে। দেশে এসে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। কোনো রোগ হলে তা সহজে ভালো হয় না। মানুষ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। হাসপাতালে গেলে ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, সে একটি ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করে। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বৈদেশিক নীতির সংজ্ঞা দাও। ১
খ. ইভটিজিং রোধ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রহিম কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাজজীবনে উক্ত রোগের প্রভাব ভয়াবহ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি বা পদ্ধতির মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকেই বৈদেশিক নীতি বলে।

Teachingbd24.com

খ সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য ইভটিজিং রোধ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ইভটিজিং। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। ইভটিজিং এর ফলে একদিকে যেমন সমাজে অস্থিরতা বাড়ছে অন্যদিকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। ইভটিজিং এর কারণে মেয়েদের স্কুল পরিত্যাগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাল্যবিবাহও আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কারণে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরি।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সমাজজীবনে উক্ত রোগ অর্থাৎ এইডস রোগের প্রভাব ভয়াবহ— উক্তিটি যথার্থ।

এইডস (AIDS) মানবজাতির জন্য মারাত্মক এক মরণব্যাধি। এটি এমনই মারাত্মক যে, তা মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় এবং একটি দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এটি মানবসভ্যতা এবং উন্নয়নের ক্রমাগত বিকাশের পথে অন্যতম অন্তরায়।

বিশ্বব্যাপী এইডস এর প্রভাব সর্বকালের সকল মহামারীর চেয়ে ভয়াবহ। এইডস শুধু জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই নয় বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এইডস রোগে মানুষ ভীত এই কারণে যে, এই রোগে মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। যে দেশে এইডস ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে সে দেশে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। সাহারা মরুভূমির চারপাশের দেশগুলোতে মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ এইডস। এইডস আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করা বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া এর কোনো চিকিৎসা নেই। এইডস এর পরিণতি মৃত্যু। এইডস এর কারণে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে যা একটি দেশের জনশক্তিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। কারণ উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা গেলে পরিবারটি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সেই পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে কেউ মিশতে চায় না। ফলে পরিবারটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। সুদূরপ্রসারী ফলাফল হিসেবে একটি দেশের মাথাপিছু আয় কমে যায় এবং জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এইডস এমন একটি মারাত্মক রোগ সমাজজীবনে অগ্রগতি রোধে যার প্রভাব নেতিবাচক।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাংলাদেশের একজন ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল দিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছেন। তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয় এবং আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হয়। আসলে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া অর্থ মানবদেহে ভেজাল দেওয়া। *[য. বো. ১৭ । প্রশ্ন নং ১১]*

ক. HIV এর বিস্তারিত রূপ লিখ। ১

খ. ইভটিজিং সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়ে দুদকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি আলোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV-এর বিস্তারিত রূপ হলো- Human Immunodeficiency Virus।

খ ইভটিজিং মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্যাতন নির্দেশক একটি শব্দ।

বর্তমানে ইভটিজিং বেড়ে যাওয়ার পেছনে পরিবারে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা দায়ী। এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারে শিশুর সঠিক সামাজিকীকরণের অভাব ইভটিজিং এর কারণ হিসেবে ধরা যায়। মাদকাসক্ত ও বেকার যুবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ইভটিজিং করে। এছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইভটিজিং এর জন্যে ব্যাপকভাবে দায়ী।

গ উদ্দীপকে খাদ্যে ভেজাল সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠছে খাদ্যে ভেজাল তার মধ্যে অন্যতম। মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে শুরু করে তৈরি খাবার, ফলমূল এমনকি শিশুখাদ্যে পর্যন্ত ভেজালের ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য লক্ষ করা যাচ্ছে। একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মুনাফা অর্জনের লোভ, নাগরিক অসচেতনতা এবং আইন প্রণয়নে প্রশাসনের শিথিলতাই এ সমস্যার প্রধান কারণ। এ সমস্যা সমাধানে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তন্মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

সাধারণ অর্থে নীতিবিহীন কাজ করাই হচ্ছে দুর্নীতি। উদ্দীপকের খাদ্যে ভেজাল এ নীতিবিহীন কাজেরই একটি অংশ। বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন এসব নীতিবিহীন কাজকে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন অপরাধসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, মামলা দায়ের ও পরিচালনা, গণসচেতনতা গড়ে তোলা, দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন অপরাধের উৎস চিহ্নিত করতে নানা কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি অর্থাৎ 'আসলে খাদ্যে ভেজাল দেয়া অর্থ মানবদেহে ভেজাল দেওয়া'।

উদ্দীপকের এ বাক্যটি দ্বারা আমরা খাদ্যে ভেজালের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হই। খাদ্যে ভেজাল মানবদেহে নানা ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের আধিক্য সমাজজীবনের সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেশের জনস্বাস্থ্যের সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলছে।

ভেজাল খাদ্যদ্রব্য মানুষের মধ্যে নানা রোগ ছড়িয়ে থাকে। এ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে পেটের পীড়া, আলসার, দৃষ্টিহীনতা এমনকি ক্যান্সারের মতো রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। শিশুরা নানা রকম ভেজাল খাদ্য যেমন জুস, চানাচুর, চিপস, চকোলেট প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করে মারাত্মকভাবে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে; যা নতুন প্রজন্মকে দুর্বল জাতিতে পরিণত করছে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের কারণে যে স্বাস্থ্যহীনতার সৃষ্টি হয় তা কর্মক্ষম মানুষের কর্মস্পৃহা ও উৎপাদন ক্ষমতাকে হ্রাস করে। ভেজালের দৌরাত্ম্যে তরুণ-তরুণীদের জীবনে নেমে আসছে অন্ধকার। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যে, পানীয়ে, ওষুধে ভেজাল খেয়ে প্রতিনিয়ত অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, খাদ্যে ভেজাল একটি সামাজিক অপরাধ। এ অপরাধ মানুষের প্রাত্যহিক খাবারের মাধ্যমে তার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে। তাই ভেজালের সর্বনাশা গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ৯ মি. 'R' একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতিদিন তার পণ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করেন। একবার ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের জন্য জরিমানাও করে। অতি মুনাফার লোভে তিনি জেনেশুনে নাগরিক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। *[ঢা. বো. ২০১৬ । প্রশ্ন নং ৮]*

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলিখিত মি. 'R' এর কর্মকাণ্ড কোন সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাগরিক সমস্যা নিরসনকল্পে তোমার সুপারিশ লেখ। ৪

https://teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ হলো— Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১০ বাশার সাহেব একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি তার ক্ষমতার জোরে পরিবারের অনেক সদস্যকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেন। তার এ অন্যায় নীতির কারণে অনেক মেধাবী এ প্রতিষ্ঠানে চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়। *[চা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গ্রিন হাউস গ্যাস কী? ১

খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাশার সাহেবের কার্যক্রমে সমাজজীবনের কোন সমস্যাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা প্রতিহত করতে নাগরিক সমাজের করণীয় তোমার পাঠ্যসূচির আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কার্বন ডাই- অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত গ্যাসই হলো গ্রিন হাউজ গ্যাস।

খ বিশ্বে উষ্ণায়নের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়।

বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মিথেনের এক ধরনের তাপ ধারণক্ষম প্রভাব রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে এ রকম নানা ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে মহাশূন্যে তাপ নির্গমনে বাধার সৃষ্টি করছে, যার ফলাফল হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। যখন বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই মহাশূন্যে তাপের বিকিরণ কমে যায় এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যায় যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হিসেবে পরিচিত।

গ বাশার সাহেব একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি তার ক্ষমতার জোরে পরিবারের অনেক সদস্যকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেন। তার এ অন্যায় নীতির কারণে অনেক মেধাবী এ প্রতিষ্ঠানে চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়। আলোচ্য উদ্দীপকে বাশার সাহেবের কার্যক্রমে সমাজজীবনের অন্যতম সমস্যা দুর্নীতির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, সাধারণভাবে যেসকল কার্যাবলি নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ বহির্ভূত তাই দুর্নীতি। দুর্নীতি মূলত সামাজিক অপরাধ। বাংলাদেশে যথেষ্ট আইন থাকলেও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। বরং দুর্নীতিবিরোধী আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশে দুর্নীতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। উদ্দীপকে বাশার সাহেব ক্ষমতার জোরে পরিবারের সদস্যদেরকে অন্যায়ভাবে চাকরি দেন। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় দেশ দুর্নীতির কালো ছায়ায় নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। স্বজনপ্রীতি ছাড়াও দুর্নীতির আরো নানাবিধ কারণ আছে। যেমন- আর্থিক অসচ্ছলতা, সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইনের ফাঁকফোকর ইত্যাদি। দুর্নীতির করালগ্রাসে দিন দিন দেশ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি প্রতিহত করতে নাগরিক সমাজের করণীয় বিষয় আমার পাঠ্যসূচির আলোকে আলোচনা করা হলো—

১. দুর্নীতি রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা।

২. সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও তথ্য লাভের অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৪. বাক স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ (নিরীক্ষা) নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৮. দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ও কর্মীদের পুরস্কৃত করে উৎসাহ দিতে হবে এবং যারা অসৎ তাদেরকে তিরস্কৃত করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। প্রয়োজনে অপসারিত করতে হবে।

৯. গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. বেতনভুক্ত কর্মচারীদেরকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দুর্নীতি রোধে উপরিউক্ত সুপারিশ ছাড়াও মূল্যবোধের বিকাশ এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দুর্নীতির ভয়াবহতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১১ জাভেদ ভাগ্যোন্নয়নের জন্য চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুর যায়। চার বছর চাকরি করার পর সে দেশে ফিরে আসে। কিছুদিন পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ঘনঘন জ্বর হয়, হজম শক্তি কমতে থাকে, স্মরণশক্তি লোপ পায় এবং সে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা করে বলেন যে, জাভেদ ভাইরাসজনিত একটি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তারের কথা শুনে জাভেদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব জাভেদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করে। *[রা. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. ইভটিজিং কাকে বলে? ১

খ. অটিজম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জাভেদ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার নাম উল্লেখপূর্বক রোগটি প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাভেদের প্রতি তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের আচরণ অত্যন্ত ইতিবাচক ও মানবিক— মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুরুষ কর্তৃক নারীকে উত্ত্যক্ত করা, লাঞ্ছিত করা বা যৌন নিপীড়ন করাকে ইভ-টিজিং বলে।

খ অটিজম মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা, যা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয়মাস হতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়।

এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না। এমনকি তাদের চেহারা, অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এ ধরনের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনায় জাভেদ এইডসে আক্রান্ত হয়েছে।

এইডস প্রতিরোধে পুরুষের ভূমিকা মুখ্য। সমকামী পুরুষ দ্বারা পরিবারের নারীরা আক্রান্ত হয়। পুরুষ থেকে নারীতে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা ৮ গুণ বেশি। কারণ পুরুষের যৌনসঙ্গী বেশী থাকে। তাই পুরুষরা সচেতন হলে এ রোগ প্রতিরোধ করা অনেকটা সম্ভব। তাছাড়া অবাধ যৌন মেলামেশা পরিহার করা, যৌন মেলামেশায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করা, স্ত্রী সন্তানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, কেবল একজন যৌন সঙ্গী বেছে নিয়ে যৌনকর্মীদের সঙ্গ ত্যাগ করা, ঝুঁকিপূর্ণক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা, রক্ত গ্রহণের সময় সুঁচ ভাইরাস মুক্ত কিনা তা দেখা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত উপায়ে এইডস প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে জাভেদের প্রতি তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের আচরণ অত্যন্ত ইতিবাচক ও মানবিক।

এইচআইভি এইডস ভাইরাসজনিত একটি রোগ। অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সুঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার, শিশুর জন্মের সময়, পূর্বে ও পরে এইচআইভি আক্রান্ত হলে, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্রাশ ও দাড়ি কামানোর ব্লেড ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এইডস রোগ হয়। এটি ছোঁয়াচে রোগ নয়। তাই এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা করলে ঝুঁকির কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবাদানের মাধ্যমে মানসিকভাবে অনেকটাই সুস্থ করে তোলা সম্ভব। অথচ এইডসে আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগীরা পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতা ও সেবা তো পায়ই না বরং তারা ঘৃণার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। এমতাবস্থায় এইডসে আক্রান্ত রোগীটি রোগে ও মানসিকভাবে ভুগতে ভুগতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনা মতে, জাভেদ এইডসে আক্রান্ত হলে জাভেদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব জাভেদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করে। তাদের আচরণ নি:সন্দেহে অত্যন্ত ইতিবাচক ও মানবিক। এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে এমন ইতিবাচক ও মানবিক আচরণই সকলের নিকট কাম্য।

প্রশ্ন ▶ ১২ 'ক' একটি কলেজের ছাত্রী। প্রতিদিন কলেজে আসা যাওয়ার পথে কিছু বখাটে ছেলে তাকে বিরক্ত করত। তাই সে বাধ্য হয়ে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয়। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. এইডস কী? ১

খ. দুর্নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইডস হলো একটি মরণব্যাধি। এই রোগ হলে মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়।

খ সৃজনশীল ৪ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' ইভটিজিং সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইভ' বলতে বোঝায় রমণী বা নারী, 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে, পুরুষরা যখন নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণকেই ইভটিজিং বলা হয়। ইভটিজিং-এর ফলে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে মেয়েদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকের 'ক'-কে প্রতিদিন কলেজে আসা যাওয়ার পথে কিছু বখাটে ছেলে দ্বারা বিরক্ত করত। তাই সে বাধ্য হয়ে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এ ঘটনাটি ইভটিজিং সমস্যাকেই তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' ইভটিজিংয়ের শিকার। এ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইভটিজিং ও এর নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে পারেন। দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

যথাযথ আইন প্রণয়ন, সামাজিক প্রতিরোধ, নৈতিকতার বিকাশের মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ সম্ভব। এর মাধ্যমেই উদ্দীপকের 'ক'-এর মতো মেয়েদের সোনালি ভবিষ্যত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র সৌরভের চোখে আলো নেই। তাতে কি? থেমে থাকেনি তার পথ চলা। কিন্তু এ পথ পাড়ি দিতে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এইতো সেদিনের কথা গত বছর স্নাতক পরীক্ষা দেয়ার সময় শ্রুতলেখক পাচ্ছিল না। শেষে তার কয়েক বন্ধুর সহায়তায় একজন শ্রুতলেখক পেয়ে যায়। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. HIV-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সৌরভ কোন ধরনের প্রতিবন্ধী? তাদের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সৌরভের মতো জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো আলোচনা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV-এর পূর্ণ রূপ হলো Human Immunodeficiency Virus।

খ কোনো স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়ার গড় অবস্থা যখন পরিবর্তিত হয় এবং মানবজীবনের সাধারণ নিয়মাবলি নতুন রূপ লাভ করে তখনই একে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

কোনো বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের কৃষিকাজ, বনভূমি, মৎস্য চারণক্ষেত্র, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ, খনিজ সম্পদ, শিল্প-কারখানা স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন হওয়াকেই জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সৌরভ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

সমাজে যেসব জনগোষ্ঠী কোনো কার্য সম্পাদনে দৈহিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ, তাকে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলে। প্রকৃতি অনুযায়ী ৫ ধরনের প্রতিবন্ধীর মধ্যে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী অন্যতম। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা সমাজে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

১. সমাজ প্রতিবন্ধীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, যার কারণে তাদের সাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটে না।

২. তারা সাধারণ মানুষের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায় না।

৩. এই জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়। ফলে সে অন্যদের মতো সবার সাথে মিশতে পারে না।

৪. সমাজের মূল স্রোতের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো ভাতাও তারা রাষ্ট্র থেকে লাভ করে না।

Teachingbd24.com

৫. তাদের জন্য রাষ্ট্র থেকে বরাদ্দকৃত সুযোগ-সুবিধারও অপব্যবহার হয়।
৬. পরিবহন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
৭. বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তাদের জন্যে বিশেষ কোটা ব্যবস্থা না থাকায় তাদের আর পড়ালেখা করা হয় না।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ার কারণেই উদ্দীপকের সৌরভের স্নাতক পরীক্ষা দিতে সমস্যা হয়। কিন্তু তার এক বন্ধুর সহায়তায় সেবারের মতো সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সৌরভের মতো এমন আরও অনেক প্রতিবন্ধীর জীবন এমনি করে প্রতি পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়।

ঘ উদ্দীপকের সৌরভ একজন প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধীরা ব্যক্তিগত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এরা সমাজের বিশেষ এক অংশ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এদের সমস্যার সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

১. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের এই বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সদয় হতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে ইতিবাচক।
২. শিক্ষা: প্রতিবন্ধীদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।
৩. সামাজিক সচেতনতা: প্রতিবন্ধীরাও আমাদের মতোই মানুষ। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে তাদেরকে সহযোগিতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
৪. রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা: প্রতিবন্ধীদের জন্যে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. ভাতা: প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা সমাজের আর সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।
৬. পরিবহন ও বিদ্যালয়ে সিট বরাদ্দ: প্রতিবন্ধীরা সমাজের বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী। তাই গণপরিবহন ও বিদ্যালয়ে তাদের জন্যে বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্দীপকের সৌরভের মতো আরও অনেক ধরনের প্রতিবন্ধী আমাদের সমাজে রয়েছে। তাই সচেতন জনগোষ্ঠীর উচিত বঞ্চিত এই মানুষদের প্রতি সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

প্রশ্ন ▶ ১৪ কলেজছাত্রী 'X' কলেজে যাওয়ার পথে একদল বখাটে ছেলে তাকে প্রায়শ অশ্লীল কথা বলে, নানা অঙ্গভঙ্গি করে। একদিন সে প্রতিবাদ করলে তারা তাকে ভয় দেখায়। সে বাড়িতে এসে তার বাবাকে ঘটনাটি বলে। তার বাবা গ্রামের মুরব্বিদের অবহিত করে। গ্রামের মুরব্বিরা তার পাশে দাঁড়ায়। সকলে মিলে বখাটেদের প্রতিহত করে এবং ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তাদের তুলে দেয়ার কথা বলে। এতে বখাটেরা ভয় পেয়ে যায়। *[চ. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. এইডস কী? ১
খ. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত একটি সমস্যা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন নাগরিক সমস্যাটি উঠে এসেছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সমস্যাটি সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইডস একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। এইডসকে ঘাতক ব্যাধি বা মরণব্যাধি বলা হয়।

খ বর্তমান বিশ্বের আলোচিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হলো জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার তালিকায় উঠে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার মধ্যে একটি উল্লেখ্যযোগ্য সমস্যা হলো গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইপিসিসি-এর চতুর্থ সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ১৪ বছরে (১৯৮৫-৯৮) মে মাসে ১ ডিগ্রি এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

গ সৃজনশীল ১২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সোহেল আরমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স পড়ছে। সে হুইল চেয়ারে বসে ক্লাস করে এবং পরীক্ষা দেয়। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। জন্মগতভাবেই তার পায়ের আকৃতি ও গড়ন স্বাভাবিক মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার জন্য উপযোগী নয়। অন্যদিকে, তার এক বন্ধু এমন একটি মরণব্যাধিতে আক্রান্ত যার কোনো চিকিৎসা নেই। *[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. AIDS-এর ভাইরাসের নাম কী? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সোহেল আরমান কোন সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সোহেল আরমানের বন্ধু যে মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত তা থেকে মুক্তি পেতে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় কি বলে তুমি মনে করো? তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর ভাইরাসের নাম (HIV) Human Immunodeficiency Virus.

খ সৃজনশীল ৮ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সোহেল আরমান একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। কারণ সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। জন্মগতভাবেই তার পায়ের আকৃতি ও গড়ন স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। দাঁড়িয়ে থাকার জন্য উপযোগী নয়। যা পাঠ্যবইয়ের শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নিচে শারীরিক প্রতিবন্ধী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

শারীরিক প্রতিবন্ধী হলো সেই ব্যক্তি যার একটি বা উভয় হাত/পা নেই বা কোনো হাত/পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক অথবা স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নেই। অন্ধ, বধির, বোবা, ল্যাংড়া, অপুষ্টির শিকার, বৃদ্ধরা শারীরিক প্রতিবন্ধীর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবন্ধীরা সমাজে অত্যন্ত অবহেলিত। নানা কারণে তারা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। কিন্তু তারাও মানুষ। তারা সমাজের বোঝা নয় বরং সম অধিকারের সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে তারাও সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের সোহেল আরমানের বন্ধু যে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত তা এইডস রোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এইডস প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যত্নবান হওয়ার প্রয়াস চালাতে হবে।

এইডস প্রতিরোধে একজন নাগরিক হিসাবে আমাদের করণীয়গুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে।
২. পরিবারের সদস্যদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও নিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন।
৪. যথাযথভাবে পরীক্ষার পর রক্ত গ্রহণ করতে হবে।
৫. ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে না।
৬. সুঁচ-সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে।
৭. এইডস রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা সুলভ ও সহজলভ্য করতে হবে।

Teachingbd24.com

৮. ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
৯. মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে।
১০. গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।
সর্বোপরি, এইডস সম্পর্কে নিজে সতর্ক হওয়া এবং অন্যকে সতর্ক করে তোলা দরকার। এভাবে নাগরিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে মরণব্যাধি এইডস থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মারুফ বাজার থেকে একটি রুই মাছ কিনে আনে। ভুলে মাছটি ফ্রিজে না রেখে টেবিলে রেখে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। তিন দিন পর ফিরে এসে দেখে টেবিলে মাছ পড়ে আছে কিন্তু একটুও পঁচেনি। সে অবাক হয়। এখন সে বাজার থেকে আম, আপেল বা অন্য কোনো ফল কিনতেও ভয় পায়। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগদান করেন কে? ১
খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২
গ. মারুফ এর ক্রয়কৃত মাছ না পঁচার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার কারণে জনজীবনে যে প্রভাব পড়তে পারে তার প্রতিকারে তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগদান করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

খ বৈদেশিক নীতি হলো জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হলো-

১. **সবার সাথে বন্ধুত্ব:** বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— সবার সাথে বন্ধুত্ব , কারো সাথে শত্রুতা নয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘোষণা করেন।
২. **স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা:** বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং সমতা বজায় রাখা।

গ মারুফ এর ক্রয়কৃত মাছ না পঁচার কারণ হলো মাছে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ফরমালিন মেশানো হয়েছে।
উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, মারুফ বাজার থেকে একটি রুই মাছ কিনে আনে। ভুলে মাছটি ফ্রিজে না রেখে টেবিলে রেখে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। তিন দিন পর ফিরে এসে দেখে টেবিলে মাছ পড়ে আছে কিন্তু একটুও পঁচেনি। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বর্তমানে সারাদেশে খাদ্যে ভেজাল এক মহামারি আকার ধারণ করেছে। বাজারে সব ধরনের ফলমূল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস এবং দুধে নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করে বিক্রি করছে। ব্যবসায়ী প্রতিদিন তাদের পণ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করেন। যেমন ফরমালিন, কার্বাইড ইত্যাদি। পচনশীল দ্রব্যকে চড়া দামে বিক্রি করার জন্য এবং এর স্থায়ীত্ব দীর্ঘ করতে এগুলো করেন তারা। ব্যবসায়ীরা সাদা ডিম কেমিক্যাল দিয়ে লাল করছে। তরমুজ, সস ও জেলিতে মিশাচ্ছে বিষাক্ত রং। দেশের অধিকাংশ খামারে গরুকে খাওয়াচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ও সোডা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা তথা মাছে ফরমালিন মেশানোর কারণে জনজীবনে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। নিচে এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. সরকারিভাবে জেলাভিত্তিক নিয়মিত ফরমালিনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা।
২. মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের দমনে সৎ ও যোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে।
৩. ফরমালিন বিরোধী অভিযান পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র একটি অধিদপ্তর গঠন করা।
৪. ফরমালিন বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন করা ও তার যথাযথ প্রয়োগ করা।
৫. ফরমালিনের ক্ষতিকর দিকগুলো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া।
৬. প্রত্যেক বাজারে ক্রেতাদের জন্য অভিযোগ বক্স স্থাপন করে তাদের অভিযোগ মতো যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
৭. ফরমালিন আর ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগকারীদেরকে শাস্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং আর্থিক জরিমানার বিধান করতে হবে।
৮. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।
উপরিউক্ত সুপারিশসমূহের মাধ্যমে ফরমালিনের প্রতিকার পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৭ কিছুদিন থেকে জনাব নারায়ণ লক্ষ করলেন তার ওজন কমে যাচ্ছে এবং প্রায়শই তিনি অসুস্থবোধ করছেন। তাকে দেখেও বেশ ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত মনে হয়। তাছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন থেকে জ্বর, শুকনা কাশি এবং নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। এসব জটিলতা নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার জানান, তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ডাক্তার আরও বলেন তিনি এক ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ রোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. HIV কী? ১
খ. ভেজাল খাদ্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব নারায়ণের রোগের কারণসমূহ উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রোগের বিস্তার রোধে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সেগুলো বর্ণনা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV হলো এক ধরণের ভাইরাস যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

খ সৃজনশীল ২ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব নারায়ণ এইডস রোগে আক্রান্ত। উক্ত রোগের কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. HIV দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে ।
২. ইনজেকশনের একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে।
৩. HIV সংক্রামক মায়ের দুধ পান করলে।
৪. HIV আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে।
৫. HIV সংক্রমিত অঙ্গ অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে।
৬. HIV আক্রান্ত রোগীর অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে।
৭. এইচআইভি বা এইডস-এ আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে শিশু গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় সংক্রমিত হতে পারে।

ঘ সৃজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বেলাল সাহেব চাকরি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা যায়। সেখানে তিন বছর থাকার পর সে লক্ষ্য করে যে, অল্পদিনের মধ্যে তার শরীরে ওজন হ্রাস পাচ্ছে। হালকা জ্বর ও গলা ব্যথা হচ্ছে, শরীরে বিভিন্ন স্থানে ছত্রাক জনিত সংক্রামক দেখা দিচ্ছে। সে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার সাহেব বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেন যে, বেলাল সাহেব একটি ভাইরাস জনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]

https://teachingbd24.com

ক. ইভটিজিং শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে? ১
খ. দুর্নীতি বলতে কি বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে যে ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উক্ত ব্যাধি প্রতিরোধে পারিবারিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বস্ততা খুব গুরুত্বপূর্ণ—ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইভটিজিং শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে যৌন হয়রানি।

খ দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করাকে বোঝায়।
রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠা বা চাওয়া পূর্ণ করা হলে তাকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মোটকথা, নীতি বিচ্যুত হয়ে যেকোন কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

গ উদ্দীপকে যে ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো এইডস রোগ এবং এ রোগের অনেকগুলো কারণ রয়েছে।
এইডস এক প্রকার ভাইরাসজনিত রোগ। এই ভাইরাসকে Human Immunodeficiency Virus বা এইচ আই ভি (HIV) বলা হয়। এইচ আই ভি ভাইরাসটি রক্তের সাদা কোষ (CD-8 বা টি সেল) নষ্ট করে দেয়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে।এইডস (AIDS) মানবজাতির জন্য মারাত্মক এক মরণব্যাধি। এটি এমনই মারাত্মক যে, তা মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় এবং একটি দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এ রোগ সংক্রমণের অনেকগুলো কারণ রয়েছে।
HIV দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে । ইনজেকশনের একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে। HIV সংক্রামক মায়ের দুধ পান করলে। HIV আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে। HIV সংক্রমিত অঙ্গ অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে। HIVআক্রান্ত রোগীর অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে। এইচআইভি বা এইডস-এ আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে শিশু গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় সংক্রমিত হতে পারে।

ঘ উক্ত ব্যাধি তথা এইডস প্রতিরোধে পারিবারিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বস্ততা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
এইডস একটি জীবনঘাতি ব্যাধি। এর কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এ ব্যাধি প্রতিরোধে পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেমন সমাজের সবাই ঘৃণার চোখে দেখে, তেমনি তার পরিবারের সদস্যদেরকে বিভিন্নভাবে হেয়-প্রতিপন্ন হতে হয়। এ কারণে নিজের এবং পরিবারের সামাজিক মর্যাদার কথা মাথায় রেখে অনৈতিক যৌনসম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে। সবাই যদি সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধের অবস্থানের বিষয়ে অবগত থাকে তা হলে এ ব্যাধিটি অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।
এ ব্যাধি প্রতিরোধে যৌন মেলামেশায় স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি। কারণ স্বামী ও স্ত্রী একাধিক যৌনসম্পর্কে লিপ্ত থাকলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ রোগের মূল কারণ হলো একাধিক যৌনসম্পর্ক। তাই সবার উচিত যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং অবৈধ যৌনসঙ্গ পরিহার করা।
উপরের আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এইডস প্রতিরোধে পারিবারিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বস্ততা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ স্টেশন রোডের ব্যবসায়ী গৌতম ধর আজ কোটি টাকা ব্যয় করে বাড়ি করেছেন। অথচ ৪/৫ বছর আগেও তিনি ছিলেন স্টেশনের কুলি। খাদ্যে স্বাদ ও ফ্লেভার বাড়াতে এবং খাদ্যকে দৃষ্টিনন্দন করতে যে কোন প্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বনে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ভোগবাদী প্রবণতা, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অভাবে, অবক্ষয়ের এ পর্যায়ে তিনি এসেছেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. খাদ্যে ভেজাল কাকে বলে? ১
খ. ভেজাল খাদ্য গ্রহণের নেতিবাচক কারণগুলো বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণগুলো চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের প্রতিকারের জন্য তোমার সুপারিশসমূহ তুলে ধর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায় খাদ্যের স্বাভাবিক গুণগত মান নষ্ট করা।

খ খাদ্যে ভেজালের রয়েছে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভয়ঙ্কর নেতিবাচক প্রভাব।
কেমিক্যালযুক্ত খাদ্যের দরুণ নষ্ট হচ্ছে আমাদের শরীরের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ যেমন– লিভার, কিডনি, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, চোখ, কান ইত্যাদি। নাগরিকগণ আক্রান্ত হচ্ছে লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, ব্লাড ক্যান্সার, কিডনি ফেইলিউর, হৃদরোগ, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি রোগে। পাশাপাশি বন্ধ্যাত্ব, হাবাগোবা বা বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হওয়া, সন্তানের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়াসহ নানাবিধ সমস্যার জন্য ভেজাল খাবার একটি অন্যতম কারণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ খাদ্যে ভেজাল নামক সমস্যাকে নির্দেশ করে। যার পেছনে রয়েছে বহুবিধ কারণ।
খাদ্যের স্বাদ বাড়াতে এবং খাদ্যকে দৃষ্টিনন্দন করতে খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয়। পাশাপাশি গুণগত মানের দিক দিয়ে খারাপ খাদ্যকে খাবারযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতেও ভেজাল মেশানো হয়। আর এ সবকিছুর পেছনে রয়েছে অধিক মুনাফা লাভের লিপ্সা। মানুষের মধ্যে এই লিপ্সা সৃষ্টি হয় মূলত নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে। অর্থের প্রতি অধিক মোহ মানুষকে অন্ধ করে তোলে যার ফলে সে যেকোনো ধরনের অনৈতিক কাজ করতে পারে। যে কারণে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেও অনেক বিক্রেতা খাদ্যে রাসায়নিক উপাদান প্রয়োগ করে।
উদ্দীপকের গৌতম ধর অধিক অর্থ উপার্জনের আশায় খাদ্যে ভেজাল মেশানোর মতো অবৈধ পথ অবলম্বন করে। যার মূল কারণ হলো তার ভোগবাদী প্রবণতা, নৈতিক শিক্ষার অভাব ও মূল্যবোধের অবক্ষয়।

ঘ উদ্দীপকের গৌতম ধর খাদ্যে ভেজাল সমস্যাটির সাথে জড়িত। আর এ সমস্যাটি প্রতিরোধ করতে হলে সরকার,ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ সকলকেই বিভিন্ন পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
১. খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী BSTI-এর দ্বারা মানোত্তীর্ণ হবার সার্টিফিকেট অর্জন এবং তা প্রদর্শন করতে হবে।
২. BSTI এর দ্বারা পরিক্ষীত নয়, এমন উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করা হলে কঠিন শাস্তির বিধান এবং তা কার্যকর করতে হবে।
৩. হোটেল, রেঁস্তোরায় পঁচা-বাসি খাবার যেন পরিবেশন করা না হয় সেজন্য নজরদারি জোরদার করতে হবে।
৪. অসৎ ব্যবসায়ী, উৎপাদক, পরিবেশকদের বিরুদ্ধে কী শাস্তি প্রদান করা হলো, ভ্রাম্যমান আদালত কী করছে তা নিউজ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে।

https://teachingbd24.com

৫. চাল-ডাল-আটা-ময়দা, ফলমূল প্রভৃতির আড়তগুলোতে নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে।
৬. বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িতদের ওপর সতর্ক নজরদারি রাখতে হবে, যেন এসব পদার্থ খাদ্যে ভেজালের জন্য নয় বরং উপযুক্ত কাজেই শুধু ব্যবহার হয়।
৭. খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং খাদ্য সংরক্ষণের জন্য জনবান্ধব ও স্বাস্থ্যসহায়ক উপায় বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।
৮. জনগণ নিজেরাই যেন ফরমালিনমুক্ত বা ভেজাল পণ্য চিনতে পারে সে পদ্ধতি প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

সর্বোপরি, জনগণের সচেতনতা, সাবধানতা, ব্যবসায়ীদের সততা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যাটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২০ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে সমগ্র পৃথিবীর জলবায়ুর উপর। পৃথিবীর জীববৈচিত্র আজ হুমকির সম্মুখীন। নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্বাভাবিক ছন্দ পতন ঘটাচ্ছে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনযাত্রায়। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত মানুষের অনৈতিক কর্মকাণ্ডই দায়ী।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কবে? ১
খ. গ্রিণ হাউজ এফেক্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও। ২
গ. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে তোমার সুপারিশগুলি লিখ। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

খ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমণ্ডলীয় গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূ-পৃষ্ঠের তথা বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে প্রাণিজগতের বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষত জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত দহন এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে প্রাকৃতিক গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে, যার নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক।

গ উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাণিবৈচিত্র্যের হুমকি ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ছন্দপতনের বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব বাংলাদেশের ওপর সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ক্ষতির মুখে পড়ছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিঠা পানির মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। আর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এতে অনেক মানুষের প্রাণহানি, গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক কালে ঘটে যায় ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলা। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডর-এ ২৮টি জেলার ৩০ লক্ষ মানুষ এবং ২০০৯ সালের ২০ এপ্রিল আইলায় মানুষ, পশুপাখি, ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে খরা, শৈত্যপ্রবাহ এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত প্রভাব অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তির নানাবিধ উপায় আছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এবং পরিবর্তন রোধে এখনই বিশ্বকে এক যোগে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট সৃষ্টিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভূমিকা বেশি। তাই শিল্পোন্নত দেশগুলো যাতে এ সমস্যার প্রতিকারে পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল স্থানে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করতে হবে। নদীর তীরবর্তী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গাছপালা ধ্বংস এবং গাছপালার অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পণ্যে সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। যানবাহন ও কলকারখানায় পরিবেশ সহায়ক জ্বালানির ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহৃত বর্জের বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা ও পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক মহলকে সোচ্চার হতে হবে, বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমগ্র মানব জাতিকে এক চরম সংকট এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উক্ত সংকটের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। বিশ্ববাসী সচেতনভাবে কাজ করলে এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২১ 'X' পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশু। তার চেহারা ও অবয়ব অন্য শিশুদের মতো। তার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সে অন্যদের তুলনায় একটি বেশি বা কম সংবেদনশীল।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. 'OIC' এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝ? ২
গ. 'X' কি এক ধরণের শিশু? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে 'X' এর মতো শিশুরা একদিন সম্পদে পরিনত হবে— তুমি কী একমত? যুক্তি স্থাপন কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'OIC' এর পূর্ণরূপ হলো Organization of Islamic Co-operation.

খ সৃজনশীল ৮ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ মাহফুজ চাকরি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা যায়। সেখানে সে একবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এর পর থেকে সে সব সময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথাব্যথা, শরীরে ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব করে। ফলে সে দেশে এসে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, মাহফুজ একটি ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তার পিতামাতা তাকে খুব যত্ন করে সেবা করে।

[হলি ক্রস কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. 'দুদক'-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো কোন্ রোগের লক্ষণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কী কী কারণে উক্ত রোগের বিস্তার ঘটে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

https://teachingbd24.com

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদক-এর পূর্ণরূপ হলো-'দুর্নীতি দমন কমিশন'।

খ সৃজনশীল ৮ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের মাহফুজ মরণব্যাধি এইডস- এ আক্রান্ত হয়েছে।

এইডস এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা গঠিত রোগ। এই ভাইরাসকে Human Immunodeficiency Virus বা এইচ আই ভি (HIV) বলা হয়। এইচ আই ভি ভাইরাসটি রক্তের সাদা কোষ (CD-8 বা টি সেল) নষ্ট করে দেয়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের মাহফুজের মধ্যেও এই রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠেছে।

উদ্দীপকের মাহফুজ দুর্ঘটনায় আহত হলে হাসপাতাল থেকে রক্ত দিয়ে তার অপারেশন করা হয়। এরপর থেকে সে সবসময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথাব্যাথা, শরীর ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব করে। ডাক্তারের নিকট গেলে মাহফুজ জানতে পারে সে মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত। কেননা তার মধ্যে এইডস এর লক্ষণ বা উপসর্গগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের ওজন হ্রাস পেতে থাকে। সেই সাথে দুই মাসের বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে, দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি লেগে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। HIV আক্রান্ত হলে ব্যাকটেরিয়া- ভাইরাস এবং অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজম দ্বারা সংঘটিত রোগ সহজেই শরীরকে আক্রান্ত করে ফেলে। এইডস এর কার্যকর প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এজন্যই এইডসকে ঘাতকব্যাধি বা মরণব্যাধি বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের মাহফুজও এইডস রোগে আক্রান্ত।

ঘ যেসব কারণে উক্ত রোগের অর্থাৎ মরণব্যাধি এইডস-এর বিস্তার ঘটে সেগুলো হলো:

- এইচ.আই.ভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে।
- ইন্‌জেকশনের একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে কিংবা অপরিশোধিত অবস্থায় ব্যবহৃত হলে,
- এইচ. আই. ভি সংক্রমিক মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে।
- এইচ.আই.ভি. এবং এইডস আক্রান্ত কোনো নারী বা পুরুষের সাথে অন্য কোনো সুস্থ পুরুষ বা নারীর অনিরাপদ দৈহিক মিলনের ফলে।
- এইচ.আই.ভি সংক্রমিত অঙ্গ (যেমন—হৃৎপিণ্ড, কিডনি, কর্নিয়া ইত্যাদি) বা কোষসমষ্টি কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে,
- এইচ.আই.ভি সংক্রমিত রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে,
- এইচ.আই.ভি এবং এইড্‌স-এ আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে শিশু গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময়, মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাহফুজ চাকুরি সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থানকালে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এরপর থেকে সে সব সময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথাব্যথা, শরীরে ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব করে। ফলে সে দেশে এসে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, মাহফুজ একটি ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যা এইচ.আই.ভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণের ফলে আক্রান্ত হয়েছে বলে উদ্দীপকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে এবং জলবায়ু ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর সকল স্থানে ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ মানবগোষ্ঠীর জীবন ও জীবন ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলছে। কিন্তু এ পরিবর্তন নিছক প্রাকৃতিক নয় বরং এর বেশির ভাগই মানুষের সৃষ্টি। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. প্রতিবন্ধী কারা? ১

খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশের ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের একজন নাগরিকের কী কী করণীয় রয়েছে বলে তুমি মনে করো? ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবন্ধি হলো তারা যারা দৈহিক, মানসিক ও বোধশক্তিজনিত অসুবিধায় সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত।

খ খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।

খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়। যথা— অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাণিবৈচিত্র্যের হুমকি ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ছন্দপতনের বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব বাংলাদেশের ওপর সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ক্ষতির মুখে পড়ছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিঠা পানির মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। আর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস আঘাত হানে। এতে অনেক মানুষের প্রাণহানি, গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক কালে ঘটে যায় ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলা। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডর-এ ২৮টি জেলার ৩০ লক্ষ মানুষ এবং ২০০৯ সালের ২০ এপ্রিল আইলায় মানুষ, পশুপাখি, ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে খরা, শৈত্যপ্রবাহ এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত প্রভাব অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তির উপায় আছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এবং পরিবর্তন রোধে এখনই বিশ্বকে এক যোগে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট সৃষ্টিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভূমিকা বেশি। তাই শিল্পোন্নত দেশগুলো যাতে এ সমস্যার প্রতিকারে পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল স্থানে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করতে হবে। নদীর তীরবর্তী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গাছপালা ধ্বংস এবং গাছপালার অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পণ্যে সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। যানবাহন ও কলকারখানায় পরিবেশ সহায়ক জ্বালানির ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহৃত বর্জের বিশুদ্ধকরণের

https://teachingbd24.com

ব্যবস্থা করতে হবে। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা ও পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক মহলকে সোচ্চার হতে হবে, বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমগ্র মানব জাতিকে এক চরম সংকট এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উক্ত সংকটের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। বিশ্ববাসী সচেতনভাবে কাজ করলে এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মাহফুজ চাকুরি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। সেখানে সে একবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এরপর থেকে সে সব সময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথাব্যথা, শরীরে ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব করে। ফলে সে দেশে এসে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, মাহফুজ একটি ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তার পিতা-মাতা তাকে খুব যত্ন করে সেবা করে?

[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. দুদক এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো কোন রোগের লক্ষণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কী কী কারণে উক্ত রোগের বিস্তার ঘটে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদক এর পূর্ণরূপ দুর্নীতি দমন কমিশন।

খ সৃজনশীল ৮ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো এইডস (AIDS) রোগের। এটি একটি মরণ ব্যাধি।

বর্তমান বিশ্বে সব থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি কারি ব্যাধি এইডস যার (AIDS) পূর্ণ রূপ 'Acquined Immuno Deficiency Syndrome'। এটি নামক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোনিয়া অঞ্চলে ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ২৭ লক্ষ লোক HIV বা AIDS রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো জ্বর জ্বর ভাব, মাথা ব্যথা, শরীরে ক্লান্তভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব দ্বারা এইডস (AIDS) রোগকে নির্দেশ করছে। এই রোগের আরো যে লক্ষণগুলো রয়েছে তাহল :

১. শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পায়।
২. শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হয়।
৩. বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে।
৪. অতিরিক্ত অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পড়ে।
৫. দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি লেগে থাকে।
৬. হজম শক্তি হ্রাস পায়।
৭. স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা লোপ পায়।
৮. মুখ ও গলায় এক ধরণের ঘা হয় এবং তা থেকে ফেনাযুক্ত রস বের হয়।

ঘ বর্তমানে এইডস একটি মারাত্মক রোগ যা বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এ রোগের প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয়নি। এ রোগ প্রতিরোধকল্পে উন্নত দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বর্তমানে এ রোগের ছোবল থেকে রক্ষা পেতে হলে নাগরিকদের সচেতন হয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দীপকের মাহফুজ এইডস- এ আক্রান্ত। এরোগ থেকে মুক্তি পেতে ধর্মীয় অনুশাসন সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে মানুষ পারিবারিক জীবনে বিশ্বস্ত থাকে। সেই সাথে অনিরাপদ ও বিবাহ-বর্হিভূত শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে। এছাড়া সুই কিংবা সিরিঞ্জ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করলে এইডস এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। তাই কারো সাথে সুই কিংবা সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করা যাবে না। এইডস- এ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো যাবে না এবং তার ব্যবহৃত সুঁচ, সিরিঞ্জ ও অন্যান্য অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে। এ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হলে পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে, সমকামিতার কুফল সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়াও এইডসের কারণ ও এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। এইডস প্রতিরোধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। এইডস সংক্রমণের আশঙ্কা আছে এমন কারণ থেকে নিজে দূরে থাকতে হবে এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকলে এবং তা যথাযথভাবে মেনে চললে মরণব্যাধি এইডস এর বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৫ 'ক' একটি কলেজের ছাত্রী। প্রতিদিন কলেজে আসা যাওয়ার পথে কিছু বখাটে ছেলে তাকে বিরক্ত করত। তাই সে বাধ্য হয়ে কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেয়। *[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. HIV-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV-এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus।

খ খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।

খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়। যথা— অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং-এর সম্মুখীন হয়েছে।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' প্রতিদিন কলেজে যাওয়া-আসার পথে কিছু বখাটে ছেলে তাকে বিরক্ত করে। ফলে সে বাধ্য হয়ে কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায়, 'ক' ইভটিজিং-এর সম্মুখীন হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এবং কর্মস্থালে পুরুষদের দ্বারা উত্ত্যক্তের শিকার হচ্ছে। ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে অনেক মেয়ে লেখা-পড়া বন্ধ করেছে। এমনকি অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা অর্থাৎ ইভটিজিং মোকাবিলায় বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে হবে। তাহলেই ইভটিজিং সমস্যাটি অনেকাংশে কমে আসবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়ে ইভটিজিং সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মাহমুদ সাহেব ২৫ বছর যাবৎ উচ্চপদে চাকরি করেও সংসারে অভাব অনটন দূর করতে পারেননি। অন্যদিকে তারই বন্ধু হায়দার সাহেব ও একই চাকরি করেন। হায়দার সাহেব লোভে পড়ে রাতারাতি অঢেল টাকা-পয়সা ও সম্পদের মালিক হন। মাহমুদ সাহেবের ছেলেমেয়েরা জানতে চায় তার বন্ধুর এত সম্পদ হলো কীভাবে। জবাবে মাহমুদ সাহেব বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের মালিক হওয়া একটি অনৈতিক কাজ। মাহমুদ সাহেবের ছেলেমেয়েরা এসব কথা শুনে বাবার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১

খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে হায়দার সাহেবের সম্পদশালী হাওয়াকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মাহমুদ সাহেবের আদর্শ দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর— তোমার মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল কর্মকাণ্ড প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-নীতির পরিপন্থি এবং সাধারণভাবে বিবেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য তাকেই দুর্নীতি বলে।

খ ইভটিজিং মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথে-ঘাটে উত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্যাতন নির্দেশক একটি শব্দ।

বর্তমানে ইভটিজিং বেড়ে যাওয়ার পেছনে পরিবারে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা দায়ী। এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারে শিশুর সঠিক সামাজিকীকরণের অভাব ইভটিজিং এর কারণ হিসেবে ধরা যায়। মাদকাসক্ত ও বেকার যুবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ইভটিজিং করে। এছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইভটিজিং এর জন্যে ব্যাপকভাবে দায়ী।

গ উদ্দীপকে হায়দার সাহেবের সম্পদশালী হওয়ার পদ্ধতি একটি অবৈধ পন্থা যা নীতি বহির্ভূত এবং জনস্বার্থ বিরোধী।

দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের মালিক হওয়া একটি অনৈতিক কাজ। দুর্নীতি একটি নেতিবাচক শব্দ। দুর্নীতি বলতে নীতি বা আইন বিরুদ্ধ আসন কেই বোঝায়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক যে কোন নীতি বহির্ভূত এবং জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি। রাষ্ট্র ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা না করে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো, ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিবেক বিরোধী কাজ হলো দুর্নীতি।

উদ্দীপকে বর্ণিত হায়দার আলী লোভে পড়ে রাতারাতি অঢেল টাকা-পয়সা ও সম্পদের মালিক হন। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত তার সমস্ত সম্পদ অবৈধ এবং জনস্বার্থ বিরোধী। এই সম্পদ দ্বারা হায়দার আলী যে অর্থ উপার্জন করেছে তার দ্বারা তিনি কারও নিকট শ্রদ্ধাশীল হবেন না। তাই বলা যায় হায়দার আলী একজন দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত মাহমুদ সাহেবের আদর্শ দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর— উক্তিটি যথার্থ।

মাহমুদ সাহেব ২৫ বছর যাবৎ উচ্চপদে চাকরি করেও সংসারে অভাব অনটন দূর করতে পারেন নি। সততা ও সরলতা তার জীবন চলার পাথেয়। তারই বন্ধু হায়দার সাহেব লোভে পড়ে রাতারাতি অঢেল টাকা-পয়সা ও সম্পদের মালিক হন। মাহমুদ সাহেব বিশ্বাস করেন দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের মালিক হওয়া একটি অনৈতিক কাজ।

দুর্নীতি পরিহার করলে সমাজ, দেশ ও মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। দেশের সম্পদের সঠিক ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। মানুষের মৌল-মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানব সমস্যা সম্পদে পরিণত হয়।

অভাব ও লোভ মানুষকে দুর্নীতির পথে পরিচালিত করে। বিবেকবান মানুষ বিবেকের শক্তির টানে অন্যায়, দুর্নীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। মানবাধিকার এবং জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ।

উদ্দীপকে মাহমুদ সাহেব এবং হায়দার সাহেবের জীবন প্রণালী বিশ্লেষণ করলে জানা যায় মাহমুদ সাহেব প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে থেকেও দুর্নীতিকে আশ্রয় দেন নি। অপর দিকে হায়দার সাথে লোভে পরে সম্পদের মালিক হয়েছে। মাহমুদ সাহেবের আদর্শ দ্বারা রাষ্ট্রে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বাকস্বাধীনতা, দেশ প্রেম, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি মানবিকগুণের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মোটকথা অভাব ও লোভ পরিহার করে মাহমুদ সাহেব দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণের জন্য দুর্নীতিমুক্ত জীবন-যাপন করছেন। এর ফলে মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ খানেপুর বাজারে সবজি ও ফলের দোকানে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে তাদের পণ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের জন্য জরিমানা করে। ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফার লোভে জেনে শুনে নাগরিক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সবজি ও ফল বিক্রেতাদের কর্মকাণ্ড কোন সমস্যা নির্দেশ করে? ৩

ঘ. বর্ণিত সমস্যা নিরসনকল্পে তোমার সুপারিশ লেখ। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ বিশ্বে উষ্ণায়নের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়।

বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মিথেনের এক ধরনের তাপ ধারণক্ষম প্রভাব রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে এ রকম নানা ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে মহাশূন্যে তাপ নির্গমনে বাধার সৃষ্টি করছে, যার ফলাফল হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। যখন বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই মহাশূন্যে তাপের বিকিরণ কমে যায় এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যায় যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হিসেবে পরিচিত।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি বাংলাদেশের খাদ্যে ভেজাল সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

সাধারণভাবে খাদ্যে ভেজাল বলতে খাঁটি বা আসল পণ্যের সাথে নিম্নমানের ও নকল পণ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিক্রয় করাকে বোঝায়। এতে দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধতা হারায়। বর্তমান যুগে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মিশ্রণ করে কিছু অসাধু, নীতি বিবর্জিত ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে থাকে, উদ্দীপকেও এ সমস্যার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে মূলত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভেজাল খাদ্য। মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে শুরু করে তৈরি খাবার, ফলমূল এমনকি শিশু খাদ্যে পর্যন্ত ভেজালের ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মুনাফা অর্জনের লোভে, নাগরিকদের অসচেতনতা এবং আইন প্রয়োগে প্রশাসনের শিথিলতার কারণে দিন দিন এ সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে পুষ্টির অভাব থেকে ভোক্তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উদ্দীপকেও এ সমস্যাটির কথা বলা হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ আরিফের প্রিয় ফল আম। সে বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে কিছু ল্যাংড়া আম ক্রয় করে। বাসায় এনে কেটে দেখে ভিতরে আঁটি শক্ত হয়নি। আমগুলো খেতে অতিরিক্ত মিষ্টি। এ আম খেয়ে তার ছোট ভাইয়ের পেটে অসুখ দেখা দেয়। *[লায়ন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. দুর্নীতি কী? ১

খ. বাংলাদেশে দুর্নীতির দুটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আরিফের সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? নিরুপন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আরিফ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা প্রতিরোধে নাগরিকদের করণীয়— ব্যাখ্যা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

খ বাংলাদেশে দুর্নীতির দুটি কারণ হলো—

১। স্বচ্ছতার অভাব: বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জনগণের স্বার্থজড়িত কাজ ও প্রকল্প বিষয়ে জনগণকে জড়িত এবং অবহিত করা হয় না। যা দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ।

২। জবাবদিহিতার অভাব: জবাবদিহিতার অভাবে বাংলাদেশে দুর্নীতির শিকড় এখন সর্বত্র বিরাজমান। সরকারি কর্মকর্তাগণ বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করে না। ফলে তাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা বেড়ে যায়।

গ উদ্দীপকে আরিফের সমস্যাটি বাংলাদেশের খাদ্যে ভেজাল সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

সাধারণভাবে খাদ্যে ভেজাল বলতে খাঁটি বা আসল পণ্যের সাথে নিম্নমানের ও নকল পণ্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিক্রয় করাকে বোঝায়। এতে দ্রব্যের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিশুদ্ধতা হারায়। বর্তমান যুগে খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল মিশ্রণ করে কিছু অসাধু, নীতি বিবর্জিত ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করে থাকে, উদ্দীপকেও এ সমস্যার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আরিফ বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে দুই কেজি আম ক্রয় করে। বাসায় এসে কেটে দেখে টমেটো পাকার মতো হয়নি। এই আম খেয়ে তার ছোট ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখানে মূলত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে যে সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভেজাল খাদ্য। মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে শুরু করে তৈরি খাবার, ফলমূল এমনকি শিশু খাদ্যে পর্যন্ত ভেজালের ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সীমাহীন মুনাফা অর্জনের লোভে, নাগরিকদের অসচেতনতা এবং আইন প্রয়োগে প্রশাসনের শিথিলতার কারণে দিন দিন এ সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে পুষ্টির অভাব থেকে ভোক্তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উদ্দীপকেও এ সমস্যাটির কথা বলা হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জালালের প্রিয় ফল আম। সে বাজার থেকে সুন্দর রং দেখে কিছু ল্যাংড়া আম কিনে বাসায় আনে। বাসায় এনে কেটে দেখে ভিতরে আঁটি এখনও শক্ত হয়নি। অথচ আমগুলো খেতে অতিরিক্ত মিষ্টি, এ আম খেয়ে তার ছোট ভাইয়ের পেটে অসুখ দেখা দেয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বিশ্বের কতভাগ জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় আক্রান্ত? ১

খ. শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জালালের ক্রয়কৃত আমগুলোর সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? নিরুপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জালাল যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা প্রতিরোধে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় আক্রান্ত।

খ অসুখ, দুর্ঘটনা, চিকিৎসাজনিত ত্রুটি অথবা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে লোপ পা তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বলে।

যাদের মাঝে নিচে উল্লেখিত লক্ষণগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যাবে তারা শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে বিবেচিত হবে। যথা- একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত এমন ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম বা সাধারণ চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়; স্নায়ুবিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সেলিম বখাটে ছেলে। তার চাচা ও মামা দুজন দুটি বড় রাজনৈতিক দলের নেতা। তারেক তার বখাটে বন্ধুর সাথে গার্লস স্কুল, শপিং মলের সামনে প্রায়ই আড্ডা দেয়। মেয়েদের উত্যক্ত করে অশোভন অঙ্গভঙ্গি ও অশ্লীল মন্তব্য করে। কুপ্রস্তাব করে বসে। এসব দেখে কেউ প্রতিবাদ করে না। যাদের এগুলো প্রতিরোধ করার কথা তারাও তা ঠিকমত করে না। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. আন্তর্জাতিক নারী দিবস কোনটি? ১

খ. গ্রিণ হাউস গ্যাস কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার নাম কী? কেনো এই সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা প্রতিরোধ এবং নির্মূল করার জন্য তুমি কী কী সুপারিশ করবে? ৪

Teachingbd24.com

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চ।

খ সাধারণত বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাস সূর্যরশ্মির তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। এগুলো হলো কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2), নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন গ্যাস, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদি। এই গ্যাসগুলোই মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস এবং এই গ্যাস পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি সামাজিক সমস্যা ইভটিজিংকে নির্দেশ করে।
ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইভ' বলতে বোঝায় রমণী বা নারী, 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গাভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্যক্ত প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণই ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকে তারেক তার বখাটে বন্ধুর সাথে গার্লস স্কুল, শপিং মলের সামনে মেয়েদের উত্যক্ত করে, অশোভন অঙ্গাভঙ্গি ও অশ্লীল মন্তব্য করে এবং বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দেয়। তারেক ও তার বন্ধুর এসব আচরণ ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি ইভটিজিং সমস্যাকে ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা অর্থ্যাৎ ইভটিজিং প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।
ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইভটিজিং ও এর নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে পারেন। দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি বিমেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটি ধর্মেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে হবে। তাহলেই ইভটিজিং সমস্যাটি অনেকাংশে কমে যাবে।
পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে ইভটিজিং সমস্যা প্রতিরোধ ও নির্মূল করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ নিচের ছকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মেয়েদের উত্যক্ত করা
↓
রাস্তাঘাটে মেয়েদের দেখে অশ্লীল মন্তব্য করা
↓
মেয়েদেরকে দেখে শিস বাজানো

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. EU এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী কারা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা মোকাবেলায় কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক EU এর পূর্ণরূপ European Union।

খ প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলা হয়।
বর্তমান সময়ে প্রতিবন্ধীদের বোঝানোর জন্য বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ হচ্ছে 'Person with Special Needs'। এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী'। প্রকৃতপক্ষে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

গ ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং-এর প্রতি ইঙ্গিত দেয়।
ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গাভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্যক্ত প্রভৃতি ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো- মেয়েদের উত্যক্ত করা, রাস্তাঘাটে তাদের দেখে অশ্লীল মন্তব্য করা ও শিস বাজানো। এ বিষয়গুলো আমাদের সমাজে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটমান সামাজিক সমস্যা ইভটিজিংকে নির্দেশ করে। বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এবং কর্মস্থালে পুরুষদের দ্বারা উত্যক্তের শিকার হচ্ছে। এটি এখন আমাদের সমাজের এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করছে।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ ইভটিজিং মোকাবিলায় বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি।
ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।
দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে হবে। তাহলেই ইভটিজিং সমস্যাটি অনেকাংশে কমে আসবে।
আলোচনা শেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে ইভটিজিং সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩২ লিমা জন্মগতভাবে অন্ধ তাই বলে সে পড়ালেখা বাদ দেয়নি। উচ্চ শিক্ষার জন্য সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায়। কিন্তু তার বাবা মা নানা সমস্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তার ইচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে মানুষের সেবা করা।

[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৬]

ক. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কী? ১

খ. এইডস কিভাবে প্রতিকার করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে লিমা কোন সামাজিক সমস্যার শিকার? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. লিমার স্বপ্ন পূরণে রাষ্ট্রের করণীয়সমূহ আলোচনা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বে উষ্ণায়নের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়।

খ এইডস থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেকের উচিত—

- অবাধ যৌন মেলামেশা পরিহার করা।
- যৌন মেলামেশায়, স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।
- ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করা ও স্ত্রী-সন্তানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- যেকোন যৌন মেলামেশার ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অন্যের রক্ত গ্রহণের সময় এইডস ভাইরাস মুক্ত কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- এইডসের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ সৃজনশীল ১৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সোহেল আরমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স পড়েছে। সে হুইল চেয়ারে বসে ক্লাস করে এবং পরীক্ষা দেয়। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। জন্মগতভাবেই তার পায়ের আকৃতি ও গড়ন স্বাভাবিক মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার জন্য উপযোগী নয়। অন্যদিকে তার এক বন্ধু এমন একটি মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত যার কোনো চিকিৎসা নেই।

[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ২]

ক. ফরমালিন কী? ১

খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সোহেল আরমান কোন সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সোহেল আরমানের বন্ধু যে মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত তা থেকে মুক্তি পেতে নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় কী বলে তুমি মনে কর? তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরমালিন হলো এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ।

খ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ কলেজছাত্রী শরিফাকে কলেজে আসা-যাওয়ার পথে বখাটেরা প্রায়ই উত্ত্যক্ত করে। একদিন কলেজে যাওয়ার পথে একজন বখাটে তাকে এসিড নিক্ষেপের হুমকি দিলে শরিফা রুখে দাঁড়ায়। শরিফার ডাকে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসে এবং বখাটেকে পুলিশে সোপর্দ করে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]

ক. খাদ্যে ভেজাল কী? ১

খ. জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের শরিফার ঘটনাটি মূল পাঠের কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'নাগরিক সচেতনতা ও আইনের যথার্থ প্রয়োগই পারে সমাজকে এই সামাজিক ব্যাধি হতে মুক্তি দিতে'—তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের মধ্যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান মেশানোকে খাদ্যে ভেজাল বলে।

খ পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যার জন্য সর্বপ্রথম মানুষকে দায়ী করা হয়। তাছাড়া গ্রিনহাউস এফেক্ট, সূর্যালোকের ঘনত্বের তারতম্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শক্তির অপরিকল্পিত ব্যবহার প্রভৃতির কারণেও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শরিফা কলেজে যাতায়াতের পথে বখাটেদের উত্ত্যক্তের শিকার হয়। শরিফা যে সামাজিক সমস্যার শিকার তা হলো ইভটিজিং।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইভ' বলতে বোঝায় রমণী বা নারী, 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্ত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে, পুরুষরা যখন নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণকেই ইভটিজিং বলা হয়। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে, দেশের শতকরা ৬২ জন স্কুলগামী মেয়ে ইভটিজিং-এর শিকার হয়। ইভটিজিং-এর ফলে গ্রামাঞ্চলের স্কুল কলেজে মেয়েদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, উদ্দীপকের শরিফা সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং এর শিকার হয়।

ঘ হ্যাঁ, নাগরিক সচেতনতা ও আইনের যথার্থ প্রয়োগই পারে সমাজকে এই সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি দিতে।— এ বিষয়ে আমি একমত।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শরিফা ইভটিজিংয়ের শিকার। ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে শরিফা কলেজে যাওয়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে শরিফা সোনালী ভবিষ্যত রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইভটিজিংকে প্রতিরোধ করা। ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইভটিজিং ও এর নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে পারেন। দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির

Teachingbd24.com

ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
সুতরাং বলা যায়, নাগরিক সচেতনতা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগই পারে সমাজকে এই সামাজিক ব্যাধি হতে মুক্তি দিতে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জনাব মো. শরিফুল ইসলাম চাকরি করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। সেখানে সে একবার সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এরপর থেকে সে সব সময় জ্বর জ্বর ভাব, মাথা ব্যথা, শরীরে ক্লান্তিভাব, মাংসপেশি ও গিরায় ব্যথা অনুভব করে। ফলে সে দেশে এসে হাসপাতালে গেলে ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন, যে মাহফুজ একটি ভাইরাস জনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. 'দুদক' এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো কোন রোগের লক্ষণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কী কী কারণে উক্ত রোগের বিস্তার ঘটে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দুদক' এর পূর্ণরূপ হলো 'দুর্নীতি দমন কমিশন'।

খ ইভটিজিং মূলত এক ধরনের প্রকাশ্য যৌন হয়রানি।
Eve Teasing শব্দটি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে এসেছে। Eve বা ইভ শব্দটি দ্বারা বাইবেলে বর্ণিত ইভকে (Eve) বা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত প্রথম মানবী হাওয়াকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ Eve হলো সমগ্র নারী জাতির নির্দেশক শব্দ। অন্যদিকে, Teasing বা টিজিং অর্থ পরিহাস বা জ্বালাতন। ইভটিজিং বলতে কোনো নারীকে প্রকাশ্যে যেকোনো ধরনের জ্বালাতন বা পরিহাসকে নির্দেশ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো মরণব্যাধি এইডস রোগের লক্ষণ।
এইডস এক প্রকার ভাইরাস সংক্রমিত রোগ। এই ভাইরাসকে Human Immuno Deficiency Virus বা সংক্ষেপে HIV বলা হয়। এইচআই ভি রক্তের সাদা কোষ নষ্ট করে যায়, যার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এইড আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যেও অন্যান্য রোগের মত নানা লক্ষণ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— দ্রুত শরীরের ওজন হ্রাস, দীর্ঘদিন (দু'মাসের অধিক) ধরে পাতলা পায়খানা, বারবার জ্বর বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, নাসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া, অত্যধিক দুর্বলতা, স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়া, হজম শক্তি কমে যাওয়া, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা লোপ, শুকনা কাশি হওয়া ইত্যাদি।
উদ্দীপকের শরীফুল ইসলামের মধ্যেও এ সমস্ত লক্ষণ ফুটে ওঠেছে।
উদ্দীপকের শরীফুল ইসলাম চাকরির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে তাকে রক্ত নিতে হয়। এরপর থেকে সবসময় তার জ্বর-জ্বর ভাব, মাথা ব্যাথা, ক্লান্তি, মাংশপেশী ও গিরায় ব্যাথাসহ নানাবিধ সমস্যা হতে থাকে, যা উপরোল্লিখিত এইডস রোগের লক্ষণগুলোর সাথে মিলে যায়। এরপর ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার এইডসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান। উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে বর্ণিত লক্ষণগুলো এইডস রোগের লক্ষণ।

ঘ সৃজনশীল ২৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ সুমনা বাজার থেকে একটি রুই মাছ কিনে আনার পর ভুল ক্রমে মাছটি ফ্রিজে না রেখে তাড়াহুড়ার কারণে টেবিলে রেখে ঈদে গ্রামের বাড়ী চলে যায়। ঈদ শেষে ৪ দিন পর ফিরে এসে দেখে টেবিলে মাছ পড়ে আছে কিন্তু একটুও পচেনি। সে অবাক হয়। এখন সে বাজার থেকে আম, আপেল বা অন্য কোন ফল কিনতেও ভয় পায়।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুজিব নগর সরকার কত তারিখে শপথ গ্রহণ করে? ১
খ. আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুমনা কর্তৃক ক্রয়কৃত মাছ না পচার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনার কারণে জনজীবনে কী প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে কর। যুক্তিসংগত মতামত দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে শপথ গ্রহণ করে।

খ আইন হলো দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এমন কিছু প্রথা রীতি-নীতি ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত এমন কিছু নিয়ম-কানুন যা একটি রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী নিজেদের উপর বাধ্যগত বা অবশ্য পালনীয় বলে স্বীকার করে। আর অধ্যাদেশ হলো- জাতীয় সংসদে যখন অধিবেশন থাকবে না, তখন যদি জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনামতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে জরুরি আইন প্রণয়ন জারি করে। এসব অধ্যাদেশ আইনের মতোই কার্যকর হয়। আবার এসব অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদিত হলে তা আইনে পরিণত হয়। আইন প্রণয়ন করে থাকে সাধারণত আইনসভা বা জাতীয় সংসদ পক্ষান্তরে অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

গ সুমনার ক্রয়কৃত মাছ না পঁচার কারণ হলো মাছে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ফরমালিন মেশানো হয়েছে।
উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, সুমুনা বাজার থেকে একটি রুই মাছ কিনে আনে। ভুলে মাছটি ফ্রিজে না রেখে টেবিলে রেখে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। তিন দিন পর ফিরে এসে দেখে টেবিলে মাছ পড়ে আছে কিন্তু একটুও পঁচেনি। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বর্তমানে সারাদেশে খাদ্যে ভেজাল এক মহামারি আকার ধারণ করেছে। বাজারে সব ধরনের ফলমূল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস এবং দুধে নানারকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত করে বিক্রি করছে। ব্যবসায়ী প্রতিদিন তাদের পণ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করেন। যেমন: ফরমালিন, কার্বাইড ইত্যাদি। পচনশীল দ্রব্যকে চড়া দামে বিক্রি করার জন্য এবং এর স্থায়ীত্ব দীর্ঘ করতে এগুলো করেন তারা। ব্যবসায়ীরা সাদা ডিম কেমিক্যাল দিয়ে লাল করছে। তরমুজ, সস ও জেলিতে মিশাচ্ছে বিষাক্ত রং। দেশের অধিকাংশ খামারে গরুকে খাওয়াচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ও সোডা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার কারণে অর্থাৎ খাদ্যে ভেজালের কারণে জন-জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি।
বিষাক্ত কেমিক্যালযুক্ত খাদ্য খেয়ে আমরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। খাদ্যে ভেজালের রয়েছে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী ভয়ঙ্কর প্রভাব। গর্ভবতী মা ও শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি। বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন রোগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিষাক্ত কেমিক্যাল শরীরে স্থায়ী স্ট্রেসের সৃষ্টি করে। কেমিক্যালযুক্ত খাদ্যের দরুণ নষ্ট হচ্ছে আমাদের শরীরের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। যেমন- লিভার, কিডনী, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, চোখ, কান ইত্যাদি। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে লিভার ক্যানসার, লিভার সিরোসিস, ব্লাড ক্যানসার, কিডনি ফেইলিউর, হৃদরোগ, অ্যামিনিয়া ইত্যাদি রোগে। খাদ্যে অরুচি, ক্ষুদামন্দা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, পাবস্থলী-অন্ত্রনালী প্রদাহ ইত্যাদি একন নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। বন্ধ্যাত্ব, হাবাগোবা বা বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হওয়া, সন্তানের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়াসহ নানাবিধ সমস্যার জন্য ভেজাল খাবার একটি অন্যতম কারণ। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৪৫ লক্ষ লোক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হওয়া জটিল রোগের চিকিৎসায় দেশের বাইরে প্রচুর অর্থের খরচ সংশ্লিষ্ট পরিবার হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। মারাত্মক এসব রোগের চিকিৎসা

https://teachingbd24.com

অনেক ব্যয়বহুল। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা করেও লাভ হয় না। অকারনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে চিকিৎসার প্রয়োজনে। কাজেই জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতির পাশাপাশি ব্যাপক চাপ বাড়ছে অর্থনীতির ওপর।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত খাদ্যে ভেজালের কারণে জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ ডাঃ মুফতী মাহমুদ শহরের নামকরা চিকিৎসক। ২০ বছরের চিকিৎসা পেশায় তার হাতে বহু জটিল রোগের চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু তার এলাকার এক রোগীর চিকিৎসায় তিনি ব্যর্থ হলেন। দীর্ঘদিন ধরে সে রুগীর জ্বর, পাতলা পায়খানা, কাশি, দেহের ওজন কমে যাওয়া থেকে শুরু করে কোন রোগই ভাল হচ্ছে না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি রুগীকে ঢাকায় পাঠিয়েছেন। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দেখা গেল তার ক্যান্সার হয়নি। অথচ শরীরে রোগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা নেই। রোগীর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ১০]

ক. 'দুর্নীতি' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ কী? ১
খ. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রোগীর লক্ষণ দেখে কি রোগ হয়েছে বলে তুমি মনে কর। ৩
ঘ. উক্ত রোগ প্রতিরোধে নাগরিকের করণীয় নির্ধারণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দুর্নীতি' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Corruption'।

খ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো—
শারীরিক প্রতিবন্ধিতা: যাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যাবে তারা 'শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলে বিবেচিত হবে। যথা- (ক) একটি হাত বা উভয় হাত বা পা না থাকা (খ) কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত, এরূপ ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্ম বা সাধারণ চাল-চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় (গ) স্নায়ুবিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা।
মানসিক অসুবিধাজনিত প্রতিবন্ধিতা: ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা বা ফোবিয়াজনিত কোনো মানসিক সমস্যা, যার কারণে কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন বাধাগ্রস্থ হয়, তিনি মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ তাহের ও বিদ্যুৎ দুই বন্ধু তারা একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে টকশোতে আলোচনায় অংশ গ্রহণকালে দেশে কিশোর ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ক্রমাগত বৃদ্ধির ক্ষতিকর দিক, সম্প্রতি সরকার কর্তৃক মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ ও র‍্যাবের সাড়াশি অভিযান, জিরো টলারেন্স এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। তাহের তার আলোচনায় বলল, মাদকের ব্যবহার বন্ধে শুধু পুলিশ, র‍্যাবের অভিযানই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এবং কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ৪]

ক. NGO এর পূর্ণরূপ কি? ১
খ. স্বাধীনতার ২টি রক্ষা কবচ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আলোচ্য বিষয়ে পরিবার ও সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোচক তাহেরের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO এর পূর্ণরূপ Non Government Organization.

খ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নামে খ্যাত। নিম্নে স্বাধীনতার দু'টি রক্ষাকবচ ব্যাখ্যা করা হলে—

১. **গণতন্ত্র:** গলতন্ত্র স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রে জনগণই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র অথবা সর্বাত্মক রাষ্ট্রে যেখানে জনগনের ভূমিকা গৌন সেখানে স্বাধীনতা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়।

২. **মৌলিক অধিকার:** স্বাধীনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ। এর ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি আইন দ্বারা বিধিবন্ধ হয়।

গ পরিবার ও সমাজে উদ্দীপকে আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ।
মাদক একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। তরুণ প্রজন্মের একটি বিশাল অংশ এই সর্বনাশা নেশায় আসক্ত। নিতান্ত কৌতূহলের বসে মাদক গ্রহণ করলেও ধীরে ধীরে সর্বনাশা নেশা পেয়ে বসে। যার ফলাফল হয় ভয়াবহ। এর প্রভাব পড়ে মানুষের আচরণে। মাদকের ভয়াবহতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি পরিবার। কেননা মাদকাসক্ত ব্যক্তি শুধু নিজেকেই নয়, আর্থিকভাবে তার পরিবারকেও সর্বশান্ত করে। পরিবারের লোকজন সম্মান নিয়ে সমাজে বাস করতে পারে না। এছাড়া মাদকাসক্তি মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় করে। সমাজে যার প্রভাব পড়ে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজে এর ভয়াবহতা ছড়িয়ে যায় এবং আরো বেশি মানুষে মাদকে আসক্ত হয়। সড়ক দূর্ঘটনা এবং অপরাধ বেড়ে যায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, তাহের ও বিদ্যুৎ টিভি টকশোতে আলোচনায় দেশে কিশোর ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ক্রমাগত বৃদ্ধির ক্ষতিকর দিক এবং সম্প্রতি মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করছিল। যা থেকে মাদকের ভয়াবহতা বোঝা যায়। এককথায় বলা যায়, মাদক পরিবার ও সমাজকে সবদিক থেকে অস্থিতিশীল পঙ্গু করে তোলে।

ঘ উদ্দীপকের আলোচক তাহেরের মন্তব্য "মাদকের ব্যবহার বন্ধে শুধু পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযানই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"— যথাযথ।
সমাজের সকলের অংশগ্রহণ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বগ্রাসী মাদকের নেশা থেকে যুবসমাজ তথা সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব। এর জন্য সামাজিকভাবে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি মাদকের বিরুদ্ধে সরকার পুলিশ ও র‍্যাবের সাড়াশি অভিযান চালিয়েছে এবং জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। মাদকের ব্যবহার রোধে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর মাধ্যমে মাদক বন্ধ করা পুরোপুরি সম্ভব নয়। এজন্য সামাজিক গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ব্যাপক সাংস্কৃতিক উদ্দীপনা ও সুস্থ বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে, তরুণদের সম্পৃক্ত করে মাদকের হাতছানি থেকে দূরে রাখতে হবে। মাদকাসক্তির কুফল ও মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সামাজিকভাবে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করতে হবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে উদ্বুদ্ধ করায় সমাজের শিল্পী সাহিত্যিকদেরও এগিয়ে আসতে বে। কেননা দেশকে রক্ষার দায়িত্ব শুরু সরকারের নয়, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের।
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব সবার। তাই মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ব্যাপক সামাজিক গণআন্দোলন গড়ে তোলা অপরিহার্য। এর মাধ্যমেই মাদক নির্মূল করা সম্ভব হবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৯ জাভেদ দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করে সম্প্রতি দেশে ফিরে আসে। দেশে এসে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছিল। শরীরের ওজন কমে যায় এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন তার ভাইরাস জনিত রোগ হয়েছে।

[আলফেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. অপারেশন সার্চ লাইট কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তন কাকে বলে? ২

গ. জাভেদ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রোগ প্রতিরোধের উপায় নির্দেশ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর পরিচালিত একটি বর্বর অভিযানের নাম।

খ কোনো স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়ার গড় অবস্থা যখন পরিবর্তিত হয় এবং মানবজীবনের সাধারণ নিয়মাবলি নতুন রূপ লাভ করে তখনই একে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

কোনো বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের কৃষিকাজ, বনভূমি, পশু চারণক্ষেত্র, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ, খনিজ সম্পদ, শিল্প-কারখানা স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন হওয়াকেই জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪০

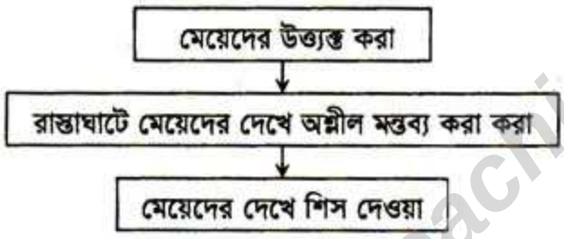

[বালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. দুর্নীতি কী? ১

খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলতে কী বোঝ? ২

গ. ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি।

খ সৃজনশীল ৩ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যা ইভটিজিং-এর প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্যক্ত প্রভৃতি ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো- মেয়েদের উত্যক্ত করা, রাস্তাঘাটে তাদের দেখে অশ্লীল মন্তব্য করা ও শিস বাজানো। এ বিষয়গুলো আমাদের সমাজে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটমান সামাজিক সমস্যা ইভটিজিংকে নির্দেশ করে। বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এবং কর্মস্থলে পুরুষদের দ্বারা উত্যক্তের শিকার হচ্ছে। এটি এখন আমাদের সমাজের এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করছে।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ ইভটিজিং মোকাবিলায় বহুবিধ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

ইভটিজিং প্রতিরোধে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। পারিবারিক সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সমাজ থেকে ইভটিজিং নির্মূল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষাই জাতিকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার করে ইভটিজিং প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আইনের পাশাপাশি সে আইন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে হবে। তাহলেই ইভটিজিং সমস্যাটি অনেকাংশে কমে আসবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে ইভটিজিং সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ মি. 'ক' এর প্রথম সন্তানের বুদ্ধি কম। তার বয়স ১৫ হলেও বয়স অনুযায়ী বুদ্ধি বাড়েনি। ফলে সমাজে সে চলাফেরায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার ছোট ভাইবোনেরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করলেও তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়নি।

[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-১১]

ক. কী সমাজের জন্য এক বিশাল অভিশাপস্বরূপ? ১

খ. কীভাবে মেয়েরা ইভ টিজিং প্রতিরোধ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. 'ক' এর প্রথম সন্তানের সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সমস্যার চিত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মি. 'ক' এর প্রথম সন্তানকে সমাজে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্নীতি সমাজের জন্য এক বিশাল অভিশাপস্বরূপ।

খ আত্মসচেতনতা ও সাহসী প্রতিবাদের মাধ্যমে মেয়েরা ইভ টিজিং প্রতিরোধ করতে পারে।

ইভ টিজিং বর্তমানে আমাদের সমাজের এক মারাত্মক ব্যাধি। নৈতিক অবক্ষয় এবং অশ্লীলতাপূর্ণ আকাশ সংস্কৃতি এ সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। ইভ টিজিংয়ের ফলে প্রতিবছর মেয়ের বাল্যবিবাহ, পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। অথচ একটু সচেতন হলে এবং নিজেরা প্রতিবাদ করলেই ইভ টিজিং অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'ক'-এর প্রথম সন্তানের সমস্যাতে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, যার মাঝে প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান তিনিই প্রতিবন্ধী। সে প্রতিবন্ধকতা যত সামান্যই হোক না কেন। তবে প্রকৃতপক্ষে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়, তবে সে ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা যায়।

উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী মি. 'ক' এর প্রথম সন্তান একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। কেননা তার বয়স ১৫ হলেও সে তুলনায় তার বুদ্ধি বাড়েনি। এ বিষয়টি প্রতিবন্ধিতার দিকেই ইঙ্গিত করে। সমাজের এ সমস্যাটি আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের দায় নয়। তাই বিশেষ চাহিদার এ জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের সুস্থ মানুষের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।

ঘ উদ্দীপকে মি. 'ক'-এর প্রথম সন্তানকে সমাজে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মি. 'ক'-এর প্রথম সন্তান একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নিজস্ব প্রতিবন্ধিতাজনিত কারণ ছাড়াও সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাদেরকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রতিবন্ধিতা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রতিটি পদে পদে সমস্যায় জর্জরিত হয়। যেমন— শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলা, কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে পিছিয়ে থাকা, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনে অসুখী থাকা এবং যৌতুক দিতে বাধ্য থাকা প্রভৃতি। যেমনটি আমরা উদ্দীপকেও দেখতে পাই যে মি. 'ক' এর দ্বিতীয় সন্তান স্কুলে ভর্তি হলেও প্রতিবন্ধী প্রথম সন্তানকে স্কুলে পাঠানো হয়নি। এতদসত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের বোঝা না হয়ে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে ইচ্ছুক। কিন্তু যথোপযুক্ত সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে তারা পিছিয়ে পরছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তবে সামাজিক সচেতনতা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তারা অনেকটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ আব্দুল করিম একজন সাধারণ কর্মচারি। তিনি যা বেতন পান তা দিয়ে কোন রকমে তার সংসার চলার কথা। কিন্তু ঢাকায় বদলী হওয়ার দশ বছরের মধ্যেই তিনি ঢাকায় ফ্ল্যাট বাড়ি, দামি গাড়ি এবং প্রচুর ব্যাংক ব্যালেন্সের মালিক হয়ে যান। এ নিয়ে তার সহকর্মী ও প্রতিবেশিদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়। তবে আব্দুল করিম এ নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নয়, তিনি তার মতোই চলতে থাকেন। তিনি মনে করেন অর্থ-সম্পদই সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী। প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রতিবন্ধী কী? ১

খ. গ্রিন হাউস ইফেক্ট কী? ২

গ. উদ্দীপক কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? তার কারণ নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে সমস্যা ইঙ্গিত করা হয়েছে-তা প্রতিরোধে তোমার সুপারিশ বর্ণনা কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন জীবনে যারা স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারেনা তারাই প্রতিবন্ধী।

খ গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ভূপৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ বায়ুমন্ডলীয় গ্রিন হাউস গ্যাস সমূহ দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় বায়ুমন্ডলের অভ্যন্তরে বিকিরিত হয়। এই বিকীর্ণ তাপ ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে ফিরে এসে ভূপৃষ্ঠের তথা বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

গ উদ্দীপক দুর্নীতি সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে। এটি একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। এ সমস্যা আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান।

দুর্নীতির কারণসমূহ জানতে ও উদঘাটন করতে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ চেষ্টা করছেন। তারা দুর্নীতির কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে TIB (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ) কর্তৃক চিহ্নিত দুর্নীতির কারণসমূহ হচ্ছে-

১। জবাবদিহিতার অভাব
২। ইচ্ছামাফিক ক্ষমতার ব্যবহার
৩। একচ্ছত্র ক্ষমতার ব্যবহার
৪। স্বচ্ছতার অভাব
৫। ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের প্রভাব
৬। স্বল্প বেতন
৭। সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাব
৮। আইনের শাসনের অভাব
৯। দুর্নীতি তথ্যদাতার নিরাপত্তার অভাব
১০। দেশপ্রেম, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবাব ও অবক্ষয় ইত্যাদি।

এছাড়া 'অভাব ও লোভকে' অনেকে দুর্নীতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। কারণ 'অভাব ও লোভ' অসংখ্য অপকর্মের চাবিকাঠি। অধিকাংশ মানুষ এ দুটি বিষয়ে তাড়িত হয়ে দুর্নীতি করে।

ঘ উদ্দীপকে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা প্রতিরোধে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একতার সাথে কাজ করতে হবে। এই সমস্যা সমূলে নির্মূল করা সম্ভব নয়। একে দমন বা প্রতিহত করার জন্য কিছু উপায় বা ব্যবস্থা নির্দেশ করা যেতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো-

১। সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
২। দুর্নীতির বিচারের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৩। বাক স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
৪। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৫। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
৬। অসৎ, দুর্নীতিবান কর্মচারীদের তিরস্কৃত করতে হবে, প্রয়োজনে অপসারিত করতে হবে।
৭। সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৮। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশ নিয়মিত পরীক্ষা (audit) করতে হবে।
৯। গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
১০। ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

উপর্যুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হলে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে বলে আমি মনে করি। তবে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সর্বস্তরের মানুষকে দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ ধ্রুব জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সেবা মিশনে সোয়াজিল্যান্ডে কাজ করছেন। এই দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ 'ক' রোগে আক্রান্ত। রোগটির লক্ষণ হল দ্রুত ওজন হ্রাস পাওয়া, হাল্কা জ্বর, গলা ব্যাথা, গলা ও বগলের লসিকা গ্রন্থি ফুলে ওঠা ইত্যাদি। কিন্তু রোগটি ছোঁয়াচে নয়। ধ্রুব মনে করে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ জোরদার থাকার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম।

[জাদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০]

https://teachingbd24.com

ক. সার্কের সদরদপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১
খ. ইভটিজিং বলতে কি বোঝায়? ২
গ. 'ক' বলতে কোন রোগটি বোঝানো হয়েছে-ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে এই রোগের বিস্তার সম্পর্কে ধ্রুব-এর মনোভাব কি ঠিক? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

খ ইভটিজিং বলতে কোনো নারীকে প্রকাশ্যে যেকোনো ধরনের জ্বালাতন বা পরিহাসকে নির্দেশ করে।
নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্যক্ত প্রভৃতি ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে'ক' রোগ বলতে এইডস রোগকে বোঝানো হয়েছে।
এইডস একটি ভাইরাস জনিত রোগ। HIV নামক ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের শরীরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই এইডস বলা হয়। এইডস মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্য রোগের মতোই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তির দ্রুত শরীরের ওজন হ্রাস, দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা লোপ প্রভৃতি লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। এ রোগ নিরাময়ের জন্য কোনো ওষুধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগের অপরিহার্য পরিণতি হলো মৃত্যু। তবে এটি কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ধ্রুব জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সেবা মিশনে সোয়াজিল্যান্ডে কাজ করছে। এ দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ 'ক' রোগে আক্রান্ত। রোগটির লক্ষণ হলো দ্রুত ওজন হ্রাস পাওয়া, হাল্কা জ্বর, গলা ব্যথা ইত্যাদি। এ রোগটি ছোঁয়াচে নয়। অর্থাৎ এ রোগটি হলো এইডস রোগ। কারণ এইডস রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস, স্বাস্থ্য কমে যাওয়া, স্মৃতিশক্তি হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। আর এটি ছোঁয়াচে নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক' রোগ বলতে এইডসকে বোঝানো হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, বাংলাদেশে এই রোগের বিস্তার সম্পর্কে ধ্রুবর মনোভাব ঠিক।
আমাদের দেশে HIV আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কম হওয়ার পেছনে অনুশাসন ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রধান ভূমিকা রাখছে। কারণ আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এবং তারা অনেকটা ধর্মভীরু। যার ফলে তার যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করে থাকে। ইসলাম ধর্মে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্যকোনো নারী বা পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা হারাম বা নিষিদ্ধ। কেও এই বিধান অমান্য করলে তাকে সামাজিকভাবে ধর্মীয় বিধান অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যে কারণে আমাদের দেশে এইডসের মতো প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব কম।
বর্তমান বিশ্বে নিজেদের আধুনিক ও সভ্য হিসেবে দাবি করা অনেক দেশে ধর্মীয় অনুশাসন না থাকায় এইডস রোগের বিস্তার ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের তুলনায় এইডস রোগীর সংখ্যা বহুগণ বেশি। এ সমস্ত দেশের মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন মানে না এবং তারা বিবাহবর্হিভূত একাধিক নারী-পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক রাখে। সেই সাথে সামাজিকভাবেও এ অনৈতিক সম্পর্ককে মেনে নেওয়া হয়। যার ফলে যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব দেশে ধর্মীয় অনুশাসন মানা হয় না সেসব দেশে এই রোগের আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।
আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশে ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক মূল্যবোধ জোরদার থাকার কারণে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ জনাব করিম ও রহিম 'দুর্নীতি' শীর্ষক একটি সেমিনারে আলোচনা করতে গিয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। জনাব করিম দুর্নীতির কারণসমূহের উপর একটি গঠনমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জনাব রহিম দুর্নীতির কারণে সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরেন। পরিশেষে বক্তারা দুর্নীতি প্রতিরোধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে সেমিনারের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন। *[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. দুদক-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বুঝ? ২
গ. জনাব করিম যে বিষয়ের উপর বক্তব্য দিয়েছেন তার একটি তালিকা তৈরি কর। ৩
ঘ. জনাব রহিমের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুদক-এর পূর্ণরূপ হলো দুর্নীতি দমন কমিশন।

খ খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।
খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। খাদ্যে ভেজাল বিষয়টি সাধারণত দুইভাবে সম্পন্ন হয়। যথা— অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের জনাব করিম দুর্নীতির কারণসমূহের ওপর বক্তব্য দিয়েছেন। দুর্নীতির কারণসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:
১. জবাবদিহিতার অভাব;
২. ক্ষমতার অপব্যবহার;
৩. একচ্ছত্র ক্ষমতার ব্যবহার;
৪. স্বচ্ছতার অভাব;
৫. ক্ষমতাশীলদের প্রভাব;
৬. স্বল্প বেতন;
৭. সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাব;
৮. তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনের অভাব;
৯. বাক স্বাধীনতাসহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব;
১০. আইনের শাসনের অভাব;
১১. বিচারবিভাগের স্বাধীনতার অভাব ও আইনের দুর্বলতা;
১২. দুর্নীতির তথ্যদাতার নিরাপত্তার অভাব;
১৩. সৎ কর্মচারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা এবং অসৎ কর্মচারীদের বিচার না করা;
১৪. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অভাব;
১৫. দেশপ্রেম, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব ও অবক্ষয় ইত্যাদি।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রহিম তার বক্তব্যে সমাজে দুর্নীতির প্রভাব এবং এটি প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর মতামত দিয়েছেন।
সমাজজীবনে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যে সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে সে সমাজে একে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়। মানুষের প্রতিভা বিকশিত হয় না এবং সৃজনশীলতা ক্রমে হারাতে থাকে। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা, নিয়ম-কানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যায়। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। আদর্শ ও মূল্যবোধ লোপ পায়।

https://teachingbd24.com

জবাবদিহিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি গড়ে উঠতে পারে না। আইনসভার সদস্যদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলেও দুর্নীতি হ্রাস পাবে। প্রশাসনের সকল স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতি প্রতিহত করা সম্ভব। জবাবদিহিতার পাশাপাশি দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা দরকার। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে না। এছাড়া কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন, সুষ্ঠু বেতন কাঠামো, নৈতিকতার শিক্ষাদান, ব্যাপক গণসচেতনতা দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জনাব রহিমের বক্তব্যের বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলে সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ ডাঃ সাহেনার কাছে এক মা তার প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে এলেন। শিশুটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। মা করুণ কণ্ঠে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো দিন কী তার সন্তান সুস্থ হবে না?" ডা. সাহেনা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "শিশুটিকে আদর সোহাগ ও যথাযথ চিকিৎসা দিলে এবং অন্য বাচ্চাদের সাথে মিশতে দিলে একদিন সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কোনো প্রাকৃতিক অভিশাপে আপনার নিষ্পাপ শিশু প্রতিবন্ধী হয়নি। *[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. প্রতিবন্ধী শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. ইভটিজিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রতিবন্ধী শিশু কীভাবে পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে উঠবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "প্রতিবন্ধীবন্ধিতা অভিশাপ নয়", উদ্দীপকে ডা. সাহেনার পরামর্শের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবন্ধী শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Autistic।

খ ইভটিজিং মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্ত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্যাতন নির্দেশক একটি শব্দ।

বর্তমানে ইভটিজিং বেড়ে যাওয়ার পেছনে পরিবারে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা দায়ী। এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারে শিশুর সঠিক সামাজিকীকরণের অভাব ইভটিজিং এর কারণ হিসেবে ধরা যায়। মাদকাসক্ত ও বেকার যুবকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ইভটিজিং করে। এছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইভটিজিং এর জন্যে ব্যাপকভাবে দায়ী।

গ প্রতিবন্ধীরা প্রতিবন্ধী হওয়ার জন্য নিজেরা দায়ী নয়, কেননা শারীরিক বা মানসিক পঙ্গুত্ব মানুষকে প্রতিবন্ধী করে তোলে। নানা কারণে মানুষের এ শারীরিক ও মানসিক পঙ্গুত্ব সংঘটিত হয়; যেমন- জন্মগত, ব্যাধিগত বা রোগে আক্রান্ত হয়ে, অপুষ্টি কিংবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা অজ্ঞাত কোনো কারণে। এ কারণগুলোর কোনোটির জন্যই প্রতিবন্ধীরা নিজেরা দায়ী নয়; বরং এর জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়ী করা যায়। তাই প্রতিবন্ধী সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। নিচে প্রতিবন্ধী শিশু যেভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার অপ্রতুলতা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা প্রতিবন্ধী হওয়ার মূল কারণ। এসব দূরীকরণে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়ার জন্য প্রচলিত ব্রেইল পদ্ধতির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। বাংলাদেশে একটি মাত্র ব্রেইল পদ্ধতি চালু রয়েছে। আর সম্প্রতি প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং অন্যান্য সহায়ক সেবা, যেমন- সুস্থ শিশুদের সাথে খেলাধুলার ব্যবস্থা, পাঠাগার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবহেলার পরিবর্তে উদার-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। ভালোবাসা, সহমর্মিতায় তাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। তাই তারা যেন কোনোভাবেই বিরূপ পরিবেশের শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষ হিসেবে প্রতিবন্ধীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরে পেলে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

ঘ যে দেহ ও মনের সাহায্যে মানুষ কর্মতৎপর হয়, তা যদি বিকল হয় তাহলে মানবজীবনে নেমে আসে হতাশার অমানিশা। অনেকে এ জন্য প্রতিবন্ধী জীবনকে অভিশাপগ্রস্ত বলে ভাবে। প্রতিবন্ধীরা হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এসব প্রতিবন্ধীর অনেকেই চোখ দিয়ে দেখতে পায়, স্নায়ু দ্বারা অনুভবও করতে পারে; কিন্তু তা উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করতে পারে না। কোনো সৃজনশীল চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। ধীরে ধীরে তারা আরও মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। তারা সারাটা জীবন অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে। প্রতিবন্ধীরা আমাদেরই কারও ভাই, কারও বোন বা কারও সন্তান। তারা আমাদেরই আপনজন। তাই প্রতিবন্ধিত্বকে আল্লাহর অভিশাপ, গজব বা আল্লাহ প্রদত্ত মনে না করে এর চিকিৎসা, প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানুষের অতিরিক্ত জ্বর, দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে অঙ্গহানি হতেই পারে। কিন্তু এসব কারণকে যখন বলা হয় আল্লাহর অভিশাপ, গজব- তখন এই ব্যাপারটি হয় অত্যন্ত দুঃখজনক। তাই প্রতিবন্ধিত্ব অভিশাপ বা আল্লাহর গজব নয়- কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ মি. এম অবাধ যৌন সম্পর্কে বিশ্বাসী, দীর্ঘদিন এই সম্পর্কের কারণে এখন তিনি এইডস রোগে আক্রান্ত। এখন তার শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. AIDS- এর ভাইরাসের নাম কী? ১

খ. বিনোদনের ব্যবস্থা ইভটিজিং প্রতিরোধ করে কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে মি. এম- এর রোগের কারণ কোন কোন লক্ষণ দেখা যাবে? চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. এম যে রোগে আক্রান্ত, সে রোগ কীভাবে ছড়ায়? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS-এর ভাইরাসের নাম হলো HIV (Human Immuedeficiency Virus)।

খ সুস্থ বিনোদন ইভটিজিং প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সমাজে ইভটিজিং বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো অসুস্থ, অস্বাভাবিক এবং অশ্লীল বিনোদন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে এগুলো হয়ে থাকে। তাই দেশের যুব সমাজকে বিদেশি সংস্কৃতির অশ্লীল বিনোদনের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত করে দেশীয় স্বাভাবিক এবং সুস্থ বিনোদনে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ সম্ভব বলে আমি মনে করি।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের মি. এম এইডস রোগে আক্রান্ত এবং এরোগে আক্রান্ত হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা লক্ষণ দেখা দেবে।

HIV নামক ভাইরাসের আক্রমণে একটি মানুষের শরীরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই এইডস বলা হয়। HIV ভাইরাসের আক্রমণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় বলে শরীরে অন্য যেকোনো রোগের জীবাণু সহজেই আক্রমণ করতে পারে। ফলে যেকোনো মারাত্মক রোগ, প্রাণঘাতী ক্ষত কিংবা ক্যান্সার হতে পারে এবং রোগী নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করে।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্য রোগের মতোই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পায় এবং অত্যধিক দুর্বলতা অনুভব করে। এ রোগীর দীর্ঘদিন ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে এবং ওষুধ খেলেও তেমন একটা কাজ হয় না। এরোগে আক্রান্ত হলে স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পায়। হজমশক্তি কমে যায় এবং পেটের নানারকম পীড়ায় ভোগে। আক্রান্ত ব্যক্তির শুকনা কাশি হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে মি. এম এইডস রোগে আক্রান্ত এবং এ রোগ HIV ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়। আর HIV ছড়ানোর অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে।

এইডস মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এইডস রোগের পেছনে বেশকিছু কারণ সক্রিয় ভূমিকা রাখে। যেকোনো ব্যক্তির শরীরে নানা পন্থায় এইচআইভি ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে। সাধারণত যেসব কারণে এইডস রোগ হতে পারে সেগুলো হলো- অনিরাপদ যৌন মিলন, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, আক্রান্ত মায়ের গর্ভাবস্থায় এবং মাতৃদুগ্ধ গ্রহণ, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি।

উল্লিখিত কারণে যেকোনো ব্যক্তি সহজেই এইডস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর পাশাপাশি উক্ত কারণগুলোর বিপরীতে সচেতনতার অভাবেও এইডস রোগ ছড়াতে পারে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ঘটলেই এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। তবে এইডস কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। উপরিউক্ত কারণগুলোই এইডসের উদ্ভব ঘটায়। এসব কারণগুলো বিদ্যমান থাকার ফলেই সমাজে এইডস এর বিস্তার ঘটছে।

প্রশ্ন ▶৪৭ রুমা দ্বাদশ শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্রী। সে কলেজে যাওয়ার পথে কয়েকজন বখাটে যুবক তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করে। রুমা এর প্রতিবাদ করলে রনি এসিড মারার হুমকি দেয়। সাহসী রুমা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিষয়টি অবহিত করেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ত্বরিত পদক্ষেপে ছাত্রীটির নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ৪]

ক. 'OIC' এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দুর্নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রনিসহ অন্যান্য বখাটে যুবকদের আচরণকে তুমি কী নামে আখ্যায়িত করবে এবং কেন? ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উল্লিখিত 'নিরাপত্তা' নারী শিক্ষার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে? ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'OIC'-এর পূর্ণরূপ হলো Organization of Islamic Co-operation.

খ দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করাকে বোঝায়।

রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে ঠকিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা বা চাওয়া পূর্ণ করা হলে তাকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মোটকথা, নীতি বিচ্যুত হয়ে যেকোন কাজ করাই হলো দুর্নীতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রনিসহ অন্যান্য বখাটে যুবকদের আচরণকে আমি ইভটিজিং নামে আখ্যায়িত করব।

ইভটিজিং বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক অসুস্থতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'ইভ' বলতে বোঝায় রমণী বা নারী, 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। খুব সহজেই অনুমেয় যে, ইভটিজিং হচ্ছে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারীর উত্যক্ত বা বিরক্তির শিকার হওয়া। আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে, পুরুষ কর্তৃক নারীদের দেখলে বাজে মন্তব্য, কুপ্রস্তাব, অশ্লীল কথা বলা, অপ্রীতিকর অঙ্গভঙ্গি করা, শারীরিক লাঞ্ছনা, শিস দেওয়া, সুযোগে গায়ে পড়ে ধাক্কা দেওয়া, পেছনে পেছনে অকারণে অনুসরণ করে হাঁটা, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, মোবাইল ফোনে বিরক্ত করা, কাগজে অশ্লীল কথা লিখে মেয়েদের দিকে নিক্ষেপ করা, পথরোধ করা এবং বাজে গান গেয়ে মেয়েদের উত্যক্ত প্রভৃতি নেতিবাচক আচরণকেই ইভটিজিং বলা হয়। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে, দেশের শতকরা ৬২ জন স্কুলগামী মেয়ে ইভটিজিং-এর শিকার হয়। ইভটিজিং-এর ফলে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে মেয়েদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত 'নিরাপত্তা' নারী শিক্ষার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

উদ্দীপকের রুমা বখাটে যুবকদের দ্বারা উত্যক্তের শিকার হলে সে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তড়িৎ পদক্ষেপে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পদক্ষেপ না নিতো তাহলে হয়তো রুমার কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত, পড়াশোনার সমাপ্তি ঘটত।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে ইভটিজিং একটি অন্যতম কারণ। এর কারণে অভিভাবকরা কন্যা শিশুদের পড়াশোনা শেষ না করিয়েই অনেক সময় বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউএন উইমেন-এর এক জরিপের ফলাফলে দেখায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বাংলাদেশের ৭৬ জন ছাত্রীই কোনো না কোনোভাবে ইভটিজিং-এর শিকার হন। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে ১৪ জনে একজন করে নারী কোনো না কোনোভাবে ইভটিজিং-এর শিকার হচ্ছে। ফলে অনেক নারী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ পরিবেশের অভাবে তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ইভটিজিং-এর বিরুদ্ধে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নারীর প্রতি এ নিপীড়নের প্রতিকার হবে; নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি সর্বক্ষেত্রে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

প্রশ্ন ▶৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইনস্টিটিউটের শিক্ষা বিভাগের ছাত্রী মীম। সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। সে প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়েছে নিজের প্রচেষ্টায় এবং পরিবারের সকলের সহযোগীতায় উচ্চ শিক্ষায় মীম একজন স্বাবলম্বী। *[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. প্রতিবন্ধকতা কত প্রকার? ১

খ. প্রতিবন্ধীরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপাকে মীম কি ভাবে সফলতার দারপ্রান্তে পৌঁছেছে? ৩

ঘ. প্রতিবন্ধীরা করুনার পাত্র নয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবন্ধকতা তিন প্রকার।

খ প্রতিবন্ধীরা দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাদের জীবনের প্রতিটি পদে পদে বাধা আসে। এই সুন্দর পৃথিবীতে তারা অনেকটা অসহায়। তাদের জীবনের চারপাশে থাকে হতাশা, অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। তারা শুধু শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু নয়, অর্থনৈতিকভাবেও পঙ্গু। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারিভাবে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মারাত্মক সমস্যা তৈরি করছে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের মীম নিজের প্রচেষ্টা এবং পরিবারসহ সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে নিজের প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

প্রতিবন্ধিতা একজন মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে। কিন্তু যদি উপযুক্ত সহায়তা ও একান্ত প্রচেষ্টা থাকে তবে একজন প্রতিবন্ধীর পক্ষে সব ধরনের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। প্রতিবন্ধীদের কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে যেহেতু সীমাবদ্ধতা থাকে তাই কেবল নিজের প্রচেষ্টায় এ বাধা পেরোনো সম্ভব হয় না। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পারিবারিক সহযোগিতা।

পরিবার থেকে উপযুক্ত সহায়তা পেলে একজন প্রতিবন্ধী নিজের সীমাবন্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে খুব সহজেই। এছাড়া বিদ্যালয় ও সামাজিক সহযোগিতাও তার জন্য একান্ত প্রয়োজন। উদ্দীপকের মীম একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়েও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। তার এ সফলতার পেছনেও রয়েছে অনুরূপ সহযোগিতা এবং নিজের একান্ত প্রচেষ্টা।

ঘ প্রতিবন্ধীরা করুণার পাত্র নয়- কথাটি যথার্থ।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের মতোই মানুষ। তাদের অন্যান্য সব যোগ্যতা থাকলেও কেবল কোনো একটি বিশেষ সীমাবন্ধতার জন্য প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থার জন্য তারা নিজেরা কোনোভাবেই দায়ী নয়। তাদেরও রয়েছে অন্যান্য সবার মতো বেঁচে থাকার অধিকার। আমরা যারা সুস্থ স্বাভাবিক, প্রতিবন্ধীদেরকে সহায়তা করা তাদের দায়িত্ব। এটি তাদের প্রতি আমাদের করুণা নয়, আমাদের দায়িত্ব। কেননা যদি উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তবে তারাও তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারে। প্রতিবন্ধী হয়েও এভারেস্ট জয় করতে পারে।

প্রতিবন্ধীরা মীম-এর মতো সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী হতে পারে। তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা যদি যথাযথভাবে পালন করা হয়, তবে তারা তাদের নিজেদের যোগ্যতা প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে। কোনোভাবেই তাদেরকে অবহেলা করা যাবে না। কেননা তারাও আমাদের মতো মানুষ এবং তাদেরও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ উপকূলীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ মৎস্য ও লবণ চাষের সাথে সম্পৃক্ত। তবে সম্প্রতি সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি ও অতি লবণাক্ততার কারণে মৎস্য ও লবণ চাষ বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের পূর্বতন পেশা হুমকীর মুখে পড়েছে।

[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. গ্রীন হাউস গ্যাস কী? ১

খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জলবায়ুর পরিবর্তনের কোন কারণে উক্ত অঞ্চলের মানুষের পেশা হুমকী সম্মুখীন হচ্ছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে কী কী সুপারিশ তুমি করবে? আলোচনা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ুমন্ডলে যেসব গ্যাস যেমন- কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি সূর্যের তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে, সেসব গ্যাসকে গ্রীন হাউস গ্যাস বলে।

খ সৃজনশীল ১০ নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনের মূলত গ্রীন হাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর মারাত্মক প্রভাব জলবায়ু-সংক্রান্ত দূর্যোগের মাত্রা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে উক্ত অঞ্চল অর্থাৎ উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের পেশা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে সমুদ্রের পানি ঢুকে গাছপালা, মৎস্যখামার ও শস্যক্ষেতের ক্ষতি হচ্ছে। কৃষি জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। সর্বোপরি এর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর। উদ্দীপকেও এমনটি দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ মৎস্য ও লবণ চাষের সাথে সম্পৃক্ত। সম্প্রতি সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি ও অতি লবণাক্ততার কারণে মৎস্য ও লবণ চাষ বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের পেশা হুমকির মুখে পড়েছে। এ সবকিছু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব। তাই বলা যায়, উক্ত অঞ্চলের মানুষের পেশা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে হুমকির মধ্যে পড়েছে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যা অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে আমি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো গ্রহণ করতে বলব -

বনভূমি রক্ষা : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে গাছপালা। তাই নির্বিচারে যাতে বনভূমি ধ্বংস করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সারা দেশব্যাপী বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। উপকূল ও নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধি করতে হবে।

গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন রোধ : গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ নির্গমন রোধ করতে হবে। শিল্পকারখানা, ইটভাটা ইত্যাদির ধোঁয়া যতদূর সম্ভব পরিবেশবান্ধব করার জন্য শোধন করে পরিবেশে অবমুক্ত করতে হবে। জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রশ্ন ▶ ৫০ বাবা-মার খুব ভালো বোঝাপড়া নেই রাসেলের। বেসরকারি একটি কলেজের বালক শাখার ছাত্র সে। ওর বন্ধুরা প্রায়ই ক্লাস শুরুর অনেক আগেই কলেজের গেটে এসে দাড়িয়ে থাকে। বালিকা শাখা ছুটি হলে সমবয়সী বা বয়সে খানিকটা ছোট মেয়েদের নানাভাবে উত্যক্ত করে ওরা। বন্ধুদের সাথে থেকে সেও এ কাজে জড়িয়ে পড়ে। একদিন পরিবারের কাছে ওর নামে এ ব্যাপারে নালিশ করে এক ছাত্রীর অভিভাবক। লজ্জায় নির্বাক হয়ে যান রাসেলের বাবা-মা।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী কতজন? ১

খ. দুর্নীতির মুল কারণগুলো কী? ২

গ. রাসেল কোন কাজে জড়িয়ে পড়েছে? উক্ত কাজে তার জড়িয়ে পড়ার কারণগুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাসেলের মতো তরুণদের সৎ পথে পরিচালিত করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়? ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী ছিল ৩৫ জন।

খ দুর্নীতির অনেক কারণ রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো:

১. অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা।
২. সামাজিক প্রভাব একং মর্যাদা বৃদ্ধির ইচ্ছা।
৩. উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ।
৪. অসৎ কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সহায়তা।
৫. দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব।

গ উদ্দীপকের রাসেল যে কাজে জড়িয়ে পড়েছে সেটি হলো ইভটিজিং। তার ইভটিজিং-এ জড়িয়ে পড়ার কারণগুলো নিচে আলোকপাত করা হলো—

https://teachingbd24.com

বর্তমান সময়ে নারী নির্যাতনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ইভটিজিং। এটি নৈতিকতার চরম অবক্ষয় এবং সামাজিক বিপর্যয়। নৈতিক শিক্ষার অভাব, নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রভৃতি কারণে এ সমস্যাটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বস্তুত, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিকাশের অভাব যৌন হয়রানির মতো অপরাধকে উদ্বুদ্ধ করে। তথাকথিত অত্যাধুনিক বিশ্ব আর বিশ্বায়নের সাথে আমরা একাত্মতা প্রকাশ করে ভিনদেশি সংস্কৃতির অবাধ গলাধঃকরণ নিশ্চিত করেছি। দিনশেষে দেখা যাচ্ছে, আমাদের অপ্রস্তুত তরুন সমাজে তার বদহজম শুরু হয়েছে। ভালো-মন্দের পরিশোধন করতে না পেরে তারা সবই অবাধে গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় বেড়ে উঠছে দূষিত মনোবৃত্তি নিয়ে। এছাড়া ইভটিজিং -এর সাথে জড়িয়ে পড়ার আরো কারণ আছে। সেগুলো_

* পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, পরিবার কাঠামো ও সাংস্কৃতি।
* পারিবারিক অস্থিরতা তথা নিরাপত্তাহীন পারিবারিক পরিস্থিতি।
* সন্তানের বেড়ে ওঠা তথা সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিতামাতার উদাসীনতা।
* পরিবারে ছেলেমেয়ের মাঝে বৈষম্য
* পিতামাতার বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক।
* নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।
* দারিদ্র্য, মাদকাসক্তি ও অপসংস্কৃতির চর্চা।
* ইভটিজিং বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার অভাব।
* আইনের কঠোর প্রয়োগের অভাব।
* প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।
* মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

ঘ উদ্দীপকের রাসেলের মতো তরুণদের সৎ পথে পরিচালিত করতে সে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হলো-

ইভটিজিং বন্ধে পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে সচেতন করতে পারে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ভূমিকা রাখতে পারেন; কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীগণ ভূমিকা রাখতে পারেন; রাস্তাঘাটে চলাচলকারী যেকোনো নাগরিক এটা বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন; আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিটি সদস্য সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়া—

পরিবারিকভাবে শিশুকাল থেকে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক পরিস্কারভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। পরিবারে নারী সদস্যদের প্রতি পুরুষ সদস্যদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মর্যাদা দান, কটু ও অশ্লীল কথা না বলা, গালি-গালাজ না করা এবং অল্প বয়সি সদস্যদেরও তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেয়া উচিত। পরিবারের সুষ্ঠু শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষকে উত্ত্যক্ত করা থেকে রক্ষা করতে পারে। উত্ত্যক্ত করা একটি নিম্নমানের ও গর্হিত কাজ, এমনকি আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ বিষয়ে সন্তানদের অবহিত করা। সামাজিকভাবে ইভটিজিং প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শ্রেণিকক্ষে এ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এর নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরা। ইভটিজিং-এ উৎসাহিত হয় এমন ধরনের বক্তব্য, বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে প্রচার না করতে কঠোরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সচেতন ও কার্যকর করা। সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে উদ্দীপকের রাসেলের মতো তরুণদের সৎ পথে পরিচালিত করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৫১ ফারদিন টিভিতে একটি সংবাদ দেখছে। সংবাদের একটি দৃশ্য তার খুব ভাল লেগেছে। ঐ সংবাদে দেখানো হয়েছে সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শেষে ফারদিন বলে যে, এর সাথে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। *[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. ফরমালিন কী? ১

খ. খাদ্যে ভেজালের দুটি ধরণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে টিভিতে ফারদিনের দেখা সংবাদের দৃশ্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে কোন উদ্যোগের প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফারদিনের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফারমালিন হলো মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য।

খ খাদ্যে ভেজাল সাধারণত দুই ভাবে সম্পন্ন হয়-

১. অসাবধানতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত : এটি সাধারণত জ্ঞান ও দায়িত্ব সচেতনতার অভাবে হয়ে থাকে। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো- ফসলে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে অধিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করা। এতে অনেক সময় উৎপাদিত ফসল ভেজালযুক্ত হয়ে যেতে পারে।

২. ইচ্ছাকৃত : অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যের সাথে নিম্নমানের খাবার বা রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো হয়। এই ভেজালটি সবচেয়ে ক্ষতিকারক।

গ উদ্দীপকে টিভিতে ফারদিনের দেখা সংবাদের দৃশ্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে আইনগত উদ্যোগের প্রতিফলন দেখা যায়।

খাদ্যে ভেজাল একটি সামাজিক অপরাধ। এটি মানবস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এজন্য বাংলাদেশে সরকার খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে বিএসটিআই (সংশোধিত) আইন-২০০৩, বিশুদ্ধ খাদ্য (সংশোধিত) আইন-২০০৫, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন-২০০৯, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা প্রভৃতি। এমনটি উদ্দীপকেও লক্ষ্যণীয়।

উদ্দীপকে ফারদিন টিভিতে একটি সংবাদ দেখছে ও এর একটি দৃশ্য তার ভালো লাগে। এ সংবাদে দেখানো হয়েছে, সরকার ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে সরকারের একটি আইনগত উদ্যোগ। তাই বলা যায়, ফারদিনের দেখা সংবাদের দৃশ্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে আইনগত প্রতিকারের প্রতিফলন দেখা যায়।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে ফারদিনের মন্তব্য অর্থাৎ 'খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে সরকারের সাথে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে'- এটির সাথে একমত পোষণ করছি।

খাদ্যে ভেজাল মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এটি নিয়ন্ত্রণে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদেরও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনেক সময় জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে ফসলের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহৃত হয়। এতে উৎপাদিত ফলস ভেজালযুক্ত হয়ে যেতে পারে। তাই কীটনাশকের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। অনেক ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যের সাথে নিম্নমানের খাদ্য মেশায়। এছাড়া মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, কীটনাশক বা বিষাক্ত রং মেশায়। যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। ব্যবসায়ীরা যদি মুনাফালোভী না হয়ে নিজেদের এসব কাজ থেকে দূরে রাখেন, তাহলে খাদ্যে ভেজাল অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ভোক্তাদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ব্যবসায়ীদের মূল্যবোধ জাগ্রত করে খাদ্যে ভেজাল অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

https://teachingbd24.com

দশম অধ্যায়: নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

★★ বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী : প্রতিবন্ধী

১. 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী' কারা? [জ্ঞান]
ক শিশুরা
খ প্রতিবন্ধীরা
গ সাধারণ মানুষেরা
ঘ এইডস আক্রান্তরা
খ

২. কোন সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৭ মিলিয়ন মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী? *[দি. বো.; রা. বো. '১৫]*
ক জাতিসংঘ খ ইউনিসেফ
গ ইউনেস্কো
ঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
ক

৩. বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয় কেন? [অনুধাবন]
ক বিশ্বে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য
খ বিশ্বে সামাজিক উন্নয়নের জন্য
গ বিশ্বে রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য
ঘ বিশ্বে সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য
ক

৪. অনুন্নত দেশসমূহের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কীরূপ জীবন যাপন করে? [অনুধাবন]
ক উন্নত খ পরাশ্রয়ী
গ স্বাধীন ঘ স্বাভাবিক
খ

৫. অটিজম কী? [জ্ঞান]
ক হাত বা পা ত্রুটিপূর্ণ হওয়া
খ বাইপোলার ডিজঅর্ডার
গ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশে জটিল প্রতিবন্ধকতা
ঘ আংশিক দৃষ্টিহীনতা
গ

৬. 'Low vision' অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক দৃষ্টিহীনতা খ ক্ষীণদৃষ্টি
গ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা ঘ আংশিক দৃষ্টিহীনতা
খ

৭. শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা কত প্রকার? [জ্ঞান]
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৫ প্রকার ঘ ৬ প্রকার
খ

৮. সেরিব্রাল পালসির বৈশিষ্ট্যসমূহ কয়টি? [জ্ঞান]
ক ৫টি খ ৭টি
গ ৯টি ঘ ১১টি
খ

৯. বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে— [অনুধাবন]
i. যারা একেবারেই কথা বলতে পারে না
ii. কণ্ঠনালী বা গলার স্বরে সমস্যা
iii. ক্ষীণ দৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ময়না একজন প্রতিবন্ধী মেয়ে। সবসময় তাকে ঘরে আটকে রাখে বাবা-মা। একদিন সকালে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর পরিত্যক্ত একটি জায়গায় তার লাশ দেখতে পাওয়া যায়।

১০. উদ্দীপকে ময়নার প্রতি তার পরিবারের আচরণ কীরূপ ছিল? [প্রয়োগ]
ক সচেতন খ উদাসীন
গ বৈষম্যহীন ঘ নিরাপত্তাপূর্ণ
খ

১১. সামাজিকভাবে সচেতন হলে ময়নার মতো মেয়েরা যে সকল সুবিধা পাবে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. নিরাপত্তা
ii. কুসংস্কার থেকে মুক্তি
iii. সেবা ও সহযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

★★ দুর্নীতি

১২. দুর্নীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— [জ্ঞান]
ক Corruptus খ Corruption
গ Coreption ঘ Correction
খ

১৩. দুর্নীতি কী? [জ্ঞান]
ক শারীরিক ব্যাধি খ উপার্জনের উপায়
গ সামাজিক অধিকার ঘ সামাজিক ব্যাধি
ঘ

১৪. দ্রব্যমূল্যের সাথে কোনটি সম্পর্কযুক্ত? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক জীবনমান খ দুর্নীতি
গ ভেজাল ঘ অস্থিরতা
খ

১৫. ভারতের কোন কমিটি ঘুষকে স্পিড মানি হিসেবে উল্লেখ করেছে? *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, কিলগাঁও, ঢাকা]*
ক শান্তারাম কমিটি খ সুনাগরিক কমিটি
গ সচেতন কমিটি ঘ জনফোরাম কমিটি
ক

১৬. অবৈধ পন্থায় জনস্বার্থবিরোধী কাজকে কী বলে? *[মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, মানিকগঞ্জ]*
ক স্বজনপ্রীতি খ চতুরতা
গ দুর্নীতি ঘ প্রতারণা
গ

১৭. দুর্নীতি নির্মূলের কার্যকর পদক্ষেপ কোনটি? *[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী লাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
ক পারিবারিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা
খ দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেওয়া
গ কঠোর আইন প্রণয়ন করা
ঘ আইনের শাসন প্রণয়ন
গ

১৮. কীসের অভাবে দুর্নীতি জন্ম নেয়? [জ্ঞান]
ক নিরপেক্ষতা
খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
গ সুশাসন ঘ দায়িত্বশীল সরকার
গ

১৯. স্বপ্নীল স্কুল অফিসে প্রশংসাপত্র আনতে গেলে কেরানি তার কাছে ২০০ টাকা দাবি করল। কেরানির আবদারটি কীসের মধ্যে পড়ে? [প্রয়োগ]
ক দুর্নীতি খ ন্যায়সঙ্গত
গ স্বাভাবিক ঘ বাধ্যবাধকতা
ক

২০. দুর্নীতির কাজে কীসের প্রয়োজন বেশি? [অনুধাবন]
ক মেধা খ মননশীলতা
গ ধূর্ত বুদ্ধি ঘ সৃজনশীলতা
গ

২১. প্রধান কর্তার টেবিলে দীর্ঘদিন কোনো কারণে ফাইল আটকা থাকলে কে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ করে? [অনুধাবন]
ক প্রধানকর্তা খ পদস্থ কর্মকর্তা
গ অধস্তন কর্মচারী ঘ পরিচালক
গ

Teachingbd.com

২২. যুবসমাজ কীসের প্রত্যাশায় বিপুল পরিমাণ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়? [অনুধাবন]
ক কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধির প্রত্যাশায়
খ বিদেশ যাওয়ার প্রত্যাশায়
গ চাকরির প্রত্যাশায়
ঘ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রত্যাশায় **গ**

২৩. সামাজিক অস্থিরতা কীসের জন্ম দেয়? [অনুধাবন]
ক বেকারত্ব খ যৌতুকপ্রথা
গ দুর্নীতি ঘ মূল্যবোধের **গ**

২৪. কোনটি বাংলাদেশে লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে? [অনুধাবন]
ক দুর্নীতি খ নৈরাজ্য
গ দ্রব্যমূল্য ঘ অস্থিরতা **গ**

২৫. দুর্নীতি নির্মূলের কার্যকর পদক্ষেপ কোনটি? [অনুধাবন]
ক পারিবারিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা
খ দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেওয়া
গ কঠোর আইন প্রণয়ন
ঘ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা **ক**

২৬. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রধান শর্ত হলো– *[রা. বো. '১৫]*
i. স্বচ্ছতা ii. জবাবদিহিতা
iii. দক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৭. দুর্নীতিবাজ লোকদের চিহ্নিত করে– [অনুধাবন]
i. অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হবে
ii. শাস্তি দিতে হবে
iii. তিরস্কার করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৮. কর্মকর্তারা দুর্নীতিবাজে পরিণত হয়— [অনুধাবন]
i. বিলাসী জীবনের প্রত্যাশায়
ii. উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশা থেকে
iii. অল্প সময়ে ধনী হওয়ার প্রত্যাশায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব 'ক' একজন চাকরিজীবী। ইদানীং তার আয় বেড়ে গেছে। তিনি শহরে একটি বাড়ি ও একটি আধুনিক গাড়ি ক্রয় করেছেন। তার ব্যয় চাকরি হতে প্রাপ্ত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন। *[কু. বো. '১৫]*

২৯. জনাব 'ক' উক্ত ব্যয় নির্বাহ করেন কীসের মাধ্যমে? [প্রয়োগ]
ক বেতনের মাধ্যমে
খ অন্যান্য ব্যবসার মাধ্যমে
গ অতিরিক্ত কাজের মাধ্যমে
ঘ দুর্নীতির মাধ্যমে **ঘ**

৩০. জনাব 'ক'-র উক্ত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. পরিবারের ii. সমাজের
iii. রাষ্ট্রের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ ii ও iii **গ**

★ খাদ্যে ভেজাল

৩১. নিয়মিত ফরমালিনযুক্ত খাবার খেলে কোন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়? [প্রয়োগ]
ক পঙ্গুত্ব খ জলবসন্ত
গ ক্যান্সার ঘ টাইফয়েড **গ**

৩২. খাদ্যে ভেজাল কোন ধরনের অপরাধ? *[আদমজী গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক সামাজিক খ রাজনৈতিক
গ অর্থনৈতিক ঘ সাংস্কৃতিক **ক**

৩৩. খাদ্যে ভেজাল কী? [জ্ঞান]
ক উৎকৃষ্ট দ্রব্যের গুণগত মান যাচাই না করা
খ উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের মিশ্রণ
গ মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য
ঘ নষ্ট খাদ্যদ্রব্য **খ**

৩৪. মুড়িতে কোন রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়? [জ্ঞান]
ক হাইড্রোজেন খ পিসিবি তৈল
গ কাঠের গুঁড়া ঘ ধানের কুড়া **ক**

৩৫. বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার রক্ষায় কোন সংস্থাটি কাজ করছে? [জ্ঞান]
ক কনজুমার এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
খ ভোক্তা অধিকার ফোরাম
গ খাদ্য পরীক্ষা কেন্দ্র ঘ বি.এস.টি.আই **ক**

৩৬. বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(১) নং অনুচ্ছেদে কোনটি সম্পর্কে বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক খাদ্য দ্রব্য সম্পর্কে
খ মৌলিক অধিকার সম্পর্কে
গ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে ঘ শিক্ষানীতি সম্পর্কে **গ**

৩৭. কয়ভাবে খাদ্যে ভেজাল সম্পন্ন হয়? [জ্ঞান]
ক ১ ভাবে খ ২ ভাবে
গ ৩ ভাবে ঘ ৪ ভাবে **খ**

৩৮. খাদ্য ভেজালরোধে করণীয়- *[ব. বো. '১৫]*
i. আইনের যথাযথ প্রয়োগ
ii. খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা
iii. ভেজাল প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৯. খাদ্যে ভেজাল মিশানো বলতে বোঝায় খাদ্যের সাথে— [অনুধাবন] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
i. নিম্নমানের খাদ্য মিশানো
ii. ফরমালিন মিশানো
iii. রঙ মিশানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪০. খাদ্যে ভেজালের কারণ— [অনুধাবন]
i. অধিক মুনাফার লোভ
ii. যথার্থ শিক্ষার অভাব
iii. নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

৪১. খাদ্যে ভেজাল মেশানোর সর্বোচ্চ শাস্তি হলো— [অনুধাবন]
i. ১০ বছরের কারাদণ্ড
ii. ১৪ বছরের কারাদণ্ড
iii. ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
জনাব রহিম উদ্দিন কাজী বাজার থেকে কিছু গুঁড়ো মসলা কিনলেন। নতুন অতিথিদের জন্য বড় বড় মাছ ও খাসির মাংস রান্না করলেন। মেহমানদের নিয়ে খেতে বসে লজ্জায় তার চেহারা কালো হয়ে গেল। কয়েকদিন পর তিনি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন গুঁড়ো মসলার সাথে কোম্পানিগুলো বিভিন্ন রং, ইটের গুঁড়ো ইত্যাদি মিক্সড করে বাজারজাত করছে।

৪২. উদ্দীপকের সাথে নিম্নের কোনটির মিল রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক খাদ্যে ভেজাল মিশানো
খ ওজনে কম দেওয়া
গ জনগণের স্বাস্থ্যসম্মত করে তৈরি করা
ঘ পরিশুদ্ধকরণ **ক**

৪৩. ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. জনস্বার্থ রক্ষা
ii. জনসচেতনতা সৃষ্টি
iii. কোম্পানিগুলোর অবৈধ কাজের মুখোশ উন্মোচন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ ইভটিজিং তথা যৌন হয়রানির ধারণা

৪৪. আন্তর্জাতিক নারী দিবস কোনটি? [জ্ঞান]
ক ৮ মার্চ খ ২৬ মার্চ
গ ২৮ মার্চ ঘ ১৮ মার্চ **ক**

৪৫. কবে হাইকোর্ট ইভটিজিংকে যৌন হয়রানি শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করে আইনের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করে? [জ্ঞান]
ক ১ নভেম্বর ২০১০ খ ২ নভেম্বর ২০১০
গ ২৬ জানুয়ারি ২০১১
ঘ ২৭ জানুয়ারি ২০১১ **গ**

৪৬. ইভটিজিং শব্দটির আভিধানিক রূপ কী? [জ্ঞান] *[ঢাকা কলেজ, ঢাকা]*
ক অত্যাচার করা খ উত্ত্যক্ত করা
গ নির্যাতন করা ঘ পরিহাস করা **খ**

৪৭. নারীরা ইভটিজিং-এর শিকার হন কেন? *[চ. বো. '১৫]*
ক সু-শিক্ষার অভাবে
খ সামাজিক স্থিতিশীলতার অভাবে
গ সংস্কৃতির প্রভাবে
ঘ নগরায়ণের প্রভাবে **ক**

৪৮. বর্তমানে ইভ শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক সমগ্র নারী জাতি খ অসাম্প্রদায়িক নারী
গ উগ্রবাদী নারী ঘ সংক্রান্ত নারী **ক**

৪৯. ইভটিজিং শব্দটি কত সালে প্রথম মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৬০ সালে খ ১৯৬৫ সালে
গ ১৯৭০ সালে ঘ ১৯৭৫ সালে **ক**

৫০. ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয়— [অনুধাবন]
i. পারিবারিকভাবে সন্তানকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া
ii. যৌন হয়রানিকারকদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান
iii. নারী-পুরুষের বৈষম্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫১. নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কোন সংস্থা কাজ করছে? *[রা. বো. '১৫]*
i. ইউনিয়ন পরিষদ
ii. উপজেলা পরিষদ
iii. বেসরকারি সংস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫২. ইভটিজিং প্রতিরোধে যেটা করা যেতে পারে— *[দি. বো. '১৫; রা. বো. '১৫]*
i. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
ii. আইনের কঠোর প্রয়োগ
iii. নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা

৫৩. জলবায়ু পরিবর্তন এখন একটি— *[ব. বো. '১৫]*
ক আঞ্চলিক সমস্যা খ বৈশ্বিক সমস্যা
গ জাতীয় সমস্যা ঘ স্থানীয় সমস্যা **খ**

৫৪. কারা হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলনের পিছনে পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুতহারে বাড়ার প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেন? [জ্ঞান]
ক পরিবেশবিদরা খ বিজ্ঞানীরা
গ সমাজবিদরা ঘ মহাকাশবিদরা **খ**

৫৫. গ্রিনহাউজ ইফেক্ট ছাড়া পৃথিবী কত ডিগ্রি শীতল থাকতো? [জ্ঞান]
ক ৩৫° খ ৩১°
গ ৩৩° ঘ ৪৩° **গ**

৫৬. সারা পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ কী? [জ্ঞান]
ক গাছ কেটে ফেলা খ খরা
গ উষ্ণতা ঘ গ্রিনহাউস গ্যাস **ঘ**

৫৭. একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা কতভাগ বনভূমি থাকা দরকার? [অনুধাবন]
ক ৩০ খ ২৫
গ ২০ ঘ ১৬ **খ**

৫৮. ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর সংঘটিত দুর্যোগটির নাম কী? [জ্ঞান]
ক আইলা খ নার্গিস
গ সিডর ঘ সুনামি **গ**

৫৯. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হলো— *[চ. বো. '১৫]*
i. গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি
ii. সুপেয় পানির পর্যাপ্ততা
iii. ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

http://teachingbd.com

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সম্প্রতি একদল গবেষক এন্টার্কটিকা মহাদেশে দেখতে পান বরফ গলার পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই ঘটনায় তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এই হতে উত্তরণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। *[ব. বো. '১৫]*

৬০. উপরোল্লিখিত ঘটনার ফলে বাংলাদেশের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে?
ক মরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে
খ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পাবে
গ ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে
ঘ নিম্নাঞ্চল নিমজ্জিত হবে **ঘ**

৬১. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা প্রতিরোধে নাগরিকের করণীয় হলো—
i. গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে হবে
ii. বনায়ন বৃদ্ধি করতে হবে
iii. নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ এইডসের ধারণা ও লক্ষণ

৬২. এইডস প্রতিরোধের উপায় কী? *[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ন্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*
ক প্রতিরোধক ইনজেকশন ব্যবহার করা
খ আচরণে সমাজ নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলা
গ এইডস রোগীর সংস্পর্শে না যাওয়া
ঘ বিদেশ যাওয়া বন্ধ করা **খ**

৬৩. বর্তমানে কতজন লোক প্রতিদিন AIDS-এ আক্রান্ত হচ্ছেন? [জ্ঞান]
ক ১৪,০০০ খ ১০,০০০
গ ৮,০০০ ঘ ২১,০০০ **ক**

৬৪. কোন মাধ্যমে HIV-এর ঘনত্ব অত্যন্ত কম? [অনুধাবন]
ক বীর্য খ যোনিরস
গ মূত্র ঘ স্তনের দুধ **গ**

৬৫. ২০০২ সালে কোন প্রতিষ্ঠান AIDS এর ওপর একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে? [জ্ঞান]
ক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় খ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গ ইউনিসেফ ঘ বিবিএস **ক**

৬৬. বিশ্ব এইডস দিবস কত তারিখে? [জ্ঞান]
ক ১ আগস্ট খ ১ সেপ্টেম্বর
গ ১ নভেম্বর ঘ ১ ডিসেম্বর **ঘ**

৬৭. ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে HIV বহনকারীর সংখ্যা কত ছিল? [জ্ঞান]
ক ৮৮ খ ১৮৮
গ ২৮৮ ঘ ৩৮৮ **খ**

৬৮. ১৫-২৪ বছর বয়সী প্রায় কত লোকের AIDS সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই? [জ্ঞান]
ক ২ কোটির ওপর খ ৩ কোটির উর্ধ্বে
গ ৪ কোটির নিচে ঘ ৫ কোটির নিচে **খ**

৬৯. বাংলাদেশে শতকরা কতভাগ যৌনকর্মী HIV দ্বারা সংক্রমিত? [জ্ঞান]
ক ৫% খ ৬%
গ ৭% ঘ ১১% **খ**

৭০. শতকরা কত ভাগ মোটরশ্রমিক ও রিকশাচালক এইডস সম্পর্কে অজ্ঞ? [জ্ঞান]
ক ৮০% খ ৯০%
গ ৯৬% ঘ ৯৯% **ঘ**

৭১. এইডস এর চরম পরিণতি কোনটি? [অনুধাবন]
ক মৃত্যু খ স্বাস্থ্যহানি
গ কর্মহীন অবস্থা
ঘ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস **ক**

৭২. এইডসের প্রভাব হলো— *[সি. বো. '১৫]*
i. আতঙ্ক
ii. গড় বয়স হ্রাস পাওয়া
iii. জনসংখ্যার প্রতি হুমকি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব পাটোয়ারী তার নাতিকে সাথে নিয়ে টেলিভিশনে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখতেছিলেন। তারা দেখতে পেলেন এইডস (AIDS) বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটি দেখে তারা রোগটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলেন। *[ব. বো. '১৫]*

৭৩. উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটি কীভাবে ছড়ায়?
ক রক্তের মাধ্যমে
খ হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে
গ একই থালা-বাসন ব্যবহার করলে
ঘ একই বাড়িতে বসবাস করলে **ক**

৭৪. উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটির প্রতিরোধে নাগরিকের করণীয়—
i. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
ii. নিরাপদ রক্ত আদান-প্রদান
iii. এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অমিতাভ একজন সাধারণ শ্রমিক। দীর্ঘদিন ধরে তার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। কিন্তু কোনো ধরনের চিকিৎসায় তার এ রোগ সারছে না। ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা করলে জানা যায় তার AIDS হয়েছে।

৭৫. নিচের কোনটি অমিতাভের করা উচিত হবে না? [প্রয়োগ]
ক তার ব্যবহৃত কাপড় ভিক্ষুককে দান করা
খ তার অর্জিত অর্থ এতিমখানায় দান করা
গ তার কিডনি অন্যকে দান করা
ঘ অন্যের সাথে কথা বলা **গ**

৭৬. অমিতাভের সাথে আমরা আচরণ করব — [উচ্চতর দক্ষতা]
i. তাকে এড়িয়ে চলব
ii. আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ
iii. তাকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com